বর্ষ—২৬ সংখ্যা—১

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

(বার্ত্তিকা)

(২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬)

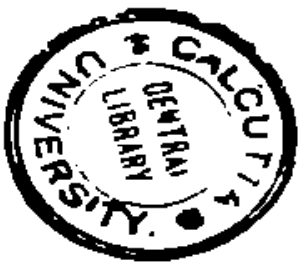

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

মাতৃবাণী		৫
মা কে	শ্রীঅরবিন্দ	৮
গ্রীক ও ভারতীয় সাধন-পদ্ধতি	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১২
শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী		১৯
ভারত কি সত্য	শ্রীঅরবিন্দ	২৩
কঠিন ডানার ওড়া	বীরবাহু	৩৪
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	৪১
প্রসঙ্গত	শ্রীমা	৭১
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু	৭৩

বর্ত্তিকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৭শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা-শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য—১৷৷০ টাকা

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

Edited by: NOLINI KANTA GUPTA

Printed by: AMIYO RANJAN GANGULI
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

PRINTED IN INDIA

১৯৬৬

এস, সত্যের সেবা করি আমরা

—শ্রীমা

মাতৃবাণী

(১)

শিক্ষা সম্বন্ধে

প্রত্যেককেই শরীর দেওয়া হয়েছে কাজটি (অন্তরাত্মার ক্রমবিকাশ) করবার জন্যে। কারণ নিজের মধ্যে এই সব বস্তু (সদ্‌গুণ) যদি অধিকার করা যায় তবেই মানবজাতিকে সাহায্য করা যেতে পারে যাতে সে-সব তার অধিকারে আসে এই পৃথিবীতে।

*

শিক্ষকের সেই সব গুণ, সেই চেতনা অবশ্যই থাকা চাই যা সে চায় ছাত্রেরা অর্জন করুক।

*

কোন্ শ্রেণীর উপযুক্ত কোন্ ছাত্র তা মামুলী পরীক্ষা দিয়ে নির্ব্বাচন করা যায় না। তা সম্ভব কেবল যখন নিজের মধ্যে সত্যকার আন্তর বোধটি বিকশিত হয়েছে।

যারা শিক্ষালাভ করতে চায় সেই সব ছাত্রদের বেছে নাও, যারা নিজেদের জাহির করতে চায় তাদের নয়।

*

"শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে ভারতে?"

—ভারতসন্তানদের প্রস্তুত করা যাতে তারা মিথ্যাকে বর্জন করতে পারে, সত্যকে প্রকাশ করতে পারে।

"তার পথ কি?"

—অধ্যাত্মের প্রকাশের জন্য জড়কে প্রস্তুত করা।

*

"ভারতের সত্যকার প্রতিভা ও নিয়তি"—

—জগৎকে এই শিক্ষা দেওয়া যে জড় হল মিথ্যা ও শক্তিহীন যদি তা অধ্যাত্মের প্রকাশ না হয়।

"আধুনিক বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশলের সার্থকতা কি?"

—তার একমাত্র সার্থকতা জড় প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ়তর পূর্ণতর এবং সফলতর করে তোলা যাতে অন্তরাত্মার প্রকাশ হয়।

*

"জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন"—

—জগতের ভবিষ্যৎ বাধ্য করে ঘটাবে সকল জাতির ঐক্য কিন্তু সকল জাতির ঐক্য সম্ভব হবে তখনি যখন প্রত্যেক জাতি লাভ করেছে তার নিজের ঐক্য।

*

"ভারতের ভাষা সমস্যা"—

—ঐক্য হ'ল একটা জীবন্ত বাস্তব, কোন যদৃচ্ছাকৃত নিয়ম জোর করে প্রয়োগ করা নয়। ভারতবর্ষ যখন এক হবে তখন স্বতঃই সকলের বোধগম্য এক ভাষা তার হয়ে উঠবে।

*

"শিক্ষার বাহ্য ঠাট ছাড়া কি করে দেওয়া যায় তার সত্যকার আন্তর মূল্য?"

—মামুলী ব্যবস্থা সব হতে মুক্ত হও, লক্ষ্য রাখ অন্তরাত্মার বিকাশের উপর।

*

"এখনকার শিক্ষার মোহ মায়া কি? কি রকমে তা থেকে দূরে থাকা যায়?"

—(ক) বাহ্য সাফল্য, পদ ও অর্থকে একান্ত প্রধান্য দেওয়া।

(খ) সকলের উপরে প্রাধান্য দাও অধ্যাত্ম-চেতনার সঙ্গে সংযোগের উপর, সত্তার মূল সত্যকে গড়ে তোলা ও প্রকট করার উপর।

*

ভারতের আছে, বলা ভাল ছিল, অধ্যাত্মের জ্ঞান, কিন্তু সে অবহেলা করেছে জড়কে সে জন্যে দু:খভোগ করতে হয়েছে।

পাশ্চাত্যের আছে জড়ের জ্ঞান, কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করেছে অধ্যাত্মকে, ফলে তাতে দু:খভোগ করে চলেছে বিশেষভাবে।

একটা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা যা যৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে পৃথিবীর সকল জাতির উপযুক্ত হবে তাকে ফিরে নিয়ে আসতে হবে পূর্ণ বিকশিত কর্ম-নিয়োজিত জড়ের উপর অধ্যাত্মের ন্যায়সঙ্গত কর্তৃত্ব।

"সত্য কি?"

—যদি তুমি সত্যসত্যই সত্যের সেবা করতে চাও তবে জানবে সত্য কি? আগে বিশ্বাস, পরে জ্ঞান।

(২)

(বুলেটিন থেকে)

তোমাদের যা ধারণা, মৃত্যু সে রকম কিছুই নয়। মৃত্যুর কাছ থেকে তোমরা প্রত্যাশা কর একটা অচেতন বিশ্রান্তির নির্গুণ প্রশান্তি, কিন্তু ও-জিনিষ পেতে হলে তোমাকে তৈরী হতে হবে সে-জন্যে।

যখন তোমার মৃত্যু হয় তখন তুমি হারাও কেবল তোমার দেহ আর জড়-জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখবার এবং তার উপর কর্ম্ম করবার সকল সম্ভাবনা। প্রাণজগতের যা কিছু তা জড়-বস্তুর সঙ্গে লোপ পায় না ; তোমার সকল বাসনা আসক্তি ক্ষুধা বর্ত্তমান থাকে, সঙ্গে থাকে বার্থতার নৈরাশ্যের বেদনা—এই সমস্তই যে শান্তির প্রত্যাশা করেছিলে তার পরিপন্থী। শান্তি-পূর্ণ বিক্ষোভহীন মৃত্যু যদি ভোগ করতে চাও তবে তার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত কর। আর একমাত্র ফলদায়ী প্রস্তুতি হ'ল বাসনার বিলোপ।

শরীর যতদিন আছে ততদিন আমাদের কাজ করতেই হবে, একটা কিছু কর্ম্মগ্রহণ করতে হবে, শ্রমে লিপ্ত হতে হবে—কিন্তু তা যদি করি, এই জন্য তা আমাদের করতে হবে ফলাকাঙ্ক্ষী না হয়ে—এ-ধরণের হোক, ও-ধরণের হোক কোন আকাঙ্ক্ষা না রেখে তবেই, ক্রমে আমরা অধিকতর নিরাসক্ত হয়ে উঠি এবং তৈরী হই শান্তিপূর্ণ মৃত্যুর জন্য।

—নভেম্বর ১৯৬৪

তমিস্রার মিথ্যার শক্তিদের উপর সত্যের আলোক বিজয় লাভ করবে—এ কাজে সহায় হতে চায় যারা তাদের কর্ত্তব্য সযত্নে পর্য্যবেক্ষণ করা তাদের বৃত্তির ও কর্ম্মের উৎস কোন প্রেরণায়, আর পৃথক করে ধরা যে সব আসে সত্য হতে আর যে সব আসে মিথ্যা হতে থাকে, প্রথমটিকে গ্রহণ করতে পারে, দ্বিতীয়টিকে প্রত্যাখ্যান বা বর্জন করতে পারে। এই নির্ব্বাচনক্ষমতা হল পৃথিবীর পরিবেশে সত্যের আলোক-আবির্ভাবের প্রথম ফল।

ফলতঃ সত্যের প্রেরণাকে মিথ্যা প্রেরণা থেকে পৃথক করে ধরা বিশেষ দুরূহ, সত্যের আলো নিয়ে এসেছে যে বিচারণার বিশেষ দান, যদি তা গ্রহণ করা না হয়ে থাকে। তবুও আরম্ভে সহায়রূপে গ্রহণ করা যায় এই একটা দিশারী নিয়ম যে যা-কিছু সঙ্গে নিয়ে আসে অথবা গড়ে তোলে শান্তি, বিশ্বাস, আনন্দ, সম্মেলন, বিশালতা, একত্ব আর ঊর্দ্ধগতি তা আসে সত্য হতে, আর যা-কিছু বহন করে চাঞ্চল্য, সন্দেহ, সংশয়, দুঃখ, বিরোধ, আত্মসার সংকীর্ণতা, তামসিকতা, নৈরাশ্য, হতাশা তা নির্ব্বিবাদে চলে এসেছে মিথ্যা হতে।

ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫

মা কে

শ্রীঅরবিন্দ

বাহ্য সংস্পর্শের বিনা প্রয়োজনে কেবল যদি মায়ের আন্তর স্পর্শই অনুভব করতে পার তবেই বাহ্য সংস্পর্শেরও সত্যকার মূল্য কার্য্যতঃ ধরা যায়।

*

মায়ের সাহায্য সর্ব্বদাই রয়েছে, তাদের জন্যে যারা তা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।

*

মায়ের শক্তি তোমার সঙ্গেই রয়েছে তুমি তা অনুভব না করলেও।

*

মায়ের শক্তিকে যদি সক্রিয়ভাবে ডেকে আনা সম্ভব না হয়, তবুও আশা নিয়ে থাকবে যে তা আসবেই।

*

তাঁর সান্নিধ্যই তোমাকে তোমার নিজের সম্বন্ধে সচেতন হওয়া সম্ভব করে তোলে।

*

ইহা হ'ল মায়ের জ্যোতি ও সক্রিয় শক্তির প্রতীক—হীরক-দ্যুতি হ'ল মায়ের চেতনার তীব্রতর মাত্রার আলোক।

*

শ্বেত-জ্যোতি হ'ল মায়ের নিজস্ব আলো, তা সর্ব্বদাই তাঁর চারদিকে ঘিরে রয়েছে।

*

শ্বেতজ্যোতি হ'ল তাঁর নিজস্ব বিশিষ্ট শক্তি—ভাগবত চেতনার সার সত্তা।

*

প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট থাকে যেন প্রত্যেককে মা যা দেন তাই নিয়ে। তিনিই শুধু জানেন কে কি গ্রহণ করতে পারে বা পারে না।

*

মায়ের সূক্ষ্ম পরিমণ্ডলে রয়েছে সকল জ্যোতির সকল শক্তির পূর্ণ লীলা।

*

মায়ের দিকে যদি খুলে রাখ নিজেকে তাহলে কাজের জন্যে বা সাধনার জন্যে যা-কিছু প্রয়োজন তা ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠবে।

সৃষ্টি ও রূপান্তর সবই মায়ের ক্রিয়া।

*

মা নিচে নেমে আসেন অতিমানসকে নামিয়ে আনবার জন্যে আর এই অবতরণই তার পূর্ণ আবির্ভাব এখানে সম্ভব করে তোলে।

*

মা কাজ করে চলেছেন এখানে শরীর ধারণ করে, এমন কিছু নামিয়ে আনবার জন্যে মা এযাবৎ এই জড়জগতে দেখা দেননি। উদ্দেশ্য এখানকার জীবন রূপান্তরিত করে ধরা।

*

মায়ের তনুগ্রহণ হ'ল সেই পরম ভাগবত কৃপাকে এখানে সক্রিয় করে ধরবার জন্যে।

*

প্রত্যেক সাধকের মধ্যে মা-ই সাধনা করেন, তবে প্রত্যেকের আগ্রহ এবং ধারণ-সামর্থ্য অনুসারে।

*

প্রত্যেককে নিয়ে মা কাজ করেন পৃথক পৃথক ধরণে প্রত্যেকের সত্যকার প্রয়োজন অনুসারে, তাদের নিজেদের মন-গড়া প্রয়োজন নয়, সাধনায় প্রত্যেকের ক্রমোন্নতির ধারা আর প্রকৃতি অনুসারে।

*

ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি, প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন স্তর—তাদের প্রয়োজন অনুসারে সাধনার কাজ মা করেন, একটা ধরাবাঁধা প্রক্রিয়া কিছু নেই।

*

দুরকমেই মা দিয়ে থাকেন—দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেন অন্তরাত্মাকে, আর হাত দিয়ে দেন স্থূলকে।

*

এক ঘন্টার স্পর্শ আর এক নিমেষের স্পর্শ, দুটিতেই মা দেওয়া হয় তা সমান মাত্রার হতে পারে।

*

কোনও ফুলের মধ্যে মা যখন তাঁর শক্তি ভরে দেন, তখনই তা শুধু প্রতীকের চেয়ে বেশি কিছু হয়ে ওঠে। তখন তা বিশেষ ফলদায়ী হয়ে উঠতে পারে যদি যাকে দেওয়া হয় তার গ্রহণসামর্থ্য থাকে।

*

মা একই, তবে তিনি আমাদের কাছে এসে দেখা দেন তাঁর ভিন্ন ভিন্ন রূপে।

মায়ের শুধু একটি রূপ নয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকার তাঁর।

*

স্থূল দেহের পিছনে মায়ের রয়েছে বহু রূপ, বহু শক্তি, বহু সত্তা।

*

তাঁর ব্যষ্টিরূপ অনেক, তাঁর শরীরও এমন সুনম্য যে সম্মুখে এসে যে রূপটিই দাঁড়াক না, তার কিছুটা প্রকাশ করতে সে সক্ষম।

*

কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকে না যদি জানবার ইচ্ছা হয় তাঁর—সমভাব, ধীরস্থির অথচ ইচ্ছাময়ী তিনি, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে তার প্রকৃতি অনুসারে, প্রত্যেক বস্তুর ও ঘটনার সঙ্গে তাদের আন্তর বল ও শক্তি অনুসারে তাঁর ব্যবহার।

*

তাঁর দৃষ্টিতে সকলেই তাঁর সন্তান—এক অদ্বিতীয়ের অংশ, এমন কি অসুর, রাক্ষস, পিশাচ পর্য্যন্ত, যারা বিদ্রোহী বিরোধী তারা পর্য্যন্ত।

*

অজ্ঞানকে, নির্ব্বোধকে তিনি চালিয়ে নিয়েছেন তাদের অক্ষমতা অনুসারে।

*

তাঁর প্রত্যাখ্যান হ'ল কেবল বিলম্বন, তাঁর দণ্ডও হ'ল তাঁর করুণা।

*

পক্ষপাতিত্ব তাঁর নাই, তিনি অনুসরণ করে চলেন পরমের অনুজ্ঞা।

*

জ্ঞানী যারা তাদের দেন তিনি আরো মহত্তর আরো জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান।

*

দৃষ্টি যাদের আছে, তাদের তিনি তাঁর মন্ত্রণায় গ্রহণ করেন।

*

বিরোধীর উপর চাপিয়ে দেন তাদের বিরোধিতার ফল।

*

তাঁর করুণা তাঁর জ্ঞানকে অন্ধ করে না কিংবা বিধিনির্দ্দিষ্ট পথ থেকে তাঁর কর্ম্মকে বিচ্যুত করে না।

*

তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হ'ল ত্রিনিষের সত্য, জ্ঞানই হ'ল তাঁর শক্তির নাভিকেন্দ্র; অন্তরাত্মাকে, প্রকৃতিকে ভাগবত সত্যে গড়ে তোলাই হল তাঁর ব্রত, তাঁর প্রয়াস।

তাঁর ভাগবতী প্রকৃতি প্রস্ফুরিত হয়ে ওঠে ঋজাবেগ কর্মের প্রোজ্জ্বলতায়।

*

ভয়ঙ্কর তাঁর মূর্তি অসুরের কাছে, বিভীষণ, নির্মম তাঁর হৃদয় ভগবৎ-বিদ্বেষীর উপর।

*

ভাগবত কর্মে উদাসীনা, অবহেলা আলস্য তিনি সহ্য করেন না, যদি প্রয়োজন হয় তবে তীব্র বেদনার আঘাতে অকালে নিদ্রালু আর দীর্ঘসূত্রীকে জাগিয়ে তোলেন।

*

পূর্ণশক্তিতে যখন তিনি কাজে নেমে আসতে পারেন তখন এক মুহূর্তে অসংহত বস্তুর মত চূর্ণ হয়ে যায় যত বাধা সাধককে গতিহীন করে রাখে, যত শত্রু তাকে আক্রমণ করে।

*

তিনি না থাকলে যা একদিনে করা যেত তার জন্য দরকার হয় বহু শতাব্দী।

*

তাঁরই হ'ল ভগবানের বিজয়ী শক্তি, তাঁরই আগুন আর আবেগ আর তীব্রগতির কল্যাণে মহান সিদ্ধিটি সম্পন্ন হবে এখনই, পরবর্তী কোন কালে নয়।

*

তাঁরই থেকে মাধুর্য্য সুষমা স্নেহ প্রবাহিত হয়েছে সূর্য্য থেকে আলোর মত।*

---

* অনুবাদক : শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

খ্রীষ্টীয় ও ভারতীয় সাধন-দৃষ্টি

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

"ন্যায়ের বিধান টলিয়ে দিল আমার ঊর্ধ্বের ভগবানকে
আমাকে গড়ল ভাগবতীশক্তি,
আর সমুচ্চ জ্ঞান আর আদি প্রেম।"

দান্তে নরকের মুখ দিয়ে এই কথাগুলি বলিয়েছেন। নরক কি করে হ'ল, কোথা হতে এল, কি উদ্দেশ্যে? দান্তে তাঁর মহাকাব্যে এই তত্ত্ব ও তথ্য ব্যাখ্যা করেছেন বা চিত্রিত করেছেন।

আমরা জানি, অর্থাৎ সাধারণ লোকেরা জানে, নরক হ'ল পাতকীদের অধার্মিকের জন্য। তারা যে পাপ করে, দুরাচার করে তার জন্য এই দণ্ড তাদের। ভগবান করেন দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন। যদিও বাস্তবে দেখি দুষ্টেরও দমন হয় না, শিষ্টেরও পালন হয় না, অনেক সময় বিপরীতই ঘটে থাকে। তাই বলা হয়, এ জগতে, এ জীবনে যাই হোক মৃত্যুর পরে পরলোকে দুষ্টদের হবে নরকে স্থান আর শিষ্টদের স্বর্গে। ভারতবর্ষে আরও একটু বলা হয়, দুষ্টদের যদি কিছু সুকৃতি থাকে তবে নরকভোগের পর স্বর্গবাসও হতে পারে কিছুকাল—পুনর্জন্ম পর্য্যন্ত। এই পুনর্জন্ম নিয়ন্ত্রিত হয় আবার পূর্বজন্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফলে। দুষ্টদের নরকভোগেও যদি পাপ সর্ব্বতোভাবে ক্ষয় না হয় তবে পরজন্মে তাদের ভোগ করতে হয় ঐহিক নরক—দুঃখ কষ্ট ইত্যাদি। শিষ্টদের পুরস্কার, পরজন্মেও তারা লাভ করে সৌভাগ্য, সুখের স্বস্তির জীবন। কিন্তু এ সবই অনেকখানি লৌকিক গাল-গল্প, অন্ততঃ সত্যের সঙ্গে তথ্যের সঙ্গে মিশে আছে অনেকখানি মিথ্যা ও কল্পনা।

যা হোক দান্তের কথা বলি। তিনি দিয়েছেন খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব, খ্রীষ্টীয় চিত্র। দান্তে বলছেন—

নরক হ'ল অধঃপতনের অবশ্যম্ভাবী উৎকট কর্ম্মফল। মানুষ ভগবানের অবাধ্য হ'ল, কেন হল? ভগবান মানুষকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, যা খুশী সে করতে পারে—হয় ত দেখবার জন্যে পরীক্ষা করবার জন্যে মানুষের টান ভগবানের উপর কতখানি। কিন্তু মানুষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে না, করলে তার স্বাধীনতার অপব্যবহার। নিজের অপকর্ম্মের জন্য মানুষকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, তাই নরকের আবির্ভাব। ভগবান হলেন

পরম ন্যায়-বিধাতা ; এই তাঁর প্রখর রূপ ; তিনি পরম শক্তিমান তাই করলেন নরক-সৃষ্টি ; তিনি পরমজ্ঞানী, জ্ঞানে দেখলেন নরকের সার্থকতা। তাঁর শক্তি আছে নরক সৃষ্টি করবার, আবার শক্তি আছে নরককে ঘুরিয়ে স্বর্গের দিকে নিয়ে চলবার অথবা নরককে উপরে উঠবার সিঁড়িরূপে পরিণত করা। কারণ ভগবান যেমন বিধি, তাঁর নিয়ম যেমন অটুট অটল, তাঁর ন্যায়দণ্ড যেমন দৃঢ় প্রভু, তেমনি তিনি আবার কেবল নির্মম বিধান নন। তাঁর সকল অনতি-ক্রমণীয় অব্যভিচারী নিয়মের পিছনে রয়েছে প্রেম, পরম প্রেম। মানুষ নিজের কর্মদোষে কর্মফল ভোগ করে অনিবার্যভাবে—কিন্তু তারই ভিতর দিয়ে, তারই কল্যাণে পরিশ্রান্ত পরিক্ষুব্ধ পরিশুষ্ক হয়ে ক্রমশঃ নরক পার হয়ে যায় স্বর্গ ; পরিণামে আসন গ্রহণ করে ভগবানের সান্নিধ্যে—সকলে না হোক বিশেষ এক গোষ্ঠী।

কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে, মানুষের যে পতন তা তার নিজের ইচ্ছাকৃত হ'লেও পতনের পরে পতনের আশ্রয়ে তার যে ঊর্ধ্বায়ন তাতে নিজের কৃতি তার কিছু নেই। এ পরিণাম তার আপন সামর্থ্য বা চেষ্টার—তার সুকৃতির ফল নয়। ভগবান দণ্ড দিলেন কর্মফলদাতা ঈশ্বর হিসাবে, তাকে উদ্ধার করে নিয়ে চললেন স্নেহের ডোরে, পরম প্রেমিক-রূপে। মানুষের উদ্ধার উত্তরণ শুধু সম্ভব ভগবৎ-করুণায় ভগবৎ প্রসাদে ভগবৎ-প্রেমে।

ভগবান দেখলেন মানুষ পারবে না নিজের চেষ্টায় উঠে দাঁড়াতে, ফিরে আবার শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে ভগবৎ-সামীপ্যে পৌঁছিতে। তিনি নিজে তাই নেবে এলেন এই পৃথিবীতে—ঠিক নিজে নয়, নিজের পুত্ররূপে—মানুষী শরীর ধারণ করলেন, মানুষের পাপভার নিজের উপর গ্রহণ করলেন, মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তিনিই করলেন, পাপের ফল দুঃখকষ্ট অত্যাচার উৎপীড়ন এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত (মৃত্যু নয় নিষ্ঠুর হত্যা) নিজে বরণ করে নিলেন। পাপের ফল নিজে গ্রহণ করে মানুষকে মুক্ত করলেন পাপের ভার থেকে। নতুবা মানুষের সাধ্য নাই যে সে নিজে নিজের পাপভার থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। মানুষের সাধ্য নাই উপরে উঠবার, নরক থেকে উঠে দাঁড়াবার, ভগবান নিজে যদি তাঁর করুণায় হাত প্রসারিত করে না দিতেন নরক অবধি এবং নিজে তাঁকে তুলে না নিতেন। সে সামর্থ্য মানুষের যদি থাকতই উপরে উঠবার, তাহলে তার পতনও ঘটত না। তার পতন হয়েছিল তার প্রকৃতিগত দুর্বলতার জন্য, সে সবল হতে পারে শুধু ভগবৎ-কৃপায় বলে।

ভারতবর্ষ, প্রাচীনতর ভারত, বৈদিক কি বৈদান্তিক ভারত এ ধরণের কথা বলে নি। মানুষকে সে বলেছে "তুমি মানুষ নও, তুমি আত্মা, তুমি ভগবান্, তুমি সর্বশক্তিময়।" দুঃখ দৌর্বল্য মৃত্যু দিয়ে গড়া এই যে মানুষের রূপ তা তার স্বরূপ নয়। রূপ হ'ল মিথ্যা মায়া ভুল জ্ঞান, অজ্ঞান। মানুষের জ্ঞান লাভ করতে হবে, সজ্ঞান হতে হবে, তবেই তার ক্ষণিকের ভ্রান্তি ঘুচে যাবে, দুঃস্বপ্ন মুছে যাবে, হবে স্বরূপে স্ব-সত্যে প্রতিষ্ঠিত। এই শক্তি মানুষের আছে, কারণ সে নিজেই সেই শক্তি, তৎ ত্বমসি, সোঽহম্।

কিন্তু এ হ'ল একটি ধারা। পরম ও চরম কৈবল্য তত্ত্ব হল এই। লোকাতীতের

বিশ্বাতীতের তত্ত্বের সত্য। কিন্তু এ ছাড়াও আছে আবার সৎবস্তুর সত্য। বিশ্বাতীত নয়, বিশ্বগত, বিশ্বভূত যে সত্য। ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা ছাড়া আছে আবার মায়ারও জিজ্ঞাসা। তাই বলা হয় ব্রহ্মরূপী ভগবান ছাড়া আছে আবার জগৎরূপী জীবরূপী ভগবান। জগৎরূপী জগৎগত, জগৎ-ভূত ভগবানের নামই ত' ঈশ্বর। এই দিক দিয়ে দেখলে বুঝব মায়া কেবল মায়াই নয়, জগৎ কেবল মিথ্যা নয়, তা-ও সত্যের এক অংশ এক-দিক। ব্রহ্মের প্রকাশ হিসাবে ভগবানের লীলাক্ষেত্র হিসাবে সৃষ্টির রয়ে গেছে গভীর এক রহস্য।

জগৎ দুঃখময়, সৃষ্টি অজ্ঞান-প্রসূত; জগৎ থেকে উদ্ধার চাই, সৃষ্টি অতিক্রম করা চাই—ভারতীয় সাধনার ও প্রজ্ঞার অনেকখানিই জুড়ে আছে এই সিদ্ধান্ত কিন্তু তার চেয়ে গভীরতর যা তিনুতর রহস্য ভারতের অধ্যাত্ম প্রজ্ঞা আবিষ্কার করেছে, আর এক তত্ত্ব সেটি—তা হল এই যে ভগবান সৃষ্টিকে সৃষ্টি করে চলে যান নি বা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন নি সৃষ্টির বাহিরে কোথাও, তিনি নিজেকেই সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন, তার অণুপরমাণুতে আপন সত্তাকে লুকিয়ে রেখেছেন, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে রয়েছেন—রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।

ভগবানকে মানুষী জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হ'লে, মানুষের দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হলে, ভগবানকে বিশেষ করে মানুষী রূপ গ্রহণ করে, ধারণ করে জন্মগ্রহণ করবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ পৃথিবীতে দুঃখী যত দীন যত হীন যত পাপী যত সকলেই স্বয়ং ভগবান। ভগবান নিজে ঐ সব মূর্ত্তি গ্রহণ করে পৃথিবীতে জীবনধারণ করছেন। সর্ব্বভূতে ভগবান, সর্ব্বভূতই ভগবান, এ হ'ল এক অপূর্ব্ব ভারতীয় আধ্যাত্মিক উপলব্ধি—সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম—সর্ব্ব অর্থ সর্ব্বই, ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক, পাপী-পুণ্যবান, সুখী-দুঃখী, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, দুর্ব্বল-সবল, সচেতন-অচেতন, দেবতা থেকে বালুকণা অবধি সকলের মধ্যে ব্রহ্ম নিবিষ্ট, অনুস্যূত—সকলের সত্য-সত্তা স্বরূপ ব্রহ্মই; সকলে, প্রত্যেকে সত্যসত্যই ব্রহ্ম—এ কেবল উপমা নয়, চিত্র নয়—আক্ষরিক সত্য।

তবে এ হল বিশ্বগত বিশ্বভূত ভগবান, সাম্বিক ব্রহ্ম। প্রথমে বলেছি বিশ্বাতীত ভগবানের কথা, সর্ব্বাতীত তৎ সত্যের কথা, একান্ত কৈবল্যময় সচ্চিদানন্দ যে। তবে ভগবানের আর এক তৃতীয় রূপ আছে ব্যক্তিরূপ, যখন তিনি বিশেষ ব্যক্তি হয়ে ব্যক্তিগত সত্তা ধারণ করে মানুষী তনু গ্রহণ করেন। খ্রীষ্টানেরা যেমন বিশ্বাস করেন, দাবী যা বলেছেন, খ্রীষ্ট হলেন সেই ব্যক্তিরূপী ভগবান। তবে খ্রীষ্টিয়ানদের মতে ভগবান কেবল এই একটিবারই নরদেহ ধারণ করে পৃথিবীতে লীলা করেছিলেন, দুহাজার বৎসর পূর্ব্বে একবার মাত্র। এর আগেও তিনি ও-ভাবে আবির্ভূত হননি, পরেও হবেন না। ভারতীয় উপলব্ধি দেখেছে ভগবান বলছেন "সম্ভবামি যুগে যুগে"। কেন? কোন উদ্দেশ্যে? ধর্ম্মের যখন গ্লানি হয় অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখনই তিনি নেমে আসেন দুষ্টের দমনের জন্য, শিষ্টের পালনের জন্য। ব্যক্তিবিশেষ রূপ নিয়ে তিনি অবতীর্ণ হন—তিনি অবতার তখন।

মানুষের, মানবজাতির শিক্ষা-দীক্ষা অনুসরণ করে একটা যুগক্রম। ভারতবর্ষে বলা হয়েছে চতুর্যুগের কথা। পাশ্চাত্যেও আছে এর প্রতিধ্বনি। মানুষ প্রথমে থাকে শুদ্ধ সিদ্ধ পূর্ণচেতনা নিয়ে, এই চেতনা ক্রমে ক্ষয় লাভ করে। শেষ অবস্থায় চেতনার প্রায় কিছুই থাকে না। এক পাদ করে তার চেতনা গ্রস্ত হয়ে যায়। এই চতুর্যুগ হ'ল, আমরা জানি সকলেই—সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি।

ভগবান হলেন যুগান্তরকারী যুগ-প্রবর্ত্তক। কালের প্রয়োজন অনুসারে কোন বাধা-বিঘ্ন দূর করতে হবে, কোন নূতন সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে তা তিনি নিজে এসে নিজের জীবনে কার্য্যতঃ দেখিয়ে দেন।

আমাদের দেশে প্রচলিত সিদ্ধান্ত অনুসারে মানুষের যুগক্রম চলেছে চক্রাবর্ত্তে। অর্থাৎ প্রায় একই ধারার পুনরাবৃত্তি মাত্র—একই চতুর্যুগের আবর্ত্তন চলেছে নিত্যকাল। পৃথিবীতে সৃষ্টির মধ্যে মানবজাতির যে একটা ক্রমোন্নতি চলেছে এই যুগান্তর ধারার ভিতর দিয়ে তা মনে হয় না। শুধু তাই নয়, যুগচক্রে দেখি অভ্যুত্থানের চেয়ে পতনেরই লীলা। চিত্রটি কিন্তু বিস্ময়জনক। মানুষ আরম্ভ করে তার সমুচ্চতম পরিপূর্ণ চেতনা দিয়ে, সত্যযুগ দিয়ে কিন্তু ক্রমে হয় তার পতন। যখন পতনের শেষ সীমা, কলিযুগ, তখন একটা প্রলয়কাণ্ড হয়, আবার নূতন সৃষ্টি হয় সত্যযুগ দিয়ে। তারপর আবার সেই পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

ভারতের প্রচলিত ঐতিহ্য এই। ক্রমোন্নতির ধারা আছে কিন্তু সেটি সমষ্টিগতন য়, ব্যষ্টিগত। ব্যক্তি-মানুষ জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে ক্রমশুদ্ধ ক্রমপরিণত বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে চলেছে ঊর্দ্ধতর চেতনার দিকে। প্রথম অবস্থায় সে থাকে অজ্ঞানের মধ্যে, প্রাকৃত চেতনায় আবদ্ধ। ক্রমেই মুক্ত হয়ে তার আত্মা উঠে যায় ভগবানের দিকে। ফলতঃ একদিক দিয়ে যুগচক্রের আবর্ত্তনও অজ্ঞানের বা অর্দ্ধজ্ঞানের লীলা। তা থেকে মুক্ত হওয়া, তা অতিক্রম করে চলে যাওয়াই মানব-আত্মার লক্ষ্য। বিশ্বমানবের সমবেত মুক্তি বা অধ্যাত্ম-সিদ্ধি সম্ভব নয়। তবে ব্যক্তিগতভাবে মানুষ সে চেষ্টা করতে পারে।

একটা সমবেত মুক্তি ও সিদ্ধির স্বপ্ন অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মুক্তি ও সিদ্ধি মানুষ দেখেছে এখানে, ওখানে—প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যেও, কিন্তু তা কোথাও স্থির লব্ধপ্রতিষ্ঠ হতে পারে নি—সম্যক জ্ঞানের অভাবে, সম্যক শক্তির অভাবে, হয়ত বা কাল সমাগত নয় বলে।

খ্রীষ্টীয় সিদ্ধান্তে বলা হয় "City of God", "Reign of Saints" প্রভৃতির কথা। আমাদের বৈষ্ণব আদর্শে পাই অদ্বৈত আচার্যের প্রেমরাষ্ট্র। কিন্তু সে বস্তু কতখানি ঐহিক এবং কতখানি পারলৌকিক, কতখানি অন্তরের চিন্ময় জগৎ আর কতখানি স্থূলের মানুষী সমাজ, তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে।

যা হোক, খ্রীষ্টীয় অবতারের কথা বলছিলাম। তার মূল কেন্দ্রগত সত্য হ'ল এই যে ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন স্বয়ং মানুষী রূপ নিয়ে—পূর্ণ স্বয়ং না হোক তাঁর আপন অংশ এক, আত্মপ্রতিম আত্মজ তাঁর। এবং এই অবতরণের একমাত্র হেতু ও প্রেরণা হল তাঁর সমুচ্চতম প্রেম—দান্তে যাকে বলছেন 'আদি প্রেম' (primo amore)। ভগবান প্রেমময়, মূর্ত্ত প্রেম, আর সে প্রেম মানুষী কল্পনার মধ্যে ধরা যায় না। আর এই প্রেমের প্রধান উপাদান হ'ল সহানুভূতি। মানুষের দুঃখ দৈন্য রোগ শোক দূর করা, দূর করার চেয়ে তাদের অংশ গ্রহণ করা হ'ল এই প্রেমের লক্ষণ ও অভিব্যক্তি। প্রেমের ভগবান অর্থ হ'ল আর্ত্তের বন্ধুজন। এখানে দুঃখের অংশ গ্রহণ করার মধ্যে একটা বিশিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে এবং তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে একান্তভাবে, প্রায় অনন্যানুষী হয়ে। ভগবান মানুষের দুঃখ শোক শুধু ভোগ করেন না, নিজের মধ্যে তিনি আকর্ষণ করে নেন যাতে মানুষের ভার লাঘব হয় এবং সে সবের থেকে মুক্ত হওয়ার পথ তাদের সহজ সরল হয়। এই ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে তাঁর একটা নিবিড় আদান-প্রদান ঘটে। তারই চিত্র হ'ল খ্রীষ্টের নৈশভোজ (supper)। তিনি যে পানীয় বিতরণ করেন তা সত্যসত্যই তাঁর নিজের রক্ত এবং যে খাদ্য পরিবেশন করেন তা হ'ল তাঁর মাংস। এই অনুষ্ঠানের নাম ইউকারিস্ট (Eucharist) অর্থ মহাকৃপা—খৃষ্টের রক্তমাংস আত্মসাৎ করা হয় এই রক্তে এবং ঐ রক্তে খ্রীষ্টের সঙ্গে একান্ত পূর্ণ সাযুজ্য লাভ হয়। এই একটা দেহজ অন্তরঙ্গ সংযোগের ফলে ভগবান মানুষের মধ্যে নিয়ে আসেন শুদ্ধি, স্বস্তি, শান্তি।

ভারতীয় অবতার একটু বিভিন্ন প্রকৃতির। বলেছি ভারতীয় দৃষ্টিতে অবতার হলেন প্রধানতঃ যুগপ্রবর্ত্তক অর্থাৎ নূতন ধর্ম্মের বা নূতন করে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। জগতে মানুষের চেতনায় ও জীবনে ধর্ম্মের অধোগতি হয়েছে, ধর্ম্ম ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, মানুষের ও জগতের দুঃখের কষ্টের দুর্যোগের মূল হেতু তাই। একটা অজ্ঞানের শক্তি আসুরিক চেতনা মানুষকে জগৎকে অধিকার করে। তার বশীভূত হয়ে কবলিত হয়ে মানুষ প্রবেশ করে এক অন্ধকারের আত্তির জীবনে। অবতারের কর্ম্ম এই আসুরিক শক্তিকে যুদ্ধে পরাভূত করে দূর করা এবং এইভাবে মানুষকে জগৎকে মুক্ত করা উদ্ধার করা। খৃষ্ট তবেও রয়েছে শয়তান। কুরুক্ষেত্রে অর্জুন যে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করেছেন তা হল এক রকম ভাগবত-অবতারের নিত্যকার আসুরমূর্ত্তি—"কালোঽস্মি লোককয়কৃৎ"। পরাশক্তি জগৎজননীর যুগে যুগে অসুরঘননী মূর্ত্তিও আমরা দেখেছি। অবতারের ব্রতে এই হল কর্ম্মকাণ্ড।

এই কর্ম্মও প্রতিষ্ঠিত অবশ্য সম্যক জ্ঞানের উপর, পূর্ণ প্রেমের উপর। সে জ্ঞানের পিছনে আবার রয়েছে পরম প্রীতি বা প্রেম। তবে এ প্রেম রয়েছে অন্তরে নিভৃতে যতখানি, ততখানি বাইরে হয়ত প্রকট নয়।*

---

* দান্তেও উল্লেখ করেছেন ভগবানের এই তিনটি গুণ বা বিভূতির প্রকাশ : (১) la divine potestate, ভাগবত শক্তি ; (২) la summa sapienza, পরম জ্ঞান ; (৩) il primo amore, আদি প্রেম।

ভারতের প্রাচীনতর আধ্যাত্মিক পন্থায় প্রেমকে হৃদয়-বৃত্তিকে যথাসম্ভব সংযত সংবৃত অন্তরঙ্গ করে রাখা হয়েছে, যতখানি সম্ভব অন্তরাত্মা অন্তঃপুরুষের আধারেই গভীরে গাঢ়ত্বে রাখা হয়েছে। সর্ব্বদাই বলা হয়েছে অন্তর্হৃদয়ের, হৃদয়গুহার কথা। প্রেমের হৃদয়াবেগের পরিবর্ত্তে বলা হয়েছে যে কথাটি নিরন্তর তা হল আনন্দ, রস। ভগবান প্রেমময় এ কথার পরিবর্ত্তে বেশি বলা হয়েছে ভগবান আনন্দময়, রসময়। বেদে উপনিষদে বলা হয়েছে এই আনন্দের রসের বার্ত্তা। সে যুগে এর বোধ হয় প্রয়োজন ছিল।

হৃদয়, হৃদয়বৃত্তির বাহ্য প্রকাশ, মর্য্যাদা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মর্য্যাদা এল পৌরাণিক যুগে এবং তার পূর্ণপ্রকাশ মধ্যযুগে। এ ক্ষেত্রে খ্রীষ্ট হলেন একজন পুরোধা বা অবতার—দিব্য আনন্দকে যিনি দিয়েছেন একটা ঐহিক প্রেমের বৃত্তি, মানুষী রূপ ও ছন্দ।

বৈষ্ণব জগতেও প্রেমময় ভগবান আপনাকে প্রকাশ করেছেন কিন্তু কিছু অপরূপ ভাবে—সে প্রেমময় ভগবানের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় দুঃখময় ভগবানের কোন সম্বন্ধ নাই। বৈষ্ণব ভাবে ভারতীয় প্রথায় প্রেমকে আনন্দের দিকে যথাসম্ভব টানা হয়েছে এবং এতখানি একান্ত করে ধরা হয়েছে, তাকে পরিণত করা হয়েছে হর্ষে পুলকে ভাবে উল্লাসে—রসময়কে এতখানি রাসময় করে দেখান হয়েছে—প্রেম পরিণত হয়েছে এত সর্ব্বতোভাবে মধুরভাবে, শৃঙ্গার-তিলকে—যে সে বস্তু পাশ্চাত্যের প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত; পুরাতন বাইবেলে—সলোমানের গানে—তার প্রতিধ্বনি হয়ত কিছু পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু আধুনিক খ্রীষ্টের বাইবেলে তার কোন হদিশ নাই।

খ্রীষ্টীয় ভাগবত প্রেমের দুইটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে—প্রথমতঃ প্রেমাস্পদের দুঃখকষ্ট নিজের মধ্যে গ্রহণ করা, তার সুখের পুণ্যের ভাগী হওয়া অপেক্ষা তার দুঃখের পাপের ভাগী হওয়া অনেক বেশি পরিমাণে। এইভাবে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজের পথে নিজের চেতনায় তুলে ধরা। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল শুধু ভাবে ও চেতনায় একাত্ম হওয়া নয়, অন্তঃশরীরে পর্য্যন্ত একটা নিবিড় আদান প্রদান, যার ফলে হয় প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের 'পদার্থান্তর' (trans-substantiation)। পূর্ব্বে বলেছি তার কথা। খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যে উচ্চতর স্তরের সাধকদের মধ্যে একটা বিচিত্র ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাই। তাঁদের দেহে ফুটে ওঠে ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের দেহের রক্তাক্ত চিহ্নগুলি—খ্রীষ্টের দেহের (সূক্ষ্মদেহের) সঙ্গে তাঁদের স্থূল জড়দেহ এতখানি মিলে মিশে গিয়েছে।

ভারতের প্রাচীন সাধনা, বৈদান্তিক সাধনা এই দিকটি উহ্য রেখে গিয়েছে, বলেছি—বলেছি আধ্যাত্মিকতার এ রকম পরিণতি কিছু দেখতে পাই তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব ধারায়। তবে ভগবান মানুষের দুঃখ গ্রহণ করেন, পাপ গ্রহণ করেন—অর্থাৎ মানুষ যে রকমে ভোগ করে এ সব অনর্থ, এই খ্রীষ্টীয় উপলব্ধি ভারতের ভূমিতে, আবহাওয়ায় তেমন ভাবে ফুটে ওঠেনি।

ভগবানের সঙ্গে, ভগবৎ-আধারের সঙ্গে মানুষী আধারের যে নিবিড় আদান-প্রদানের

রহস্য খ্রীষ্টীয় সাধনায় রয়েছে তার অনুরূপ উদাহরণ কিছু গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধের মধ্যে আমরা পাই ভারতীয় ধারায়। তবে খ্রীষ্টীয় প্রথা দুঃখের বেদনায়—পাপবোধের—যতখানি মাহাত্ম্য ও মর্য্যাদা দিয়েছে আমাদের দেশে তা হয়নি। সাধকের কর্ম্মভার গুরু নিজের উপর গ্রহণ করেন বটে কিন্তু তা গুরুর কর্ম্মের অংশমাত্র এবং তারও মধ্যে পাপভার গ্রহণ আরও গৌণ অংশ। আসলে গুরু নিয়ে আসেন আনন্দ আলোক সামর্থ্য—তাই ঢেলে দেন শিষ্যের আধারে, তাতেই আপনা হতেই শিষ্যের সব ভার ক্রমে লঘু হয়ে যায়, সব মালিন্য ঘুচে যেতে থাকে আপনা হতে। এই হ'ল গুরুর অবদান। খ্রীষ্ট হলেন "The man of Sorrows", তাঁর বাণী তাই "Blessed are they that mourn, for they shall be comforted." তবে খ্রীষ্টীয় সাধনায় দুঃখের চেতনা পাপের চেতনা অনুশোচনা যে এতখানি প্রাধান্য পেয়েছে তার কারণ হয় ত এই যে এ ধরণের অনুভব নিয়ে আসে একটা বিশেষ ধরণের তীব্রতা, একাগ্রতা, অভীপ্সার আবেগ এবং সাধনার ক্ষেত্রে এ জাতীয় প্রেরণার বিশেষ উপকার ও প্রয়োজন আছে বলা বাহুল্য। পাশ্চাত্যের ঐতিহ্য রস-সৃষ্টিতে আমরা যেমন দেখি tragedy-র মাহাত্ম্য একান্তভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও খ্রীষ্টীয় ধারায় তারই জের টানা হয়েছে মনে হয়। এ হল যেন দুঃখভোগে, দুঃখাভিঘাতের * ফলে Katharsis-র চিত্তশুদ্ধি।

খ্রীষ্ট বলছেন—

'I came not to bring peace but a sword.'

—কথা ক'টি খুবই অর্থপূর্ণ—অর্থ এই যে মানুষের হ'ল যোদ্ধৃ আত্মা, তাকে যুদ্ধ করে চলতে হয় রাত্রির অন্ধকারে, এগিয়ে যেতে হয় অন্ধকার ঠেলে ঠেলে—Dark Night of the Soul—শয়তানের বাকো আমরা দেখেছি দান্তের মতে আধ্যাত্মিক সত্তা অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ হ'ল নরক এবং আঁধার আর এক তৃতীয়াংশ আলোআঁধার (Purgation), বাকী এক তৃতীয়াংশ হ'ল কেবল আলো। তবে কার্যতঃ খ্রীষ্টীয় সাধকের এ জীবনে পৃথিবীতে সবটাই প্রায় হ'ল রাতের আঁধার—মহানিশা।

খ্রীষ্টীয় সাধনায় অন্তশ্চেতনায় রাত্রির অন্ধকারের স্থান দেওয়া হয়েছে অনেকখানি, আমরা জানি। কিন্তু আর একটা পথ আছে—দিনের পথ, সূর্য্যালোকের পথ, সূর্যাযান, শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন Sunlit path, ভারতের সাধনা, আধ্যাত্মিক সাধনা সেই পথই অনুসরণ করতে চেয়েছে। তার সমস্ত লক্ষ্য ছিল প্রয়াস ছিল যেন নিরন্তর অবিচ্ছিন্ন ভাবে অনিমেষ দৃষ্টিতে সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে—জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে।

---

* দুঃখেনাভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা—(সাংখ্য)।

শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী

(২)

দ্বিতীয় পর্ব্ব :

প্রথমেই সে উপস্থিত হ'ল গিয়ে সূক্ষ্ম জড়ের এক মোহন গান্ধর্ব রাজ্যে—

"অপরূপ এক গোপন কক্ষে জড় ও আত্মা সজ্ঞানে মিলিত...
আত্মার উজ্জ্বল আলোর সঙ্গে ওতপ্রোত অনুস্যূত
জড়ের ভারবহ শক্তি

এখানে একমাত্র লক্ষ্য হল রূপের পূর্ণাঙ্গ সৌষ্ঠব, দৃঢ়বদ্ধ গঠন, তার একান্ত স্বকীয় অনন্য পরিপূর্ণতা—

"এখানে সব সমাপ্ত, কোন অবকাশ কোথাও নাই—
কোন ছিদ্র নাই, অপ্রত্যাশিত আকস্মিক কিছু প্রবেশ করতে পারে না,
আত্মা-পুরুষ রয়েছে পিছনে দাঁড়িয়ে আবেষ্টনের আড়ালে নিজেকে মুছে দিয়ে"

অশ্বপতি কিন্তু এতে সন্তুষ্ট নন, তিনি আরও এগিয়ে চললেন, প্রবেশ করলেন জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন সংগ্রামক্লিষ্ট ক্ষেত্রে সব।

"জীবন সেখানে অপরিমেয় প্রকাশ,
চঞ্চল সাগরের আন্দোলন,
আকাশের গর্ভে অধ্যাত্ম-পুরুষের এক দীর্ঘ দুঃসাহসী উত্তরণ"

জীবনের নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় সার, তার অন্তর্নিহিত ধারা হ'ল আনন্দের ধারা ; জীবনকে তবু সে অব্যাবদ্ধিত রেখে চলে—তার একদিকে, উপরের দিকে, অহংকারের শিখর সব আর একদিকে হতাশার গভীর অচল, এ দুয়ের মাঝে—সে আসক্ত অপূর্ণ খণ্ড সুখে, তাতে সে ভুলে যায় সার-বস্তুকে, লাভ করে শুধু অসন্তুষ্টি।

"কিন্তু কোন যাদুর প্রভাবে বুকের শ্বাস উঠে চলেছে আপন পথে...
তবে তখনই আবার আঁধারের অনিশ্চয়ের এক সত্তা এসে
জাগিয়ে তোলে সংশয়"

জীবনকে তখন আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে হয় কেবল অর্থ-সাফল্যের ভিতর দিয়ে। ধূসর অন্ধকার, ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র প্রবৃত্তিতে ভরাট, তাদের অধীশ্বর হল রাবন দেবতাদের বাহিনী ;

তার মধ্যে থেকে উঠে আসে মানুষের সংগঠনী বুদ্ধি-শক্তি। কিন্তু এ শক্তি ত' জিনিষের গোপন অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না, সে দেখে শুধু উদ্ভিদানা আর ফেনপুঞ্জ যা থেকে তৈরী হয় তার অহংকারের কর্মশালা, যা অবরোধ করে রাখে অন্তরাত্মার মন্দির সব।

কিন্তু এমন এক মুহূর্ত্ত আসে যখন এই গণ্ডীবদ্ধ পরিবেশে ক্রমবর্দ্ধমান আকুতি খুলে দেয় অতলের মুখ—তার সহায় হয় এক সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রশান্তি :

"বিশ্ব-শশিত, হৃদয় কন্দরে ভাগবত জ্যোতি ধারণ করে"

আর অপরিসীম এক মুক্তির পূর্ব্বাভাস জেগে ওঠে। সত্তার ক্রম-বর্দ্ধমান সংকল্পের আহ্বানে আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে এক সাক্ষী-আত্মা—রূপাবলির নিগূঢ় তাৎপর্য্য—প্রতীকের দেবত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে আরম্ভ করে সে। এই বৃহত্তর চেতনা রয়েছে আমাদের নিজস্ব রাজ্যের সীমানা ঘিরে, তারই মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে তার মূল গতি-ক্রিয়া সব। মনের পাশ-বন্ধন অসীমকে ত' ধারণ করতে পারে না ; দূরের ব্যবধান স্ফুটতর হয়েছে। অচেতনার অপরূপ আবির্ভাব অতিক্রান্ত হয়েছে বটে কিন্তু পরাচেতনার অপরূপ আবির্ভাব অধিগত হয়নি। এই ব্যবধান ভরাট করে দেবার উদ্দীপনায় নীরবতা মুখর হয়ে উঠেছে অজস্র কণ্ঠে, কিন্তু এই কোলাহলের মাঝে হারিয়ে গিয়েছে পরমের অদ্বিতীয় বাণী।

এই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অশ্বপতি অবতরণ করলেন রাত্রির অন্ধকারে—তিনি নেমে গেলেন অশেষ গোলক-ধাঁধার পথে।

"সেখানে দেবীমূর্ত্তি সব বিচরণ করে ঘোরবর্ণা উলঙ্গিনী
ত্রাতাস সন্ত্রস্ত এক বিপুল অস্বস্তিতে—"

এদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অশ্বপতি প্রবেশ করলেন এক রাজ্যে যেখানে কপটতা তার সঙ্গী শ্লেষকে নিয়ে স্থাপন করেছে তার নির্লজ্জ স্বাচ্ছন্দ্য। রাজ্যহীন রাজাহীন এক রাজধানীতে উপস্থিত হলেন যেখানে অহং জেগে রয়েছে ভ্রান্তির গতিবিধিকে অব্যাহত রাখতে ; আর প্রত্যেকেই প্রত্যেকের যাতনাক্লিষ্ট কণ্ঠে জর্জরিত হয়ে আপন আপন রাত্রির অন্ধকারে বিক্ষুব্ধ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আরো নীচে একটা সীমানা পার হয়ে যেখানে ইন্দ্রিয়-সকল তাদের বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে—অশ্বপতি চলতে চলতে চললেন এক স্বপ্নের ঘোরে—একটা যেন বস্তি-কুঠুরীর মধ্যে দেখতে পেলেন প্রলুব্ধকারিণী রক্তসোন্মত্তা এক অপরূপা বারাঙ্গণাকে। তারই বুকের উপর জীবনধারা টেনে আনে আত্মঘাতী চিন্তাকে, মনকে দেবার সেই সব চিন্তা অন্তরাত্মা যা ঘৃণা করে, দেহকে জোর করে সম্মত করায় সেই ছন্দে চলতে।

অশ্বপতি যুদ্ধ করে চলেন এমন সব শক্তির বিরুদ্ধে, মানসের আলো অপহরণ করে এরা। একটা আসন্ন বিভীষিকা সব বুঝি গ্রাস করে, তার সম্মুখে অশ্বপতির শেষ চেষ্টা নিজের নিজত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে।

"তারপর শান্তি ফিরে এল, ফিরে এল অন্তরাত্মার ঐশী-দৃষ্টি
একটা শূন্য তীতির প্রত্যুত্তরে এল প্রশান্ত জ্যোতি;
অক্ষর অমর অজাত বিপুল মূক
মহাদেবতা জাগল তার অন্তরে"

অবশেষে বিশ্বগুহার সুষুপ্তি-ঘোরে তখন যেন প্রকৃতির একটা গুপ্ত দুয়ার খুলে গেল—

"অদৃশ্য হাত একখানি নেমে এল ব্যাপ্তির উপর বেদনার উপর
তা হয়ে উঠল তীব্রানন্দের শাসন"

নরকের বিপুল তোরণ খুলে গেল দুই ভাগে, রাত্রির অবসান হল; অশ্বপতি উপস্থিত হলেন প্রথম এক স্বর্গে, জীবনের মহান দেবতাদের স্বর্গে—যাঁরা জয় করেছেন তাঁদের আনন্দ, জয় করেছেন তাঁদের শক্তি। জীবনের সার হ'ল যজ্ঞ—তাতে আহুতিদান চলেছে প্রতিনিয়ত—এখন সে আহুতি চলেছে প্রদাতার জ্ঞানের আনন্দের ভিতর দিয়ে, গ্রহীতার অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে।

কিন্তু পরম লীলাময় যতই নিকটে থাকুন না তিনি মানুষের অনধিগম্য চিরকাল।

অচেতনার, অবচেতনার রাত্রি পার হয়ে বিধাতার কুটিলতার বাধা অতিক্রম করে অশ্বপতি এখন উঠে এলেন যাকে মনে হল যেন মুক্তির আনন্দের আলোর জগৎ। দেবতারা সব এখানে সোমরস পানে উল্লসিত, তাদের হাস্যে সঙ্গীতে দিক মুখরিত। এ যেন প্রেমের অভিসারের মধুময় জগৎ। সাযুর্য্য বাসনা সুখভোগ স্বপ্ন এনে দিয়েছে যেন নন্দনের মাধুর্য্য। এখানে যেন অমরত্ব কালকে বন্দী করে রেখেছে, জীবনকে সস্নেহে বহন করে চলেছে। এ হ'ল প্রাণদেবতাদের স্বর্গ।

কিন্তু এ জগৎও ছেড়ে উঠে যেতে হবে। এ স্বর্গের সীমানা সঙ্কীর্ণ; অন্তরাত্মা তাতে সন্তুষ্ট হতে পারে না। এই সৌন্দর্য্য নিভে যায় মুছে যায় নূতন পর্য্যায়ে। এখন তবে দেখল সে

"ঊর্দ্ধে রয়েছে এক তীব্র শুভ্র প্রশান্তি
ধ্যানী চেতনা এক তাকিয়ে রয়েছে লোকসমূহের দিকে।
উজ্জ্বল আকাশের পর উজ্জ্বল আকাশ উঠে গিয়েছে
একটা পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছতার ভিতর দিয়ে অদৃশ্য এক আলোকের দিকে:
মানসের জ্যোতির্ম্ময় বৃহৎ রাজ্যসব উপরের শুদ্ধতা থেকে ফুটে উঠল।"

অশ্বপতির অন্তঃপুরুষ তবে এই রকমে নূতন সম্ভাবনার দ্বারা আবিষ্কার করল। সূক্ষ্ম-মনে প্রথমে একটা বাছাই হয়, ইন্দ্রিয়গত প্রাণ আর মানস-চিন্তার প্রথম উন্মেষ এই দুই-এর মধ্যে। অনিশ্চিত অনুভব-সমষ্টির পরিবর্ত্তে দেখা দেয় আলোকের আদি স্ফুরণ, বুদ্ধি এসে দাঁড়ায় অনুভবের ও চিন্তার মাঝখানে। অনতিবিলম্বে তার সাহায্যের জন্য পাশে এসে দাঁড়ায় বিচার এবং ভাষা। তারপর কল্পনা এসে এ সকল উদ্ভুর রচনা ঝাঁট দিয়ে দূর করে

2C1000

দেয়—স্বপ্ন এসে জ্ঞানের খোরাক জোগায়। তবুও তারই মধ্যে মন তার স্থির প্রতিষ্ঠা খুঁজে বেড়ায় তার তিনটি যানস সঙ্গী নিয়ে (১) দৈনন্দিন অভ্যাস, (২) অতৃপ্ত জিজ্ঞাসু বুদ্ধি, (৩) বিচার। শেষোক্তটি কালের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে জগতের তার নিজের অঙ্কে গ্রহণ করে অতি দুঃসাহসে। কিন্তু পরিশেষে তাকে হার ছেড়ে দিতে হয়, যে-সবনুয় সে খুঁজেছে তাকে না পেয়ে। তখন ফিরে এসে খোঁজে শুধু প্রকৃতি-যন্ত্রের কলকাঠি, আবিষ্কার করে একটা অবোধ যন্ত্র, কোন চিন্তা না করেই যে ব্যবস্থা দিয়ে চলেছে, সহস্র উপাদান ছড়িয়ে চলেছে কোন ব্যবহারে না এনে। আমাদের চিন্তা হল এই যন্ত্রের মধ্যে একটা গতির কণা, আমাদের বিচার তার বিধানের একটা সূত্র। এখানে অন্তরাত্মার কোন প্রয়োজন নেই আমাদের।

ফলে এই যে-বিশ্ব সুদৃঢ় জড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তা ভেসে যায় একটা চির প্রবহমান স্রোতের মধ্যে—সব ফিরে যায়, ডুবে যায় বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মহাকালীর নৃত্যের তলে। এক আশা তবু রয়ে যায়, এই শক্তিকে অধিকার করবে মানুষ, প্রকৃতির প্রভু সে হয়ে উঠবে যেন, এই মনোময় জাতিটির প্রয়োজনের জন্যই সব আয়োজন।

"তা হ'তে পারত, অন্তঃপুরুষ যদি ঘুমিয়ে থাকত...
জীবনের রুদ্র হৃদয় যদি বিদ্রোহ না করে উঠত,
যদি অন্তর্যামী ভগবান একটা মহত্তর ব্যবস্থা এনে না দিতেন"

বিচারবুদ্ধি একদিকে অনুসরণ করে চলল তার নিজস্ব কাজ, অন্যদিকে শুদ্ধ বুদ্ধি তার যন্ত্রটিকে ছাড়িয়ে গেল। অশ্বপতি শুদ্ধবুদ্ধির আশ্রয়ে উঠে গেল উর্দ্ধতর যানস-রাজ্যে। এখানে বিশ্বদেবতারা লোকসমূহের অসংখ্য প্রতীকাবলী সৃষ্টি করে চলেছে, তার উর্দ্ধে রয়েছে আর এক শ্রেণীর দেবতা যাদের দৃষ্টি বৃহত্তর, অদৃশ্যের দিকে প্রসারিত। কিন্তু তাদের কর্ম্ম-মুখী জ্ঞানে ভাগবত স্বরূপ ধরা দেয় নি। সে জ্ঞানের সীমানা টেনে দিয়েছে শূন্যতা। তারও উর্দ্ধে অনন্ত সলিলের মত জ্বলতে জ্বলতে উঠে গিয়েছে সোপানাবলী শুদ্ধ কৈবল্যের দিকে। সেখানে মন জানতে পারে যে সে হ'ল চেতনার আদান-প্রদানের একটা পথ, যদিও তার একটা বোধ রয়ে যায় যে চেতনাকে ধারণ করবার শক্তি নাই তার। অনির্ব্বচনীয় সত্য তার ধারণার মধ্যে আসে শুধু নীরবতারূপে। আরো এগিয়ে যেতে হলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় দিব্য দৃষ্টির।

অশ্বপতি এখন প্রবেশ করলেন সুনীল জ্যোতির্ময় আদর্শের স্বর্গে যেখানে ফুটে উঠছে অমর সরোজ

"প্রকৃতির গভীর প্রণত হৃদয় থেকে উঠে চলেছে সে,
ভগবানের পদতলে নিত্য প্রস্ফুটিত জীবন-যজ্ঞের নিভৃত আহুতি সব
তাকে সঞ্জীবিত রেখেছে,
অহেতুক ভাগবত কৃপা অকস্মাৎ যেন ফুটে উঠল এখানে

বাসনা-আরক্ত আমাদের এই পৃথিবীতে,
হিরণ্ময় করে তুলল...
আমাদের অন্তরে দিব্যশক্তির গুপ্ত চক্র সব
ফুলের মত তাদের দল খুলে দিল"।

বিশ্ববস্তুর এই সব শিহরণের স্পন্দনের পিছনে এসে দেখা দিল এক নিস্পন্দ শিখা। মানসের শেষ গতিক্রিয়া থেমে গেল, তাকে আত্মসাৎ করল এক অপ্রাকৃত রশ্মি, তার স্থান অধিকার করল যেন এক স্বচ্ছ দর্পণ যার মধ্যেই শুধু প্রতিফলিত হতে পারে ভাগবত সৎবস্তুর আত্মসত্তা।

এখানেই শেষ জগৎসমূহের সোপানাবলী। মনোময় পুরুষের হৃৎকেন্দ্রে যে গভীর নীরবতার মধ্যে বাক্ রূপ গ্রহণ করে, অশ্বপতির অনুভব হ'ল এখন যেন তিনি সব বুঝতে পারছেন।

"এই যে সাক্ষীস্বরূপ স্তব্ধতা এই হ'ল চিন্তাশীল পুরুষের
গোপন প্রতিষ্ঠা...
নীরবতাই হল অন্তঃপুরুষের নিভৃত জন্মস্থান...
দ্রষ্টাপুরুষ আর বীর্যময় শক্তির সাক্ষাৎ হ'ল...
নৈঃশব্দ্য জানতে পারল নিজেকে, চিন্তা গ্রহণ করল রূপ
এই দ্বৈত শক্তি থেকে নিজেকে গড়ে তুলে সৃষ্টি প্রকট হ'ল।"

কিন্তু জ্যোতির্ময় রেখা এক তর্জনীর মত এসে স্পর্শ করল চিন্তার ইন্দ্রিয়ের শিকড়ে: দেখিয়ে দিল এই স্পন্দহীন শেষ সীমানা অপেক্ষা বৃহত্তর একটা চেতনা রয়েছে। সেই কেবল উত্তর দিতে পারবে; আর কিছুই জানা যেতে পারে না যতক্ষণ সেই পরম তত্ত্ব অধিগত না হয়। এই যে নহিমাময় দ্রষ্টা ও দৃষ্টা মন তা পরিণামে হয় শুধু একটা আবরণ, অন্তরাত্মা আর তার আলোর মাঝখানে।

*

অশ্বপতিকে তাহ'লে এখন মানস-অভিজ্ঞতা পার হয়ে যেতে হবে, আরও দূরে প্রবেশ করতে হবে বিশ্বের অন্তরাত্মার মধ্যে। তাঁর অভিযানের এই শেষ পর্ব্বটি তাকে যেন বাধ্য হয়ে অনুসরণ করতে হবে। সে পথটিকে এক অজানা স্পন্দন যেন ঢেকে রেখেছে, সেখানে দিনের নির্দ্দেশ নাই, রাত্রির নির্দ্দেশ নাই; রয়েছে শুধু এক ধ্বনির রেশ।

"একটা কলরোল, বহুল বিচিত্র নিঃসঙ্গ,
সকল ধ্বনি চলেছে যেন একের পরে একে, তবে সবই অনুরূপ...
তার তীব্র অতন্দ্র যাদুকর জাগরী নয়
এসে ভেঙ্গে পড়ছে যেন স্নায়ুমণ্ডলীর একটা নিথর সুপ্তির পারে..."

অশ্বপতি

"একটা বিচিত্র বিদেহ রাজ্যের মধ্যে উপস্থিত হলেন
নামহীন, কণ্ঠহীন এক আবেগের স্বধামে...
একটা নীড় পেলেন তিনি যার মধ্যে সকল লোক আশ্রয় পেয়েছে
একটা বিন্দু যা হল সমস্ত আকাশের সচেতন গ্রন্থি
কালের বুকে শাশ্বত মুহূর্ত্ত এক, সমস্ত বিশ্বের নিস্তব্ধ অন্তরাত্মা
রয়েছে সেখানে
কে একজন রয়েছে সেখানে তার সত্তা নিয়ে তার শক্তি নিয়ে
একই ব্যক্তি হন স্বয়ং নিজে এবং আর-সকলে...
চিন্তা সেখানে নাই কিন্তু রয়েছে এক অন্তরঙ্গ অদ্বৈত জ্ঞান
সকল জিনিষকে আলিঙ্গন করে রয়েছে একাত্মতার স্পন্দনে...
প্রাণশক্তি সেখানে নেই, আছে আবেগময় শক্তি...
শরীরের প্রয়োজন হয় না অন্তরাত্মা নিজেই তার নিজের মৃত্যুঞ্জয় রূপ
সাক্ষাৎ সম্মিলিত সে আর-সব অন্তরাত্মার সঙ্গে
এক নিবিড় আনন্দময় প্রমূর্ত্ত অত্যাশ্চর্য্য সত্তার মধ্যে।"

পিছনে রয়েছে অনন্ত দ্বি-মূর্ত্তি নিত্যযুক্ত, সমচ্ছন্দ, সৃষ্টির গভীর আনন্দে নিমগ্ন। তেমনি পিছনে রয়েছে উষার বেশের মত কে একজন যে উভয়কে প্রকট করে ধরেছে অজ্ঞেয়ের ভিতর থেকে।

"সুদূরপ্রসারিত প্রত্যেক লোকের আরম্ভে তিনি তাঁর শক্তি দিয়ে
পূর্ণ করেছেন তাদের সূর্য্য সব
শাসনকর্ত্রী তিনি তাদের বহন কর্ম্মাবলীর প্রেরণাদাত্রী...
সর্ব্বশক্তিময়ী অদ্বিতীয়া দেবী চিরদিন অবগুণ্ঠিত তিনি
স্পষ্ট হল তাঁর দুর্ভেদ্য মুখাবরণ।"

অশ্বপতি তারই দিকে আপন সত্তা ঠেলে দিলেন। একটা যবনিকা খুলে গেল— বিপুল আকর্ষণে কে যেন তাঁকে টেনে নিল এক শুদ্ধ চেতনার পূর্ণালোকে—তিনি লাভ করলেন নবজন্ম। কালের বাহিরের দেবশিশুর জ্ঞান নিয়ে তিনি ক্রমবর্দ্ধিত হয়ে চললেন।

ভারত কি সভ্য

শ্রীঅরবিন্দ

দ্বিতীয় অধ্যায়

একবার যখন বৃহত্তর সমস্যাটি তোলা হয়েছে তখন এই ভারতীয় সভ্যতার প্রশ্নটি তার সংকীর্ণ অর্থ ছাড়িয়ে আরো বৃহত্তর সমস্যায় জড়িয়ে পড়ল। তাহলে মানুষের ভবিষ্যৎ কি শুধু যুক্তি ও বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতির মধ্যে? মানব-জীবনের ক্রমোন্নতি শুধুই মনের প্রয়াস, অনিত্য ব্যষ্টি দিয়ে গড়া চিরচঞ্চল সমষ্টি এই ধারাবাহিক সমবেত মনের প্রয়াস,—যে বস্তু অজ্ঞান জড় বিশ্বের অন্ধকার থেকে উদ্‌গত হয়ে হোঁচট খেয়ে ঘুরে মরছে একটু স্বচ্ছ আলোর জন্য, আর বিপত্তি ও মুস্কিলে একটু অবলম্বন পাবার জন্য? আর সভ্যতার অর্থ কি এমন তর্ক সার জ্ঞান এবং যুক্তিসার জীবনে এই আলো ও অবলম্বন লাভের সাধনা? তাহলে জড়প্রকৃতির ঐশ্বর্য শক্তি সম্ভাবনার এবং মন- ও দেহ-সার মানুষের মনস্তত্ত্বের এক সুবিন্যস্ত জ্ঞানই একমাত্র সত্যকার বিজ্ঞান। তাহলে জীবন শিল্পের সেরা হবে এই জ্ঞানের সুশৃঙ্খল প্রয়োগে এক ক্রমোন্নতিশীল সামাজিক পটুতা ও স্বাচ্ছন্দ্য, যা এখানকার ক্ষণস্থায়ী জীবনকে করে তুলবে আরো কর্মিৎকর্ম, সহনীয়, আয়ামী, সুখী, সুব্যবস্থ, প্রাণ মন দেহের লীলা প্রাচুর্যে আরো বিচিত্রসমৃদ্ধ। তাহলে আমাদের যাবতীয় দর্শন, ধর্ম,—ধরা যাক ধর্ম বুড়িয়ে বাতিল হয়ে যায়নি,—সমস্ত বিজ্ঞান, চিন্তা, শিল্পকলা, সামাজিক আয়তন, আইন ও প্রতিষ্ঠান এই ধরণের জীবন-ভাবনার উপরই দাঁড়াবে এবং এই একমাত্র লক্ষ্য ও প্রয়াসের সেবাদাস হবে। য়ুরোপীয় সভ্যতার বনিয়াদ এই সূত্র এবং এরই একরকম একটা সিদ্ধি তার সাধনে। এই সূত্র যুক্তিসার ও কার্যকরী সংস্কৃতির বাহন চতুরভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ সভ্যতারই।

অন্যদিকে, বলা চলে না কি আমাদের সত্তার সত্য প্রকৃতিকবলে অবয়বী অন্তরাত্মা —তার নিরন্তর প্রয়াস নিজেকে জানা, নিজেকে চেনা, নিজের চেতনার প্রসার, বৃহত্তর জীবনের রহস্য অধিকার, অন্তশ্চেতনায় উন্নতি এবং আত্মজ্ঞানের পূর্ণ আলোয় উত্তীর্ণ হওয়া ও পরিশেষে একটা আভ্যন্তরীণ ভাগবত সিদ্ধি? বলা যায় না কি ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা শিল্প সমাজ এবং জীবন পর্যন্ত এই সিদ্ধির উপায় ও নিমিত্ত, এরই সেবাথে অন্তর্দেবতার

যাহন এবং এরা সম্মুখে রেখেছে এদের প্রধান লক্ষ্য অথবা অন্ততপক্ষে চরম সাধ্য হিসাবে এই আধ্যাত্মিক প্রবতার। ? ভব জীবনের ও সংস্কৃতির এই হল অর্থ—ভারতের কাছে প্রস্ফুট যে-ভাবে—যার জন্য সে অতীতে দাঁড়িয়েছে, ভবিষ্যতেও যার জন্য সে দাঁড়াতে সচেষ্ট নিজের প্রকৃতির সমস্ত অটল প্রবল সামর্থ্য নিয়ে। সূত্রটি হল শুধু পরিপূর্ণতার মধ্য দিয়ে নয়, অধিকন্তু দেহ মন প্রাণ পার হয়ে অধ্যাত্মের রসে ভারিত সভ্যতার প্রয়াস একটা সমুচ্চ আত্মার সংস্কৃতিতে এসে পৌঁছান।

মানবজাতির ভবিষ্যৎ আশা ভরসা নির্ভর করছে একটা যুক্তিসঙ্গত ও বুদ্ধিসম্মত শৃঙ্খলাবদ্ধ না আধ্যাত্মিক বোধিনির্ঝিত ধর্মাশ্রয়ী সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর—তাহলে, আসল প্রশ্ন হল এই। আমাদের যুক্তিবাদী সমালোচকটি যখন বলেন ভারতবর্ষ কোনোদিন সভ্য ছিলনা বা হয়নি, যখন বলেন উপনিষদ বেদান্ত বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা ও কাব্য বর্বরতার এক প্রকাণ্ড স্তূপ, একটা নির্ভেজাল বর্বর মস্তিষ্কের ব্যর্থ ফসল তখন পরিষ্কার তিনি বোঝান যে এই সভ্যতা কথাটি জড়বাদী যুক্তির ব্রত ও চর্চার সমার্থক ও সমধর্মী, এবং আর যা-কিছু এমন মানমাত্রার উপরে বা নীচে তাকে সভ্যতা আখ্যা দেওয়া যায় না। একটা অতিতাত্ত্বিক দর্শন, একটা অতিধার্মিক ধর্ম,—সকল দর্শন সকল ধর্ম যদি না-ই হয়,—একটা অতিমাত্র এবং সাঙ্ঘ্য ভাব ও শিল্পকলা, সকল রকম গুহ্যবিদ্যা ; সব যা কিছু শুচিশুভ্র করে ও যুক্তির সীমা পেরিয়ে জিজ্ঞাসার দৃষ্টি ফেলে এবং যেজন্য সব তার কাছে মনে হয় অস্পষ্ট, অতিশয়, অবোধ্য ; সব যা-কিছু অসীমের ডাকে সাড়া দেয় ; যা-কিছুর পক্ষপাতিত্ব শাশ্বতকে নিয়ে ; আর যে-সমাজ পার্থিব উন্নতি ও দক্ষতালাভ এবং একমাত্র যুক্তিবুদ্ধির স্বচ্ছতার পরিবর্তে এ-সবের দ্বারা চালিত তারা কেউ সভ্যতার ফসল নয়, তারা এক গ্রাম্য জৌলসবাধা বর্বরতার অবতংস। অবশ্য এ মতবাদ কিছুই প্রমাণ করে না ; তাহলে মানুষের মহৎ অতীতের অধিকাংশকে নাকচ করতে হয়। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতাও রেহাই পাবে না ; আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার চিন্তা ও শিল্পকলার মোটা অংশ সেক্ষেত্রে অন্ততঃ আধা-বর্বরতার ছাপ পাবে। সুতরাং কথাটির অর্থ সংকীর্ণ এবং মানবজাতির অতীত প্রয়াসের তাৎপর্য খর্ব করতে গেলে অতিশয়োক্তি এবং অযৌক্তিকতার খপ্পরে পড়তে হয়। স্বীকার করতে হবে ভারতীয় সভ্যতা অতীতে এবং বর্তমানে এক মহান সংস্কৃতির ফল—গ্রীক-রোমক, খৃষ্টিয়, ইসলামী কিম্বা য়ুরোপে পরবর্তী রেণেসাঁস সভ্যতার চেয়ে কোনো অংশে হীন নয়।

কিন্তু আসল প্রশ্নটি তবু থাকল ; তার মূল সমস্যার কণাটি শুধু ধরা গেল। আর একটু অনুগ্র ও সজাগ যুক্তিবাদী সমালোচক ভারতের অতীত গৌরবের মর্যাদা দেবেন। বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্ত, সকল ভারতীয় শিল্পকলা দর্শন ও সামাজিক ভাবকে তিনি বর্বরোচিত বলবেন না, তবে হয়ত সেই সঙ্গে এও বলবেন যে এর মধ্যেই মানবজাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণ নিহিত নয়। যথার্থ উন্নতির পথ য়ুরোপীয় আধুনিকতা, জড়বিজ্ঞানের মহাকর্ম, মানুষের

বিরাট আধুনিক অ্যাডভেঞ্চার কল্পনা বা অনুমান নয় কিন্তু প্রমাণিত প্রত্যক্ষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এদের প্রয়াস, নিঃসন্দেহ এবং সুপরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলার দারুণ শ্রমজাত সমৃদ্ধির। আবার স্বীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠ ভারতীয় ভাবুক বলবেন যে মানুষের প্রয়াসে যুক্তি বিজ্ঞান এবং তাদের চেলাচামুণ্ডাদের স্থান আছে বটে, তবে প্রকৃত সত্য তাদের ছাড়িয়ে। পরম পূর্ণতার গুপ্তরহস্য খুঁজতে হবে আমাদের অন্তরতলে, সর্বভূত ও প্রকৃতির গভীরে; মূলত তার সন্ধান মিলবে আধ্যাত্মিক আত্মজ্ঞানে, আত্মসিদ্ধিতে ও সেই আত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠ জীবনায়তনে।

একবার সমস্যাটি এভাবে তুলে পরিষ্কার দেখতে পাই যে ত্রিশ বা চল্লিশ বছর আগের চেয়ে এখন পূর্ব আর পশ্চিম, ভারত ও য়ুরোপের মধ্যে তফাৎ তত গভীর ও দুর্নিবার নয়। তবে মূল পার্থক্যটি রয়েছে; যুক্তিবুদ্ধি ও জড়সেবা পশ্চিমের জীবনে প্রধান নিয়ন্তা। তাহলেও চিন্তার চূড়ায় এবং ক্রমে শিল্পকলা কাব্য সংগীত ও সাহিত্য সূত্রে নীচেও স্পর্শ করছে একটা আমূল পরিবর্তনের স্রোত। গভীরের দিকে একটা আকুতি, নির্বাসিত এই আকুলিবিকুলির পুনরাবর্তন, অপ্রাপ্ত উচ্চতর অভিজ্ঞতার প্রতি একটা টান, প্রতীচ্য মনোভাবের কাছে দীর্ঘকাল পরদেশী প্রতীত ভাবধারাকে স্বীকার আজ হামেশা দেখা যায়। এর সাহায্যে, এই পদ্ধতির পালে হাওয়া দিয়ে শুরু হয়েছে প্রাচ্য ভাবধারা ও প্রভাবের চোরাগোপ্তা অনুপ্রবেশ; এখানে সেখানে প্রাচীন আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি উচ্চ মূল্যবোধ ও মহত্তর মর্যাদা আরোপ করতেও দেখা যাচ্ছে। যখন ইংরেজ ভারতবর্ষ অধিকার করেছিল তখন সঙ্কুল মুহূর্তে সুদূর প্রাচ্য ও য়ুরোপের যে অনাবৃত ঘনিষ্ঠতা তার প্রথম দিকে এই মনচুরি শুরু। গোড়ায় এর রূপ একটা হাল্কা স্পর্শ, গুটিকয়েক সেরা মেধাবীর উপর একটা বুদ্ধির প্রভাব-প্রলেপ একটা চিন্তাগত কৌতূহল কিম্বা বেদান্ত সাংখ্য বৌদ্ধ ধর্মের দিকে পণ্ডিত ও চিন্তাশীলদের মনোযোগ, ভারতীয় দার্শনিক আদর্শবাদের সূক্ষ্মতা ও ঔদার্যের প্রতি শ্রদ্ধা, শোপেনহাওয়ারের এবং এমার্সনের মতো মহাবনীষীদের তথা কতিপয় স্বল্পখ্যাতের উপর গীতা উপনিষদের ছাপ,—প্লাবনপ্রবাহদের এই কয়েকটি ক্ষীণধারা। তবে এই প্রভাব সুদূর-প্রসারী হয় নি, যে সামান্য কিঞ্চিৎ সুফল ফলবার সম্ভাবনা ছিল তা-ও সাময়িকভাবে ব্যাহত এবং অবলুপ্ত হল বৈজ্ঞানিক জড়বাদটির কল্যাণে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এটিই য়ুরোপের সমস্ত জীবনদর্শন গ্রাস করে বসেছিল।

আজ অবশ্য বিজয়-পতাকা তুলে অন্য সব আন্দোলন এসে জীবন ও ভাবনাকে অধিকার করেছে। দর্শন ও চিন্তনা যুক্তিসার জড়বাদ এবং তার নিঃসংশয় প্রত্যয়াবলী থেকে বেশ সরে এসেছে। এক পক্ষে, একটা বৃহত্তর চিন্তা ও বিশ্বকল্পনার সন্ধান করতে গিয়ে পরিণাম স্বরূপ ভারতীয় অদ্বৈতবাদ বহুর মনে স্থান নিয়েছে—নানা বিচিত্র পরিধানের অন্তরালে হলেও। অপর পক্ষে নূতন নূতন দর্শনের আবির্ভাব হয়েছে—তারা নিরঙ্কুশ আধ্যাত্মিক নয়, বরং প্রাণিক ও ব্যবহারিক, কিন্তু তাহলেও অধিকতর আত্মনুখিতার জন্য ভারতীয় চিন্তা-

ধারার সমগোত্রীয়। পুরাণো বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার সীমানা ভাঙতে শুরু হয়েছে; বিবিধ ধরণের আত্মিক গবেষণা, মনোবিজ্ঞানের অভিনব সব পন্থা এবং আত্মচর্চা ও গুহাশাস্ত্রে পর্যন্ত ঔৎসুক্য ক্রমে ফ্যাশন হয়ে উঠছে। গোঁড়া ধর্ম এবং গোঁড়া বিজ্ঞানের ধমকানি অনুশাসন টেকেনি। পুরাতন ও নূতনের বৃহত্তর সমন্বয়, এবং প্রাচীন আধ্যাত্মিক ও আত্মিক সাধনার আকর্ষণ নিয়ে থিওসফি সর্বত্র তার পরিচিত অনুরাগীদের বাহিরেও প্রভাব বিস্তার করেছে। বহুকাল নিন্দা ও বিদ্রূপের সম্মুখীন হয়ে থেকে আজ সে কর্ম, পুনর্জন্ম, সৃষ্টির ধারাবলী, বুদ্ধি ও চৈত্যপুরুষের মধ্যে দিয়ে দেহাশ্রিত আত্মার চিৎসত্তায় বিবর্তনে বিশ্বাস প্রচার করতে পেরেছে—এসব ভাব একবার গৃহীত হলে জীবন সম্বন্ধে গোটা মনোভাবটিই পরিবর্তিত হতে বাধ্য। বিজ্ঞান প্রত্যহ যে সব সিদ্ধান্ত জড়স্তরে পুনরাবৃত্তি করে চলে সে তার আপন ভাষায় ব্যক্ত করছে এমন সত্য যা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বেদ-বেদান্তের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ আগেই উচ্চারণ করেছে। এসব আবিষ্কার প্রত্যক্ষভাবে কিম্বা গূঢ়ার্থে পরোক্ষ-ভাবে পূর্ব আর পশ্চিমের মনকে কাছে এনে ধরছে এবং সেই অনুপাতে ভারতীয় চিন্তা ও আদর্শ বুঝবার বৃহত্তর সুযোগ।

কয়েকটি দিকে এই মনোভাবের পরিবর্তন বেশ গভীর এবং তা বেড়েই চলেছে। স্যার জন উড্রফ বর্ণিত খৃষ্টীয় যাজকটি "দেখে বিস্মিত হয়েছেন হিন্দু দেবদেবী জর্মন মার্কিন ও বিলাতী ধর্মচিন্তার পর্যন্ত চুকতে শুরু করেছে"; লোকটির মতে এর মোটফল পরবর্তী মানব-কুলের "বিপদ"। উড্রফ-কথিত আর একজন লেখক বলে ফেলেছেন যে য়ুরোপের যাবতীয় সমুচ্চতম দার্শনিক চিন্তার মূলে পূর্বসূরী ব্রাহ্মণদের গবেষণা এবং চিন্তাগত সমস্যাগুলির সব আধুনিক সমাধান প্রাচ্যে অনেক আগে থেকেই রয়েছে। নামকরা জনৈক ফরাসী মনো-বিজ্ঞানী সেদিন একজন ভারতীয় আগন্তুককে বলেছিলেন, ভারতবর্ষ খাঁটি মনোবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি, আসল সত্যসমূহ, মোটা কাঠামোটি, সর্বাগ্রে দিয়ে রেখেছে এবং য়ুরোপের এখন যা করতে বাকী তা এই বিশেষের মধ্যে বিস্তারিতের বিন্যাস সাজিয়ে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োগ। একথাগুলি একটা ক্রমস্ফূর্ত পরিবর্তনের উগ্র ইঙ্গিত—তবে ধারাটির লক্ষণে আর সন্দেহ নেই।

শুধু যে দর্শন ও উচ্চচিন্তায় এই পরিবর্তন দ্রষ্টব্য তা নয়। য়ুরোপের শিল্পকলা পুরাণো খাঁচ থেকে অনেক দিকে বেশ সরে এসেছে; তার ফুটছে নূতন দৃষ্টি, নিজস্ব নূতন আত্মোন্মীলন—এতদিন যাকে একান্ত প্রাচ্যেরই বরেণ্য বলে রাখা হয়েছিল তার প্রতি। প্রাচ্য শিল্পকলা এবং সঙ্গীতের ব্যাপক সমাদর শুরু হয়েছে, সূক্ষ্ম হলেও প্রবল প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি কাব্যের ভাষাতে দ্বিধাগ্রস্ত হলেও বেজেছে একটা নূতন সুর,—লক্ষণীয় তিরিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অচিন্তনীয় ছিল,—আর আজকাল প্রায়ই দেখা যায় সাধারণ কবির মধ্যেও এমন ভাব ও ভঙ্গীর সমাবেশ যা সেকালে ভারতীয়, বৌদ্ধ বা সুফী কবিদের বাইরে বড় একটা চোখেই পড়ত না। সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও

এরকম নক্‌শা দৃষ্টিগোচর হয়। ভারতবর্ষকে যারা তাদের অন্তরাত্মার কুলায় বলে মনে করে, তাদের অনুপ্রেরণার জন্য বহুলাংশে দায়ী ভাবে, অন্তত তার আলোক স্বীকার করে এবং প্রভাব মেনে নেয় তাদের সংখ্যাও বেড়েই চলেছে। এই ধারার গতি যদি প্রখরতর হয়—অন্যথা হবার আশঙ্কা খুবই কম—তাহলে পূর্ব ও পশ্চিমের অন্তবর্তী খাদ না বুজলেও সেতু-বন্ধনে জোড়া লাগবে, ভারত-সংস্কৃতির ও ভারতীয় আদর্শকে রক্ষার কাজটাও দৃঢ়তর হবে।

সুতরাং কেউ কেউ হয়ত বলবেন এমন ঘনিষ্ঠ মিলমিশ যখন হবেই তখন আর ভারতীয় সংস্কৃতির পক্ষে লড়াই, কোনো লড়াইয়েরই বা প্রয়োজন কী? অধিকন্তু ভবিষ্যতে বিশিষ্ট ভারতীয় সভ্যতার বর্তে থাকবারই কী দরকার? দু'দিক থেকে এসে মিলবে বিশ্বে পূর্ব আর পশ্চিম এবং এক মিলিত মানবের অঙ্গনে উঠবে সকলেরই আপন এক বিশ্ব-সংস্কৃতি। পূর্বতন ও বর্তমান সব রূপায়তন, অনুষ্ঠান, বৈচিত্র্য একাকার হয়ে যাবে এই নব মিশ্রণে, পাবে তাদের সার্থকতা। অথচ সমস্যাটি ঠিক অত সহজ নয়, অত মসৃণ সরল নয়। কারণ, যদিই বা ধরে নিই যে একতাবদ্ধ বিশ্ব-সংস্কৃতিতে নানা প্রখর বিশেষ বৈচিত্র্যের কোনো আধ্যাত্মিক প্রয়োজন বা প্রাণিক উপকারিতা থাকবে না, তাহলেও বস্তুত আমরা এই ঐক্যের থেকে সেই দূরেই রয়ে গেলাম। অন্তর্মুখী আধ্যাত্মিক প্রবণতা অধিকতর অগ্রসর আধুনিক মনের মধ্যে আবার অল্প সংখ্যককেই স্পর্শ করেছে, য়ুরোপের গণবুদ্ধিকে রাঙাতে পেরেছে সামান্য উপরে উপরে। তাছাড়া এ তো চিন্তার উপরে তরঙ্গভঙ্গ মাত্র; য়ুরোপীয় সভ্যতার গভীর জীবন-বারিধি যেমন তেমনি রয়েছে। মানুষে-মানুষে সম্বন্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যতের নবকল্পনায় কিছু আদর্শবাদীর চাপ পড়ছে, তবে সদ্যাগত অভ্রবাদী অতীতের জোয়াল ঝেড়ে ফেলা তো দূরের কথা একটুও আল্‌গা হয় নি। এই সন্ধিক্ষণে এই পরিস্থিতির মধ্যে সারা দুনিয়াকে, ভারত শুদ্ধ, এক দ্রুত রূপান্তরের ঘূর্ণির মধ্যে ফেলা হয়েছে। বিপদ হল প্রবলতর য়ুরোপীয় ভাবধারা ও অভিলাষ, কালোপযোগী রাজনীতিক চালের লোভ, দ্রুত অনিবার্য পরিবর্তনের প্রবেগ কোনো সুস্থির চিন্তা এবং আধ্যাত্মিক ভাবতন্ময়তার সময় রাখবে না, প্রাচীন ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে আকর্ষণের অতিচাপে ভাঙবার মুখে নিয়ে ফেলবে ভারতবর্ষকে। মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি পুনঃসংস্থান করা কিম্বা যে-সব ব্যবস্থা জাতীয় পারি-পার্শ্বিক প্রয়োজনের দাবি আর মেটাতে পারে না সেসব বর্জন করার অবকাশ দেবার পূর্বে তার প্রাচীন সভ্যতাই চূর্ণ করে দেবে, নূতন বিশিষ্ট শক্তি ও ব্যবস্থা এবং নিজস্ব প্রতিভা ও আদর্শ অনুসারে দ্রুত বিবর্তনের দৃঢ় ভিত্তি পত্তনের সুযোগও মিলবে না। সেক্ষেত্রে প্রলয়পয়োধি থেকে হয়ত উঠবে যুক্তিবাদী সাহেবী ভারত, য়ুরোপের এক বাদামী বাঁদর, তার প্রাচীন মনীষার তেমন কিছু উচ্ছিষ্ট নিয়ে যাতে তার গোটা অস্তিত্বের একটু আধটু হেরফের হয় কিন্তু পুনর্গঠন ও নিয়ন্ত্রণ চলে না। অন্য আর পাঁচটা দেশের মতো তারও খোলস হবে পাশ্চাত্য আধুনিকতা, প্রাচীন ভারতের ঘটবে মৃত্যু।

এই অবস্থাকে অনেকে সাংঘাতিক মনে করেন না, বরং বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন ও শুভ ঘটনা বলে স্বাগত জানান। তাঁদের মতে এর অর্থ হল যে ভারত তার আধ্যাত্মিক বিচ্ছিন্নতা ত্যাগ করেছে, লাভ করেছে সেই বহুবাঞ্ছিত মানসিক ও নৈতিক রূপান্তর যা তাকে আধুনিক দেশগোষ্ঠির মধ্যে স্থান দেবে। আর যেহেতু এই নব বিশ্ব-সমাবেশে ক্রমবিবৃদ্ধিহারে প্রবেশ করবে আধ্যাত্মিক ও আত্মমুখী উপাদান এবং সম্ভবত ভারতের ধর্মচিন্তা ও দার্শনিক প্রভাবনার অনেকটা জুড়ে বসবে এই সভ্যতায়, তাই তার ব্যক্তিগতভাবে প্রাচীন প্রেষণা ও ব্যক্তিগত প্রকাশধারা হারানোর একান্ত লোকসান হল না। পুরাতন গ্রীসের মতো প্রাচীন ভারতও বিদায় নেবে, জাতির বৃহত্তর ও উন্নতিশীল জীবনধারায় সে রেখে যাবে শুধু অবদান। কিন্তু পরবর্তী য়ুরোপখণ্ড গ্রীক-রোমক সংস্কৃতি হজম করলেও, বৃহত্তর জটিলতর সভ্যতায় তার কিছু কিছু রেশ পাওয়া গেলেও, সেটি দারুণ নিইয়ে গিয়েছিল। স্বচ্ছ সমুচ্চ বুদ্ধি বিন্যাসের এ দারুণ অবনতি, অধিকতর শোচনীয় হল প্রাচীন সৌন্দর্য-প্রীতির অপহ্নব—আর এত শতাব্দী পরেও সেই হারানো আলোর উদ্ধার হল না। ভারতের অভিনব সভ্যতার অন্তগগনে বিশ্বের ভাণ্ডার এর চেয়েও অনেক বেশি রিক্ত হবে, কারণ ভারতীয় সৃষ্টির সঙ্গে য়ুরোপী আধুনিকতার পার্থক্য গভীরতর : ভারতের আত্মৈষণা অনন্য, আজ একমাত্র ভারতবর্ষই তার পূর্বেকার জটিল সত্য ও প্রাণবন্ত শৃঙ্খলার মধ্যে আন্তর অভিজ্ঞতার বিধৃত সহস্রধার ঐশ্বর্যের বিশাল সমাহার ও বৈচিত্র্য রক্ষা করতে সক্ষম।

ওদেশের সাধারণ মনের রীতিই হল নীচে থেকে উপরে ওঠা, বাহির থেকে ভিতরে ঢোকা। প্রাণিক ও জড় প্রকৃতির মধ্যে গড়া হয় সুদৃঢ় ভিত্তি আর উর্ধ্বতর শক্তিদের আহ্বান করা হয় প্রাকৃত জড়জীবনকে শুধু একটু অদল বদলের একটু তুলে ধরবার জন্য। আন্তর জীবন গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় বাহ্যিক শক্তির দ্বারা। অপরপক্ষে ভারতের চিরন্তন লক্ষ্য হল উচ্চতর আধ্যাত্মিক সত্যের ভিতরে জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, আত্মার এষণা থেকে বাহিরের দিকে চলা, বর্তমানের মন প্রাণ দেহকে অতিক্রম করা, বাহ্য প্রকৃতিকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করা। বৈদিক ঋষি বলেছিলেন,—নীচীনা: স্বুপরি এষাং, বুধ্ন অস্মে অন্তর নিহিতা: কেতব: স্যু:—নীচের অভিমুখে তারা উপরে রেখেছে ভিত্তি, এই অন্তরেই নিহিত এর আলো। আজ পার্থক্য তুচ্ছ সূক্ষ্মতায় সীমাবদ্ধ নয়, তার পরিণাম বাস্তবে দুরাবহ ও অন্তঃস্পর্শী। চোখের সামনে দেখলাম য়ুরোপ কী ব্যবহার করে আধ্যাত্মিক প্রভাবের সঙ্গে—খৃষ্টধর্ম ও তার আন্তর শাসন সে জীবনের সূত্র হিসাবে গ্রহণ করল না। তার যেটুকু স্থান তা আদর্শ হিসাবে হৃদয়াবেগের প্রভাব হিসাবে,—তার প্রয়োগ চিউটনের উত্তাল প্রাণপ্রবৃত্তিতে একটু অধ্যায়ের রঙ মাখিয়ে নেবার জন্য, লাতিনের স্বচ্ছ বুদ্ধি এবং প্রাণজ বোধবৃত্তিতে আধ্যাত্মিকতার আবির মাখিয়ে দেবার জন্য। নূতন আধ্যাত্মিক আবির্ভাবকে সে এই ভাবেই গ্রহণ করবে, এই আংশিক তুচ্ছ ব্যবহারেই লাগাবে—অবশ্য যদি কোনো দুর্বার জীবন্ত সংস্কৃতি বিশ্বাঙ্গনে

এই ক্ষুদ্রতর আদর্শের বিরোধিতা করে ও প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবনের চারণ হয়ে দেখা দেয় তো স্বতন্ত্র কথা।

আসলে এই দুই ধারাই, য়ুরোপের মন-প্রাণ-দেহের উপর প্রাধান্য দান আর ভারতবর্ষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিকের উপর টান, মানুষের পূর্ণতার পথে প্রয়োজন। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার আদর্শ যদি বাস্তব জীবনে সর্ববাধাজয়ী সুসঙ্গতির শ্রেষ্ঠ পথ দেখায় তাহলে ভারতবর্ষের পক্ষে পরম গুরুত্বপূর্ণ হল এই সত্য হাতছাড়া না করা, বিদিত এই উচ্চতমকে ত্যাগ না করা, তার যথার্থ ও চিরন্তন প্রকৃতির কাছে অনাহত কোনো বেশ চৌকশ ও নিম্নতর আদর্শের বিনিময়ে তাকে বিলিয়ে না দেওয়া। উপরন্তু, বিশ্বমানবেরও প্রয়োজন এই ঊর্ধ্বতন আদর্শে সিদ্ধির প্রয়াস—অতীতে যতই খুঁত থেকে থাক, সাময়িক যতই বিশৃঙ্খলা ও অবনতি তাকে গ্রাস করে থাকুক—এ-প্রয়াসের না খেয়ে চলাই উচিত। শক্তির পুনরুজ্জীবনের প্রকাশের পুনরুদ্দীপনের সম্ভাবনা সর্বদাই রয়েছে; আত্মা অনিত্য রূপের মধ্যে বন্দী হয় না—চির-নূতন শাশ্বত অসীম সে। পাশ্চাত্য প্রকৃতির কোনো নীতির মধ্যে চেলে সাজা নয়, পুরাতন ভারতীয় স্বধর্মের নবসৃষ্টিই আমাদের কাছে মানুষের সনাতনগত উন্নতির শ্রেষ্ঠ পথ।

এখানেই প্রয়োজন হয় উঠেছে স্বরক্ষার, সুদৃঢ় এবং আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষার কারণ; আধুনিক সাময়িক পরিস্থিতিতে কেবল আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষাই সফল হতে পারে। তবে এখানে আমরা সামনে দেখছি বিপরীত ধরণের মন ও তার নিরঙ্কুশ বিরুদ্ধ মেজাজ। এখন এমন অনেক ভারতীয় দেখা যায় যারা একান্ত নিশ্চল প্রতিরক্ষার পক্ষে, যা একটু কিছু আক্রমণাত্মক তারা অনুমোদন করে তার অনেকটা বিকট চিন্তালেশহীন সাংস্কৃতিক 'শোভিনিজ্‌ম্' (আত্মপ্রীতি ও পরশ্রীকাতরতা)—অর্থাৎ আমাদের যা আছে সব আমাদের পক্ষে ভালো, কারণ তা ভারতীয়, যাকিছু ভারতবর্ষে আছে তা সকলের সেরা, কারণ ঋষিরা যে তা বানিয়ে রেখে গেছেন। অর্থাৎ কিনা পরবর্তী যুগের যত অস্পষ্ট অসংলগ্ন ব্যাপারেও প্রণেতা সেই আমাদের সংস্কৃতির আদিকর্তারা যাদের বহু অপব্যবহার ও কুপ্রয়োগ হয়েছে, বহু বহু জাল বেরিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল স্বাণু প্রতিরক্ষার আদৌ কোনো মূল্য আছে কি না। আমার মতে কোনো মূল্য নেই, জিনিসের সত্য স্বভাব ওরকম হয় না, ওর পরিণামও ব্যর্থতা এর অর্থ জেদ করে স্বাণু হয়ে বসে থাকবার চেষ্টা যখন বিশ্বের শক্তি সবেগে ছুটে চলেছে তাঁর পক্ষে, আর শুধু বিশ্বের শক্তি নয়, ভারতশক্তিও। এটা নিজেদের অতীত সাংস্কৃতিক মূলধনের উপর ভর করে খুঁড়িয়ে বাঁচবার চেষ্টা, তাকেই জেরবার করার চেষ্টা—আমাদের অমিত-ব্যয়ী অযোগ্য হাতে সে এসে পৌঁছেছে শেষ কপর্দকে: তবে নূতন লাভের জন্য ব্যবহার না করে বসে খেলে দেউলিয়া হওয়া আর দারিদ্র্যভোগ ভবিতব্য। অতীতকে লাগাতে হবে খাটাতে হবে অনলস চালু মূলধন হিসাবে যাতে আসে লাভ, সম্পদ, ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি। অবশ্য পেতে হলে ছাড়তে হয়, কিন্তু ছাড়তে হবে যাতে আরো পূর্ণ আরো বিচিত্র জীবন আসে—সৃষ্টির অব্যাহত নিয়ম তা-ই। নতুবা ভিতরে প্রাণের ধারা তার নিস্পন্দ স্বাণুত্বে থেকে শুকিয়ে

যাবে। সুতরাং সম্প্রসারণ এবং পরিবর্তনশিলুখতা বন্ধ্যাত্বেরই সমব ঘোষণা। তাহলে বলতে হবে ধর্মে দর্শনে ভারতের সৃজনী-প্রতিভা শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মধ্ব এবং চৈতন্যদেবের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ, সমাজ গঠনে রঘুনন্দন ও বিদ্যারণ্যের দ্বারাই ইতি। শিল্প ও কাব্যলোকে তখন বস্তুহীন উষর শূন্যতায় কালাতিপাত, সুন্দর অথচ নিষ্প্রাণ মূর্তি ও ভাব নিয়ে চর্বিতচর্বণের বিলাস। তখন আমাদের প্রয়াস সত্ত্বেও ভেঙে পড়ছে ও আরো ভেঙে চলবে যে সব সমাজ-ব্যবস্থা তাদের আঁকড়ে ধরা, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার ঝুঁকি নিয়েও।

কোনো বিরাট পরিবর্তনের বিরুদ্ধে—বিরাট ও দুঃসাহসিক পরিবর্তনই দরকার, কোনো জোড়াতালিতে হবেনা—যুক্তিসঙ্গত আপত্তি চলতে পারে যদি সে আপত্তির ভিত্তি হয় এই সত্য যে সংস্কৃতির বাহ্য রূপাবলী চিৎশক্তিরই ধৃতছন্দ এবং সে ছন্দ ভঙ্গ হলেই চিৎশক্তিরও বহিষ্করণ ও সুসঙ্গতিরও চিরতরে বিনাশ। ঠিক কথা, পরম চিৎ মূলত শাশ্বত এবং তার সুসঙ্গতির আদি সূত্রে অপরিবর্তনীয়, কিন্তু তার রূপে রূপে প্রকাশের বাস্তব ছন্দে চিরপরিবর্তনশীল। আপন স্বভাবে ও শক্তির আধাররূপে নিত্যস্থির অথচ জীবনের লীলাক্ষেত্রের চির-পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বহুসমৃদ্ধ—চিৎপুরুষের প্রকটরূপের এই ধারা। দেখতে হবে তৎকালীন বাস্তব ছন্দ তখনও সুসঙ্গত কিনা, কিম্বা নিকৃষ্টতর অজ্ঞান সুরসমাহারে পড়ে কর্কশ হয়ে প্রাচীন আন্তঃসামর্থ্য আর যথাযথ ও যথেষ্ট প্রকাশ করতে অক্ষম। মূলরূপের এই ত্রুটি স্বীকার করা অর্থ তার অন্তর্নিহিত চিৎকে নাস্তি বলা নয়; বরং এই রূপকেই এগিয়ে চলা যায় ভবিষ্যতের বৃহত্তর সমৃদ্ধিতে, পূর্ণতর সিদ্ধিতে, অন্তরবাসী পরমসত্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে। অতীতের চেয়ে বৃহত্তর প্রকাশে কার্যত আমরা সাফল্য লাভ করব কি না তা নির্ভর করবে আমাদেরই উপর,—কতখানি আমরা উন্মুখ শাশ্বত জ্ঞান ও শক্তির দিকে—অন্তর্লীন শক্তির জ্যোতির দিকে, নির্ভর করবে আমাদের কর্মকৌশলের উপর, কতখানি কৌশল আমরা অর্জন করেছি অন্তর্দেবতার সঙ্গে একাত্মতার দ্বারা সেই আন্তর জ্যোতি প্রকাশের প্রয়াসে তার উপর—যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।

ভারতীয় সংস্কৃতির তরফ থেকে এই পর্যন্ত, এইটিই সর্বদা আমাদের চিন্তায় প্রথম বিবেচ্য, দৃষ্টিভঙ্গীর মূলস্থান। কালপুরুষের প্রভাব আমাদের উপর—সেদিকও দেখতে হবে। বিশ্বশক্তির এই ক্রিয়াকে অবজ্ঞা করা চলে না, দূরে ঠেকিয়ে বাহিরে রাখা যায় না। এখানেও নবসৃষ্টির নীতিই একমাত্র যথার্থ ফলপ্রসূ পন্থা। সুরক্ষিত ঘরের ভিতরে নিশ্চল নিশ্চুপ বসে থাকা সুবিধাজনক হলেও কার্যত আর সম্ভব নয়। যাওয়া-আসার স্রোতপথ ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রমরুভূমির মধ্যে একটি দ্বীপের মতো মহামানবের প্রান্তরে বিচ্ছিন্ন এক বিন্দু জমি নিয়ে থাকা আর চলে না—সম্ভব হলেও নয়। চাই বা না-চাই বিশ্ব আমাদের ঘাড়ের উপর—আধুনিক ভাব ও প্রভাব বন্যার জলের মতো এসে ঢুকছে, মানা সে শুনবে না। দু'রকমে এর সম্মুখীন হওয়া যায়—এক, নিষ্ফল নিরাশ প্রতিরোধ; দ্বিতীয়, গ্রাস ও বশীকরণ। যদি শুধুই অলস অথবা একরোখা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চালাই তাহলেও তারা আমা-

দের উপর এসে পড়বে, ব্যূহের দুর্বল স্থান ভেঙে ফেলবে, শত্রু জায়গার রস শুষে নেবে, আর যেখানে দুটির কোনোটাই পারবে না সেখানে সুড়ঙ্গ বা পাতালপথে লুকিয়ে আচমকা ঢুকে পড়বে। অস্ত্রবদ্ধ না হয়ে ঢোকার দরুণ তারা ধ্বংসকারী শক্তির কাজ করবে, এক্ষেত্রে বাহিরের আক্রমণের চেয়ে ভিতরে বিস্ফোরণেই ভারতীয় সভ্যতা চূর্ণবিচূর্ণ হবে। স্ফুলিঙ্গ ইতিমধ্যে এদিক ওদিক উড়ছে—নেভাবার কৌশল কারো জানা নেই, জানা থাকলে মঙ্গল হত, কারণ যেখান থেকে তারা উঠছে সেই অগ্নিকুণ্ডে হাত দেওয়া তো বাকী থাকল। অতীতের নামে যাঁরা বর্তমানের গোঁড়া রক্ষক তাঁদের প্রতিটি কথায় টের পাওয়া যায় নূতন চিন্তাধারায় তাঁরা কতখানি প্রভাবিত। সকলে না হলেও অনেকেই প্রাণপণে নিরুপায় হয়ে কোনো কোনো বিষয়ে নূতনকে ডাকছেন—ভারতীকরণ এবং একান্ত আত্মসাৎ না করে এসব য়ুরোপী ভাব ও পদ্ধতি গ্রহণ সেই সমাজ-গঠনকেই বিধ্বস্ত করবে যার রক্ষার তারা ব্রতী। অক্ষমতা এবং বিভ্রান্ত চিন্তাই এসবের কারণ। যেহেতু কোনো বিষয়ে আমরা চিন্তা ও নবসৃষ্টি করতে পারি না তাই আত্মস্থ না করে আমরা ধার করি, আত্মস্থকরণের একটা তাগিদ শুধু থাকে। যেহেতু অন্তরে সমুচ্চ শিখরের দৃষ্টি থেকে আমাদের কর্মের পূর্ণ প্রকৃতি আমরা দেখি না তাই সার্থক মিলন না পেয়ে দ্বন্দ্বকে জোড়া-তালি দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করি। এরকম চেষ্টার সম্ভাব্য পরিণাম তুষের আগুন এবং শেষে একটা চকিত বিস্ফোরণ।

আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা অর্থ এই আভ্যন্তরীণ সমুচ্চ দৃষ্টি থেকে নবসৃষ্টি—তার অর্থ আমাদের যা আছে তাকে দিতে হবে নবশক্তিধারী আকার, নবজীবনের পক্ষে যা কিছু উপকারী ও অন্তরাত্মার সঙ্গে মিত্রভাবাপন্ন তাদের সে যেন আত্মস্থ করতে দেয়। যুদ্ধ, সংঘাত দ্বন্দ্ব শুধুই ধ্বংসের ব্যর্থ পরিচয় নয়; মহাকালের বিপুল লেনদেনের দারুণ মুখোসটি। সর্বাপেক্ষা সফল বিজয়ীও বিজিতের কাছ থেকে গ্রহণ করে, আর সে দান নিলে প্রাণ নিজেই সে বন্দী হয়। পাশ্চাত্যের আক্রমণ প্রাচ্য-সংস্কৃতির রূপাবলী ভাঙাতেই সীমাবদ্ধ নয়; প্রতীচ্যের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য পূর্বে মূল্যবান অনেক কিছু আত্মসাৎ করাও তার উদ্দেশ্য। সুতরাং অতীত গৌরবকে টেনে এনে যতটা তারা গ্রহণ করতে পারে ততটা য়ুরোপ-আমেরিকার উপর ছড়িয়ে দেওয়া—এতে আমাদের আত্মরক্ষা হবে না। এই ঔদার্যে সাংস্কৃতিক শত্রুর সমৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধিই হবে, আমরা পাব একটুখানি আত্মবিশ্বাস। সে আত্ম-বিশ্বাস নবসৃজনের পূর্ণোদ্যমে যদি না পৌঁছায় তবে তাও নিরর্থক। কর্তব্য হল এই আক্রমণের সামনে দাঁড়ান নূতনতর প্রবলতর বাহিনী নিয়ে শুধু তাকে হটিয়ে দিতেই নয়, বরং যেখানেই সম্ভব জাতির পক্ষে কল্যাণকর সেইখানেই শত্রুর রাজ্যেই চালিয়ে নেওয়া সংগ্রাম। সেই সঙ্গে যা আমাদের স্বার্থের অনুকূল এবং ভারতীয় ভাবের স্বপক্ষে তা সাগ্রহে আত্মসাৎ করতে হবে। নিতান্ত কম হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে এই বিবিধ ক্রিয়া সুরু হয়ে গিয়েছে। অন্যক্ষেত্রে শুধু চলেছে নির্বোধের নিষ্ফল, যার শুরু করেছি দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে—পরস্ব

হজম না করেই। অনুকরণ, শক্তির যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির এলোপাতাড়ি গ্রহণ সাময়িকভাবে ফলদায়ক হতে পারে, তবে বিজয়ীর কাছে এ আর এক রকমে অবনতি স্বীকার। নিছক আত্মসাৎও আবার যথেষ্ট নয়; ভারতীয় অন্তঃপুরুষের সঙ্গে একাত্ম করে নিতে পারাই আসল কাজ। সমস্যাটির গোড়াতেই দারুণ বাধা, কাজটির পরিমাণও বিরাট—আমরা বিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে এদিকে এখনো শুরু করিনি। আশু প্রয়োজন এখন অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া, এমন সচেতন কর্ম দ্বারা এর সম্মুখীন হওয়া যার অন্তর্দৃষ্টিতে থাকবে জ্ঞান আর বীর্য, কর্মধারায় অকুণ্ঠ নিশ্চয়তা। নূতনকে একটা সর্বজয়ী ও সহায়ক স্বীকরণ সনাতন আধারের মধ্যে—অতীতে চিরকাল এই রকমই দেখা গিয়েছে ভারতীয় প্রতিভার বিশেষ ক্ষমতা।*

---

* Foundations of Indian Culture. Chap. II

কঠিন ডানায় ওড়া

(পূর্বানুবৃত্তি)

বীরবাহু

ফ্লেনহীন বিমানের ফ্লাইটে তখন ফ্লা: লে: চৌধুরী ছাড়া তিনজন বৈমানিক ও এঞ্জিনীয়ার পাতে বর্ম্মায় রহিয়া গেল। আর সকলকেই দমদমায় ফিরাইয়া আনা হইল। কিন্তু ওয়াপিটি ফ্লাইটের চারজন বৈমানিক ছাড়া আর কাহাকেও বর্ম্মা হইতে ফিরাইয়া আনা গেল না।

এদিকে সিঙ্গাপুরের পতন হইয়াছে। জাপানী বাহিনী মালয় দেশের বন্যা দিয়া আসিয়া পড়িয়াছে বর্ম্মায়। জাপানী বিমানগুলি প্রায় বিনা বাধায় যেখানে যেমন ইচ্ছা বোমা ফেলিয়া বর্ম্মার যান চলাচল ও সমস্ত পৌর ব্যবস্থার নাস্তি ঘটাইয়াছে। এক কথায় বর্ম্মা তখন অরাজকতার চরম স্তরে পৌঁছিয়াছে—কিছুটা জাপানীদের আক্রমণে আর কিছুটা জাপানীরা আসিয়া কি ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিবে সেই অজানা ভয়ে।

ওয়াপিটি ফ্লাইটের যাঁহারা কয়েকদিন পূর্ব্বে বৌলমেনে মহাসমাদরে আপ্যায়িত হইতেছিলেন, তাঁহারা সিঙ্গাপুরের পতনে অকূল পাথারে পড়িলেন। কেমন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসা যায় সেই চিন্তায়। যানবাহন সবই অচল। ট্রেন কখন কখনও চলে, কিন্তু কোন ট্রেন কোথায় যাইবে কেহই সঠিক জানেনা। সেনাদল সুযোগমত একদিকে যাওয়ার ট্রেন অন্য দিকে ঘুরাইয়া লইয়া যায়। নির্ব্বাচিত ও পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কোন পন্থায় কিছু করিবার উপায়ও সেনাদল হারাইয়াছে, কারণ সেনাদলের তখন পরিচালকহীন অবস্থা। বেতারবার্ত্তা-চালক অভাবে বেতার বার্ত্তার আদান প্রদানও বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

আমাদের বৌলমেন ডিটাচমেন্টের দশ বার জন যাহারা বিমানে ফিরিয়া আসিবার স্থান পায় নাই, তাহাদের আর কোন সংবাদ না পাওয়াতে, তাহাদের নাম খরচের খাতায় তোলা হইল। অনেকেই মনে করিল, অবধারিত মৃত্যু হইতে যদিও বা তাহারা রক্ষা পায়, তবে জাপানীদের হাতে বন্দী হইয়া অশেষ লাঞ্ছনা ও যাতনা ভোগের পর যখন যুদ্ধ বিরতি হইবে তখন তাহারা বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত স্বদেশে ফিরিতে পারিবে। কিন্তু আমাদের দেশেই ত কিংবদন্তি আছে "রাখে কৃষ্ণ মারে কে?" আমাদের এ ডিটাচমেন্টে

এক নম্বর ছিলেন হরভজন সিং। ভারতীয় বিমানবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পূর্বে কলিকাতায় এলুমিনিয়াম কম্পানীতে যানবাহন বিভাগে শিক্ষানবীশের কাজ করিতেন। মৌলমেনে একটা পরিত্যক্ত লরী তাঁহার নজরে পড়ে। লরীটা ছিল সৈন্যবিভাগেরই। সেই লরী নাড়াচাড়া করিয়া দেখা গেল সহজেই মেরামত করা সম্ভব। সকলে মিলিয়া তখন মেরামতের কাজে লাগিয়া গেল, এবং মেরামতের পর সেই লরীতে চাপিয়া উত্তর দিকে রওনা হইল। রাস্তা কাহারও জানা ছিল না, রাস্তার নক্সা তখন সংগ্রহ করাও অসম্ভব; তদুপরি বর্মী ভাষা কাহারও জানা নাই। কাজেই রাস্তার নির্দেশ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই। সেইজন্য যে রাস্তা উত্তর দিকে গিয়াছে, সেই রাস্তাই যোগ্য রাস্তা, অন্য রাস্তা পরিত্যাজ্য এই বিবেচনা করিয়া তাহারা অগ্রসর হইল। যতক্ষণ পর্যন্ত পেট্রল সংগ্রহ করা গেছে ততক্ষণ তাহারা লরী ত্যাগ করে নাই। রেঙ্গুন পার হইয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর লরীর পেট্রল ফুরাইয়া গেলে আর সংগ্রহ করা অসম্ভব হইল। এবার তাহারা পায়ে হাঁটিয়া রেললাইন বরাবর উত্তর দিকে চলিল। কয়েক মাইল উত্তরে এক ষ্টেশনে একটা রেল এঞ্জিন পাওয়া গেল। বর্মী এঞ্জিন ড্রাইভার একলাই কয়লা কাঠ দিয়া এঞ্জিনে বাষ্পের চাপ বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল। মৌলমেন ডিটাচ-মেন্ট যখন পৌঁছাইল এঞ্জিন চালাইবার মত বাষ্পের চাপ তখনও বাড়ে নাই। হরভজন্ সিং এঞ্জিন চালকের সাথে কথাবার্তা বলিয়া এই দশবারজনকে যতটা উত্তরে পৌঁছান যায় সেই চুক্তি করিল, শুধু বিনিময়ে কয়েক শত টাকা দিতে হইবে।

ডিটাচমেন্ট বর্ম্মার উত্তর দিকে যাওয়ার পথে খাদ্য নিজেরাই সংগ্রহ করিতেছিল। এই যুদ্ধে তাহারাই বোধ হয় প্রথম দল যাহারা জমিনির্ভর পক্ষ, অর্থাৎ স্থানীয় খাদ্য সংগ্রহে উদরপূর্তি করা, সে সংগ্রহ যে কোন উপায়েই হউক, সুরু করে। লরীতে আসার সময়, প্রথম দিকে তাহারা অর্থ দিয়াই খাদ্য সংগ্রহ করিতেছিল, কিন্তু পরে অর্থাভাব হইলে গ্রামবাসীদের খাদ্য হস্তান্তরে অনিচ্ছা প্রকাশ পাইল; তখন তাহারা বাধ্য হইয়াই নিতান্ত অরুচি সত্ত্বেও গ্রামবাসীদের অজ্ঞাতসারে ও একটা বিশেষ বিদ্যার প্রয়োগে খাদ্য সংগ্রহ করিত। অবশ্য তাহাদের নিকট যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ছিল, যাহার বিনিময়ে খাদ্য সংগ্রহ হয়ত সহজ হইত; কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র তাহারা শেষ পর্যন্ত হস্তান্তর করে নাই। বর্মী এঞ্জিন-চালকের কৃপায় খাদ্য সংগ্রহ কিছু সহজ হয় ও প্রায় তিনদিন পরে তাহারা আরও উত্তরে পৌঁছায়। রাত্রে এঞ্জিন না চালাইয়া কোন ষ্টেশনের সাইডিংএ তাহারা অপেক্ষা করিত।

এইবার এক বিচিত্র নিছিনের সাক্ষাৎ তাহাদের মিলিল। অনেক ভারতীয় যাহারা এতদিন সুখে বর্ম্মায় বসবাস করিতেছিল, জাপানীদের ভয়ে, তাহারা বাড়ীঘর ত্যাগ করিয়া শুধু সামান্য কিছু মালপত্র লইয়া ধীরে ধীরে আকিয়াব হইয়া ভারত অভিমুখে চলিয়াছে। সবাই পদব্রজে। অহাদের মধ্যে হিন্দুও আছে, মুসলমান, খ্রীষ্টানও আছে। বঙ্গবাসীও আছে, দক্ষিণ ভারতীয়রাও আছে। অনেকের নিকটই অর্থসামর্থ্য নিঃশেষ হইয়াছে।

তাহারা একরূপ অনাহারেই চলিয়াছে। যাহাদের নিকট অর্থ ছিল, তাহারাও বলিতেছে অর্থ নাই। আশপাশের গ্রামবাসী বা ব্যবসায়ীদের খাদ্যভাণ্ডার শূন্য। যাহাদের নিকট খাদ্য লুকান আছে, তাহারও সব তুলিয়াছে খাদ্য ভাণ্ডার শূন্য। এবং এরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ যাহা হওয়া স্বাভাবিক, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। হাঁটিতে হাঁটিতে যে একবার বসিয়া পড়িল, হাঁটার অসামর্থ্যে, তাহার জন্য দলের অন্য কেহ অপেক্ষা করিবে না। যাহারা পরে আসিতেছে, তাহারা কটুবাক্য ছাড়া অন্য কোন আপ্যায়ন করিবে না। যে বসিয়া পড়িল, সে চিরকালের জন্য সেখানেই রহিয়া গেল। আর যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহাদেরও নির্যাতন ভোগ হইতে মুক্তি নাই অনাহারের পর অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়া, বিশ্রামের অভাব ; আর সব সময় চোর ডাকাত বাটপাড় হইতে সাবধান থাকা। যার সেই চোর ডাকাত বাটপাড় হয়ত তাহারই দেশবাসী, খুব পরিচিত ব্যক্তি, কিন্তু ওৎ পাতিয়া রহিয়াছে, কখন কোথায় দাঁও মারা যায়।

এই বিছিলের সাথে সাথে, অথচ বিছিলের অঙ্গ না হইয়া, কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের ডিটাচমেন্টের দশবারজন বৈমানিক আকিয়াব জাহাজ বন্দরে পৌঁছিল। সেখান হইতে জাহাজে কলিকাতায় পৌঁছাইতে সপ্তাহখানেক সময় লাগিয়াছিল। কিন্তু এই এক সপ্তাহ অনেকের অনেকদিন পর্য্যন্ত মনে রহিবে। জাহাজে আরোহণের পূর্ব্বে শুধু পরিহিত বস্ত্র ছাড়া আর সব, এমনকি অস্ত্র পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া স্থানীয় ভারতীয় সেনার নিকট জমা দিতে হইল। তাহার পর এক সপ্তাহ মধ্যে আর বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের কথা হইতেই পারে না। জাহাজে জলাভাব হেতু স্নান করা নিষেধ হইয়াছে। সামান্য একটু জল যাহা মিলিত, তাহাতে কোন প্রকারে মুখ ধোয়া ব্যতীত আর কিছু করার উপায় ছিল না। আর এই এক সপ্তাহ জাহাজের মধ্যে যেখানে দশজনের মত থাকিবার স্থান, সেখানে অন্ততঃ তিরিশ চল্লিশ জনকে গাদাগাদি করিয়া ভর্ত্তি করা হইয়াছে। যতলোক ভারতে আসিবার জন্য আকিয়াব পৌঁছিয়াছিল, তাহাদের সবাইকেই জাহাজে উঠাইবার চেষ্টা চলিতেছিল। কাজেই এত অসুবিধাতেও কেহ বিরক্তি প্রকাশ করে নাই। বরঞ্চ সবাইকেই সাহায্য করিবার মনোবৃত্তি প্রকাশ ছিল।

জাহাজে খাদ্য অফুরন্ত ছিল না। প্রত্যেক চারিজন পিছু এক টিন বুলি বীফ্ দিনান্তে মিলিত। ঐ এক সপ্তাহ সকলেই জাতবিচার না করিয়া, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কথা না তুলিয়া, রুচি-অরুচির বিতর্ক না আনিয়া বুলি বীফ্ মহা আনন্দেই উদরসাৎ করিয়াছে।

হরতজন সিংয়ের বুদ্ধি ও কৃতিত্বে আমাদের ডিটাচমেন্ট একদিন দমদম বিমান বন্দরে পৌঁছিল। কিন্তু আমাদের সাথে আর বেশীদিন যাপন করা হরতজনের সম্ভব হয় নাই ; দমদমায় ফিরিবার কিছুদিন পরে, বিমান হইতে গুলি চালনায় উচ্চ শিক্ষার জন্য তাহাকে ভূপালের বৈড়াগড় বিমান বন্দরে যাইতে হয়। সেখানে হারিকেন বিমানে মাটির উপর আক্রমণ শিক্ষার সময় বিমানের একদিকের ডানার কোনা মাটিতে লাগিয়া যায়। তিনশত

মাইল বেগে উড়িবার সময় টক্কর খাইলে যে কোন বিমানই ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাওয়ার কথা। এ ক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। হরভজনের ও ঐ বিমানের গল্প ঐখানেই শেষ।

বিমান হইতে গুলিচালনার শিক্ষা যে কত কঠিন ও মারাত্মক হইতে পারে তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে ধারণায় আনা সম্ভব নয়। না পড়িয়া কেহ হাঁটিতে শেখে না, একথা সকলেই জানে। সাইকেল চড়া শিখিবার সময় কয়জন একবারও ধরণীতে পপাত না হইয়া চড়া শিখিয়াছেন? হাঁটিতে শেখা বা সাইকেল চড়া শিখিবার সময় পড়িয়া গেলে আঘাত লাগিবে কিন্তু তা মারাত্মক না হওয়াই সম্ভব। সাইকেল হইতে পড়িয়া গেলে বড়জোর হাত পায়ের হাড় ভাঙ্গিতে পারে। সাইকেলের গতিবেগ ঘন্টায় সাধারণতঃ দশ মাইলের বেশী হয় না। কিন্তু হারিকেন বিমানের গতিবেগ সাইকেলের তুলনায় কিছু বেশী;—দশ মাইলের পরিবর্তে তিনশত মাইল। প্রথম কয়েক ঘন্টা শিক্ষার সময় একজন শিক্ষক বিমানে থাকেন ও ছাত্রের মারাত্মক ভুল হওয়ার পূর্ব্বেই সংশোধনের কার্য্য করিয়া তাঁহার, ছাত্রের ও বিমানের জান রক্ষা করেন। কিন্তু কয়েক ঘন্টা শিক্ষার পর যখন ছাত্র একা একাই বিমান লইয়া খেলা সুরু করে, তখন মারাত্মক ভুল সংশোধনের অবকাশ আর থাকে না। ফলে প্রত্যেক কোর্সে শতকরা প্রায় পঞ্চাশটি বিমানসহ ছাত্র নষ্ট হয়। নষ্ট হওয়ার সংখ্যা এত সাংঘাতিক হইলেও উপায় নাই। দেশরক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দিতেই হইবে। আর বিমান এমনই জিনিষ ও বৈমানিক হওয়ার নেশা এত গভীর যে শতকরা পঞ্চাশজন বিনষ্ট হইবে জানিয়াও, সব দেশেই, সব কালেই বৈমানিক হওয়ার জন্য তরুণের অভাব নাই। তখন হারিকেনের গতিবেগ ঘন্টায় তিনশত মাইল ছিল, এখন নূতন জেট ফাইটার বিমানের গতিবেগ ঘন্টায় নয়শত মাইল হইয়াছে। কিন্তু বিমানবাহিনীর জন্য বৈমানিকদের অভাব কখনও হয় নাই, হইবেও না।

বৈড়াগড়ে বৈমানিক বিনষ্ট হওয়ার হার এত উচ্চ হওয়াতে বিমানবাহিনীর ভাষায় বৈড়াগড় বেশ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। কাহাকেও কঠিন ভাষায় কিছু বলিতে হইলে বলা হইত "তেরা বৈড়াগড় কর দুঙ্গা"—অর্থাৎ তোমাকে এমন কঠিন বিপদের কাজ দিব যে, তাহা হইতে তোমার কোন মতেই আর নিস্তার নাই। হরভজনকে অবশ্য ঐ কথা কেহ কখনও বলে নাই। সকলেই তাহাকে ভালবাসিত।

মালয়, বর্ম্মা ও ভারত যাহাতে ব্রিটিশদের নিকট হইতে কেহ ছিনাইয়া লইতে না পারে, তাহার জন্য দূর প্রাচ্যে বহু অর্থব্যয়ে তাহারা দ্বিতীয় জিব্রাল্টার অর্থাৎ সিঙ্গাপুর গড়িয়াছিল। সিঙ্গাপুরের জন্য ডক তাহারা ব্রিটিশ দ্বীপেই বানাইয়াছিল। সমুদ্রে ভাসাইবার পরে জাহাজ দিয়া টানিয়া লইয়া আসে। সিঙ্গাপুরের চারিদিকে ছোট ছোট অনেকগুলি দুর্গের বেড় করিয়া রাখিয়াছিল। বড় বড় ও দূর পাল্লার কামান এই দুর্গগুলিতে লুকাইয়া বসান ছিল। বিমানবাহিনীর উপযুক্ত বিমান-বন্দর সিঙ্গাপুর ছাড়া, আশেপাশে আরও কয়েকটি ছিল।

সিঙ্গাপুর রক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। সকলেই বলিত সিঙ্গাপুরের পতন হইতে পারে না। তবু সত্ত্বেও যখন প্রায় বিনাযুদ্ধে সিঙ্গাপুরের পতন ঘটিল (পানীয় জলের অভাবে আত্মসমর্পণ), তখন ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ সৈন্যদের একটা গান গাহিতে প্রায়ই শোনা যাইত।

"I sing a song of Singapore
The greatest naval notion
Eighty million pounds
Poured into the Indian Ocean."

"আমি গাহি গান সিঙ্গাপুরের
সবচেয়ে খাঁটি নৌসেনার
আশীটি লক্ষ পাউণ্ড মুদ্রা
ভারত সাগরে ডুবিল যেথায়।"

ঘটনাবলীর প্রবাহ এখন বিদ্যুৎগতিতে চলিতেছিল। বর্মা হইতে ভারতীয় বিমান-বাহিনীই শুধু ফিরিয়া আসে নাই, রয়াল এয়ার ফোর্সের আঠাশ নম্বর স্কোয়াড্রন ও অন্য স্কোয়াড্রনগুলিও ফিরিয়া আসিল। আঠাশ নম্বর স্কোয়াড্রনে লাইসাণ্ডার বিমান ছিল। এই স্কোয়াড্রনের গল্প যথাস্থানে বলিব।

এই সময় রয়াল এয়ার ফোর্সের বহু বৈমানিক সোজা বিলাত হইতে নৌজাহাজে কলিকাতায় পৌঁছায়। দুইটি ওয়াপিটি বিমান ছাড়া অন্য কোন বিমান তখন দমদমায় ছিল না।

একটি ছোটনাক প্লেনহীন লইয়া ফ্লাঃ লেঃ চৌধুরী তখনও বর্মার যুদ্ধ একলাই চালাইয়া যাইতেছিলেন।

এই সময় তিন নম্বর ফ্লাইটের সমস্ত বৈমানিকদের ও দুইখানা ওয়াপিটি বিমান লইয়া একশত চার নম্বর ভারতীয় স্কোয়াড্রন কাগজ পত্রে তৈয়ারী হইল। এক স্কোয়াড্রনের উপযুক্ত সংখ্যক বৈমানিক তিন নম্বর ফ্লাইটে ছিল না। সেইজন্য রয়াল এয়ার ফোর্সের নবাগত কয়েকজন এক্তিনীয়ারিং বৈমানিক একশত চার নম্বর স্কোয়াড্রনে আজ্ঞাপত্র পাইয়া যোগ দিল। তাহাদের মধ্যে দুইজনের কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়ে। একজন কর্পোরাল ফিচ্‌টে ও দ্বিতীয় জন এল, এ, সি ল্যাফার্টি। এই নূতন স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডিং অফিসার হইলেন স্কোয়াড্রন লীডার সমন ;—সত্যই আকারে ছোটখাট কিন্তু শক্তি ও তেজে সেই অনুপাতে বড়। প্রথমেই তিনি ভারতীয় বৈমানিকদের লইয়া এক বৈঠকে বসিলেন। বৈঠকে আলোচনার বিষয়বস্তু হইল কি করিলে নূতন বিমান ও বিমান মেরামতের যন্ত্রপাতি শীঘ্র সংগ্রহ করা যায় ও বিমান সংগ্রহের পর বৈমানিকদের এই নূতন বিমান চালনা শিক্ষা কত

অল্প সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হইতে পারে, যাহাতে বিমান ও বৈমানিকরা শীঘ্রই যুদ্ধোপযোগী হয়। এই জোয়াড়ুনে এখন ভারতীয় ও ব্রিটিশ দুই দেশের বৈমানিক একত্র হইল। কিন্তু এই দুই পক্ষের মনে মনে যে একটা রেষারেষি ছিল, সে কথা তিনি জানিতেন। বৈঠকের শেষে তিনি তিন নম্বর স্কোয়াড্রনের বৈমানিকদের বলিলেন যে নবাগত বৈমানিকদের বিমান যুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু তিন নম্বর স্কোয়াড্রনে সকলেরই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হইয়াছে। সেইজন্য তাহারা যেন নবাগতদের শিক্ষা দিয়া শীঘ্রই উপযুক্ত করিয়া লয়। ব্রিটিশ বৈমানিকদিগকে এই কথা তিনি পরে বলিলেন। তাহাতে ফল এই হইল যে কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহাদের সাথে আমাদের বৈরিতা ছিল না।

পূর্ণ যুদ্ধোপযোগী হওয়ার খসড়া ত হইয়া গেল। বাধা হইল শুধু এক যায়গায়; বিমানের অভাব। যাহা হউক বর্ষাগুহ্ম ফেরৎ দুইখানা ওয়াপিটি বিমান আমাদের ছিল। তাহাতেই উৎসাহ পূরণ করার উদ্যম চলিল। প্রত্যহই দিনের আলোতে যতক্ষণ সম্ভব ওয়াপিটিতে চারিদিকে চহল দিয়া আসা হইত।

একদিন সকালে স্কোঃ লীঃ স্বল নিজে একখানা ওয়াপিটি লইয়া বঙ্গোপসাগর অভিমুখে গেলেন। দ্বিতীয় ককপিটে কে ছিলেন এখন আর মনে নাই। দুপ্রহরে বিমান ফিরিয়া আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে সকলেই উদ্বিগ্ন বোধ করিতে লাগিলেন, বিশেষতঃ অফিসার কমাণ্ডিং নিজেই যখন বিমান চালনা করিতেছিলেন। বেলা দুইটা নাগাদ ডায়মণ্ড হারবার হইতে পুলিসের সংবাদ পাওয়া গেল যে ঐ এলাকায় এক ধানক্ষেতে কোন বিমান অবতরণের চেষ্টা করে ও ধানক্ষেতে অবতরণের পর এক ক্ষুদ্র নালার মধ্যে চাকা পড়িয়া যাওয়ায় বিমান উল্টাইয়া গিয়াছে। বৈমানিক দুইজন তাহাদের ককপিটেই ছিলেন, অক্ষত দেহেই, শুধু তাহাদের মস্তক নীচের দিকে ছিল আর পদদ্বয় উপরের দিকে। গ্রামবাসীরা তাহাদিগকে বিমানে ঝুলান অবস্থা হইতে মাটিতে নামাইয়াছে। অনেকক্ষণ শিরাগন অবস্থায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও থাকার দরুণ কিছু অসুস্থ বোধ করিতেছেন। অবিলম্বে তাঁহাদের দমদমায় ফিরিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিমানচালকের নাম স্কোঃ লীঃ স্বল।

অফিসার কমাণ্ডিংএর বিপদে আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল; কিন্তু দুইখানা ওয়াপিটির মধ্যে একখানা নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা আমরা কখনও চাহি নাই। তখনই এম্বুলান্স গাড়ী ও বিমানবাহিনীর ডাক্তার লইয়া অকুস্থলে রওনা হওয়া গেল। সন্ধ্যার পর পৌঁছাইয়া, অন্ধকারে, টর্চের আলোতে, যতটুকু সম্ভব পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে দুই বৈমানিক ও এক বিমান সবই অক্ষত রহিয়াছে; শুধু বৈমানিক দুইজন পরিশ্রম ও তৃষ্ণায় কাতর; আর বিমান চাকা মাটিতে না রাখিয়া উল্টাইয়া আকাশের দিকে রাখিয়াছে, যেন ক্ষুব্ধ হইয়া। ক্ষোভ কেন? কারণ বৈমানিকদ্বয় এক নম্বর ট্যাঙ্কের পেট্রল শেষ হওয়ার পর দুই নম্বর ট্যাঙ্কের কল খুলিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেই কারণে পেট্রল অভাবে এঞ্জিন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তখন নিরুপায় হইয়া বৈমানিকদ্বয় ধানক্ষেতে অবতরণের

চেষ্টা করেন। কিন্তু ধানক্ষেতের মাঝখানে যে সেচবিভাগের জলপূর্ণ খাল ও তাহার পাড়ে যে উঁচু আল থাকিতে পারে এ কথা তাহাদের জানা ছিল না, আর ঐ অবস্থায় অবতরণের সময় নজরেও আসে নাই। সেইজন্য এত বিপদ। বিপদ বৈমানিকদেরও নয়, বিমানেরও নয়। বিপদ হইল এঞ্জিনীয়ারদের। পরদিন নানা যন্ত্রপাতি ও ত্রিপাদ ক্রেন লইয়া বিমান উঠাইয়া সোজা করিয়া রাখা হইল। পরে গ্রামবাসীদের সাহায্যে টানাটানি করিয়া ধানক্ষেতের মাঝে এমন যায়গায় বিমান নেওয়া গেল, যেখান হইতে যে কোন প্রথম শ্রেণীর বিমান চালক বিমান আকাশে উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারিবে। পাঃ অঃ ভাটিয়া সহজেই এই কাজ সম্পন্ন করিলেন। এতক্ষণ একটা কথা বলা হয় নাই। এই ওয়াপিটি বিমানের নম্বর ছিল ৫৪।

সকলেই বিশ্বাস করে বিমানবাহিনীর সবাই খুব সাহসী হয়। জীবন-মরণ তুচ্ছ করিয়া চলিতে তাহারা সব সময়ই ওস্তাদ। কিন্তু কতকগুলি ব্যাপারে তাহারা বড়ই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। যেমন বিমানবাহিনীর সকলেই বিশ্বাস করে "বার বার তিনবার" একেবারে ধ্রুবসত্য। কোন কিছু হয়ত প্রথম ও দ্বিতীয়বার হইতে হইতেও কস্কাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তিনবারের বার নির্ঘাৎ ফলিবে। কোন বিমান বা বৈমানিকের প্রথম ও দ্বিতীয়বার আকস্মিক বিপদ হইতে বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে, কিন্তু তৃতীয়বারের সময় আর বাঁচা সম্ভব নয়। অথবা কোন বৈমানিক যদি আদিষ্ট বিমান না লইয়া অন্য কোন বিমান লইয়া যায়, বা আদিষ্ট বৈমানিকের স্থলে অন্য কোন বৈমানিক যায়, তাহা হইলে বিপদ অনিবার্য্য। যদিও এগুলি কেবল কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু যেখানে মুহূর্ত্তে আকস্মিক বিপদ ঘটিয়া জীবন-মরণ সঙ্কট হইতে পারে, সেখানে এই বিষয়ে যথেষ্ট সাবধান থাকা হয়।

৫৪ নম্বর ওয়াপিটির ব্যাপারে কোন অবহেলাই আর বরদাস্ত করা হইত না। বিমান সম্পূর্ণ নিরাপদভাবে উড়িবার উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত উড়িবার ছাড়পত্র এঞ্জিনীয়ার বৈমানিকরা দেওয়া বন্ধ করিলেন।

দমদম বিমান বন্দরের রানওয়ে তখন কেবল বারশত গজ লম্বা ছিল। দ্রুতগামী বিমানের পক্ষে এত ছোট রানওয়েতে উড়িয়া যাইবার ও অবতরণের সময় যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা থাকে। তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ এইবার পাওয়া গেল। এক অপরাহ্নে সংবাদ আসিল যে পরদিন প্রত্যূষে এক বিরাটকায় আমেরিকান বম্বার পৃথিবী প্রদক্ষিণে বাহির হইয়া দমদমায় পৌঁছিবে। প্রত্যূষে সকলেই বিমান বন্দরে আসিয়া অপেক্ষায় রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে চারি এঞ্জিনযুক্ত এক বিরাট বিমান বন্দরের উপরে আসিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে লাগিল। একবার রানওয়ের উপর খুব নীচু দিয়া ধীরে ধীরে উড়িয়া গেল। আমরা বুঝিলাম চালক ধীরে ধীরে রানওয়ের উপর বিমান উড়াইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন আঘাত না লাগাইয়া এই ক্ষুদ্র রানওয়েতে বিমান অবতরণ করান যাইবে কিনা? এইবার দক্ষিণ দিকের নারিকেল গাছগুলির উপর দিয়া আসিয়া রানওয়ের প্রথম অংশেই অবতরণ

করিল : বিমানের চাকা রানওয়ের সংস্পর্শে আসা মাত্র বৈমানিক ব্রেক ব্যবহার করিতে সুরু করিলেন। বিপরীত কোণে পৌঁছিবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বিমানের অগ্রগতি রোধ হইল। আমরা সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম। এর পর হ্যাঙ্গারের সম্মুখে বিমান আনিয়া রাখা হইলে আমরা রানওয়ে পরীক্ষা করিতে গেলাম। দেখা গেল বিমানের চাকা যেখান দিয়া গিয়াছে, সেখানে প্রায় একফুট মত গভীর খাদ হইয়া গিয়াছে। উড়িয়া যাইবার বা অবতরণের সময় কোন বিমানের চাকা এই খাদে পড়িলে তাহার রক্ষা নাই, নির্ঘাৎ উল্টাইয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে। পাব্লিক্ ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্টের বিমানবন্দর বিভাগ তাড়াতাড়ি আসিয়া এই খাদ ভর্ত্তি করিয়া দিয়া গেল।

এটি ছিল প্রথম লিবারেটর বম্বার। নানা অসুবিধার মধ্যে উড়িবার উপযোগিতা ও যুদ্ধরত বন্ধু দেশগুলিকে সাহস দিবার জন্য পৃথিবী প্রদক্ষিণে বাহির হইয়াছে। তবে কোথায় যাত্রা সুরু হইয়াছে ও কোন সহর বা বিমানবন্দরে অবতরণ করিয়াছে সব কথাই সামনের দিকে বিমানের খোলের উপরে লেখা ছিল। লেখা ছিল নিউ ইয়র্কের লা-গার্দিয়া বিমানবন্দর হইতে যাত্রা সুরু করিয়া প্রথমে অবতরণ করে লণ্ডনের বিমানবন্দরে। সেখান হইতে লোলা মস্কো। মস্কো হইতে দিল্লীর পালম বিমান বন্দর। এইবার দমদম হইয়া জাপানীদের সাথে যুদ্ধরত চিয়াং-কাইশেকের চীনদেশে তাহারা চলিয়াছে।

বিমানের ভিতর দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। বিমান যে এত বড় হইতে পারে সে ধারণাই আমাদের ছিল না। বোমা রাখিবার খোলই এক বিরাট গহ্বর, আমাদের ওয়াপিটি বিমান হইতেই আকারে বড়। তাহার মধ্যে দশবার জোড়া পাঁচশত পাউণ্ড ওজনের বোমা ঝুলাইয়া রাখার ব্যবস্থা রহিয়াছে। পাঁচ হাজার পাউণ্ড ওজনের বোমা দুই হাজার মাইল দূরের টার্গেটে ফেলিয়া আসিবার ক্ষমতা এই বিমানের ছিল। উপরন্তু সামনের ও পিছনের গানটারেট্ ছাড়া আরও চারিটি গানটারেট্ ছিল। পেটের তলায়, পিঠের উপরে ও দুইপাশে দুইটি লইয়া মোট ছয়টি পাওয়ার গানটারেট, এবং প্রত্যেক টারেটে চারটি করিয়া মোট চব্বিশটা গান। এইগুলিও ব্রিটিশ গানের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী। ব্রিটিশগানের কার্ত্তুজগুলির ব্যাস হইল ·৩০৩ ইঞ্চি, আর এর কার্ত্তুজগুলির ব্যাস ·৫ ইঞ্চি। এ ছাড়া বম্ব নিশানা করিবার যন্ত্রও একেবারে নূতন। মেঘের আড়াল হইতেও নিশানায় বম্ব ফেলা যায়। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল সত্যই গগনের ডেষ্ট্রয়ার। এইজন্য আমেরিকান বিমানবাহিনী দিনের বেলাতেই এই বিমান জার্ম্মানীর অনেক ভিতরের টারগেট বোমা ফেলিবার জন্য যাইতে সাহস পাইত। জার্ম্মানীর অনেকগুলি ফাইটার বিমান একত্র না হইলে লিবারেটর বম্বারের নিকট আসিত না।

কিছুদিন পূর্ব্বে কানাডার এম্পায়ার এয়ার ট্রেনিং স্কীম সুরু হইয়াছিল। সেখানে বৈমানিকদের শিক্ষা সমাপ্ত হইলেই নানা দেশে তাহাদের পাঠান হইতেছিল। তাহাদের

মধ্যে কিছু এদেশেও আসে। দমদমায় যাহারা পৌঁছিল তাহাদের মধ্যে চালক, এঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্য সব প্রকার ট্রেডের বৈমানিকরা ছিল। ক্রমেই ব্রিটিশ বৈমানিকদের সংখ্যা দমদমায় আমাদের তুলনায় সংখ্যায় বেশী হয়। তখন একজন স্কুয়াড্রন এয়ার ফোর্সের উইং কমাণ্ডার দমদম বিমানঘাটির অফিসার কমাণ্ডিং হইয়া আসেন।

এর পর প্রায় প্রত্যহই একখানা দুইখানা করিয়া হারিকেন কাইটার বিমান দমদমায় পৌঁছাইতেছিল। একদিন একসাথে পাঁচখানা ফর্মেশন ফ্লাইট করিয়া পৌঁছায়। প্রথমটি, রাণওয়ে লম্বায় ছোট হওয়াতে অবতরণের বেগ সামলাইতে পারে না, ও শেষের দিকে খুব জোরে ব্রেক করার জন্য উল্টাইয়া যায়। দ্বিতীয়টি অবতরণের সময় কিছু লক্ষ্য না রাখাতে, একেবারে প্রথমটির উপরে আসিয়া পড়ে। উইং কমাণ্ডার নিকটেই ছিলেন। ভেরী পিষ্টলে লাল রংয়ের কার্তুজ আকাশে মারিয়া অন্য তিনটি বিমানকে অবতরণ না করিবার সংকেত তিনি দিলেন ও দৌড়াইয়া গিয়া দ্বিতীয় বিমানে উঠিলেন, এবং বিমান চালকের পার্টের ঘাড় ধরিয়া তাহাকে নাচিতে নামাইলেন ও ঘুষি মারিতে লাগিলেন। সাথে সাথে বিমানবাহিনীর সেরা বাক্যবাণগুলিও এই দুই বৈমানিকের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়া চলিলেন। বড়দিন ছিল বিমানের এত অভাবের সময় তোরা দুই শুয়র দুইখানা হারিকেন বিমান ধ্বংস করিলি প্রথম বিমানচালকের তখন কিছু শুনিবার অবস্থা পার হইয়া গিয়াছিল। পরের দিন তাহার দেহ হাসপাতাল হইতে আনিয়া আমরা কয়েকজন গ্লো মার্চ করিয়া লইয়া গেলাম মাটিতে দেওয়ার জন্য।

এরপর হইতেই রানওয়ে লম্বা ও শক্ত করিবার কাজ সুরু হয়, যাহাতে হারিকেন স্পিট্ ফায়ার ও মস্কুইটোর মত বিমান সহজে অবতরণ করিতে পারে।

এই সময়ের কয়েকটি ঘটনা সামান্য হইলেও শিক্ষার পক্ষে খুব সাহায্য করিয়াছে। মনে বিশ্বাস আনিয়া দিয়াছে যে বিমান জীবন্ত বস্তু, তাহার সাথে হেলা-ফেলা করিয়া চলিবার উপায় নাই; বিমানের সাথে যে ছেলেখেলা করিয়াছে, সময়মত বিমান তাহাকে ডুবাইয়া দিয়াছে। একদিন সদ্য-আগত একখানা হারিকেন বিমান মাঠের মধ্যে রাখিয়া এঞ্জিন ও বিমান পরীক্ষা দেখার সময় আমেরিকান বিমানবাহিনীর দুই এঞ্জিন যুক্ত একটি বিচেল বম্বার, অবতরণের পর পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিলাম। আরও দেখিলাম এঞ্জিন দুইটি চালু রাখিয়া বিমানচালক কর্পোরাল বাহির হইয়া আসিলেন। বিচেল বম্বার একেবারে নূতন বিমান; খুব নাম ডাক। বিমানের বাহির ও ভিতর তখনও দেখা হয় নাই। হারিকেনের কাজ তখনকার মত স্থগিত রাখিয়া বিচেল বম্বার দেখিয়া লইব এই মনস্থ করিয়াছি, সেই সময় দেখিলাম বিমান চালক কর্পোরাল বামদিকের এঞ্জিনের নীচে গিয়া উপরের দিকে অর্থাৎ এঞ্জিনের দিকে দেখিতেছেন। পরমুহূর্তেই হতভম্ব হইয়া দেখি কর্পোরালের বড় একটু ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া প্রপলারের নীচে পড়িয়া গেল, আর ফুটবলের মত একটা কিছু গড়াইয়া খানিকটা দূরে আগাইয়া গেল। কাণ্ডটা এত স্বল্প

সময়ের মধ্যে হইয়া গেল যে নিজ চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করাই কঠিন হইত যে ঘূর্ণায়মান প্রপলরের সামান্য আঘাতেই আমেরিকান কর্পোরেলের শির ধড় হইতে চ্যুত হইয়া ফুটবলের মত দূরে গড়াইয়া চলিয়া গেল।

অন্য একদিন বৈকালে তিনজন বৈমানিক একখানা লঘুনাক্ষ স্নেহহীন বন্দর লইয়া পৌঁছিল। বিমান ডিস্‌পার্সাল পয়েন্টে রাখার পর চালক আসিয়া জানাইল যে বামদিকের এঞ্জিনের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, এবং প্রশ্নের পর তাহারা বলিল যে পরের দিন তাহারা যাত্রা করিবে না। কাজেই মেরামতির কাজ পরদিন লওয়া হইবে এই কথা সাব্যস্ত হইল। পরদিন প্রত্যূষে বিমানে অন্য কাজে যাইতে হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম ঐ তিনজন বৈমানিক বামদিকের এঞ্জিন মেরামত না করাইয়াই বিমান লইয়া রওনা হইয়াছিল। কিন্তু বেশী দূর যাওয়া তাহাদের ভাগ্যে হয় নাই। বামদিকের এঞ্জিন বিমান মাটি ছাড়িয়া উঠিবার মুহূর্তেই নিশ্চল বন্ধ হইয়া যায়; ফলে বিমান বামদিকে ঘুরিয়া যায় ও সামান্য দূরে এক ডোবার মধ্যে পতিত হয়। ডোবাতে তখন জল দুই তিন ফিটের বেশী ছিল না। এই দুই তিন ফিট জলের মধ্য হইতে তাহাদের মৃতদেহ বাহির করিতে হইয়াছিল, বিমানের খোল কুড়াল দিয়া কাটিয়া।

নৌসেনের আমাদের একজন বৈমানিক গিয়াছিল, নাম এ, বি, সি, রাও। বাড়ী তেলেঙ্গনায়। ডাব নারিকেল পাইলে আর কিছু খাইতে চাহিত না। বিমান বন্দরের ব্যারাকগুলিতে স্থানাভাব হওয়াতে মতিঝিল কলোনী পাড়ার এক বাড়ীতে রাও ও আরও কয়েক জনের থাকিবার ব্যবস্থা হইল। মতিবিবি ছিলেন সিরাজদ্দৌলার একজন প্রিয় বেগম। তাঁহার বাগান বাড়ী ঐখানেই ছিল; চারিদিকে ঝিলে ঘেরা, তাই মতিঝিল। সে বাড়ী এখনও আছে; শুধু তাই নয়, নারিকেল গাছও অনেকগুলি আছে। কয়েকটা আবার উচ্চতায় ষোটে দশবার ফুট। একদিন দুপ্রহরে রাও নারিকেল গাছতলায় উপস্থিত হইয়া মনের মত নারিকেল পছন্দ করিলেন; ও একটা লম্বা বাঁশ সংগ্রহ করিয়া সেই নারিকেলে কয়েকটা খোঁচা দিলেন। নারিকেল পড়িল না। কাটারী কোথায় সংগ্রহ করা যায় এই ভাবনায় একবার চারিদিক দেখিয়া লইয়া, পুনরায় বাঁশ দিয়া খোঁচা দিবার জন্য উপর দিকে যেই মুখ ফিরাইয়াছেন, সেই মুহূর্তে খোঁচা হইতে খসিয়া নারিকেল তাহার নাকের উপরে পড়িল। তিনিও এই তীব্র আঘাতে জ্ঞান হারাইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। রাও অনেকক্ষণ ঘরে ফিরিয়া না আসাতে, সাথীরা কি হইল দেখিতে বাহিরে আসিয়া রাওকে আর চিনিতে পারে না, কারণ তখন নাক ফুলিয়া কলাগাছ না হইলেও প্রায় ডাবের আকার হইয়াছে। তিনমাস হাসপাতালে থাকার পর তিনি একশত চার নম্বর স্কোয়াড্রনে ফিরিয়া আসিলেন। এবার আর এ, বি, সি রাও নয়, আমরা নূতন নামকরণ করিলাম—কোকোনাট রাও। আর নাক কোকোনাটের মত আকারে বড় না হইলেও আপেলের সাইজ হইতে

ছোট আর হইল না। রাওয়ের সাথে কিছুদিন পূর্ব্বে দেখা হয়; কোকোনাট রাও বলিতে দুইজনেই খুব হাসিয়া লওয়া গেল।

দমদম এখন হারিকেন বিমানের আড্ডার দাঁড়াইল। এশ্লায়ার এয়ার ট্রেনিং স্কীমে শিক্ষিত সকলেরই হারিকেন ফাইটার বিমান উড়াইবার কৌশল জানা ছিল। এখন কতকগুলি হারিকেন বিমান আসিয়া পড়ায়, সেইগুলি দিয়া নবাগত ও পুরাতন বৈমানিকদের শিক্ষা ও অনুশীলন পুরা দমে সুরু হইল।

এদিকে রাণওয়ে লম্বা করিবার কাজও সুরু হইয়া গিয়াছে। ধীরে সুস্থে চলা ওয়াপিটি দুইখানা এখনও প্রত্যহই গঙ্গানদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহানা পর্য্যন্ত টহল দিতে যাইত। হারিকেন বিমান উড়াইবার ও অবতরণ করিবার শিক্ষার কার্য্যে রাণওয়ে এখন সব সময় ব্যবহৃত হইতেছিল। একটি বিমান উড়িয়া যাইতে না যাইতে অন্য আর একটি হয়ত অবতরণ করিবার জন্য আসিয়া গিয়াছে। এইটি অবতরণ করিতে না করিতেই অন্য আর একটি উড়িয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত। হয়ত তিনটি বিমানই একের পর এক কন্ট্রোল টাওয়ারকে রাণওয়ে ব্যবহার করিবার জন্য অনুমতি চাহিয়া অনুরোধ করিতেছে। রাণওয়ে ব্যবহার করিবার অনুমতি সর্ব্বাগ্রে শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয়। সেইজন্য ওয়াপিটিগুলিকে উড়িয়া যাওয়ার ও অবতরণের সময় প্রায়ই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত।

বর্ম্মা অধিকার করার পর জাপানীরা বসিয়া থাকিবে না, ভারত জয় করার অভিপ্রায়ও তাহাদের আছে, একথা সকলেই জানিত। তাহাদের বাধা দিতে হইলে বিমান ও বিমান ঘাঁটির সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া একদিন পাল্টা আক্রমণ করিয়া জাপানীদের বর্ম্মা মালয় ও সিঙ্গাপুর হইতে হটাইয়া দিতে হইবে। এই সব কারণে কলিকাতা ও আশেপাশে বিমান উড়ানোর ও অবতরণের জন্য আট দশটা রাণওয়ে করা হইল। এমনকি গড়ের মাঠে রেড্ রোড্ও ফাইটার বিমানের জন্য রাণওয়েতে পরিণত হইল।

দমদম হইতে প্রায় পনর মাইল উত্তর দিকে দত্তপুকুরে ধানক্ষেত কাটিয়া এক রাণওয়ে বানান হইয়াছিল। এখন হইতে প্রত্যূষে, হারিকেনগুলি উড়িবার জন্য প্রস্তুত হওয়ার পূর্ব্বেই, আমরা ওয়াপিটি দুইখানা দত্তপুকুরে লইয়া যাইতাম, আর সারাদিনের পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে দমদমায় ফিরিয়া আসিতাম। দুইটি আড়াইশত পাউণ্ড বোমা ও মেসিনগানগুলির জন্য যথেষ্ট কার্ত্তুজ সব সময় বিমানে ব্যবহার উপযোগী করিয়া মজুত থাকিত। গোরা বৈমানিকদিগকে লরীতে করিয়া দত্তপুকুরে পাঠান হইত। সেখানে অনেক নারিকেল গাছ ছিল। ডাব নারিকেল যে গোরাদের এত প্রিয় আমাদের জানা ছিল না, কিন্তু দুই একদিনেই জানা গেল। নিকটস্থ গ্রামবাসীরা দুই আনার ডাব বার আনায় গোরাদের নিকট বিক্রয় করিত। আর এক মাসের মধ্যেই দাম এক টাকায় উঠিল, যদিও চারি আনা দিলে তখন কলিকাতাতেও একটা ডাব পাওয়া যাইত।

একদিন প্রত্যূষে ৫॥ নম্বর বিমানে অন্য এক বৈমানিকসহ প্রথম দত্তপুকুরে পৌঁছিয়া অপেক্ষা করিতেছি। দ্বিতীয় বিমান তখনও আসে নাই। দ্বিতীয়টিতে পাঃ অঃ সাহুরে ও পদ্মনাভনের আসার কথা। পদ্মনাভনের কাজ ছিল বেতারযন্ত্র মেরামত করা। কখন কখন উড়িবার সময় বেতার যন্ত্র পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়। সেই কাজের জন্যই পদ্ম-নাভন বিমানে আসিতেছে। ভদ্রলোক খুব ধর্মভীরু, কথাবার্তা জোরে বলিতে পারেন না, সব সময় যেন সন্ত্রস্তভাব। বিমানে কখনও উড়িতে হইবে জানিলে বোধ হয় বিমানবাহিনীতে যোগ দিতেন না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয় বিমান আসিয়া পড়িল। আমি রানওয়ের প্রায় মাঝামাঝি যায়গায় দাঁড়াইয়াছিলাম, যাহাতে বিমান অবতরণের পর কোথায় রাখা হইবে সেই নির্দেশ দিতে সমর্থ হই। বিমান এক চক্কর ঘুরিয়া আসিয়া, অবতরণের জন্য রাণওয়ের লম্বালম্বির পাশের সাথে এক লাইনে আসিয়া ধীরে ধীরে নামিতে লাগিল। আরও কিছু নিকটে আসার পর দেখিলাম বিমান ভাসিয়া যাইতেছে, অবতরণ করার জন্য যতটা নীচু হওয়া প্রয়োজন ততটা নীচু হইতে পারে নাই। বিমানকে আর এক চক্কর ঘুরিয়া আসিতে হইবে মনে করিয়া রাণওয়ের এপাশ হইতে অন্য পাশে যাইব কিনা চিন্তা করিতেছি; তাকাইয়া দেখি বিমান সোজা নামিয়া আসিতেছে। এত শীঘ্র অবতরণ করিতেছিল যে, মনে হইল নিশ্চয় ক্র্যাশ করিবে। কিন্তু করিবার বা বিমানচালককে সাবধান করিবার উপায় তখন আর নাই। সর্বোপরি চিন্তার কারণ হইল পশ্চাতের ককপিটে পদ্মনাভনের অবস্থিতি। ভগবান ভরসা করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। শুধু আমি নয়, দত্ত-পুকুর রাণওয়ের নিকটে যে যেখানে ছিল, সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। দুইটি আড়াইশত মোট পাচশত পাউণ্ডের বোমা বিমানে আছে, একথা কেহই ভুলিয়া যায় নাই। আর সকলেই জানে ক্র্যাশের ধাক্কা বোমা সহ্য করিতে পারে না, সাধারণতঃ ফাটিয়া যায়। দেখিতে দেখিতেই বিমানের এঞ্জিন ও চাকা একই সাথে রাণওয়ের মাটিতে ধপাস করিয়া পড়িল; তাহার পর যাহা ঘটিল তাহা মোটেই ভয়াবহ নয়, শুধু হাস্যকর। সম্মুখের চাকার পা দুইটি একই সাথে গোড়া হইতে ভাঙ্গিয়া গেল। সম্মুখের পা দুইটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় অব্যবহিত পূর্বে বিমানের ডানার নীচে বোমা ঝুলাইবার হুক দুইটি ভাঙ্গিয়া গিয়া বোমা দুইটি মাটিতে পড়িয়া সামনের দিকে ছুটিয়া চলিল। আর চাকাবিহীন অবস্থায় বিমান রাণওয়ের উপর দিয়া বোমা দুইটির পশ্চাদ্ধাবন করিয়া চলিল; যেন পলায়মান বোমা দুইটিকে বিমান ধরিয়া ফেলার চেষ্টা করিতেছে। বোমাদ্বয়ের ও বিমানের গতিবেগ সামান্য ব্যবধানে প্রায় একই সাথে বোধ হইল। তাহার পরই আমরা একশত মিটার দৌড়ের প্রতিযোগিতা দেখিলাম। পাঃ অঃ সাহুরে ও পদ্মনাভন বিমান হইতে বাহির হইয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়াইতেছে। কে জিতিয়াছিল এখন আর মনে নাই। এইটুকু মনে আছে, কেহই সোজা হইয়া দৌড়াইতেছিল না, কারণ দুইজনেই

পিঠের উপর প্যারাস্যুট বহন করিতেছিল। এখন একশত চার নম্বর ভারতীয় স্কোয়াড্রনে বিমানের সংখ্যা দাঁড়াইল একে ও বৈমানিকদের সংখ্যা হইল প্রায় দেড়শত।

এইবার পুনরায় ফ্ল্যা: লে: চৌধুরী ও তাঁহার ছোটনাক ব্লেনহীমের গল্পে ফেরা যাক। কোষ্টাল ডিফেন্স উইংয়ের কমাণ্ডিং অফিসার ছিলেন উইং কমাণ্ডার কার। একশত চার নম্বর স্কোয়াড্রন হওয়ার পূর্বে আমরা ছিলাম কোষ্টাল ডিফেন্স উইংএর তিন নম্বর ফ্লাইট। উইং কমাণ্ডার এইবার বর্ম্মায় গেলেন আমাদের ব্লেনহীম ডিটাচমেন্টের কাজ পর্য্যবেক্ষণের জন্য। তাঁহার বিমানে বৈমানিক দাতে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ আনিল যে কয়েকদিনের মধ্যেই ফ্ল্যা: লে: চৌধুরী উ: ক: কারকে লইয়া ফিরিয়া আসিবেন, ও ফিরিয়া আসার পর ফ্ল্যা: লে: চৌধুরীকে আরও বড় কাজ দেওয়া হইবে বলিয়া এয়ার হেড্ কোয়ার্টার্স সাব্যস্ত করিয়াছে।

একদিন রাত্রে বিমান মেরামতের কাজে ব্যস্ত আছি, হ্যাঙ্গার ও বিমানগুলি উজ্জ্বল আলোয় বেশ দেখাইতেছিল ; ঘুম পাইলে দুগ্ধবিহীন ঠাণ্ডা চা খাইতেছি। রাত প্রায় একটার সময় স্কো: লী: সমল হন্তদন্ত হইয়া উপস্থিত হইলেন। ৫৪ নম্বর ওয়াপিটি উল্টানর সময়ও তাঁহাকে এত বিষাদগ্রস্ত দেখায় নাই। অন্তরালে লইয়া গিয়া আমাকে বলিলেন "আজ বৈকাল হইতে ফ্ল্যা: লে: চৌধুরীকে পাওয়া যাইতেছে না।" তৎক্ষণাৎ বিমান মেরামতের কাজ বন্ধ করিয়া দুইজনেই কন্ট্রোল টাওয়ারে গেলাম। সেখানে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গেল। আজ দ্বিপ্রহরে ফ্ল্যা: লে: চৌধুরী উ: ক: কারকে লইয়া আকিয়াব হইতে দন দন অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্বেই দনদন পৌছানর কথা। দনদনায় এখনও পৌছান নাই, বা অন্য কোন বিমানবন্দরে পৌঁছানর সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আকিয়াব বিমান বন্দরেও খবর লইয়া জানা গেছে সেখানেও ফিরিয়া যান নাই। তাহার মানে বিমান সহিত নিশ্চয় সমুদ্রে পড়িয়াছেন। কোথায় পড়িয়াছেন তাহা জানিবার কোন উপায়ই নাই। কন্ট্রোল টাওয়ারে আর দেরী না করিয়া আমরা দুইজনে ফিরিয়া আসিলাম। কর্ত্তব্য স্থির করিতে সময় লাগিল না। তিনচারখানা বিমান যাহা পাওয়া গেল, তখনই যাহাতে উড়িয়া গিয়া সমুদ্রের উপর খুঁজিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইল। ব্লেনহীমে একখানা ডিঙ্গি ছিল, সেইজন্য আমাদের আশা হইল বিমান ডুবিয়া যাওয়ার পর তাঁহারা ডিঙ্গিতে উঠিয়া অপেক্ষা করিবেন। বেশীক্ষণ হয়ত অপেক্ষা করা সম্ভব হইবে না কারণ ডিঙ্গিটা রবারের প্রস্তুত ও পুরাতন ছিল। ৫৪ নম্বর ওয়াপিটি বিমান প্রত্যুষে উড়িয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হইল। কাহারও মুখে আর কথা নাই। সবাই উদ্বিগ্ন। ফ্ল্যা: লে: চৌধুরীকে ভালবাসিত না এমন কোন ভারতীয় বৈমানিক আমার জানা ছিলনা। মুখে না বলিলেও সবাই মনে মনে প্রার্থনা করিতেছিল ফ্ল্যা: লে: চৌধুরী যেন সুস্থ শরীরেই ফিরিয়া আসেন।

ভোরের দিকে কন্ট্রোল টাওয়ার হইতে ডাক আসিল। সেখানে গিয়া শুনিলাম যে

ফ্ল্যা: লে: চৌধুরী ও ঐ বিমানের অন্য যাত্রীরা কক্সবাজারে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনখানা বিমানে তাঁহাদের কক্সবাজার হইতে লইয়া আসিলে পর সঠিক সংবাদ পাওয়া গেল। আকিয়াব হইতে রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ পরে দক্ষিণ দিকের এঞ্জিন হইতে প্রচুর ধুম বাহির হইতে দেখা যায়। ঐ এঞ্জিন বেশীক্ষণ চালু রাখা সম্ভব হয় নাই। আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়। তখন শুধু বামদিকের এঞ্জিনের শক্তিতে তাঁহারা ধীর গতিতে দমদম অভিমুখে আসিতে থাকেন। আরও অর্দ্ধঘন্টা উড়িবার পর তাঁহারা লক্ষ্য করেন যে বামদিকের এঞ্জিনের তৈলের ট্যাঙ্ক হইতে সব তৈল বাহির হইয়া যাইতেছে। ভাল করিয়া দেখিতে বোঝা গেল আকিয়াব বিমান বন্দরে গোরা বৈমানিকরা এঞ্জিনের ট্যাঙ্কে তৈল দেওয়ার পর ট্যাঙ্কের ঢাকনা বন্ধ করে নাই। তখন আকিয়াব পর্য্যন্ত ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। নিকটে কয়েকটা জেলে নৌকা ছিল। তাহাদের নিকটে গিয়া বিমান সমুদ্রে অবতরণ করান হয় ও জেলে নৌকাগুলিকে সাহায্যের জন্য ডাকা হয়। এদিকে রবারের ডিঙ্গি খোলা যায় না, খুব সম্ভব বহুদিন পরীক্ষা না করার অকেজো হইয়া গিয়াছিল। জেলে নৌকাগুলি নিকটে আসিতে রাজি হয় না কারণ তাহারা ভাবিয়াছিল বৈমানিকরা সব জাপানী। তখন ফ্ল্যা: লে: চৌধুরী প্রায় অর্দ্ধমাইল সন্তরণ করিয়া তাহাদের নিকট গেলে, তাহারা আসিয়া সকলকে নৌকায় তুলিয়া লয় ও কক্সবাজারে পৌঁছায়।

[ক্রমশ:]

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রশ্নোত্তর]

২২ মার্চ, ১৯৫১

প্রশ্ন : আপনি বলেন, "সময় আপেক্ষিক ব্যাপার," তার অর্থ কি ?

উত্তর : সময়ের দীর্ঘতা-বোধ নির্ভর করছে তোমার বর্তমান চেতনার অবস্থার উপর। সাধারণ মানব-চেতনাতে তুমি ভেবে নাও যে কত বছর তুমি বাঁচবে, তারই অনুপাতে সময়ের একটা মাপ ঠিক ক'রে নাও। যদি শোনো কোনো একটা জিনিস সফল হতে পঞ্চাশ বছর লাগবে, তুমি তখন ভাবো, "পঞ্চাশটা বছর !...তখন কোথায় আমি থাকব ?" মুখে না বললেও চেতনাতে এটা আগে। কিন্তু যদি মনশ্চেতনার দ্বারা কোনো কিছুকে দেখ, যেমন বিশেষ কিছু দামী লেখা সম্বন্ধে, সেখানে একশো বা হাজার বছরকেও খুব বেশি মনে হয় না। যদি কেউ বলে, "তোমার এই ভাবধারা ছড়িয়ে পড়তে একশো বছর লাগবে," তাকেও খুব দীর্ঘকাল বলে মনে হয় না। আবার যদি তোমার চেতনা চৈত্যচেতনার সঙ্গে এক হয়ে যায় তখন একটা জীবনকে মনে হবে একটা মুহূর্ত মাত্র, এমন মুহূর্ত আরো কতবার এসে গেছে ; তখন জনসংখ্যার কমবেশিতে তেমন কিছু যায় আসেনা। আর চিরন্তনের চেতনাতে নিলে গেলে তখন সময়ের কোনো দামই থাকেনা।

অতএব এখানে সবই হচ্ছে আপেক্ষিক।

প্রশ্ন : যখন আমি সত্তার বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে সচেতন হই, তখন আমার কোন অংশটি এ সম্বন্ধে সচেতন হয় ?

উত্তর : সব সময় যে কোনো একটা অংশই সচেতন হবে এমন কথা নয়। যদিও চেতন হওয়ার কাজটা স্বভাবত চৈত্যেরই হওয়া উচিত, কিন্তু তা খুব কমই হয়। প্রায় মনেরই কোনো অল্পবিস্তর দীপ্তিপ্রাপ্ত অংশ এটা টের পায়, যে অংশ সকল কিছু হতে তফাতে সরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে পারে। কিন্তু এ তোমরা তো নিজেরাই জানো ; মনের মধ্যে সচেতন হলেই দেখতে পাও যে তার একটা অংশ এক কথা বলছে, অন্য অংশটা তার প্রতিবাদ করছে, দুই অংশে অনবরত তর্কবিতর্ক শুরু করেছে। অনেকের মনের মধ্যে এমন তর্ক-যুদ্ধ নিত্যই চলতে থাকে।

কোন অংশ যে সচেতন হবে সে কথা সাধারণভাবে বলা কঠিন : কিন্তু সাধারণত যে অংশ পর্যবেক্ষণকারী সে হলো তোমার "সাক্ষী" অংশ—সত্তার প্রত্যেক বিভাগেই তার একটি "সাক্ষী" অংশ আছে, যে কেবল দেখছে। এমন কি দেহসত্তাতেও এক "দৈহিক সাক্ষী" রয়েছে, সে-ই অনেক সময় গোলমাল বাধায় ; যেমন, তোমার খেলার সময় যদি সে লক্ষ্য করতে থাকে যে কেমনভাবে তুমি খেলছ, তাহলে তোমার খেলাটি এতে থেমে যেতে পারে। তেমনি প্রাণসত্তাতেও তার "সাক্ষী" আছে, সে কেবল নজর রাখছে যে কখন তোমার মধ্যে কোন কামনা জাগছে, আর কী সব করছে সেদিকে সকৌতুক দৃষ্টি রাখছে এতে দমনের কাজ হয়। আবার তেমনি মনের তরফের "সাক্ষী"ও আছে, যে তোমার ভাবনাগুলির সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করছে, যে বলছে "অমুক মনোভাবটি তমুক মনোভাবের বিরোধী হচ্ছে", এবং সকল বিষয়ে একটা মীমাংসা করছে। এ ছাড়া চৈত্য-সাক্ষী আছে, যে তোমার অন্তরস্থ ভগবান।

এ সব সাক্ষীদের মধ্যে অনেক সময় কোনো সম্পর্ক থাকে না—যদিও থাকা উচিত, কিন্তু কাজে সর্বদাই তা হয় না। তবে যদি সত্তাতে আত্মপরিণতির প্রবল ইচ্ছা লেগে থাকে, তখন শীঘ্র একটা আপস এসে যায় ; প্রতি অংশটি অন্য অংশের সঙ্গে সহযোগিতা করে, তারপর যথেষ্ট একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা থাকলে তখন সবগুলিতে মিলে জড়ো হয় মূল সাক্ষীর কাছে, এবং সেই শেষ সিদ্ধান্ত করে। কিন্তু সাধারণত মনেরই কোনো অংশ অল্পবিস্তর আলোকিত হয়ে আভ্যন্তরীণ সত্তার সংস্পর্শে আসে, এবং সে-ই তখন সেই চেতনার দ্বারা যা-কিছু পর্যবেক্ষণ ও নিরূপণ করে।

প্রশ্ন : চেতনা জিনিসটা কী ?

উত্তর : (কিছুক্ষণ নীরব থেকে) এর অনেক ব্যাখ্যার ভিতর থেকে আমি একটু বাছাই করে দেখছিলাম ; তার মধ্যে একটি হচ্ছে—রহস্যভাবে বলি—চেতনা হলো অচেতনার ঠিক উল্টো জিনিস ; আর একটি ব্যাখ্যা—চেতনা হলো বিশ্বসৃষ্টির সার, চেতনা না থাকলে বিশ্বও নেই ; চেতনা হতেই যত কিছুর বাস্তবীকরণ। আরো বলা যায়, চেতনাই প্রকৃত অস্তি, যা আছে, চেতনা না থাকলে কোনো কিছুই নেই—এটি হলো সব চেয়ে ভালো ব্যাখ্যা —চেতনা নেই তো জীবনও নেই, আলোও নেই, বস্তু নেই, বিশ্ব নেই, সৃষ্টি নেই।

বোধ করি অনভিব্যক্ত পরাৎপরেও রয়েছে চেতনা (এ বিষয়ে কিছু বলতে গেলেই এমনি অসম্ভব কথা বেরিয়ে পড়বে) , কথিত আছে যে পরাৎপর নিজেকে জানতে চাইলেন, (অর্থাৎ ধরে নিতে হয় যে তাহলে আগে তিনি নিজেকে জানতেন না। এমন অবস্থায় তিনি যে "চেতন" ছিলেন তা বলা যায় না)—অতএব তাঁর তখন প্রথম কাজই হলো আপন চেতনাকে আয়ত্তের মধ্যে আনা, তারপর সেই চেতনাকে তিনি বাইরে প্রয়োগ ক'রে যা-কিছু

সৃষ্টি করলেন। অন্ততপক্ষে প্রাচীন প্রবাদে এই কথাই বলে। যদি বলো যে আরম্ভ বলতে কোনো কিছুই কখনো ছিল না, এটা কেবল মানবীয় ভাষাতেই বলা হয়, "আরম্ভ" বলতে পারো সেই অবস্থাকে যখন পরাৎপর অনভিব্যক্তি থেকে নিজের চেতনাকে অভিব্যক্তিতে বিকাশ করলেন। হয়তো তিনি দেখলেন যে অমন অনভিব্যক্ত চেতনা তাঁর মনঃপুত হচ্ছেনা (!) তাই তিনি তাকে বাইরে প্রক্ষেপ করলেন, অবশ্য নিজের থেকে বাইরে নয়, কারণ কোনো কিছুই তাঁর বাইরে নেই, কিন্তু সেই চেতনাকে তিনি বাইরে সক্রিয় করলেন যাতে নিজেকে তিনি বাস্তবীকৃত করতে পারেন। সুতরাং এটা সাব্যস্ত হচ্ছে যে চেতনাই সকল সৃষ্টির মূল, ভাষাতে যতটা ঠিকমতো ব্যক্ত করা যায় তা এই পর্যন্ত। চেতনা হতেই সৃষ্টি, চেতনা ছাড়া সৃষ্টি হয়না...আর আমরা যাকে "চেতনা" বলি সে হলো সেই পরম চেতনার একটা সুদূর স্পর্শ মাত্র, যার কোনো নির্দিষ্টতা নেই। কিংবা বলতে পারো ঈষদচ্ছ আয়নাতে একটা তার যাবছা প্রতিবিম্ব মাত্র। সে আয়না স্বচ্ছ নয় (কখনো ঝাপসা কখনো বিকৃত), সেই ব্যক্তিগত অস্পষ্ট আয়নাতে মূল চেতনার অস্পষ্ট ক্ষীণ প্রতিবিম্ব আমাদের এই চেতনা। এই প্রতিবিম্ব ধরেই যদি অল্পে অল্পে আমরা মূলের দিকে চলে যেতে পারি, তাহলে তার সংস্পর্শ পেতে পারি। আর সে সংস্পর্শ একবার পেলে তখন দেখতে পাবো যে সেই এক চেতনাই সর্বত্র বিরাজিত। বিকৃত হয়েছে বলেই তার এখন আলাদা আলাদা ভাগ হয়ে গেছে ; বিকৃত না হলে দেখা যেতো যে সেই একই চেতনাতে সব কিছু বিধৃত। বিকৃত আয়নাতে প্রতিবিম্বের বিকৃতি হয়ে চেতনার এত প্রভেদ ঘটেছে, নতুবা আসলে চেতনা হলো এক ও অনন্য। তবে এ সব কথা অনুভূতির দ্বারাই বোঝা যায়।

প্রশ্ন : আপনি বলেছিলেন বারো রকম ইন্দ্রিয়র কথা, সেগুলি কি কি?

উত্তর : পাঁচ রকম স্থূল ইন্দ্রিয় আমাদের দেওয়াই আছে, তাই না? সে ছাড়াও একটা অন্তত আছে যা চেতনার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এ-কথা শুনেছ কিনা জানিনা, কিন্তু যে অন্ধ সে কিছু চোখে না দেখেও অদূরে কি রয়েছে তা টের পায়, একরকম বোধের দ্বারা, যা স্পর্শ নয় কারণ সে কোনো কিছুর স্পর্শই পায়নি। যা দৃষ্টি নয় কারণ সে তো দেখতেই পায়না, তবুও সেটা একরকম দূর থেকেই সংস্পর্শবোধ, যাতে সে না দেখে না ছুঁয়ে না শুনেও জানতে পারে। আমরা যে ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করি তা ছাড়াও এ একটা আলাদা রকমের অধিত ইন্দ্রিয়বোধ।

আর একরকম ইন্দ্রিয়বোধ আছে যার দ্বারা নৈকট্য অনুভব হয়, মনে হয় যেন তুমি তার খুবই কাছে রয়েছ। অপর একটি আছে তাও দেহগত, যার দ্বারা তুমি অনেক দূরের ঘটনার সংস্পর্শ পেতে পারো। এ বোধ মনের নয়, দেহের, কারণ তা স্থূল জগতের অন্তর্গত জিনিস,

যা তোমার অনুভবে আসে। কোনো কোনো লোকের এ বিশেষ বোধটি আছে যার দ্বারা সে জানতে পারে যে অনেক দূরে কি হচ্ছে। স্মরণ রেখো যে দৈহিক চেতনারও অনেক স্তর আছে; তার মধ্যে রয়েছে প্রাণের দৈহিক বোধ, মনের দৈহিক বোধ,—যা পুরোপুরিই দেহেরই জিনিস নয়। বাস্তবেতে যাকে বলে দূরদৃষ্টি, তাও একটা দৈহিক ইন্দ্রিয়বোধ।... এমন কিছু ক্ষমতা মানুষের আছে যা খানিকটা দূরে দেখতে পায়, এমন কিছু আছে যা অনেকটাই দূরে দেখতে পায়, আবার এমন কিছু ক্ষমতা আছে যা বিশেষ কিছু হবার আগেই টের পায়; এতেই তিনরকম হয়ে গেল। এগুলিকে সাধারণ ইন্দ্রিয়ের উপরকার অতীন্দ্রিয় বলা চলে। যেমন কানে শুনতে পাচ্ছি অনেক দূরের শব্দ। কেউ কেউ দূরের শব্দ পায়, আবার কেউ কেউ দূরের গন্ধও পায়। এগুলি যেন আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয়াদির রাজ্যেরই অতীন্দ্রিয়তার পূর্ণতাপ্রাপ্তি

প্রশ্ন: কেউ কেউ যে জানতে পারে মাটির নীচে কোথায় জল আছে, তা কোন ইন্দ্রিয়বোধ দিয়ে?

উত্তর: বিভিন্ন ব্যক্তি জানে বিভিন্ন প্রকারে। কেউবা হয়তো যেন দেখতেই পায়; কেউবা কোনো স্থানে মাটির নীচে জলের গন্ধ পায়; কেউ বা জানে মানসবোধির দ্বারা, সেটা তখন দৈহিক জানা নয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এখানে একটি লোক ছিল যে জলের গন্ধ পেতো; তার যন্ত্রস্বরূপ একটা লাঠি ছিল, কিন্তু সে একটা অছিলা মাত্র, যেন জলের আয়গাতে ঠেকলেই সেটা বেঁকে যাচ্ছে। তুমি যতই কেন নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকতে চেষ্টা করো, তোমার মনে যখন হবে যে এখানে কিছু আছে, তখন তুমি কিছু নড়ে উঠবেই। এ আমি অনেক সময় পরীক্ষা করে দেখেছি; লাঠিটা হাতে দিয়ে কাউকে নীরবে চলে যেতে বলো, তুমিও তার সঙ্গে নীরব হয়ে চলো একাগ্র হয়ে। হঠাৎ একসময় তুমি তীব্ররূপে চিন্তা করতে শুরু করো— "এখানে, এখানে নিশ্চয়ই জল আছে", অমনি দেখবে যে তার হাতের লাঠিটা একটু নড়ে যাবে। তোমার চিন্তার অভিভাব থেকেই তা ঘটেছে। পরীক্ষার জন্য আমি কোথায় জল আছে না জেনেই ঐ ভাবেই চিন্তাসঞ্চার করে দেখেছি, সেই ব্যক্তির হাতের লাঠিটা তাতে নুয়ে গেছে। তার অবচেতন সেই অভিভাবটি গ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন: আপনি যদি সম্পূর্ণ নীরব থাকতেন, তাতেও কি স্নায়ুগুলি জলের স্পন্দন পেতো?

উত্তর: কিন্তু সেখানে তো জল ছিলই না। কেবল আমি চিন্তাই প্রেরণ করেছিলাম যে এখানে জল আছে (অবশ্য জল সেখানে থাকতেও পারত, কিন্তু তা খুঁড়ে দেখা হয়নি)।

কিন্তু এই পরীক্ষার প্রমাণ হলো যে আমার চিন্তা কাজ করেছে তার হাতের আঙুলগুলির উপর, তাতেই লাঠিটা ঐভাবে নুয়ে গেল।...এমনও হতে পারে যে সেখানে জল ছিল বলেই আমিও ঐরকম চিন্তা করেছিলাম।

প্রশ্ন : নিম্নপ্রাণীদের মধ্যে অনেকজাতি আছে যাদের ইন্দ্রিয়চেতনা খুব জোরালো।

উত্তর : নিশ্চয়, এ বিষয়ে অনেক প্রাণীই আমাদের চেয়ে যথেষ্ট উন্নত।

প্রশ্ন : আমি একটি হাতির কথা জানি যে বাঘ শিকার করতে যাওয়া হলে সোজা জলের কাছে গিয়ে হাজির হতো।

উত্তর : পশুদের ইন্দ্রিয়বোধ মানুষের চেয়ে অনেক নিখুঁত। কুকুর যেমন সহজে কোনো মানুষের সন্ধান নিখুঁতভাবে টের পায়, তুমি তা কখনই পারবেনা। তার মানে এই সব পশুদের বিবর্তনচক্র (বিশেষ যাদের আমরা "উচ্চস্তরের" পশু বলি মানুষের অনেকটা কাছা-কাছি বলে) তাদের জাতি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হতে হতে ঐ সব ইন্দ্রিয়বোধকে অতিমাত্রায় সচেতন করে তোলে। মৌমাছি, পিঁপড়ে, এদের জাতিগত আচরণরীতি খুব উঁচুদরের। আমরা যাকে "সহজাত প্রবৃত্তি" বলি তার দ্বারা তারা জাতিগত প্রেরণাতেই জানে যে কোনটা করতে হবে আর কোনটা করতে হবেনা। এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। একটা গরুকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে দেখ ; সে চারিদিকে শুঁকে বেড়াবে, তারপর এক জায়গায় হঠাৎ জিভ বাড়িয়ে এক গুচ্ছ ঘাস টেনে নেবে। আবার ঘুরে বেড়িয়ে শুঁকতে শুঁকতে আরো কোথাও একগুচ্ছ ঘাস টেনে নেবে, এই ভাবে সে চরে বেড়াবে। এর মধ্যে কখনো কি দেখেছ যে কোনো গরু কোনো অনিষ্টকারী বিষাক্ত ঘাস টেনে নিয়ে খাচ্ছে? তা কখনো সে খাবেনা। কিন্তু গোহালের মধ্যে আবদ্ধ রেখে কতকটা ঘাস কেটে এনে দাও যার মধ্য ভালো ঘাস ও বিষাক্ত ঘাস একত্রে মিশে আছে, তখন সে মানুষকে বিশ্বাস ক'রে (কিছু মনে কোরোনা) বাছাবাছি না করেই সবটাই সে খেয়ে নেবে। এই ভাবে আমাদের তিনটি গরু বিষাক্ত ঘাস খেয়ে মারা গেল। এই সব গৃহপালিত পশুরা মানুষকে বড়ো বলে জেনে তাদের হুকুমমত চলে (যদিও সেটাকে অন্যায্য বলব), তাই বিষাক্ত ঘাস দিলেও এরা তাই-ই খেয়ে ফেলে। কিন্তু যদি এদের বেঁধে না রেখে ছেড়ে দিয়ে দেখ, এদের জাতিগত প্রবৃত্তি অনুসারে কখনই তেমন বিষাক্ত ঘাস এরা খাবেনা। গৃহপালিত সকল পশুই মানুষের কাছে কাছে থেকে তাদের প্রবৃত্তি হারিয়ে ফেলে, কারণ মানুষের কাছে বিনা চেষ্টাতে খাদ্য ও আশ্রয় পেয়ে মানুষকে তারা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করে—এবং কিছু ভয়ও করে, কারণ জানে যে মানুষের অবাধ্য হলেই তারা প্রহার খাবে।

এটা এক অদ্ভুত ব্যাপার যে এরা এদের স্বাভাবিক গুণ হারিয়ে ফেলে মানুষের কাছে থাকলে। যেমন, মেষপালক কুকুর মেষপালের সঙ্গে ঘুরে অনেকটা স্বাধীন থাকে(যদিও সময়মত ঘরে ফিরেও প্রভুকে চেনে কিন্তু সর্বদা থাকেনা) তাই এদের যদি কখনো সাপে কামড়ায়, এরা তখন এক কোনে গিয়ে অনবরত সেখানে চাটতে থাকে এবং নানারকম ভাবে নিজেকে সারিয়ে ফেলে ; কিন্তু সেই কুকুরকেই যদি ঘরে রাখো, তাকে তখন সাপে কামড়ালে সে মানুষদেরই মতো মরে যাবে।

আমার এক শান্তপ্রকৃতির বেড়াল ছিল, সে আশ্চর্য রকমের সভ্য ছিল। তার এক অভ্যাস ছিল, যা সকল বেড়ালেরই থাকে, কিছু একটাকে নড়তে দেখলেই তাকে নিয়ে খেলা করত। বাড়িতে একটা মস্ত বিছা এসেছে দেখে সে অভ্যাসবত তাকে নিয়েও খেলতে গেল, অমনি বিছাটা তার থাবাতে দংশন ক'রে দিলে। কিন্তু বেড়ালটা ছিল নিরীহ জাতের, সে প্রায় মরো মরো অবস্থাতে আমার কাছে এসে থাবাটি তুলে দেখালে। দেখলাম জায়গাটা খুব ফুলেছে, অবস্থা খুব খারাপ। আমি তাকে টেবিলের উপর শুইয়ে শ্রীঅরবিন্দকে ডেকে এনে বললাম "কিকিকে বিছায় কামড়েছে, একে সারিয়ে তুলতে হবে।" বেড়ালটা গলা বাড়িয়ে প্রায় নিষ্প্রভ চোখে শ্রীঅরবিন্দের দিকে চেয়ে রইল। শ্রীঅরবিন্দ তার সামনে বসে স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে চাইলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখি বেড়ালটা যেন অল্পে অল্পে সুস্থ হয়ে উঠছে, ক্রমশ এক ঘন্টা পরে সে উঠে দাঁড়াল, সেরে গিয়ে বেশ চলাফেরা করতে লাগল। ঐ সময়ে আমি শ্রীঅরবিন্দের শোবার ঘরেই ধ্যানে বসতাম (যে ঘরে এখন অ থাকে), সে ঘরে নির্দিষ্ট কয়েকজন মাত্রই আসত, আর সব কিছু জিনিষ ঠিকভাবে সাজানো থাকত। একটা চেয়ার ছিল সেখানে, যাতে ঐ বেড়ালটি উঠে বসত, অন্য কেউ তাতে বসতে পেতোনা। তারও নিয়মিতভাবে ধ্যানের সমাধি হতো—তা ঘুম নয়, কারণ বেড়াল কখনো অমনভাবে ঘুমোয় না, সমাধির অবস্থায় সে মাঝে মাঝে চমকে উঠত, হয়তো কিছু অন্তর্দৃষ্টি পেতো, মুখে একরকম আওয়াজ করত। এই সমাধির অবস্থাতে সে ঘন্টার পর ঘন্টা এক ভাবে থেকে যেতো। ওর থেকে জেগে উঠে সে আর কিছু খেতে চাইত না। খাবারের কাছে তাকে তুলে নিয়ে গেলে সে মুখ ফিরিয়ে আবার সেই চেয়ারে গিয়ে সমাধিস্থ হতো। ছোটো একটি বেড়ালের পক্ষে সেটা নিরাপদ নয়—কিন্তু সে সাধারণ বেড়াল ছিল না।

এ গল্পের পরে সেই কথাই বলতে চাই যে কোনো পশুকে যদি মানুষের কাছে না রেখে তার স্বাভাবিক অবস্থাতে রাখো, তাহলে সে তার জাতের প্রকৃতি অনুসারে চলবে, তার সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই সে কোনো ভুল কাজ করবে না। কিন্তু যদি তুমি তাকে নিজের কাছে রাখো তাহলে তার স্বাভাবিক প্রকৃতি সে হারিয়ে ফেলবে, তখন তোমাকেই তাকে সামলাতে হবে, কারণ উচিত অনুচিতের জ্ঞান তার আর থাকবে না। আমি বেড়ালদের নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি যে তাদের বিবর্তনধারা বদলানো যায় কিনা, অর্থাৎ পরবর্তী জীবনে যাতে তারা

পশুর বদলে মানুষ হয়ে জন্মাতে পারে এমন কিছু করা যায় কিনা। এ পরীক্ষা আমার সম্পূর্ণই সফল হয়েছিল। তিনটির বেলাতেই দেখলাম—তাদের চৈত্যসত্তা যথেষ্ট চেতনাযুক্ত হয়ে মানুষের মতো হবার উপযোগী হয়েছে। কিন্তু সাধারণত কেউ এমন করে না; বরং ওদের স্বাভাবিক জিনিসকে নষ্ট করে দেয়।

২৪ মার্চ, ১৯৫১

প্রশ্ন: আপনি বলেছেন (মায়ের কথাবার্তা হতে), "প্রেম আছে সর্বত্র। তার ক্রিয়া গাছপালাতেও আছে, এমন কি হয়তো পাথরের মধ্যেও আছে।" পাথরের আছে কিনা তা কেমন করে জানা যাবে?

উত্তর: যে সব উপাদান একজোট হয়ে পাথর তৈরি, হয়তো প্রেমের স্ফুলিঙ্গের স্পর্শেই সেগুলি ঐভাবে একজোট হতে পেরেছে। এটা নিশ্চয় কথা যে দিব্যপ্রেম যখন জড়ের মধ্যে নামে তখন জড় ছিল সম্পূর্ণ চেতনাশূন্য ও আকারশূন্য, প্রেমের চেতনাস্পর্শের ফলেই জড় কিছু গঠন পেলে। যদি তোমরা কেউ নির্ভেজাল নিশ্চেতনের মধ্যে নেমে যেতে পারো (যদিও তা সম্ভব নয়), তাহলে বুঝবে যে সেটা কেমনতরো ব্যাপার, তার তুলনায় পাথরকেও মনে হবে আশ্চর্য চেতন পদার্থ। তোমরা তাচ্ছিল্য ক'রে বলো ওটা একদম পাথর, যেহেতু তোমাদের নিজের মধ্যে চেতনা আছে তার চেয়ে কিছু বেশি, কিন্তু পাথরেতে ও তোমাতে যতটা তফাৎ, তোমাতে ও পূর্ণচেতনাতে তার চেয়েও অনেক বেশি তফাৎ। বস্তুত সেই নিশ্চেতন রাজ্য হতে পাথরের মুক্তি ঘটেছে কেবল ভগবৎ-কৃপায় তার মধ্যে প্রেমের অবতরণ হওয়াতে। সুতরাং প্রথমে যে আমি বলেছিলাম "হয়তো", সে কথাটা বাদ দিয়ে জোর করেই বলব যে পাথরের মধ্যেও প্রেমের অস্তিত্ব আছে। প্রেম ছাড়া কিছুই হয়না, পাথরও না, ধাতুওনা, অ্যাটমের গুচ্ছবাঁধাও না।

লোকে বলে যখন তুমি কিছু ভাবছ সেটাই "চেতনার" লক্ষণ—আর যখন তুমি কিছু ভাবছনা তখন চেতনা নেই। কিন্তু উদ্ভিদেরা তো সম্পূর্ণই চেতন, যদিও তারা কিছুমাত্র ভাবেনা। তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট সংবেদনের দ্বারা তাদের চেতনার বিকাশ হয়, যদিও ভাবনা বলে কোনো জিনিসই তাদের মধ্যে নেই। পশুরা একটু আধটু ভাবতে শুরু করে, তাই তার প্রতিক্রিয়া হয় জটিল। কিছুমাত্র চিন্তা না করেও সংবেদনচেতনা তোমার মধ্যে থাকতে পারে।

প্রশ্ন দিব্যপ্রেম অবতরণের আগে বস্তু বলে কিছু ছিল কি?

উত্তর বস্তু ছিল এমন কথা বলা যায়না, ছিল কেবল নিশ্চেতনা। এটা কেমন ক'রে বোঝাবো তা জানিনা। যেখানে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই তাই হলো নিশ্চেতনা, সমস্তই শুধু নেতি নেতি। এমন কি শূন্যতার যে গুণ থাকে তাও নেই। তার মধ্যে নেমে গেলে তবেই তাকে বুঝতে ও বোঝাতে পারো। তা হলো নিছক অনস্তিত্ব, কারণ অস্তিত্ব মাত্রেরই আরম্ভ চেতনা হতে। চেতনা ব্যতীত কোনো কিছুই অস্তি হবার নয়।

প্রশ্ন এই প্রেম অবতরণের আগে কি কোথাও কোনো সত্তা ছিল? সেই সব সত্তাতে কি কোনো চেতনা ছিল?

উত্তর: পার্থিব কোনো সত্তাই ছিল না। এই পৃথিবী, এই পার্থিব জগতের অস্তিত্ব সমস্তই ঘটেছে নিশ্চেতনার মধ্যে প্রেম অবতরণের পরে, তার আগে নয়।

ক্রমশ যত বিভিন্ন প্রকার সত্তার সৃষ্টি, সর্বোচ্চ চেতনরাজ্য থেকে সম্পূর্ণ জড়রাজ্য পর্যন্ত, সমস্তই গড়ে উঠেছে নিশ্চেতনের পরে। চেতনা যখন প্রথম সৃষ্টির সূত্রপাত করলে (একে যেন ভেবে নিওনা কোনো দেশ গড়ে ওঠার মতো ঐতিহাসিক ব্যাপার, আদৌ তা নয়, তোমাদের বোঝাবার জন্যই এই ভাবে কথাটা বলছি), তখন তার প্রথম অভিব্যক্তি হলো চেতনারই কিছু অংশসম্ভূতি—কিছু চেতন আলোর বিকাশ—আর এই অংশসম্ভূতি যখন তার মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হলো, তখন তারই বিপরীতক্রিয়া রূপে সৃষ্টি হলো নিশ্চেতনের—এ ছাড়া কেমন ভাবে সেটা বলা যায়?...হাঁ, বৈপরীত্যের কারণেই। সুতরাং এই নিশ্চেতনের সৃষ্টি হওয়া জগৎ-সৃষ্টির আগেকার কথা, তারপর যখন জানা গেল যে সমগ্র বিশ্বই অবধা সৃষ্ট হতে চলেছে, তখন ভগবানের দিব্যপ্রেম নেমে এলো সেই নিশ্চেতনার মধ্যে, তাকে চেতনাতে ফিরিয়ে আনতে। অতএব বলা যায় যে এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি হয়েছে নিশ্চেতনার মধ্যে পরম চেতনার অবতরণের ফলে। সুতরাং বলতে পারো না যে এই বাস্তবের রাজ্যে আগের থেকে কিছু ছিল (আমার কথাগুলি জটিল শোনাচ্ছে, কিন্তু সাধারণ ভাষাতে এ জিনিস ঠিক ব্যক্ত করা যায় না)।

আর আমাদের পরিচিত এই পৃথিবী, বিরাট বিশ্বজগতের মধ্যে এই সামান্য অণুরেণু-বৎ জিনিসটুকুর বিশেষ সৃষ্টি হয়েছে চেতনাতে রূপান্তর প্রয়াসকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করতে; বিরাট বিশ্বের মাঝে এ যেন একটি বিশেষ প্রতীকবিন্দু, অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র বিন্দুটির মধ্যে আগে রূপান্তরের কাজটি সফল করে নিয়ে পরে সারা বিশ্বেই তা ব্যাপ্ত করা হবে।

এ সমস্যা আরো ভালো করে বুঝতে চাইলে প্রথমে আমাদের এই পৃথিবীর ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ হতে হবে, কারণ এর ইতিহাস সমগ্র বিশ্বের প্রতীকস্বরূপ।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের দিক থেকে পৃথিবী একটা দৈব সংঘটন ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু অধ্যাত্ম জ্ঞানের দিক থেকে এটি এক ইচ্ছাকৃত প্রতীকের সৃষ্টি। আগেই বলেছি যে কেবল এখানেই নিয়মে ভগবৎ-উপস্থিতি, আদি মূল চেতনার সঙ্গে এখানেই প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ রয়েছে, দিব্যচেতনা এখানেই লুকিয়ে আছে সর্বত্র। অন্যান্য জগতের সৃষ্টি হয়েছে যথারীতি ক্রমিক পর্যায়ে, কিন্তু এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে সরাসরি ভাবে পরম চেতনার নিশ্চেতনের মধ্যে প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার জন্য, যার কোনো মাধ্যম থাকবে না।

প্রশ্ন : সূর্যের মধ্যে যে সব অণু-পরমাণু আছে তা কি এই পৃথিবীরই অনুরূপ?

উত্তর : আমি তোমাদের বিশেষ করেই বললাম যে পৃথিবীর বিচ্ছুরণ হওয়া মানে একটি প্রতীকবিন্দুর সৃষ্টি হওয়া, ওর মধ্যে যা কিছু ঘটবে তা সবগুলি বিশ্বে প্রযুক্ত হবে; এই কথাটি ভুলে গিয়ে যেন সেই মামুলী কথা বলতে শুরু করোনা যে পৃথিবী হঠাৎ সূর্য থেকে বিক্ষিপ্ত তারই একটা অংশ, কিংবা কোনো এক নীহারিকা ছড়িয়ে পড়ে তার থেকে সূর্য ও তার উপগ্রহগুলি জন্মেছিল ইত্যাদি।

প্রশ্ন : কিন্তু এটা তো ঠিক কথা যে সূর্যের উপাদান ও পৃথিবীর উপাদানে কোনো প্রভেদ নেই? সূর্য ও সৌরমণ্ডলের অন্যান্য জগৎ কি পৃথিবীর সঙ্গে একত্রেই ঘটেছিল?

উত্তর হয়তো তাই হয়ে থাকবে, পরম চেতনা যখন বিশেষভাবে এই পৃথিবীর উপর কেন্দ্রীভূত হয়, তখন তারই সঙ্গে এগুলিরও সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন : অন্যান্য জগতের এবং অন্যান্য গ্রহের সত্তাদের মধ্যে কি চৈত্যবস্তু আছে?

উত্তর : না, ওটি সম্পূর্ণভাবে কেবল পৃথিবীরই বিশেষত্ব। তবে এখানকার চৈত্য সত্তারা ইচ্ছা করলে অন্যান্য জগতেও প্রবেশ করতে পারে। সুতরাং তুমি অন্য কোনো গ্রহে গিয়ে পড়লে সেখানে যে আদৌ কোনো চৈত্যসত্তার সাক্ষাৎ পাবেনা এমন কথা বলা যায়না। সেটা কিছু অসম্ভব নয়, কারণ পৃথিবীর চৈত্যসত্তারা মুক্তগতি, তারা কোনো কারণে এখানে ওখানে চলে যেতে পারে। পৃথিবীর সকল দেশেরই প্রাচীন জ্ঞানে বলা হয়েছে যে চৈত্যের সৃষ্টি পৃথিবীর জন্য, আর এখানেই চৈত্যের যা-কিছু উন্নতি ঘটছে। কিন্তু এখানে চৈত্য পরিণত হয়ে উঠলে তবেই তারা মুক্ত, তাদের তখন স্বাধীন গতিবিধি, বিশ্বের মাঝে যে কোনো স্থানে তারা চলে যেতে পারে; আর এখানেই চৈত্যকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে বলে তাদের সৃষ্টি থেকে ক্রমবিকাশ হওয়া পার্থিব জীবনেরই অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ভগবৎ-প্রেম আর ভগবৎ-কৃপা কি একই জিনিস ?

উত্তর মূলতঃ সবই তো এক জিনিস। সবই সেই চেতনার লীলা, তবে কৃপা ছাড়া প্রেম আর প্রেম ছাড়া কৃপাও হতে পারে। কিন্তু মানব-চেতনার পক্ষে কৃপার বিকাশ মাত্রই দিব্যপ্রেমের বিকাশ, যদিও তা মানব-চেতনাকে ছাড়িয়ে যায়।

প্রশ্ন : ভগবৎ-প্রেমকে কেমন করে বুঝতে পারি ও কিরূপে তার উপযুক্ত যন্ত্র হতে পারি ?

উত্তর : প্রথমত কোনো জিনিসকে জানতে হলে তার জন্য তেমনভাবে ইচ্ছা করা চাই। কিন্তু "ইচ্ছা করা" মানে এই নয় যে হঠাৎ একদিন আমি ইচ্ছা করলাম মনে করে বললাম, "আচ্ছা, এই আমি ইচ্ছা করছি, "আর দুদিন পরেই সে কথা ভুলে গেলাম। তা নয়, এই ইচ্ছা মানে নিত্যকার এক সনির্বন্ধ একাগ্র আস্পৃহা, চেতনা সর্বক্ষণ তাতেই একান্ত-ভাবে নিযুক্ত হয়ে থাকবে। এই হলো প্রথম ধাপ। তার পরে আরো অনেক কিছু করবার আছে—মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ, নিরবচ্ছিন্ন বিশ্লেষণ, কোন কাজটি বিশুদ্ধ হবে ও কোনটি তা নয় এই নিয়ে সূক্ষ্ম বিচারণা। তোমার যদি কল্পনাশক্তি থাকে তাহলে ভেবে দেখতে পারো যে তোমার কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিল হচ্ছে কিনা।

অনেকে ভাবে যে একদিন সকালে উঠে যদি ঝোঁকের মাথায় বলি, "আহা, দিব্যপ্রেম লাভ করতে আমার বড়ই ইচ্ছা হচ্ছে, তাহলে জগতে আমি তাকে কতই না সুন্দরভাবে অভি-ব্যক্ত করতে পারব,"—জানিনা কারো মনে এই ধরনের ইচ্ছা কত লক্ষ বার জেগে উঠেছে, কতবার সে ভেবেছে যে দিব্যপ্রেমের শক্তি পেলে জগতে আমি অনেক বড়ো বড়ো কর্ম সাধন করতে পারি, আর কতবার সে বলেছে, "আচ্ছা, চেষ্টা করে তো দেখা যাক দিব্যপ্রেমের জন্য, দেখি তার কি ফল দাঁড়ায়!" কিন্তু এহলো সব চেয়ে খারাপ পথ ধরা, কারণ জিনিসটির স্পর্শমাত্র পাবার সম্ভাবনার আগের থেকেই তুমি তার আসবার রাস্তা বন্ধ করে দিলে। তোমাকে অগ্রসর হতে হবে বিশুদ্ধ আস্পৃহা ও সমর্পণের ভাবটি গ্রহণ ক'রে, যা আনতে পারা খুব কঠিন কাজ। নিজেকে সেই আস্পৃহার জন্য প্রস্তুত ক'রে আনতে আগে তাই নিয়েই যথেষ্ট খাটতে হয়। যদি আন্তরিকভাবে নিজের মধ্যে সোজাসুজি চেয়ে দেখ তো দেখবে যে প্রেমের কথা ভাবতে গেলেই আপন অন্তরের মধ্যে ছোটোখাটো তুফান ওঠা শুরু হয়ে যায়। তোমার মধ্যে যেটি আস্পৃহা করতে যাবে সে চাইবে কতকগুলি প্রাণস্পন্দনের সাড়া। যোগের পথে অনেকটা অগ্রসর হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তোমার প্রেমের ধারণায় ভিতর থেকে প্রাণের তরফের কামনা ও স্পন্দনগুলিকে পৃথক করে নিতে পারা অসম্ভব। অনেক ব্যক্তির সম্বন্ধে আমার

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এ কথা বলছি। তুমি এখন যেমন আছ এই অবস্থাতেই যদি দিব্যপ্রেমের সংস্পর্শ আসে তো দেখবে তা বন্ধকের মতো, এতখানি সে তফাৎ আর এতখানি তার উচ্চতা যে তুমি নিশ্বাস নিতেই পারবে না ; যেন কোন পাহাড়ের চূড়াতে উঠে তুমি ঠাণ্ডায় জমে গেছ, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, স্বাভাবিক বলে মোটেই বোধ করবে না। দিব্য-প্রেম যদি চৈত্য বা প্রাণের স্পন্দন দিয়ে আড়াল করা না থাকে তাহলে মানুষের পক্ষে তাকে অনুভব করাই কঠিন হয়। কৃপার সম্বন্ধে একটা ধারণা অবশ্য তুমি করতে পারো, যে তা অনেক দূরের ও অনেক উপরের ও অনেক পবিত্র, আর এমনই নির্ব্যক্তিক যে...হাঁ, কৃপা সম্বন্ধে এমনি কিছু ধারণা তোমার হতে পারে, কিন্তু প্রেম সম্বন্ধে ধারণা করা খুব কঠিন।

প্রশ্ন : কিন্তু তবে এ কথা কি বলা চলে যে চৈত্যের স্পন্দন দিব্যপ্রেমেরই স্পন্দন ?

উত্তর : তোমরা প্রত্যেকেই আপন চৈত্যের সম্পর্কে আসতে পারো, তা খুব অনধি-গম্য নয়। ভগবৎ-শক্তির সান্নিধ্য পাবার জন্যই তোমাদের চৈত্যসত্তাটি দেওয়া হয়েছে। আর তার সংস্পর্শ পেলে তখন জানতে পারবে যে দিব্যপ্রেম কেমন হতে পারে। কিন্তু এমনটি একদিন সকালে উঠে বললে, "হাঁ, আমি দিব্যপ্রেমেরই সংস্পর্শ চাই," ওতে কিছু হবে না। নিত্যকার প্রয়াস, সুগভীর একাগ্রতা, সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি, এর দ্বারা তুমি চৈত্যের সংস্পর্শে আসতে সক্ষম হবে, কেবল চাই বললেই কোনো কাজ হবে না, এমন অবস্থাতে আসা চাই যখন সব কিছুতেই মনে হতে থাকবে যে দিব্যপ্রেম ছাড়া কোনো কিছু নয়। তাও একটা চাকনি দেওয়া মাত্র, যদিও সূক্ষ্ম চাকনি।

প্রশ্ন : তাহলে চৈত্যের সন্ধানকে বাদ দিয়ে দিব্যপ্রেমের সন্ধান চলেনা ?

উত্তর : না, আগে চৈত্যকে জানো, তখন বুঝবে দিব্যপ্রেম কি...
দিব্যপ্রেমের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসতে চেষ্টা কোরো না, কারণ সেও হবে প্রাণের কামনারই তাগিদ। তুমি নিজে তা না জানলেও সেও প্রাণের কামনা ছাড়া কিছু নয়। আগে চৈত্যের সংস্পর্শ পেতে চেষ্টা করো, চৈত্যচেতনা পেলে তখন তুমি মুক্ত হবে, তখন স্বভাবত এবং সহজেই জানবে যে দিব্য প্রেম কি জিনিস।

প্রশ্ন : আমরা যে পৃথিবীতে এই চৈত্য নিয়ে জন্মেছি এবং তা আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার প্রতীক হিসাবে, তাতেই কি প্রমাণ হয়না যে আমাদের প্রত্যেকের কিছু গুরু দায়িত্ব রয়েছে ?

উত্তর : নিশ্চয়। দায়িত্ব খুবই রয়েছে ; একটা বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই তোমরা এখানে জন্মেছ। অবশ্য তোমাদের চৈত্য কিছু পরিণতি পেয়েছে বলেই তাই, নতুবা বলতে হতো এ দায়িত্ব গোটা পৃথিবীর। যে যত চেতন ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হবে তার দায়িত্ব তত বেশি বলে মনে হবে। তাই হয়ে দাঁড়ায় একটা কোনো মুহূর্তে ; তুমি হঠাৎ

ভাবতে শুরু করো যে বিনা উদ্দেশ্যে অনর্থক এখানে তুমি আসোনি। তুমি জানতে পারো যে একটা কিছু কাজের জন্যই এসেছ, যা নেহাৎ অহংসম্পর্কিত নয়। এই হলো যোগের পথে আসার যুক্তিযুক্ত কারণ, তুমি হঠাৎ বোধ করো, "এখানে যখন রয়েছি তখন নিশ্চয় আমার একটা কিছু করণীয় আছে। আমাকে যখন চেতনা দেওয়া হয়েছে তখন এর কিছু সার্থকতা চাই—তা কী হতে পারে?

অতএব এই প্রশ্নটাই তোমার মনে প্রথম জাগা চাই—আমি কেন এখানে আছি?

এমন কি পাঁচ ছয় বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখেছি এ প্রশ্ন: "আমি কেন রয়েছি, কেন বেঁচে আছি?" যেটুকু চেতনা তাদের মধ্যে এসেছে তারই মধ্যে খোঁজ করা, কেন আছি এখানে?

এটাই হবে স্বাভাবিক সূচনা।

২৬শে মার্চ, ১৯৫১

প্রশ্ন: "প্রতি মুহূর্তে জেনো যে সবকিছুকে পাবার জন্য সবকিছুই হারাতে হবে", কি অর্থ?'

উত্তর আগেই এ সম্বন্ধে বলা হয়ে গেছে। যেমনি তুমি যোগের পথে পা বাড়াও, অমনি কেন দেখ যে প্রিয়জনেরা আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে? দেখ যে পার্থিব অধিকার সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বন্ধন সব ঘুচে যাচ্ছে, এমন কি নিজের যা প্রতিপত্তি ছিল তাও নষ্ট হচ্ছে, কোন জিনিস পাবার জন্য এত কিছু হচ্ছে?—সেই জিনিস যা সবার চেয়ে দামী: দিব্য-চেতনা। সে জিনিস পেতে হলে পৃথিবীর সব কিছুকেই হারানো চাই, নিজের বলতে যা কিছু, নিজের ভিতরকার যত রকমের আসক্তি ও সুখের জিনিসকে ছেড়ে দেওয়া চাই; দিব্যচেতনা পেতে হলে সব কিছুকে হারানো শিখতে হবে।

মনের দিক থেকে এ কথা কতকটা হেঁয়ালির মতো শোনায় বটে।

প্রশ্ন: আপনি বললেন, চৈত্যসত্তা পরিণত হয়ে উঠলে সে অন্যান্য জগতেও চলে যেতে পারে; কিন্তু চৈত্য জিনিসটা তো কেবল পৃথিবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

উত্তর: কিন্তু চৈত্য কোনো জিনিসই নয়, সে নিছক চৈত্য। বস্তুজগতে সে আবদ্ধ হয়ে থাকে না। যেমনি সে দেহের মধ্যে বাস করা ছেড়ে দেয় অমনি চলে যায় চৈত্যেরই রাজ্যে। সে রাজ্য আদৌ বস্তুরাজ্য নয়।

প্রশ্ন : প্রাণসত্তাকে কেমন ক'রে রূপান্তরে আনা যায় ?

উত্তর : তার প্রথম ধাপ হবে : ইচ্ছা। দ্বিতীয় ধাপ : ঐকান্তিকতা ও আশ্পৃহা। কিন্তু ইচ্ছা আর আশ্পৃহা প্রায় একই জিনিস, একটা অন্যটার অনুগমন করে। তার পরে চাই : অধ্যবসায়। হাঁ, কিন্তু অধ্যবসায়ের একটা প্রণালী আছে, সেটা কেমন ?— প্রথমত চাই পর্যবেক্ষণের ও বিচারণার সামর্থ্য। প্রাণসত্তার নিজেকে বেশ ক'রে চিনে নিতে হবে, নতুবা "এটা আসছে প্রাণ থেকে, ওটা আসছে মন থেকে, সেটা আসছে দেহ থেকে," এমন পৃথক করে বোঝা কঠিন হবে, সব একত্রে মিলিয়ে গণ্ডগোল পাকাবে।

বহুদিনের পর্যবেক্ষণ অভ্যাসের ফলে অবশেষে তুমি বিভিন্ন অংশের প্রভেদ বুঝে কোন ক্রিয়াটি কোথা হতে ঘটেছে তা জানতে পারবে। এতে সাধারণত অনেক বেশি সময় লাগে, তবে ব্যক্তিবিশেষ অনুযায়ী শীঘ্রও হয়ে যেতে পারে। এমনি বিভিন্ন অংশকে যখন চিনতে পারো তখন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করতে থাকো, "এ কাজটির মধ্যে প্রাণের অংশ কতখানি আছে ? তোমার চেতনাতে প্রাণসত্তা কতখানি কাজ করছে ? তোমার উদ্দিষ্ট কর্মটিকে কেমনভাবে কতখানি সে বদ্‌লে দিচ্ছে ? কতটা জিনিস যোগ করছে, কতটাকেই বা বাদ দিচ্ছে ? প্রাণসত্তার প্রভাবে তোমার চেতনা কতটা প্রভাবিত হচ্ছে ?" এ সব কথা যখন জানতে পারো তখন তুমি কি করো ? তখন তুমি লক্ষ্য করতে যাও যে ওর প্রভাবের ফলে কি দাঁড়াচ্ছে। মনে করো তুমি প্রাণসত্তার রূপান্তর আনতে চাও, তোমার আশ্পৃহার যথেষ্ট ঐকান্তিকতাও আছে আর শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে যাবার মনও আছে, সবই ঠিক আছে। তখন তুমি দেখবে যে সেখানে দুটি জিনিস হতে পারে—অবশ্য অনেক কিছুই হতে পারে—কিন্তু প্রধানত দুটি।

প্রথম, একটা উৎসাহের ঝোঁক তোমাকে পেয়ে বসে। তীব্র আগ্রহের সঙ্গে তুমি কাজ সুরু করে দাও। ঝোঁকের বশে তুমি ভাবতে থাকো "আমি অমুক করব, তমুক করব, যেমন করেই হোক লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছব। সবই আশ্চর্য রেমালুম ভাবে ঠিক হয়ে যাবে। প্রাণসত্তা এবার দেখুক যে সে যদি আমার বাধা হয়ে না চলে তাহলে তাকে নিয়ে আমি কি করি !" কিন্তু তোমার খুব তীব্রদৃষ্টি থাকলে দেখতে পাবে, তোমার প্রাণসত্তা তখন আপন মনে বলছে, "আচ্ছা তাই হবে, এবার তাহলে আমি সুযোগ পেয়ে গেছি।" সে তোমার কথাতেই উপস্থিতমত সায় দিয়ে উৎসাহ দেখিয়েই চলবে, তারপর...বেরিয়ে পড়বে অসহিষ্ণুতা।

দ্বিতীয় যা হতে পারে তা ওর বিপরীত। একটা কেমন অস্থিরতা এসে পড়ে : "আমি কিন্তু ভালো বোধ করছি না ; জীবনটা বড়ো ক্লান্তিকর ঠেকছে, সবই প্রাণের ব্যাপার। এত কিছু করা যাবে কেমন করে ? লক্ষ্যের শেষ অবধি কি কোনোকালেই পৌঁছব ? এ পথ নেওয়া কি উচিত হবে ? এতটা কি সম্ভব ? অসম্ভব বলেই তো মনে হচ্ছে।"

এর মানে প্রাণসত্তাকে দিয়ে যা করাতে চাও তাতে সে খুশি হচ্ছেনা, সে চায়না যে অন্য কেউ তার ব্যাপারে মাথা গলায়, এটি সে পছন্দ করেনা। তাই সে এনে হাজির করে যত নিরুদ্যম, প্রতিবাদ, অবিশ্বাস, সন্দেহ—এত কষ্ট ক'রে কি লাভ আছে।

এই দুই ভাবের প্রত্যেকটিরই মধ্যে তদনুযায়ী নানা বিপত্তি আছে। নিরুদ্যম এসে তোমার কানে বলবে (যদি তোমার ইচ্ছার জোর ততটা না থাকে) "এর সমস্তই হবে ব্যর্থ, তোমাকে সারাজীবন অপূর্ণ প্রত্যাশা নিয়েই কাটাতে হবে।" আবার উৎসাহ তোমাকে বলবে (যে চাইবে রূপান্তর কালই হয়ে যাক) "তোমাকে তেমন কিছু কষ্ট করতে হবেনা, এই যোগের পথে হেলায় এগিয়ে যাবে, দিব্যচেতনা শীঘ্র এসে যাবে।"

আরো সমস্যা আছে...প্রচুর সময়ের দরকার, প্রচুর অধ্যবসায়ের দরকার। কিছু-কাল কাটলেই তোমার প্রাণসত্তা বলতে শুরু করবে—হয়তো কয়েক ঘন্টা বা কয়েক দিন বা কয়েক মাস পরে—"এতখানি উৎসাহ নিয়ে তো এতদিন চললাম, কিন্তু কতটুকু বা এগোতে পেরেছি, কিছু কি এতে লাভ হয়েছে? যেখানে ছিলাম সেখানেই যে এখনও রয়ে গেছি। তাহলে তো আরো খারাপই হলো, অব্যবস্থিত ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় রয়ে গেলাম। আগে যতটা জোর ছিল এখন আর তেমন নেই, যা হবার কথা ছিল তার কিছুই এখনও হলোনা। নিতান্ত একঘেয়ে ভাবে এ সব কাজ করেই যাচ্ছি।" এরপরে নিজেকে নিয়ে আরো বেশি টানাটানি করতে থাকলে ভিতর থেকে একজন বেরিয়ে এসে বলবে, "না, না, এবার ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, যথেষ্ট হয়েছে আর কিছু করে কাজ নেই। আমাকে থাকতে দাও আমার নিজের কোণটিতে, আমিও তোমাকে কিছু বলবনা, তুমিও আমাকে কিছু বলোনা।" সুতরাং এমন হলে কাজটা বিশেষ এগোবেনা।

এই সব বড়ো বাধাটিকে খুব সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলতে হবে। যেমনি কোনো অসন্তোষ বা বিরক্তির আভাসমাত্র পাবে, অমনি তখনই নিজের প্রাণসত্তাকে ডেকে বলবে, "বাপুহে, তুমি চুপ করে থাকো, যা করতে বলা হচ্ছে তাই শুধু করে যাও, নতুবা তোমাকে চড় খেতে হবে।" আর যেজন উৎসাহ দেখিয়ে তোমাকে বলছে, "এখনই যা করবার করে ফেল, একটুও দেরি করোনা", তাকে ডেকে বলবে "তুমি বাপু একটু স্থির হও। তোমার উৎসাহ খুব ভালো জিনিস, কিন্তু পাঁচ মিনিটেই তা ফুরিয়ে দিওনা। যত্নের সঙ্গে দীর্ঘকালের মতো ওটিকে সঞ্চয় করে রাখো, দরকারের সময় চাইলে তখন যেন এই সদিচ্ছা তোমার কাছে পাই। তখন এই সদিচ্ছাটি বজায় রেখে আমার বাধ্য হয়ে যেন চলো, বিনা নালিশে ও বিনা বিদ্রোহে, যা বলব তাই যেন করো। ত্যাগ স্বীকার কিছু করতে বললে তাও করবে, সাহায্য চাইলে তাও দেবে প্রাণের সঙ্গে।"

এই মনোভাব নিয়ে এ রাস্তায় নামতে হয়, কিন্তু এ রাস্তা খুবই দীর্ঘ। পথের মাঝে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে। হঠাৎ মনে বিশ্বাস হবে যে বাধাটা এবার পার হয়ে গেছ ; "বিশ্বাস হবে" বলছি, কারণ অতিক্রম করে গেলেও বাস্তবিক সমস্তটাই যোচেনি। একটা

সহজ দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, যেমন দেখেছি। একজন দেখলে যে তার প্রাণসত্তা বড় একরোখা, কিছুতেই তাকে বাগানো যাচ্ছেনা, বিনা কারণে সব কিছুতেই সে খাপ্পা হয়ে উঠছে। লোকটি প্রাণসত্তাকে অনেক বুঝিয়ে পড়িয়ে চেষ্টা করতে থাকল যাতে সে অমন গরম হয়ে না ওঠে, চেঁচামেচি না করে ঠাণ্ডা হয়ে যেন জীবনের আঘাতগুলোকে সে সইয়ে নেয়। তা যদি হাসিমুখে করতে পারা যায় তাহলে অনেকটাই কাজ এগোয়। তা সে কিছুতেই করতে পারলে না। মনে রেখো যে এইটাই বিশেষ দরকার—প্রাণসত্তাকে ঠাণ্ডামেজাজে রাখতে সর্বদাই চেষ্টা করা, নইলে অনেক চোট খাবে। মেজাজটি ঠিক রাখবে, অর্থাৎ যেমনি দেখবে যে রাগ এসে পড়ছে অমনি হাসতে শুরু করে দেবে। কোনো কিছু ফিরে আসছে দেখে হতাশ হয়ে যেমনি ভাববে, "আঃ, এত চেষ্টার পরেও আবার সেই জিনিসই শুরু হলো", অমনি তখন হেসে উঠে বলবে নিজেকে, "তাই বুঝি? এখনও তাহলে ওটা তোমার যায়নি! কিন্তু এতে যে নিজে হাস্যাস্পদ হয়ে পড়ছ তা দেখতে পাচ্ছনা? নেহাৎ বোকামি করছ তুমি। রাগ করে কি কোনো ফল পাবে?" মেজাজটি ঠাণ্ডা রেখে প্রাণসত্তাকে এই শিক্ষাটি কেবল দিতে থাকো। কিছুকাল পরে তাহলে দেখবে সে আর অমন রেগে উঠছে না। কিন্তু সে ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে দেখলেই তোমার মনোযোগ শিথিল হবে। তখন ভাবতে থাকবে যে বিপদ কেটে গেছে, "প্রাণসত্তা আর জ্বালাচ্ছেনা, চটেও উঠছে না, এবার তাহলে সামলেছি" কিন্তু এর পরের দিন সকালেই কোনো কিছুতে হঠাৎ রেগে উঠবে। এমনই হয়ে থাকে, এখানে খুবই সতর্ক থাকা চাই। আর এমন কথাও যেন কখনো বলা না হয়, "এইতো দেখছি সবই বৃথা হলো, সব চেষ্টাই অনর্থক হয়ে গেল, আমার কোনো কিছুই হবার নয়। সবই মরীচিকা, যা সম্ভব হবার নয় তাই।" এমন সব কথা উদয় হবার বদলে তখন তুমি নিজেকে বলবে, "এ আমারই দোষ, আমিই অসতর্ক ছিলাম।"

দীর্ঘকাল পর্যন্ত, বহুদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখে দেখে অবশেষে তুমি বলতে পারো যে "হাঁ, এবার ভবে গেছে"। কখনো কখনো বছরের পর বছর অপেক্ষাই করে যেতে হয়—এ কথা তোমাদের নিরুৎসাহ করতে বলছিনা—বলছি যাতে তোমাদের ধৈর্য ও অধ্যবসায় শেষ পর্যন্তই অটুট থাকে। আর প্রাণসত্তা তো সমগ্রের মধ্যে ছোটো এক অংশ মাত্র—যদিও যথেষ্ট ওর গুরুত্ব, তাই ওকে বলা হয় ফলদায়ক প্রাণতেজ। তথাপি ওটি ছোটোই অংশ। কিন্তু মন!...সে যে অনবরতই ছুটোছুটি করছে, সব দিক থেকে লাগাম টেনে তাকে থামাতে হয়। তুমি কি ভাবো যে আজ বাদে কালই তা করতে পারবে? আর তার পরে তোমার দেহ!...সেদিক দিয়ে যে অনেক রকমের দুর্বলতা রয়েছে, কত কিছু ঘাটতি রয়েছে, হয়তো কোনো পুরোনো ব্যাধি নিত্য লেগে আছে, মারাত্মক কিছু না হলেও কষ্টদায়ক তো বটে, তাই নয় কি? তুমি সে দোষকে তাড়াতে চাও। তার জন্য অনেক চেষ্টা, অনেক মেহনত করো, ভিতরে একটা একাগ্রতা আনো, একটা রফা করে নিয়ে ভাবো যে কায়দা করেছি এবার, কিন্তু কিছু পরেই... একটা ছোটো দৃষ্টান্ত দিই যাদের

কাশির অভ্যাস আছে, চেষ্টা করেও কাশি বন্ধ করতে পারেনা। গুরুতর কিছু নয়, কিন্তু যথেষ্ট বিরক্তিকর, মনে হয় কিছুতেই একে ছাড়ানো যাবেনা। তুমি সংকল্প করলে, "একে যেমন করে হোক থামাতেই হবে।" বাইরের চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে যোগের দিক থেকে চেষ্টা করতে থাকলে—তোমার চেতনাকে ও শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে কোনোগতিকে কাশি থামালে। তখন ভাবলে, "দেহটা এবার কাশতে ভুলে গেছে।" হাঁ, দেহকে ভোলাতে পারা খুবই বড়ো কথা। তা পারলে প্রকৃতই বলতে পারো, "আমি সেরে গেছি"। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সব সময়ে তা হয়না, কারণ দেহের ব্যাপার অবচেতনের মধ্যে নেমে চলে যায়, আর যেদিন তারসাম্যের একটু তারতম্য হয় আর শক্তিও কমে যায়, সেদিন আবার তা বেরিয়ে পড়ে। তখন তুমি খুব কাতর হয়ে বলো, "মনে করেছিলাম ওটা গেছে। নিজেকে বুঝিয়েছিলাম তাই যে দেহের উপরেও আধ্যাত্মিক শক্তি কাজ করে, এ শক্তিতে অনেক কিছুই করা যায়, কিন্তু এখন দেখছি সেটা ভুল। এই সামান্য জিনিসটাকেই জয় করতে পারলাম না, আর আমি যাচ্ছি মৃত্যুকে জয় করে অমরত্ব লাভ করতে! কি করে তা সম্ভব হবে? এই সামান্য জিনিসটা কয়েক বছর একেবারেই ছিলনা, আবার কিন্তু ফিরে এলো।" সেইজন্যই তোমাদের এত সতর্ক হতে বলছি।

অশেষ সহাশক্তি আর অসীম ধৈর্য তোমাদের থাকা চাই। একটা কাজই একবার, দশবার, শতবার করতে হবে, দরকার হলে সহস্রবারও করতে হবে, কিন্তু শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনোমতে ছাড়বেনা। কেবল এখানে বা ওখানে নয়, কিন্তু সর্বত্র সব সময়েই তাই নিয়ে লেগে থাকতে হবে। এটাই বস্তু সমর্পণের কথা যা তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি। তাই যখন কেউ এসে আড়ম্বর ক'রে বলে "আমি যোগ করতে চাই", তখন আমি তাকে বলি, "আগে বেশ করে ভেবে দেখ। অনেক বছর যোগ করেও তার কিছু ফল না পেতে পারো। যদি সত্যই যোগ করতে চাও তাহলে এমন ইচ্ছা নিয়ে লাগতে হবে যে তেমন দরকার হলে দশ জন্ম বা শত জন্মও তা চালিয়ে যেতে পারবে, যতক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্যে গিয়ে না পৌঁছাও।" বলছিনা যে বাস্তবিকই তাই করার দরকার হবে, কিন্তু তোমার মনোভাবটা সেইরকম হওয়া চাই। কোনো কিছুতেই যেন তোমাকে হটাতে না পারে: কারণ সত্তার বিভিন্ন অবস্থাতে নানারকম প্রতিবন্ধক এসে পড়ে, তার উপর জগতে কুটিল বিরোধী শক্তিদের অন্তহীন বিদ্বেষ জেগে আছে—কেন আছে তা জানো? কেন তাদের এমন প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে তা জানো? তোমার ঐকান্তিকতা কতখানি, কতদূর পর্যন্ত তুমি টিঁকে থাকতে পারো, তাই পরখ করে দেখবার জন্য। সব কিছুই নির্ভর করছে তোমার আপন ঐকান্তিকতার উপর। ভিতরকার দিব্যসংকল্পে যদি তুমি ঐকান্তিক থাকো, তাহলে কোনো কিছুই তোমাকে আটকে রাখতে পারবেনা। লক্ষ্যের শেষ পর্যন্ত তুমি যাবেই, তার জন্য যদি মনে করো হাজার বছরের প্রয়োজন হয় তবে সেই হাজার বছরই তুমি বেঁচে থাকবে।

প্রশ্ন : প্রাণসত্তা কি রূপান্তর চায়না ? আশ্পৃহা তো সেই করে, আর বাইরের যত কিছু আঘাত ও আবেগের ফল তো তাকেই ভুগতে হয়।

উত্তর : প্রাণসত্তা যদি রূপান্তর চায় তাহলে তো খুবই ভালো হয়। সে যদি নিজের রূপান্তরের জন্য আশ্পৃহা করে, তাহলে নিজের মধ্যে যা-কিছু দোষত্রুটি ও গণ্ডগোল রয়েছে তার থেকে মুক্ত হতে সে নিশ্চয় চেষ্টা করবে। সে যদি নিজে দুর্বল হয় তাহলে তার আশ্পৃহাও হবে দুর্বল। আর এ কথা জেনো যে দুর্বলতা মানেই কপটতা, নিজের কাছেই নিজের একরকম অছিলা, যা খুব চেতনভাবে হয়তো নয়, কিন্তু অবচেতনের মধ্যে অনেক রকম কপটতা জমা করা আছে,—আর যে দুর্বলতা তোমাকে দিয়ে বলাচ্ছে, "আমি তো খুবই চাই যে এটা করতে পারি কিন্তু কিছুতেই যে তা পারছিনা", তা নিশ্চয় কপটতা। কারণ তুমি যদি অকপট হও তাহলে আজকে যেটা পারছনা কাল সেটা পারবে, কাল না পারলে পরশু, কিংবা যতদিনই লাগুক ততদিনে পারবে। এটা যদি ভেবে দেখ যে গোটা বিশ্ব (অথবা ছোটো করেই ধরো এই পৃথিবী) ভগবান নিজেই হয়েছেন নিজেকে বিস্মৃত রেখে, তাহলে এর মধ্যে কোনো দুর্বলতার স্থান কোথায় ? ভগবানের মধ্যে নিশ্চয় দুর্বলতা নেই। তাহলে দুর্বলতা রয়েছে ঐ বিস্মৃতির মধ্যে। ওর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেই দুর্বলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা হবে, আর যতই ভগবানের দিকে যাবে ততই দুর্বলতা ঘুচে যাবে।

এ কথা কেবল মনের পক্ষেই নয়, কিন্তু প্রাণের এবং দেহের পক্ষেও। যত কিছু দুঃখভোগ ও দুর্বলতা ও অক্ষমতা, সবই শেষ পর্যন্ত আসছে কপটতা থেকে। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে কপটতা বাসা বাঁধে। সুতরাং ঐ কথাটি বোলোনা, যেমন অনেকে আমায় বলে "আমি পুরোপুরি ঐকান্তিক"। যেমন অনেকেই বলে থাকে, "আমি কখনো মিথ্যাকথা বলিনি।" পুরোপুরি ঐকান্তিক হতে পারলে তুমি তো ভগবান হয়ে গেলে ; যদি কখনো কোনো মিথ্যা বা অসত্য না বলো তাহলে তুমি স্বয়ং সত্য হয়ে দাঁড়ালে। কিন্তু আসলে তুমি ভগবানও নও আর সত্যও নও (মূলে তাই হলেও এখন বাস্তবে তা নও), তেমন ঐকান্তিকতায় ও সত্যে পৌঁছতে হলে তোমাকে বহুৎ দূর পর্যন্ত যেতে হবে। এতে দুঃখিত হবার কিছু নেই। এই রকমই হয়ে থাকে।

যেমন লোকে হতাশ হয়ে তোমায় জিজ্ঞাসা করে, "জগৎটা এমন ভয়ংকর হলো কেন তা বলতে পারো ?" জগৎটা যখন এমনই হয়েছে তখন তাই নিয়ে দুঃখ করে কি লাভ আছে ? তোমার দিক থেকে তুমি পারো শুধু একে বদলাবার চেষ্টা করতে। অবশ্য অনেক ভেবেচিন্তে তুমি এর কারণ বুঝে নেবতে চেষ্টা করতে পারো, কিন্তু মানুষের মন সেটা বুঝে উঠতে অপারগ। মনের দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করে আপাতত কোনো ফল হয়না ; বরং পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করলে তার কিছু ফল হতে পারে। আমরা সকলেই জানি ও মানি যে জগৎ খুবই খারাপ জায়গা, যেমন হওয়া উচিত ছিল তেমন একেবারেই নয়, সে বলে

আমাদের পক্ষে একমাত্র করণীয় যাতে এটা অন্যরকম হতে পারে, এবং তারই উপায় খুঁজতে আমাদের বিশেষ করে মন দেওয়া উচিত। একটা কথা এখানে স্পষ্টই বোঝা যায়, তার সেরা উপায় হচ্ছে আমাদের নিজেকেই বদলানো (যদিও তা আমরা এখনও মানিনা)। নিশ্চয় তুমি নিজেকে তোমার সকল প্রতিবেশীর চেয়ে ভালো করেই চেনো, আর একথাও তোমার জানা আছে যে চেতনার অভিব্যক্তি যেমন আছে মানুষের মধ্যে তেমন আর কোথাও নেই, পৃথিবী ছাড়া কোনো গ্রহনক্ষত্রেও নেই। এর পরে হয়তো একটু ইতস্তত করে শেষকালে তুমি বলবে, "তাহলে সব চেয়ে ভালো হবে নিজেকে নিয়ে কাজ শুরু করা। খুব ভালো ভাবে নিজেকে না জানলেও এটা জানি যে আমার মধ্যে কতকগুলি জিনিস রয়েছে যার সংযোগে আমি এই হয়েছি—হয়তো সেইগুলিকে নিয়েই আমার তরফের কাজ বা কাজের একটা অংশ, তা যদি করি তাহলে আমার পক্ষে তাই যথাসম্ভব ভালো কাজ করা হবে।" এমন ভাবে আরম্ভ করলে তা একটা খুব বড়ো রকমের আরম্ভ হলো। অথচ এ কিছু সাধ্যাতীত কাজ নয়, তোমার সম্ভাবনার সীমার বাইরে নয়। এ কাজ নিজের নাগালের মধ্যেই আছে, সর্বদাই এতে তুমি নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পারো—তোমার শক্তিসীমার মধ্যেই এর ক্ষেত্র, যদিও এ কাজ যত বিচিত্র তত জটিল ও গভীর, সুতরাং যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক হবে। আর এতে এক অজানা জগতে তোমাকে অনেক আবিষ্কারের দিকে নিয়ে যাবে।

অনেকে বলবে, "এও তো সেই অহং হয়ে গেল।" অহং হবে যদি তুমি কিছু নিজের লাভের জন্য তাই করো, যদি ওর দ্বারা তুমি নিজে কিছু শক্তিলাভ করতে চাও, অন্যকে প্রভাবিত করবার মতো ক্ষমতা চাও, কিংবা যদি নিজের জীবনকে সুখে রাখতে এই সব উপায় অবলম্বন করো,—তেমন মন নিয়ে করলে তখন তা অহংএর কাজই হবে। কিন্তু মজা এই যে তাতে তুমি কোথাওই গিয়ে পৌঁছতে পারবেনা। নিজেকে তুমি তখন ঠকাতে শুরু করবে, উত্তরোত্তর মরীচিকার মধ্যে পড়ে আরো তুমি জটিলতার মধ্যেই চলে যাবে। তুমি যেমন মনে করো তার চেয়ে অনেক ভালোরকম ব্যবস্থা এর করা আছে। অহংএর ভাবটি নিয়ে যদি কাজ করো (কারণ তার ক্ষেত্র রয়েছে নিজেরই নাগালের মধ্যে,) তাহলে তাতে ফল কিছু হবে না। সুতরাং এ কাজ করতে হবে ভগবৎ কর্মবিকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ণ ঐকান্তিকতা ও আশ্পৃহার সঙ্গে। তেমন মনোভাব নিয়ে যদি এ কাজ শুরু করো তাহলে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে তোমার এ পথযাত্রা এমন উপভোগ্য হবে যে এতে অনেককাল সময় লাগলেও কিছুতে তোমার ক্লান্তি আসবে না। কিন্তু এমনি ভাব নিয়েই তা করা চাই ইচ্ছার জোর ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে ; আর এমন খুশি মনে যে বিপদেও তুমি হাসবে, ভ্রান্তিতেও হাসবে। তাহলে দেখবে সবই ঠিক ঠিক কাজ হবে।

প্রশ্ন : এমন কিছু মুকুর আছে যাতে ভগবানের প্রতিবিম্ব মিলতে পারে ?

উত্তর : সে মুকুর স্বয়ং চেতনা। সেই চেতনা আছে বলেই সব কিছু ব্যাপার হচ্ছে,

চেতনা ব্যতীত কিছুই করা যায় না। সমস্ত সৃষ্টির কেন্দ্রে যদি সেই পরম চেতনা না থাকত, তাহলে সৃষ্টি কখনই কোনোরূপ চেতনার আভাসমাত্র পেতোনা।

প্রশ্ন : প্রাণসত্তার রূপান্তর ঘটাতে হলে চাই ইচ্ছার জোর, ঐকান্তিকতা, অধ্যাবসায় ইত্যাদি। কিন্তু সত্তার কোন অংশে এই সব জিনিস মিলতে পারে?

উত্তর : ঐগুলির মূল উৎস আছে চৈত্যে, কিন্তু বিভিন্ন লোকে তার বিভিন্ন রকম ভাষান্তর করে। সাধারণত এগুলি আকার নিতে শুরু করে মনের উচ্চ অংশে, কিন্তু তাকে কার্যকরী করতে হলে প্রাণসত্তার অন্তত কিছুটা অংশের তাকে সমর্থন করা চাই, কারণ ইচ্ছাতে বেগ আসবে প্রাণের ভিতর থেকেই, সার্থকতা আনার শক্তি আসবে প্রাণেরই সংস্পর্শে। প্রাণের মধ্যে যদি তার বিরোধী কিছু থাকে তাহলে তুমি ইচ্ছা করেও কোনো কিছু করতে পারবে না। কিন্তু প্রাণের মধ্যে একটা অংশ থাকেই, যে খুব ইচ্ছুক হয়ে ওঠে —হয়তো তার দাম বেশি নয়, কিন্তু তা থাকেই। তাই যদি একবার এক মিনিটের জন্যও ইচ্ছা এবং আস্পৃহা জাগে, তা ক্ষণস্থায়ী হলেও ভগবৎ-উপলব্ধির পক্ষে তা কাজের হয়, কারণ সমগ্র সত্তার ভিতর দিয়ে বিদ্যুতের মতো সেটা বয়ে যায়—এমন কি তাতে দেহের অনেক কোষও সাড়া দিয়ে ওঠে। যদিও তখনই তুমি তা টের পাওনা, কিন্তু সাড়া ওঠে সর্বত্র। আর একবারের জন্যও তেমন হলে তুমি ধীরে ধীরে সেই অংশগুলিকে একত্রে মিলিয়ে এমন কিছু গড়ে নাও যা সুনিয়ন্ত্রিত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে তোমার প্রয়াসকে ইচ্ছা, ঐকান্তিকতা ও অধ্যাবসায় যোগাতে থাকবে।

এমন কি শৈশবেও কোনো মুহূর্তে শিশুর যাহা চেতনাকে ভেদ করে এই ভাবটি ক্ষণে-কের জন্য তার মনে ভেসে ওঠে যে পরমাশ্চর্য পরম সুন্দর একটা কিছু কোথাও আছে যার সন্ধান আমার মেলা চাই—এবং সেটি তখন ক্ষুদ্র একটু বীজের মতো উপ্ত থেকে যায়, যার উপর তোমার ভবিষ্যৎ কর্মের ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে। জগতে এমন বিস্তর লোক আছে যাদের কাছে তুমি বলতেই পারবে না যে "ভগবানকে জানতে চেষ্টা করো" কিংবা "ভগবান পাবার জন্য যোগ করো।" তুমি দেখবে যে খুব কম লোককেই এ ধরণের কথা বলা যায়। সেই কয়েকজন মাত্র লোকই যোগের জন্য "প্রস্তুত" বলা যেতে পারে। তাদের মধ্যে আগেই কিছু সূচনা হয়ে গেছে—তাতেই যথেষ্ট। আবার অন্য কারো কারো বেলাতে হয়তো এটি প্রাক্তনের জিনিস, পূর্ব পূর্ব জীবন থেকে এসেছে। কিন্তু যারা তেমনভাবে প্রস্তুত ছিলনা তাদের সম্পর্কেই আমি বলছি—তাদের মধ্যে যদি কোনো এক মুহূর্তে ঐরূপ একটা বিদ্যুৎ ঝলক সমগ্র সত্তার মধ্যে প্রবাহিত হয়ে কিছু সাড়া জাগিয়ে থাকে, তাতেই যথেষ্ট। এমন জিনিস খুব বেশি লোকের মধ্যে হয় না। তাই অচেতন মানবগোষ্ঠির মধ্যে যারা যোগের জন্য প্রস্তুত এমন লোকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো

সন্দেহ নেই, তোমরা যে এখানে এসে রয়েছ তার থেকেই প্রমাণ হয় যে তোমরা ঐরূপ প্রথম ঝলকটি পেয়েছিলে—কেউ কেউ খানিকটা পথ এগিয়েই এসেছে (যদিও নিজেরা তা জানে না)—কিন্তু অন্ততপক্ষে ইলেকট্রিক শক্ লাগার মতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই নিগূঢ় স্পর্শটি তোমাদের নিলেছে যা বিদ্যুতের আলোর মতো তোমাদের জানিয়ে দিয়েছে যে পাবার মতো জিনিস কিছু একটা আছে। সে অনুভব হয়তো বাক্যে বলার মতো নয়, শুধু একটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠা। ওতেই যথেষ্ট। ওকে কেন্দ্র করেই তোমরা আস্তে আস্তে এগোবে। একবার সে জিনিস দেখা দিলে তা আর নিলিয়ে যায়না। তবে যদি তুমি বিরোধী শক্তিদের সঙ্গে মিতালি করে ওর অস্তিত্বকে আমল না দিয়ে ওকে ঠেলে ফেলে দাও, তাহলে বোধ হবে যে ওটা সরে গেছে। তথাপি সেই একবারের একটিমাত্র বিদ্যুৎ স্পর্শ আবার তোমাকে ফিরিয়ে আনতে পারে। তার স্পর্শ যদি একবারও পেয়ে থাকো তো জেনো যে বর্তমান জীবনে না মিললেও পরজীবনে তা নিশ্চয় মিলবে।

২৯শে মার্চ, ১৯৫১

প্রশ্ন : Conversation X থেকে—"...যত কিছু ধর্মীয় তত্ত্ব ও মতবাদ সবই হলো মনের তৈরি জিনিস, তাকেই আঁকড়ে ধরে যদি তোমার জীবনকে তারই বাঁধা নির্দেশ পালনের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখো, তাহলে সকল তত্ত্বকে ও মতবাদকে ছাপিয়ে আত্মার যে উদার উন্মুক্ত ও বৃহৎ সত্তা তাকে তুমি জানতেই পারবে না।...প্রত্যেক ধর্মেই এমন কেউ না কেউ থাকে যারা উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু সেটা তারা ঐ ধর্ম থেকেই পায়নি, তারাই বরং তাদের আধ্যাত্মিক প্রাপ্তিকে ঐ ধর্মের মধ্যে যোগ করে দিয়েছে। তারা যদি অন্য কোথাও অন্য কোনো ধর্মে জন্মাতো, তাতেও তারা ঐ জিনিস অর্জন করতো। সেটা হতো তাদের নিজস্ব সামর্থ্যে, তাদের আভ্যন্তরীণ সত্তার শক্তিতে, যে-ধর্মকে তারা স্বীকার করে সেই ধর্মই যে তাদের তা পাইয়ে দিয়েছে এমন নয়।"

তাহলে সকল ধর্মই কি মনের দ্বারা তৈরি করা?

উত্তর : সকল ধর্মই যে গোড়াতেই তা হয়েছে তা হয়তো নয়, কিন্তু পরে তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রশ্ন : হীনযান ("Little Vehicle") আর মহাযানের ("Great Vehicle") অর্থ কি?

উত্তর : এগুলি হলো বৌদ্ধ শব্দ। বোধ করি পালি শব্দ থেকে এগুলি তর্জমা হয়ে এসেছে। বলা হয় যে উত্তরের ধর্ম মহাযান আর দক্ষিণের ধর্ম হীনযান। বুদ্ধের নিজের যে সকল নির্দেশ যত্নে রক্ষিত আছে শুনি, সেই সকল নির্দেশগুলিকেই যথাযথ অনুসরণ করা হয় হীনযানে।

বুদ্ধ বলেছেন যে দেবতা কেউ নেই, অহংএর নির্বন্ধ কিছু নেই, এখানে অবতীর্ণ হবার মতো কোনো ঊর্ধ্বলোকের সত্তা বলে কিছু নেই...কোনো কিছুই নেই, তাই নয় কি? দক্ষিণের হীনযান ধর্মও ঠিক তাই, অত্যুগ্র নেতিবাদী, সব কিছুতেই নেতি নেতি। কিন্তু উত্তরের ধর্ম মহাযান, যা তিব্বতে অনুসরণ করা হতো এবং তিব্বত থেকে যায় চীনে ও চীন থেকে যায় জাপানে, তাতে রয়েছে অনেক বোধিসত্ত্ব (অন্যান্য ধর্মে যাদের বলে সন্ত), আরো আছে অনেক পূর্বেকার প্রাচীন বুদ্ধ যারা দেবতা বা অর্ধবেদবতাদের মতো অর্চিত হয়। উত্তরের কোনো বৌদ্ধমন্দির তোমরা দেখেছ কিনা জানিনা (আমি কিছু দেখেছি চীনে ও জাপানে)—সেখানে বড় বড় হল ঘরে আছে অসংখ্য সব মূর্তি—কেবলই যত বোধিসত্ত্বগণ ও তাদের ভক্তগণ, আর প্রকৃতির শক্তিসমূহ সবই দেবতায় পরিণত, সেখানে এত বেশি দেবতার সমাবেশ যে তুমি অবাক হয়ে যাবে; অপরপক্ষে দক্ষিণে গেলে দেখবে এ সব কোনো কিছুই নেই, একটিও মূর্তি নেই। বোধকরি "মহাযান" নামটি হয়েছে এই কারণে যে ওর মধ্যে বিস্তর কিছু আছে, আর "হীনযান" হয়েছে এইজন্য যে ওর তুলনায় কোনো কিছুই নেই! তবে আমি ঠিক করে বলতে পারব না যে কিসের থেকে এই দুটি নামের উদ্ভাবনা হয়েছে।

মা পূর্বপুস্তক থেকে পড়লেন—"প্রত্যেক জিনিসের একটা আভ্যন্তর মূল্য থাকে, তোমার কাছে তা বাস্তব হয়ে ওঠে যখন তুমি মুক্ত স্বেচ্ছাতে তাকে গ্রহণ করো, কিন্তু জোর করে তাকে চাপিয়ে দিলে তখন তেমন হয় না। নিজের ধর্ম সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হতে চাইলে নিজেই তাকে বেছে নিতে হবে; নিজের দেশ সম্বন্ধে নিশ্চয় হতে হলেও তাই। কোনটি আপন দেশ তাও তোমাকে বেছে নিতে হবে; নিজের সংসার সম্বন্ধে নিশ্চয় হতে হলেও তাই, তা নিজেই তোমাকে বেছে নিতে হবে।"

প্রশ্ন : "নিজের সংসার বেছে নেওয়া" এ কথার অর্থ কি?

উত্তর তুমি জগতের মধ্যে এসে হাজির হয়েছ বিশেষ একটা আবেষ্টনের মধ্যে, বিশেষ কতকগুলি মানুষের পরিস্থিতির মধ্যে। খুব বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া ছোটো-বেলাতে তাকেই মনে হয় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, যে অবস্থার মধ্যে জন্মেছ তাতেই অভ্যস্ত হয়ে

যাও। কিন্তু পরে যখন আধ্যাত্মিক আশ্পৃহা জাগে তখন সেই পরিস্থিতির মধ্যে খুবই অস্বস্তি হতে থাকে, বিশেষত যারা তোমাকে লালনপালন করেছে তাদের মধ্যে যদি তোমার নবো-দ্বিত আশ্পৃহার সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস থাকে। তখন তুমি বলোনা, "কি আর করা যাবে, যখন এই সংসারেই জন্মেছি! এখানে আমার বাবা, আমার মা, আমার ভাইবোনেরা রয়েছে...," তখন তুমি কেবল খুঁজে বেড়াও (বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবার কথা বলছি না) সেই রকম আত্মাকে যার সঙ্গে তোমার আত্মার মিল আছে, এমন লোক যাদের মধ্যে তোমার অনুরূপ আশ্পৃহা আছে,—আর যদি তোমার আশ্পৃহা ঐকান্তিক হয় তো দেখবে যে অপ্রত্যাশিত -ভাবে তাদের সাক্ষাৎ মিলে যাবে, আর দেখবে যে তারাও এমনি খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তেমন লোক একজনই হোক বা একাধিকই হোক তাদের সঙ্গে শীঘ্রই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যাবে, তখন তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠে তাদের নিয়েই তোমার সত্যিকার সংসার হয়ে দাঁড়াবে। আভ্যন্তরীণ মিল ও আশ্পৃহার মিল আছে বলেই ঘনিষ্ঠতা প্রগাঢ় হয়েছে, তোমাদের জীবনের লক্ষ্যও একই রকম হবে। পরস্পরকে তোমরা তখন সহজেই বুঝবে, তাদের সঙ্গে কিছুমাত্র বিরোধ থাকবে না, একটা আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি স্থাপিত হবে। একেই বলা যাবে নিজের প্রকৃত সংসার, একই রকম আশ্পৃহার ও আধ্যাত্মিক মিলের সংসার।

আর নিজের দেশ বেছে নেওয়া নির্ভর করে অনেক কিছুর উপর, একটা আভ্যন্তর পরিচয় বোধের উপর। মনে করো এমন কোনো দেশে গিয়ে পড়লে যেখানে দেখলে মনের মধ্যে বিশেষ একরকম সাড়া জাগছে, তোমার মনের আশ্পৃহার সঙ্গে আশ্চর্য একটা সাদৃশ্য রয়েছে সেখানে, তোমার রুচি ও মানসিক প্রবণতার দিক দিয়ে সেই দেশটিকে খুব অনুকূল দেখলে, সেখানে না জন্মালেও সেই দেশেই বাস করতে তুমি মনস্থ করলে। তখন বলতে পারো, "এই দেশই হলো আমার আপন দেশ"। অনেকে বাস্তব কিছু সুবিধা পেয়ে বা তেমনি কোনো বাস্তব কারণে একটা দেশে গিয়ে বাস করে, কিন্তু সে আলাদা কথা। এমন লোকও আছে যারা সেই দেশের পরিবেশকে পছন্দ করল, তাদের আশ্পৃহার পক্ষে সে দেশ উপযোগী বলে মনে হলো, সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীবনযাত্রার রীতি তাদের প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খেয়ে গেল। তখন সেখানেই তারা স্থায়ী হয়ে থেকে যায়, সেখান থেকে আর নড়ে না—আর অনেক বছর যাবৎ সেখানে থাকতে থাকতে মনে করে এটাই বাস্তবিক আমার নিজের দেশ, যে ঘরে বা যে গ্রামে বা যে শহরে তারা জন্মেছিল তার থেকে এ দেশ তখন তার বেশি আপন হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন : প্রাণসত্তা কি জন্ম থেকেই বিকৃতি নিয়ে আসে?

উত্তর : তোমার জন্ম যদি আকস্মিকভাবে না হয়ে থাকে, তাহলে বিকৃতি কিছু আসেনি বলেই মনে করতে পারো, কিন্তু প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তোমরা তেমনি গঠন নিয়ে

জন্মাও যেমন গঠন নিয়েছে তোমাদের বাপ মা আর তাদের বাবাদের যেমন গঠন চলে এসেছে তাদেরও বাপ মা থেকে। প্রত্যেক সংসারে প্রাণসত্তার এক ধরনের অনুবৃত্তি চলে আসে এবং এ ছাড়াও গর্ভাধানের সময় তাদের চেতনার অবস্থা ও তাদের ক্রিয়াগুলির অবস্থা কেমন ছিল তার উপরেও অনেকটা নির্ভর করে—সে অবস্থা লাখের মধ্যে একটির বেলাতেও প্রকৃত আস্পৃহার সঙ্গে কোনো সম্পর্কমাত্র রাখেনা। যেখানে থাকে প্রকৃত আস্পৃহা সেখানেই কেবল প্রাণসত্তা বিশুদ্ধ হতে পারে, প্রাণের যে উপাদান এসে সত্তাটিকে গঠন দেবে তা অশুদ্ধির সংক্রমণ থেকে মুক্ত হতে পারে ; অর্থাৎ যে চৈত্যসত্তা সেখানে প্রবেশ করছে সে তার অনুকূল উপাদানগুলিকে সেখানে জুটিয়ে আনে। কিন্তু বর্তমান জগতে সব কিছুই এমন জড়িয়ে আছে যে কোনো প্রাণসত্তার পক্ষে সংক্রামিত সত্তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে আপন উপাদানগুলিকে বিশুদ্ধ রাখতে পারা প্রায় অসম্ভব।

এ সম্বন্ধে আমি আগেও তোমাদের বলেছি। শিশুকে জন্ম দেবার আগে বাপ মায়ের মনে কিরূপ আস্পৃহা থাকা দরকার সে কথাও বলা হয়েছে, কিন্তু তা লাখের মধ্যে বড় জোর একটির বেলাতে হয়ে থাকে। যথোচিত পূর্বসংকল্প নিয়ে অভীপ্সিত শিশুলাভের উদ্দেশ্যে গর্ভসঞ্চার হওয়া খুবই বিরল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয়ে যায় নিতান্ত আকস্মিকভাবে। অসংখ্য বাপমায়ের মধ্যে দুই একজন মাত্রই চিন্তা করে থাকে যে এই গর্ভাধানে তাদের শিশুটি এইরূপ হোক ; তারা যেমন হয়েছে, তাদের শিশুও যে তেমনি হবে, এটা তারা জানেওনা। সামান্য জনকয়েক উচ্চস্তরের লোকই তা জানতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাহোক একটা কিছু দৈবাৎ হয়ে যায়, আর কখন যে কি হচ্ছে তার কোনো ধারণাই কেউ করেনা। তুমি এরূপ ক্ষেত্রে অনুকূল ও বিশুদ্ধ রকমের প্রাণসত্তা পাবে তা কেমন করে আশা করতে পারো ? জন্মের প্রথম থেকেই দুর্ভেদ্য রকমের আবর্জনাপূর্ণ আস্তাবল (Aegian stable) নিয়ে এসেছ যাকে তোমায় আগে সাফ করে ফেলতে হবে, তবেই তোমার প্রকৃত জীবন প্রকাশ পাবে। আর আভ্যন্তরীণ রূপান্তর আনতে যখন সেই কাজ তুমি শুরু করো তখন তোমাকে নেমে যেতে হয় অবচেতনের মূলে, যেটি তুমি পুরুষানুক্রমে পেয়েছ তোমার বাপ মা থেকে, আর সেখানে তখন দেখবে কী সব জিনিস জমা হয়ে আছে ! তোমার যত কিছু গোলমাল আর বিপত্তি সেখানেই আছে জড়ো করা, তার সঙ্গে অল্প কিছু যোগ করা হয়েছে জীবনের প্রথম কয়েক বছরে। নতুন যা কিছু এসে যোগ হয় তা যে কোনো সময়েই এসে পড়তে পারে—যখন তুমি বদ সংসর্গে মেশো, খারাপ রকমের বইগুলি পড়ো, তার থেকে তোমার মধ্যে বিষ ঢুকে পড়ে। কিন্তু সব কিছুই এসে চাপে অবচেতনের ঘাড়ে, তার থেকে যে সব মন্দ অভ্যাসগুলি জন্মায় তার বিরুদ্ধে তুমি সংগ্রাম করতে থাকো। যেমন, অনেকে আছে যারা মুখ খুললেই মিথ্যাকথা না বলে থাকতে পারেনা, ইচ্ছা করেই যে তা করে এমন নয় (যারা তাই করে তারা আরো খারাপ), আবার এমন আছে যারা লোকের সঙ্গে ঝগড়া না করে থাকতে পারেনা,—এ সমস্তই আছে তাদের অবচেতনের মধ্যে নোঙর গেড়ে।

তোমার মধ্যে শুভ ইচ্ছা থাকলে তুমি যথাসাধ্য এগুলিকে এড়াতে যথাসাধ্য চেষ্টা করো, সম্ভব হলে শোধরাতে প্রয়াস করো। যথেষ্টই সংগ্রাম করো, কিন্তু দেখতে পাও যে এগুলি যেখান থেকে আসছে সেখানে কোনোরকম শাসন টিকছেনা। কিন্তু যদি তুমি তোমার চেতনাকে আপন অবচেতনের মধ্যে পাঠিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখ, তাহলে অল্পে অল্পে আবিষ্কার করবে যে তোমার এই সব প্রত্যেকটি দোষের মূল উৎস কোথায়, তুমি তখন বুঝতে শুরু করবে যে তোমার বাপ মা ও তাঁদেরও বাপ মা কেমন ছিলেন, যখন কিছুতে নিজেকে বাগাতে পারছনা তখন বুঝবে, "তাঁরা এমন ছিলেন বলেই আমি এমন।"

কিন্তু তোমার চৈত্য যদি যথেষ্ট সজাগ থাকে আর তোমার দিকে নিত্য নজর রেখে তোমার জন্য রাস্তা তৈরি করে দেয়, সেই তোমার সহায় হয়ে অনেক কিছুকেই তোমার দিকে আকর্ষণ করে আনবে ; সেই তোমাকে অনেকের সঙ্গে সংস্পর্শ অনেক উপযুক্ত পুস্তক, উপযুক্ত ঘটনা সংস্থান ; যেন কোন শুভেচ্ছাকারীর মারা অনেক কিছু তোমার কাছে এসে হাজির হবে, কিছু ইঙ্গিত, কিছু সাহায্য, ঠিক পথে যাবার নির্দ্দেশ। তারপর একবার স্থির মনস্থ করলে যে সত্তার সত্যটি তোমাকে মানতেই হবে, আর প্রকৃত ঐকান্তিকতার সঙ্গে সেদিকে একবার পা বাড়ালে তখন দেখবে যে সব কিছুই একজোটে তোমার অগ্রগতিকে সাহায্য করছে। তখন লক্ষ্য করলেই জানবে কোথায় বিপত্তির মূল : "ও, এই বদ অভ্যাসটি আমার বাবার ছিল, এটা ছিল আমার মায়ের, এটা ছিল দিদিমায়ের, আমার দাদামশাই এমন ছিলেন" ; কিংবা যে ধাত্রী তোমাকে মানুষ করেছে, যে সব ভাইবোনদের সঙ্গে তুমি খেলেছ, বন্ধুদের সঙ্গে মিশেছ, সব অভ্যাসই এসেছে তাদের একজন বা অন্যজন থেকে। কিন্তু নিজে যদি তুমি ঐকান্তিক থাকো, তাহলে দেখবে যে শান্তভাবেই তুমি সেগুলিকে খণ্ডন করতে পারবে, আর নিজের চরিত্রকে যদি প্রকৃতই রূপান্তরিত করতে চাও তাহলে এই তোমাকে করতে হবে। সর্বদাই শুনি যে চরিত্র বদলানো অসম্ভব। দর্শনের গ্রন্থে এমন কি যোগের বইতেও বলে, তুমি যে চরিত্র নিয়ে জন্মেছ তা আর বদল করতে পারোনা, ঐ নিয়েই তোমাকে থাকতে হবে। এ কথা খুবই ভুল, আমি জোর করে বলছি ; কিন্তু তার জন্য যা করা চাই সেটাই খুব কঠিন, সেটা নিজের নয় কিন্তু পূর্বগামীদের চরিত্র বদলানো। তাদের চরিত্র বদলানো যায়না (কারণ তাদের নিজের তা ইচ্ছা নয়) অতএব যা বদলাবে তা নিজেরই মধ্যে। জন্মকালে উত্তরাধিকার সূত্রে যেগুলি তুমি উপহার পেয়েছ—চমৎকার উপহার—তাকেই বদলানো চাই। ওর মূলসূত্রটি যদি ধরে নিতে পারো, আর অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে লেগে থাক, তাহলে একদিন দেখবে যে তা সরে গেছে, সে বোঝা ঘাড় থেকে ফেলে তুমি জীবনের মুক্ত পথে অগ্রসর হবে। তখন তুমি নতুন মানুষ হয়ে নতুন চরিত্র নিয়ে নতুন জীবন যাপন করবে। শেষে পিছনের পানে চেয়ে তুমি বলবে, "তাই নাকি সম্ভব, আমি তো সত্যিই অমন ছিলাম না।"*

* Bulletin of S. A. I. C. E. থেকে। অনুবাদক—গণপতি ভট্টাচার্য

প্রসঙ্গত

"জ্ঞানলাভ করা যেন শিশুদের কিছু লাভের মতো ; সে যখন দেখে কিছু পেয়ে গেছে তখন তাই নিয়ে রাস্তায় নেচেকুঁদে চেঁচিয়ে বেড়ায়। কিন্তু প্রজ্ঞা তা নয়, সে তার পাওয়াকে গভীর চিন্তা ও শক্তিগর্ভ নীরবতার মধ্যে বহুদিন গোপনে রাখে।"

নীরবতা। তার কথা বুঝে বলার চেয়ে কাজে করাই ভালো। সে অভিজ্ঞতা আমার এখানেই নিলেছে, বহুদিন আগে, যা জেনেছি তা তখনই বলে বেড়ানো আর উচ্চতর জ্ঞান পেয়ে চুপ করে থাকা যাতে সে তার তলে তলে রূপান্তরের কাজ করে, এ দুইএর মধ্যে অনেক তফাৎ। এর জীবন্ত অভিজ্ঞতা—পুরো অর্ধদিনের অভিজ্ঞতা—আমি পেয়েছি, কিন্তু এখন মনে হয় সে বহু দূর পূর্বান্তের কথা, অনেক পিছনে ফেলে এসেছি।

প্রশ্ন : নীরবতার এমন কি শক্তি? উপরে উঠে গেলে বিরাট এক নীরবতার মধ্যে উপনীত হলাম, সেখানে সবই বরফের মতো জমে গেল, কিন্তু তাতে শক্তি কি থাকতে পারে? নীরবতায় কি কোনো কিছু করতে পারে?

উত্তর আগেকার লোকে সংসার থেকে সরে গিয়ে এটাই খুঁজতো। দেহকে স্থাণুবৎ অটল নিশ্চল ক'রে রেখে তারা সমাধিতে প্রবেশ করত ও সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয়ে থাকত। সন্ন্যাসী যারা জীবন্তে মাটির তলায় কবর নিয়ে থাকত তাদেরও ঠিক তাই হতো ; তারা বলত, "এখন আমার কাজ ফুরিয়েছে (সুন্দর ভাষায় বলত), আমি সমাধি নিলাম।" একটা গুহার মধ্যে ঢুকে তারা সেটা এঁটে বন্ধ করে দিত : দেহ যেতো বিলীন হয়ে, কিন্তু শান্তি তারা পেতো।

প্রশ্ন : কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, নীরবতা শক্তিগর্ভ।

উত্তর শক্তিগর্ভ, নিশ্চয়।

প্রশ্ন : কেমন করে তা হবে? কারণ নীরব হয়ে একই ভাবে আমি একটা চিরন্তন অবস্থার মধ্যে থাকব।

উত্তর : একটা চিরন্তন অবস্থা নয়, চিরন্তনের জন্য।

প্রশ্ন : তখন তো কিছুই বদলাবে না।

উত্তর না, কারণ তার অভিব্যক্তি নেই, সে নিরভিব্যক্ত। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছেন সেই নীরবতাকে এখানে নামিয়ে আনতে। সেখানেই মুশকিল। এ অক্ষমতা, মূঢ়তাকে স্বীকার করা, পাঁচ কোটি লোকের মধ্যে একজনেরও অতটা সাহসের জোর নেই।

সরে যাবার উপায় আছে লক্ষ রকম, কিন্তু থেকে যাবার উপায় মাত্র একটি, সাহস ও সচ্চাশক্তি নিয়ে সব কিছু অক্ষমতাকে মেনে চলা,—অসামর্থ্য, অবোধ্যতা, সত্যের অভাব সজ্ঞানে অনুভব করা। না মানলে এগুলি কখনই বদলাবে না। যারা চায় বড়ো হয়ে শক্তিমান ও তেজোদৃপ্ত হয়ে থাকতে তারা তাই থাক কিন্তু পৃথিবীর জন্য তারা কিছু করতে পারে না। ব্যক্তিগত অবোধ্যতা খুব সামান্য জিনিস (কিন্তু আত্মসর্বস্ব চেতনার তাতে কিছু যায় আসেনা), আসল কথা হলো সাধারণ ও সামগ্রিক অবোধ্যতা ! অর্থাৎ তুমি যা কিছু করছ তার জন্য অপমানও মেনে নিলে, ঘৃণা বিদ্রূপও হজম করলে। পৃথিবীর জ্ঞানীগুণী জনেরা বলে, তোমার দিব্যত্ব তুমি নিজেই ত্যাগ করেছ। ঠিক এ ভাবে না বললেও তারা বলে "সে কি ? তুমি বড়াই করছ যে তোমার মধ্যে দিব্যচেতনা রয়েছে, তাহলে..."। কিন্তু তুমি দেখবে যে সর্বত্রই তাই। ক্বচিৎ কখনো হয়তো মুহূর্তের জন্য কেউ হয়তো কিছু দীপ্তির বিদ্যুৎ ঝলক পায়, কিন্তু তা নিতান্তই ব্যতিক্রম,—আর "দেখিয়ে দাও তোমার কত ক্ষমতা"—এই হলো সর্বত্র।

প্রশ্ন : তাদের কাছে তাহলে ভগবানকে পৃথিবীতে আনাই হবে শক্তির সেরা পরিচয়।

উত্তর ঠিক তাই "দেখাও তোমার শক্তি, বদলাও এই জগৎকে। প্রথমত, আমি যেমন চাই তাই করো দেখি। এই হলো সব চেয়ে সেরা কথা, আমি যেমন চাইছি তেমনি হয়ে যাক—দেখাও তোমার শক্তি !" এই কথাই বরাবর বলে।

২৫-৯-১৯৬৫ শ্রীমা

শ্রীঅরবিন্দের যোগ*

সুধা বসু

২

পাশ্চাত্য মনীষীরা সমাজের প্রাক্তন কাঠামোতে খুশী নন। তাঁরা একটা সার্থকতর সমাজ গড়ে তুলতে চান, যা হবে মনস্বীর সমাজ (Society of intellectuals)। তাতে বুদ্ধিমানেরাই সমাজের কর্ণধার হবেন। আধুনিক জগতে বুদ্ধির জয়জয়কার হলেও মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিবর্তনের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। বুদ্ধির উর্ধ্বে রয়েছে বিজ্ঞান, যা যোগের ভিত্তি। আমাদের আদর্শ সমাজ হবে যোগীর সমাজ—যা যৌগিক উপায়ে সঙ্ঘশক্তির মুক্তি। ব্যক্তির জীবনের প্রতি পর্বে যেমন যোগশক্তির উন্মেষ ঘটবে, তেমনি সমাজের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তা দিয়ে উদ্ভাসিত হবে।

এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে অবলম্বন করতে হবে "ক্রিয়াযোগ"। পতঞ্জলি বলছেন অষ্টাঙ্গযোগের যে ফল, ক্রিয়াযোগেরও সেই ফল। অথচ ক্রিয়াযোগ অষ্টাঙ্গযোগের প্রাথমিক অনুশাসনের একদেশ মাত্র। পতঞ্জলি তাঁর অষ্টাঙ্গযোগে নির্বীজ সমাধিলাভের কথার পর ক্রিয়াযোগের কথা তুলেছেন। তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান হল ক্রিয়াযোগের অঙ্গ। অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশগুলিকে ক্ষয়সূক্ষ্ম (সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ) —এটি যেমন অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা সিদ্ধ হয়, তেমনি ক্রিয়াযোগের দ্বারাও হতে পারে। যোগের এই পরিচয়কে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে পূর্ণযোগে তাকে কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, সেটা বুঝতে পারলে শ্রীঅরবিন্দের যোগবৈশিষ্ট্য কি তা ধরা সহজ হবে।

শ্রীঅরবিন্দ যোগকে একটি সার্বভৌম সাধনরূপে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ যোগ চিত্তের সবভূমিতেই চলবে, এই তাঁর মত। 'নেতি নেতি' করে অপ্রাকৃত ভূমিতে উত্তিরে গিয়ে যেমন পরম পদে পৌঁছতে হবে, তেমনি আবার তাহিয়ে প্রাকৃত ভূমিতে নেমে এসে উপলব্ধ সত্যের শক্তিতে জীবনকেও রূপান্তরিত করতে হবে। জীবনের গভীরে তাকালে দেখি, প্রকৃতিতেও এই যোগ চলছে। বস্তুত প্রকৃতি মহাযোগিনী। পরম পুরুষের দিব্য ইচ্ছা, সংকল্প ও তপস্যাকে বহন করে অনন্তের পথে তিনি চিরাভিসারিণী।

সাংখ্যে ও যোগে আছে বিবিক্ত পুরুষের কথা। প্রকৃতিতে আশ্লিষ্ট পুরুষকে মুক্ত করতে হবে। বিবিক্ত পুরুষ হবেন প্রকৃতির উপদ্রষ্টা মাত্র। তা-ই হল তাঁর স্বরূপে অবস্থান। যোগাদের প্রবর্তদশায় এটা অবশ্যকরণীয়। কেননা, অপরা প্রকৃতির কবলে সম্যক্ থাকলে

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

তো যোগ হয় না। কিন্তু এটিকে চরম লক্ষ্য করে নিলে সর্বনাশ। তখন মহাপ্রকৃতি থেকে যোগজীবন বিযুক্ত হয়ে পড়ে। দুঃখের নিবৃত্তি চাই এবং তার জন্য গুহাহিত হতে হবে—এসবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু জীবনের দুঃখের জন্য আমরা প্রকৃতিকেই শুধু দায়ী করি। এতে প্রকৃতির অর্থ সঙ্কুচিত হয়ে যায়। প্রকৃতি যে শুধু দুঃখের কারণ তা নয়, দুঃখ মোচনের কারণও তিনি। আগেরটিকে যদি বলি অপরা প্রকৃতি, তাহলে পরেরটিকে বলব পরমা প্রকৃতি। সাংখ্য শুধু আগেরটিকে গ্রহণ করেছে—পরেরটিকে নয়। সাংখ্যের এই দৃষ্টির সংশোধন আছে গীতায়। ভগবান্ বলেছেন, সব প্রকৃতিই তাঁর। যেমন আছে তাঁর অপরা প্রকৃতি—যা নাকি সাংখ্যসম্মত অষ্টধা প্রকৃতি : তেমনি আছে তাঁর পরা প্রকৃতি—"যয়েদং ধার্যতে জগৎ"। তার পরেও আবার তিনি বলেছেন তাঁর স্বীয়া বা পরমা প্রকৃতির কথা, যিনি তাঁর লোকাতত ও লোকাতীত চেতনার নিত্যযুক্তা। একই প্রকৃতি, শুধু অভিব্যক্তির তারতম্য বোঝাতে তাকে বলা হচ্ছে অপরা, পরা ও পরমা। সাংখ্যযোগে অপরা থেকে বিবিক্ত হয়ে নিরোধে যাবার কথাই বলা হয়েছে। এতে অহং থেকে মুক্তি ঘটে, আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি হয়। কিন্তু এই নিম্ন প্রকৃতির বন্ধন খসলেই পুরুষের মুক্তি ঘটে পরা প্রকৃতিতে, যা জীবভূতা সনাতনী—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় **Psychic Being** বা চৈত্যসত্তা। জীবের এই চৈত্যসত্তা স্বভাবতই পুরুষে প্রপন্না এবং যোগযুক্তা। আমাদের মধ্যে তিনিই সাধনা করে চলেছেন। কাজেই দেখতে পাচ্ছি, প্রকৃতির একদিকেই যত বিড়ম্বনা। অন্যদিকে, এই অষ্টধা প্রকৃতির মধ্যেই "শুদ্ধ আমি"র বিকাশ হচ্ছে, পরমপুরুষের সঙ্গে যার মধুর সম্পর্ক। এইখানে সাংখ্যের জ্ঞানের সঙ্গে মেলে গীতার ভক্তি। ভক্তিপথের সাধকেরা জীবনকে পুরাপুরিই স্বীকার করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে ভগবানের সংস্পর্শে জীবন দিব্য হয়ে ওঠে। সেখানেও জীবন ও যোগ যে একাত্মক—এই ভাবনার আমরা উদ্দেশ পাই।

একদিকে যেমন ব্যবহারে সমত্ব আশ্রয়ের ফলে অপরা প্রকৃতি থেকে সাধকের মুক্তি ঘটবে, তেমনি তার সঙ্গে-সঙ্গেই পরা প্রকৃতির প্রপত্তি ও শরণাগতি থেকে জীবনে আসবে রসের জোগান—এটাই শ্রীঅরবিন্দের আত্মসমর্পণ যোগের (**Self-surrender**) মূল কথা। এ-জীবন তাঁরই, তাঁতেই উৎসৃষ্ট—এ-ভাবে সমর্পিত হয়ে চলা শুরু হয় পরা-প্রকৃতি উদ্বুদ্ধ হলে : তাইতে অপরা প্রকৃতিও পরিশুদ্ধ হয়। সাধকের আধারে তখন ঝলকে-ঝলকে যোগমায়ারূপিণী তাঁর স্বীয়া বা পরমা প্রকৃতির শক্তিপাত হতে থাকবে। এটাই যোগসিদ্ধি। পরমার আবেশ, পরার উন্মেষ আর অপরার রূপান্তর—এই তিনের সমন্বয়ে আত্মকৃৎ যোগী পুরুষ ক্রমে যোগের পরম ভূমিতে আরূঢ় হন।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, সাংখ্যের বিবেক দিয়ে অপরা প্রকৃতিকে প্রথমে প্রত্যাখ্যান করতেই হবে। কিন্তু পরে পরা ও পরমার শক্তিতে তার রূপান্তর ঘটে যায়। তখন একে বলতে পারি সর্বাঙ্গীণ যোগ। এই যোগে পুরুষ প্রকৃতি থেকে বিযুক্ত নন—বরং তার

সঙ্গে নিত্যযুক্ত। পুরুষ-প্রকৃতির এই যুগনদ্ধতাই তত্ত্বে শিব-শক্তির সাময়রস্য। তাকে লাভ করা পূর্ণযোগের প্রাথমিক লক্ষ্য। তার পরিপাকে সমস্ত জীবনে সেই শিব-শক্তির অদ্বৈতবোধনিবিড় সানর্ঘ্যের প্রকাশ ঘটবে। তখন জীবনে আর যোগে, প্রকৃতিতে আর পুরুষে কোনও ভেদ বা বিরোধ থাকবে না। তখনই আমরা বলতে পারব **All life is yoga.**

সমস্ত জীবনই যে যোগ—এ শুধু আরুরুক্ষু যোগীর পক্ষেই নয়, সর্বসাধারণের পক্ষেও সত্য। বস্তুত যোগের মূলে রয়েছে স্বোত্তরণের (**self-exceeding**) একটা প্রবেগ। এই প্রবেগ আছে জীবনেরও মূলে। বৃহৎ হবার এক দুর্বার আকূতি সবার মধ্যেই আছে। বাইরে তার সার্থকতার আমরা পাই অভ্যুদয়ের আদর্শ কিন্তু তাই জীবনের সবখানি নয়। আমরা যথার্থ বৃহৎ হতে পারি অন্তরেই। তাই নিঃশ্রেয়স, তা-ই পরম পুরুষার্থ। এই নিঃশ্রেয়সের রূপ হল আত্মচৈতন্যের ব্রহ্মচৈতন্যে বিস্ফারণ। বৈদিক ঋষি বলেছিলেন, 'আমার মধ্যে যে অগ্নি তাপ রূপে রয়েছেন, তাকে কুটিয়ে তুলতে হবে জ্যোতিরূপে : এবং সেই জ্যোতি এক হয়ে যাবে দ্যুলোকের অগ্নি আদিত্যের সঙ্গে। তখন যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।' আমার এই বৃহৎ হওয়াই আত্মার ব্রহ্ম হওয়া। আদিত্যের আলো, বৃহতের আবেশ—এ যদি সহজ হয়েই পাওয়া যায়, তাহলে নিরোধের কথা ওঠে না। নিরোধের ফলে কে-আত্মপ্রতিষ্ঠা, তা আবেশের দ্বারাই সিদ্ধ হতে পারে।

কিন্তু যোগজীবনে নিরোধেরও একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। অবশ্য নিরোধ, সেক্ষেত্রে লক্ষ্য নয়, সাধনাঙ্গ মাত্র। বাইরের আকাশে সহজ আনন্দে নিজেকে ছড়িয়ে দিলাম, এই হল সাধনার একটা দিক। আবার সেই আকাশকে গুটিয়ে আনলাম হৃদয়ের আকাশে, এও সাধনার আরেকটা দিক। এই হল নিরোধের বা গুহাহিত হবার রীতি। যোগ-জীবনে একেও একটা স্থান দিতে হবে। অহোরাত্রের মধ্যে একটা সময় এবং সংবৎসরেরও কিছুটা সময় একেবারে সবকিছু থেকে বিবিক্ত হয়ে নিজের মধ্যে ডুবে যেতে হবে। কবির ভাষায় একে তখন বলতে পারি—তাঁর "ছুটির নিমন্ত্রণ" বা আমাদের **Spiritual holiday**। চব্বিশ ঘন্টার অন্তত একটা ঘন্টাও চাই, যখন চিত্ত সম্পূর্ণ বিশ্রাম পাবে, সমস্ত প্রযত্ন শিথিল করে একেবারে অনন্তের মধ্যে তলিয়ে যাবে। এমনি করে তাঁর মুখো-মুখি হওয়া—এও **hour of God**, তাঁর সঙ্গে আমার মিলনের পরম লগ্ন। এরই আকূতি গূঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে অন্তরে বহন করে চলতে হবে। আমরা সব সময় কিছু কাজ করতে পারি না। অন্তত ঘুমের মধ্যেও কিছুটা বিশ্রাম চাই। এই হল প্রকৃতিতে নিরোধের স্বাভাবিক ছন্দ—কর্মে ও বিশ্রামে, জাগ্রতে ও নিদ্রায়। এই নিরোধের সময়টাকে যদি **hour of God**এ পরিণত করতে পারি, তার মধ্যে তলিয়ে যেতে পারি একেবারে শেষ-

পর্যন্ত, তাহলে চিত্তের অতল থেকে যোগশক্তিও সমৃদ্ধ হয়ে জীবনকে স্বচ্ছন্দ ও সার্থক করে তুলতে পারে।

এই সত্যকে রূপ দিতে হলে ধৃতিশক্তিতে উদ্‌যমন রাখতে হবে। hour of God এ তাঁর সঙ্গে যে নিবিড় সম্পর্ক, তার স্মৃতিকে বহন করে চলতে হবে। তবেই বহির্জীবনেও সহজ হতে পারা যাবে। এরই ইঙ্গিত পাই গীতায় ভগবানের এই উক্তিতে 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ'—তাইতে সর্বকালে আমার অনুস্মরণ কর, আর যুদ্ধও কর। ধর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনের সব ক্ষেত্রে এই অনুস্মৃতিকে যেমন বহন করে চলতে হবে, তেমনি করতে হবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও। 'বিদ্বান্'এর কথায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তিনি "যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি" অর্থাৎ সার্থক যোগীর জীবন সত্যের সব কর্মই রস যুগিয়ে চলবে। এইভাবে থাকতে পারলেই তাঁর ভিতর দিয়ে ভাগবত শক্তির একটা সহজ বিচ্ছুরণ ঘটবে এবং সর্বভূতে তা সংক্রামিত হবে। এই আত্মবিচ্ছুরণ প্রকৃতিতেও দেখতে পাচ্ছি—যেমন অগ্নির তাপে, সূর্যের তেজে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন "আমরা প্রত্যেকেই পরমা শক্তির দ্বারা আবিষ্ট এমনিতর একটা শক্তিকূট (dynamo)। এইভাবে নিজেকে জানাই সত্যকার আত্মসচেতনতা। একে অপরার বিপাক হতে মুক্ত করে পরমার আবেশে উদ্‌যমন রাখতে হবে। তা-ই ব্যষ্টিজীবনের পুরুষার্থ।

ক্রমশ আত্মসচেতনতাকে বাড়িয়ে তোলা যদি যোগের প্রধান লক্ষণ বলে ধরি, তাহলে দেখতে পাব, সমষ্টি প্রকৃতিতেও একটা যোগের ক্রিয়া চলছে। জড়প্রকৃতিতে প্রাণ ও চেতনার উন্মেষ হল প্রকৃতিপরিণামের তাৎপর্য। জড়ের অন্ধ-তমিস্রায় প্রাণ ও চেতনা সুপ্ত রয়েছে। এই অবস্থাকে বেদের ভাষায় বলা যায় 'নির্ঋতি' অর্থাৎ যেখানে আপাতদৃষ্টিতে ঋতচ্ছন্দের কোন নিশানাই নেই। আধুনিক বিজ্ঞানে এটাকেই বলে running down of matter—যার ফলে জড়ের মধ্যে এলোমেলো ভাবটা বেড়েই চলে। কিন্তু Schrödinger দেখিয়েছেন, এরই সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণের ক্রিয়া একটা ঋতচ্ছন্দ সৃষ্টি করে চলেছে। তাকে বলা যেতে পারে running up of matter এমনি করে জড়কে উপাদান ও প্রাণকে নিমিত্ত করে ঋতায়নী প্রকৃতির একটা ছন্দোলীলা নেপথ্যে চলছেই। এমন কি এও দেখা যায়, অণুপরমাণুও সৌরজগতের ছাঁদে গড়া। এই ছাঁদ ঋতেরই অভিব্যক্তি। সুতরাং প্রকৃতির সর্বত্র নির্ঋতিকে ঋতে আনার প্রয়াসে চলছে একটা সংহনন (organisation)-সৃষ্টির তপস্যা। এও এক দুর্লক্ষ্য প্রাণ ও চেতনার ক্রিয়া।

এমনি করে প্রকৃতিতে দেখা দিচ্ছে জড় অণু-পরমাণুর লীলায়ন। তারপর তার মধ্যে প্রাণের উন্মেষ এবং চেতনার বিকাশে সবার শেষে মানবের আবির্ভাব, মনোধর্ম যার বৈশিষ্ট্য। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিপরিণামের এই তিনটি পর্বকে যথাক্রমে দেহ, প্রাণ ও মন সংজ্ঞা দেওয়া যায়। প্রাণ ও চেতনাকে আমরা একই বর্ষের এপিঠ-ওপিঠ মনে করি—কেননা যেখানে প্রাণ আছে সেখানেই চেতনা আছে, যেখানে চেতনা আছে সেখানে প্রাণও আছে। তবে

কিনা, চেতনার প্রকাশের তারতম্য আছে। সর্বত্র প্রাণময় হলেও উদ্ভিদে চেতনা আচ্ছন্ন, পশুতে অস্পষ্ট, মানুষে স্পষ্ট। এই তারতম্যের ভাবটি মানুষের মধ্যে ফুটে ওঠে যথাক্রমে তার দেহে প্রাণে ও মনে। যোগের ক্রিয়া এই তিনটি পর্বের ভিতর দিয়ে চলছে, কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠছে মনেই। যোগ আত্মসচেতন মনের ধর্ম। তাইতে যোগচেতনা আদিপর্বে নেপথ্যচারী, মধ্যপর্বে সংঘর্ষে সঙ্কুল, কেবল অন্তপর্বেই স্পষ্ট।

প্রাণ একটি বিশেষ তত্ত্ব। যোগসাধনা সচেতনভাবে শুরু হয় এই প্রাণলোকে। এটি বেদের ভাষায় অন্তরিক্ষ, যেখানে আলো-আঁধারির দ্বন্দ্ব। যত সাধনসমর, সবই এই মধ্যপর্বে, প্রাণের ওঠা-নামার দোলায়। আদিপর্বে জড়শক্তি বা তমোগুণের প্রাধান্য। ব্যষ্টিজীবনে দেখতে পাওয়া যায়, আমরা অসাড়, আমাদের প্রকৃতিও আচ্ছন্ন। চেতনা দেহাশ্রিত বা দেহসর্বস্ব। কিন্তু পাঞ্চভৌতিক এই দেহে, এই জড়ের উপাদানেই জাগে প্রাণ-চৈতন্য। জড়ের কুণ্ডলীতে যদি জড়কেই শুধু দেখি, মনে হয় আয়তনে সেটাই সর্বাধিক; প্রাণ ও চেতনাকে যেন সে গ্রাস করে রেখেছে। কিন্তু এই জড়ের আধারেই তো জাগছে প্রাণচৈতন্য। স্তূপাকার ইন্ধনে একটিমাত্র অগ্নিকণার সংযোগের মত এই প্রাণস্পন্দন জাগিয়ে তোলাই তো ঐ মূঢ় মূক জড়প্রকৃতির উদ্দেশ্য। যোগের উদ্দেশ্যও তাই। মনে পড়ে, প্রশ্নোপনিষদের প্রশ্ন, "সব ঘুমিয়ে পড়লে কে জেগে থাকে?" তার উত্তর, 'প্রাণাগ্নয়ো জাগ্রতি অস্মিন্ পুরে',—এই দেহপুরে প্রাণের আগুনরাই জেগে থাকে। আদিপর্বের লক্ষ্য হচ্ছে, এই প্রাণের উন্মেষ ঘটানো। জড়প্রকৃতির সার্থকতাও তাতেই। কোটি-কোটি বর্ষ ধরে যে ভূমি বন্ধ্যা হয়েছিল, তাকে স্ফুরিত করে সে পুরুষের উন্মীলন ঘটায়। এরই উদাহরণ দেখি বেদে অগ্নিময়ের ভাবনায়, তন্ত্রের শক্তিপূজার বোধনে, সপ্তশতীর দেবীমাহাত্ম্যে।

মধ্যরাত্রের নেপথ্য থেকে অন্ধকারের বুক চিরে অগ্নিময়ের অভিযান শুরু হয়। আলোর রশ্মি ছুটে আসে গভীর অন্ধকার বা একার্ণবীকৃত অব্যক্তের মধ্য দিয়ে। উষার আলো ফুটবে, তার অনেক দেরী। এটি তার প্রস্তুতির পর্ব মাত্র। নেপথ্যের ওই আলো পুরোভাগে এলে হয় বোধন, যেমন উষার আবির্ভাবে আদিত্যদ্যুতির সূচনা। দুর্গাপূজার দেবীর বোধনও ষষ্ঠীতিথিতে, আগের পাঁচটি তিথি পার হয়ে। এই পাচদিন দেবীর আবির্ভাবের প্রস্তুতি চলে নেপথ্যে, দেবী তখন মহাকালী। তনিদ্রায় কুণ্ডলিতা যোগমায়া প্রসন্না না হলে জগৎপতি যোগনিদ্রার আবেশে শুচিয়েই থাকেন। তিনি জাগলেই বোধন এবং তাইতে অধ্যাত্মজীবনেরও সূত্রপাত। তারপরেই দেবীর শক্তিরূপে আবির্ভাব। তখন দেখতে পাই প্রবল অপশক্তির সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ। তিনি তখন মধুপানোন্মত্তা মহিষাসুর-মর্দিনী মহালক্ষ্মী, বোধনের পর তিনদিন ধরে আমরা যাঁর পূজা করি। বোধন হতে পঞ্চম দিনে বিজয়া, এটি বেদের সোমযাগেরও সুত্যাদিবস। দেবী তখন অপরাজিতা। তারপর দ্যুলোক হতে অন্তরিক্ষের প্রাণলোকে তাঁর আবির্ভাব বা শক্তিপাত। সাধনা তখন উত্তীর্ণ হয় প্রাণ থেকে মন ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে। এখান থেকেই প্রজ্ঞার সাধনা ও ধীযোগের শুরু,

যার লক্ষ্য অতিষ্ঠার (Transcendence) সঙ্গে নিত্যযোগে যুক্ত থাকা। জড় যদি হয়ে থাকে অস্তিত্বের কুমেরু, তাহলে অতিষ্ঠা তার সুমেরু। এটি স্বপ্রকাশ। মানুষের মধ্যে মনের বিকাশে এরই উদ্ভাসন আবির্ভাবের সূচনা।

*

মনের চোখ দিয়ে দেখা ও বোঝা মানুষের অভিনব এক বৈশিষ্ট্য, যা তাকে ইতর প্রাণি-জগৎ থেকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। সাধারণ প্রাণীর মত সেও ইন্দ্রিয় দিয়ে বিষয় আহরণ করে; কিন্তু ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ হয়ে সুস্পষ্টভাবে সে মননও করতে পারে স্মৃতি ও কল্পনার সহায়ে —যা পশু পারে না। মানুষের পক্ষে এমনি করে সামান্যপ্রত্যয়ের সাহায্যে ভাবনা (conceptual thinking) যে সম্ভব হয়েছে, তা প্রকৃতির ক্রমবিকাশের একটি সার্থক পর্ব। তারও পরে মানুষের মধ্যে এসেছে আত্মসচেতনতা। ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা হল ব্যবসায়। সাধারণত মনন চলে একেই আশ্রয় করে। কিন্তু তারও পরে 'কে দেখছে'? এই বোধে দ্রষ্টাকে দেখা হল অনুব্যবসায়। তখন বাইরের জগৎদর্শন পরাবর্তিত হয় আত্মদর্শনে। এবং তাইতে অন্তরাবৃত্তি ও আত্মসচেতনতায় যোগভূমির শুরু।

উপনিষদে এই ভূমিকে বিজ্ঞানভূমি বলা হয়। দেহ, প্রাণ ও মনের পরে এই বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের পর আনন্দ। এর মধ্যে প্রথম তিনটি ভূমি প্রাকৃত ও পরের দুটি ভূমি যথার্থ যোগভূমি। পাশ্চাত্য নবসমাজ গঠনের চেষ্টা আগের তিনটি ভূমি নিয়েই, শেষের দুটি ভূমি নিয়ে নয়। উপনিষদ-বর্ণিত বিজ্ঞানও আনন্দের সিদ্ধ রূপ এখনও আমাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু যোগের লক্ষ্যই হল বিজ্ঞান ও আনন্দকে অধিগত করে তাদের আলো ও শক্তিতে জীবনকে সমৃদ্ধ করা। পতঞ্জলিও চিত্তের পাঁচটি ভূমির কথা বলেছেন—মূঢ় ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত, তারপর একাগ্র ও নিরুদ্ধ। এর মধ্যে প্রথম তিনটি ভূমি যথাক্রমে প্রাকৃত দেহ, প্রাণ ও মনের আশ্রিত। পতঞ্জলির একাগ্র ও নিরুদ্ধ ভূমিই উপনিষদের বিজ্ঞান বা স্বপ্ন এবং আনন্দ বা সুষুপ্তির ভূমি। যোগের প্রারম্ভে এগুলিকে ভাল করে চিনে নিতে হয়। মূঢ় চিত্ত নিশ্চেষ্ট ও তামসিক, ক্ষিপ্ত চিত্ত চঞ্চল ও রাজসিক এবং বিক্ষিপ্ত চিত্ত সাত্ত্বিক হলেও তা শুদ্ধ নয়, তাতে মূঢ়তা ও ক্ষিপ্ততার নিশ্রণ আছে। তবু তাতে লক্ষ্য অনেকটা স্থির হয়ে এসেছে—যদিও যোগের প্রয়াস তখনও স্থায়ী হচ্ছে না, আত্মসচেতনতাও উদ্ভাসন নয়। অতএব যোগও তখন সর্বাঙ্গীণ নয়, কেননা তখন পর্যন্ত একাগ্রতার আলম্বন অনেকটা বাইরেই থেকে যাচ্ছে। চিত্ত সমাধিস্থ হতে পারে যদি নিজের গভীরে বা আত্মবোধে সমাবিষ্ট হয়। কিন্তু সমাধিস্থ থাকাই পূর্ণযোগের লক্ষ্য নয়, একথা আগেই বলা হয়েছে। একাগ্র ও নিরোধ ভূমির সমাধিজ প্রত্যয়কে আবার নামিয়ে আনতে হবে এবং সঞ্চারিত করতে হবে নীচের তিনটি ভূমিতে—মনে, প্রাণে ও দেহে। তবেই বিজ্ঞানানন্দময় পুরুষের জাগ্রত সমাধি নিয়ে সহজভাবে বিচরণ করতে কোন বাধা হবে না। এবনিতর সম্যক দৃষ্টি নিয়ে দেখলে পর বুঝতে পারব,—All life is yoga কথাটির ব্যঞ্জনা কত গভীর।

[ক্রমশ]

বর্ত্তিকা

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

এপ্রিল

বর্ষ—২৬ সংখ্যা—২

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে এপ্রিল, ১৯৬৬)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

২১শে ফেব্রুয়ারী, '৬৮	শ্রীঅরবিন্দ ৫
মাতৃবাণী	৯
মা কে	শ্রীঅরবিন্দ ১১
শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী	১৩
ছন্দ-দোল	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ২১
কঠিন ডানার ওড়া	বীরবাহু ৩২
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা ৪৫
প্রসঙ্গত	শ্রীমা ৬২
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু ৭০

বর্ত্তিকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা-শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য—১৷৷০ টাকা

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

Edited by : NOLINI KANTA GUPTA

Printed by : AMIYO RANJAN GANGULI
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

PRINTED IN INDIA

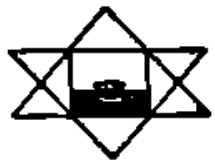

চব্বিশে এপ্রিল, ১৯৬৬

তোমাদের আমি ইতিপূর্বেই বলেছি জগতের দুরবস্থার কথা। সূক্ষ্মদর্শিদের এ বিষয়ে সাধারণ ধারণা এই যে অবস্থা যত খারাপ হয়, উপর থেকে একটা শক্তি অবতরণের কি সত্য প্রকাশের সম্ভাবনাও তত বেড়ে যায়। সাধারণ মন জানতে চাইবে—হয় তাকে বিশ্বাস করতে হয়, নয় তা অপেক্ষা করে দেখতে হয়।

তবে কথা, ভগবানের সত্য সত্যই অভিসন্ধি রয়েছে কি, একটা কিছু ঘটবে? আমার বিশ্বাস তা আছে। আমি একান্ত নিঃসন্দেহেই জানি যে অতিমানস হল একটা সত্য এবং তার আবির্ভাব অনিবার্য, জিনিষের আপন প্রকৃতি অনুসারে। প্রশ্ন শুধু কবে ও কিভাবে? এই জিনিষও স্থির করা হয়েছে, পূর্বনির্দিষ্ট হয়েছে, উপরে কোথাও থেকে; কিন্তু এই এখানে কাজটি চলে একটা লড়াইএর ভিতর দিয়ে, যেন পরস্পর-বিরোধী শক্তিসকলের নিদারুণ সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে। কারণ পার্থিব জগতে ফলটি পূর্বনির্দিষ্ট হলেও থাকে অন্তরালে, আমরা যা দেখি তা হ'ল যত সম্ভবনার ও শক্তিধারার ঘূর্ণি, যাদের প্রয়াস হ'ল একটা কিছু সিদ্ধি অর্জন, কিন্তু যেখানে সমস্তের নিয়তি আবৃত রয়েছে মানুষের দৃষ্টি থেকে। তবে এ কথা নিশ্চিত যে কতকগুলি জীবকে এখানে পাঠান হয়েছে, যাদের কাজ হ'ল জিনিষটি যাতে এখনই হয় তাই দেখা। এই হ'ল অবস্থা। তবে আমার বিশ্বাস ও সংকল্প হল এখনকার জন্যে। আমি বলছি অবশ্য মানুষী বুদ্ধির স্তর থেকে—সূক্ষ্মবোধ বিচারবুদ্ধি মিলিয়ে, বলা যেতে পারে। এর বেশি কিছু বলা হবে সীমানা পেরিয়ে যাওয়া। তুমি কি চাও আমি ভবিষ্যৎ-বাণী করি? তুমি বুদ্ধিবাদী, তুমি তা চাইতে পার না।

—শ্রীঅরবিন্দ

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬

শ্রীঅরবিন্দ

এই রকম দ্বন্দ্বের একটিই সমাধান হতে পারে—এই সব অনুভবের বাস্তব স্বীকৃতি দিয়ে, এরা পুরাতন প্রাণ-প্রকৃতির অনালোকিত গতিধারা, এই সব প্রাণের প্ররোচনা তোমাকে ঋজু পথ থেকে ঠেলে নামাবার জন্য বিরুদ্ধশক্তির প্ররোচনা বলে জেনে এদের বর্জন করে। সাধকের মন যদি এসব প্রাণিক যন্ত্রণাতে সায় দেয়, সত্তার কোনো অংশ যদি তাদের গ্রহণ বা কামনা করে, তাহলে যতদিন ওরকম চলে ততদিন সে দ্বন্দ্ব থেকে নিষ্কৃতি পায় না।

এসব প্ররোচনা খুব পরিচিত, অর্থে ও অভিব্যক্তিতে তারা বরাবর একই রকম। প্রতিক্রিয়ার ধরণও একই এবং তাদের প্রকৃতিই দেখিয়ে দেয় উৎস কোথায় তাদের—অতৃপ্ত বাসনার হতাশা, নিরুদ্যম, অতৃপ্তি, অ-সুখ, অভিযোগের ও অবিচারের বোধ, বিদ্রোহ, তামসিকতা ও জড়তার মধ্যে পতন (কারণ অহমাত্মক দাবি পূরণ না হলে প্রাণসত্তা অধ্যাত্ম প্রয়াসে অস্বীকৃতি জানায়), শুষ্কতা, নীরসতা, সাধনাভঙ্গ। একটা কথা বারংবার মাথা চাড়া দেয়,—"এ-জীবনে কোনো উৎসাহ নেই", "গণ্ডীবদ্ধতা", "বায়ুলেশহীন কক্ষ" এ-সবের মোটা অর্থ নিশ্চয় প্রাণপ্রকৃতি কিম্বা তার কোনো অংশ বিদ্রোহ করেছে, যে-ভাগবত সত্য ও তপস্যা অতিমানস রূপান্তর এনে দেবে তার বদলে অন্য কিছু চায়। অহং বাসনা আকাঙ্ক্ষা দাবি সে ছাড়তে চায় না, চায় না সত্যকার আত্মনিবেদন ও সমর্পণ, যদিও নিজের উপরে চাপ বোধ করে নিজেকে দিব্য জীবনের আধারে রূপান্তরিত করবার। এই চাপকেই সে বলে শ্বাসরোধ। বাসনার বিস্তৃতি-সাধনে অসম্মতি এবং আপনার জন্য বৃহত্তর ক্ষেত্র রচনায় অস্বীকৃতিকেই সে নাম দেয় সীমাবদ্ধতা। প্রশান্তি, পবিত্রতা, সংহত নীরবতা যা অতিমানস রূপান্তরের জন্য তপস্যার ভিত্তি—এ-সবকে সে বলে "প্রাণহীনতা"। সত্যধর্ম, অহংবর্জন এবং আত্মজয়ের উপর জোর দেওয়া এবং কামনা-বাসনা থেকে বিরত হওয়াকে সে বলে "নিশ্ছিদ্র কক্ষ"। সবচেয়ে জঘন্য প্রেরণা ও সবচেয়ে মারাত্মক প্ররোচনা আসে যখন এই দাবি ও বাসনা অধ্যাত্মের ছদ্মবেশ ধরে ও সাধকের মনে তা যোগের অঙ্গ বলেই প্রতীতি জন্মায়।

নিশ্চয় প্রাণিক প্রকৃতির কবল থেকে নিষ্কৃতির একটিমাত্রই পথ আছে। তা হল সর্বতোভাবে বর্জন করা অহমাত্মক প্রাণের সকল দাবি, কামনা-বাসনা এবং অতৃপ্ত প্রাণপ্রবৃত্তির স্থলে চৈত্যিক আত্মশুদ্ধায় নির্মলতা আনা। প্রাণের ক্ষুধার পরিতৃপ্তি নয়, আবার বৈরাগ্যের

প্রত্যাহারও যথার্থ সমাধান নয়, বরং প্রাণসত্তার আত্মসমর্পণ ভগবানের কাছে, যে পরম সত্যে দাবি-দাওয়া পৌঁছাতে পারে না তার দিকে অনন্যমনা আত্মনিয়োগ। পরম সত্যের প্রকৃতি হল জ্যোতি ও আনন্দ, এবং যেখানে কামনা বাসনা সেখানে আনন্দের স্থান নেই।

প্রাণের দাবিদাওয়া নয় কিন্তু হৃদ্‌পুরুষের প্রবেগই সত্তাকে অতিমানস রূপান্তরের দিকে নিয়ে যেতে পারে : একমাত্র সে-ই মন-প্রাণকে বদলাতে পারে এবং তাদের দেখাতে পারে তাদের নিজস্ব সত্যাশ্রয়ী গতিবৃত্তি। তবে প্রতিনিয়ত প্রাণিক দাবিদাওয়াকেই চৈত্যিক আস্পৃহা বলে ধরা হয়, যদিও পার্থক্যটি পরিষ্কার। চৈত্যিক আস্পৃহাতে এরকম কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না, কোনো বিদ্রোহ নেই, বিদ্রোহের কোনো সমর্থন নেই : যেহেতু চৈত্যের আস্পৃহা রয়েছে ভগবানের সঙ্গে আন্তর সংযোগের এবং আত্মসমর্পণের ভিত্তর দিয়ে। সে তর্ক তোলে না, ঝগড়া করে না, বরং ভাগবত ইচ্ছার সঙ্গে মিলনের জন্য চেষ্টা করে বুঝতে। সে চায় না ব্যক্তিগত ছোটোখাট তৃপ্তি, নিজের তৃপ্তি সে পায় সত্তার মধ্যে পরম সত্যের স্ফূর্তিতে : যা সে খোঁজে ও পায় তা কোনো প্রাণিক বা শারীর কামনার চরিতার্থতা নয়, তা হল সেই প্রকৃত সান্নিধ্য যার অর্থ হৃদয়ে ভগবানের নিত্য স্থিতি এবং সমগ্র সত্তায় ভগবানের শাসন। চৈত্যের ভাষা সর্বদা হল, 'সত্যের বিজয় হোক, তোমার ইচ্ছাই সফল হোক, আমার নয়।' কিন্তু প্রাণের দাবি হল ঠিক এর বিপরীত : ভগবানকে সে বলে, 'আমার ইচ্ছাই সফল হোক : আমার আদেশ মান, আমার বাসনা পূর্ণ কর, তাহলেই তোমাকে চাইব ও স্বীকার করব, কেবল তাহলেই তোমার মধ্যে আমি ভগবানকে দেখতে রাজী।' বলা নিষ্প্রয়োজন কোনটি সত্যের পথ আর কোনটি প্রকৃতির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তার আসল সমাধানের।

একটিমাত্র সৃষ্টির অবকাশ এখানে আছে, তা হল অতিমানস সৃষ্টির, পৃথিবীর উপর ভাগবত সত্য নামিয়ে আনা, শুধু মনে এবং প্রাণে নয়, শরীর এবং জড়ে পর্যন্ত। তার লক্ষ্য নয় অহং প্রসারের পথে সকল 'সীমা' অপসারণ কিম্বা মানুষী মনের ও অহংনির্ভর প্রাণশক্তির চরিতার্থতার জন্য অবাধ ক্ষেত্র ও নিঃসীম আবাস রচনা। এখানে 'যা-খুশি' করতে কেউ আমরা আসিনি, কিম্বা তৈরি করতে চাইনা এমন একটা জগৎ যেখানে অন্তত যা খুশি করে যেতে পারি ; আমরা এখানে এসেছি ভগবৎ ইচ্ছা পূরণ করতে এবং এমন জগৎ তৈরি করতে যেখানে ভগবৎ ইচ্ছা তার সেই সত্যকে প্রকাশ করতে পারে যা মানুষী অজ্ঞতায় বিকৃত কিম্বা প্রাণিক বাসনায় দূষিত ও প্রমাদকল্পিত নয়। অতিমানস যোগের সাধককে যে কাজ করতে হবে তা তার নিজের ব্যবস্থায় নিজের কাজ নয়,সে-কাজ ভগবানের নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় ভগবানেরই কাজ। আমাদের যোগ আমাদের জন্য নয়, ভগবানের জন্য। নিজের ব্যক্তিগত তুষ্টি নয়, সকল বন্ধন সকল সীমানা ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত অহংয়ের প্রকাশ নয়, ভগবানেরই প্রকাশ। সেই প্রকাশের পরিণাম ও অঙ্গ হবে আমাদের ব্যক্তিগত মুক্তি, পূর্ণতা, সমৃদ্ধি, কিন্তু কোনো অহমিকাত্মক অর্থে নয় কিম্বা অহংবদ্ধ ও স্বার্থগত উদ্দেশ্যে নয়। সৃষ্টির এই তাৎপর্যের উপর জোর দিচ্ছি কারণ এই সহজ ও আসল সত্যটির নিরবচ্ছিন্ন বিস্মৃতি, এ-সম্বন্ধে ইচ্ছাকৃত,

অর্ধ-ইচ্ছাকৃত বা অজ্ঞতাপূর্ণ একটা চিন্তাবিভ্রাট এখানে অনেকের সাধনা যে নষ্ট হয় অধিকাংশ বিদ্রোহ যে ঘটে এবং ব্যাপকক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ কাজটি ও আধ্যাত্মিক আবহাওয়াটি বিক্ষুব্ধ হয় তার মূলে রয়েছে।

অতিমানস সৃষ্টি, যেহেতু তা হবে পৃথিবীর উপরে সৃষ্টি, শুধু একটা আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনই হবে না, হবে স্থূল বাহ্যিক প্রকাশও। কাজের এই অঙ্গের জন্য, কঠিনতম অংশের জন্য আত্মসমর্পণ সবচেয়ে প্রয়োজন; এই হেতু একমাত্র অতিমানস ভগবানের জড়ের মধ্যে কার্যত অবতরণ এবং ভাগবত উপস্থিতি ও ভাগবতী শক্তির ক্রিয়াই স্থূল ও শারীর পরিবর্তনটি ঘটাতে পারে। মানুষী ইচ্ছাশক্তি ও প্রয়াসের প্রবলতম আত্মপ্রকাশও এটি ঘটাতে অসমর্থ; অহমাত্মক একগুঁয়েমি এবং প্রাণবাসনাত্মক বিদ্রোহ, এরা যতদিন বলবৎ থাকে ততদিন ঊর্ধ্বের অবতরণে অলঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক হয়। শুধু চৈত্যিক আস্পৃহাপূর্ণ শান্ত শুদ্ধ আত্মসমর্পিত শারীর চেতনাই এর ক্ষেত্র হতে পারে; কেবল এটিই শারীর চেতনায় সূচনা আনতে পারে জ্যোতি ও শক্তির দিকে উন্মীলনের, অতিমানস রূপান্তর করে তুলতে পারে বাস্তব ও সম্ভাব্য। এই উদ্দেশ্যেই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি এবং এই উদ্দেশ্যেই আমাদের পাশে তুমি ও অন্য সাধকরা মিলিত হয়েছো। কিন্তু বাহ্যক্ষেত্রে ক্ষুদ্র দাবি ও তৃপ্তির উপর জোর দিয়ে, প্রাণসত্তার একটা স্থূল নৈকট্যপ্রিয়তা ও তার গর্ব ও বাসনার ধুয়া ধরে এখানে ভগবানের সঙ্গে সঠিক সম্বন্ধ লাভ হয় না। যদি ওখানেই সিদ্ধি চাও তবে তোমাকে খুঁজতে হবে আসল সান্নিধ্য, তোমার শারীর চেতনায় মায়ের অবতরণ ও উপস্থিতি, শারীর সত্তা ও তার ক্রিয়াকর্মে নিরন্তর আন্তর স্পর্শ, তার যাবতীয় ক্রিয়া চিন্তা গতির পিছনে তাঁরই চিন্তা ও জ্ঞান, সেই উপস্থিতির চিরস্থির আনন্দ যা সকল প্রাণিক ও শারীরিক দূরত্ব, কামনা বাসনা দূর করে দেয়। তা যদি পাও তবে ঈপ্সিত সব সান্নিধ্যই তুমি পেয়ে গেলে, বাকীটুকু সানন্দে ছেড়ে দেবে মায়ের জ্ঞানের বিচারের উপর। নিজের মধ্যে এইটি এলে তোমার ভিতরে আর বোধ হবে না তোমাকে ঠেলে রাখা হল, ব্যবধান ও দূরত্ব রয়েছে, কিম্বা নালিশ উঠবে না ঐক্যের অভাব এবং শুষ্ক শূন্যতা ও অসান্নিধ্য নিয়ে।

মন ও প্রাণসত্তার দীর্ঘ প্রস্তুতির পরে এমন একটা সময় আসে যখন শারীর সত্তাকেও খুলে ধরতে হয়। তবে তা যখন ঘটে তখন প্রায়শ প্রাণিক উল্লাস—নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্তরে তা খুবই তীব্র হতে পারে—নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে এবং বিষুকর স্থূল ও একান্ত জড় চেতনা তাদের অসংস্কৃত তামসিকতা নিয়ে দেখা দেয়। আলস্য, তামসিকতা, মূঢ়তা, সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা, উন্নতিতে অসামর্থ্য, সন্দেহ, নিষ্প্রণতা, নীরসতা, প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার নিরন্তর বিস্মৃতি, হল অশুদ্ধ পার্থিব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য—তাকে যখন প্রাণ ঠেলে চলেনা বা উচ্চতর মানস ইচ্ছা ও বুদ্ধি ধরে থাকে না। তোমার ক্ষেত্রে আপাতত যা ঘটেছে তা কতকাংশে এই রকম, তবে উদ্ধারের রাস্তা পাওয়া যায় না, বিদ্রোহ ও সোরগোলে স্থূলাধারকে

উত্তেজিত করে, অবসন্ন ও নাকে দোষারোপ করে,—তাতে শুধুই অবসন্ন আরো সঙ্গীন হবে এবং তামসিকতা, নিষ্প্রাণতা, আলস্য বাড়বে,—রাত্রা হল বুঝতে পারা যে এখানে বিশ্ব-প্রকৃতির একটি উপাদান তোমার মধ্যে প্রতিফলিত, সেটি তোমাকে বর্জন করতে হবে। তা করা যায় আরো আত্মসমর্পণ ও আস্পৃহা বাড়িয়ে এবং ফলস্বরূপ প্রাণমনের ওপার থেকে দিব্যের শান্তি জ্যোতি শক্তি সান্নিধ্য এনে। জড়প্রকৃতির রূপান্তর ও সিদ্ধির এই একমাত্র রাস্তা।

—•—

মাতৃবাণী

প্রশ্ন—ভগবানকে ভালবাসব কি রকমে? তাঁকে ত কখন আমি দেখিনি, তিনি ত কখনও আমার সঙ্গে কথা বলেননি?

উত্তর—আমরা যা কেবল দেখি বা শুনি তাকেই যে শুধু ভালবাসি তা নয়। সকলেই ভালবাসে সেই ভালবাসা যা সকল রূপের ও শব্দের ভিতর দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে আর সেই ভালবাসাই হল পূর্ণতম প্রিয়তম যা হল ভগবানের ভালবাসা।

সত্যকে ধরে থাক।

এস, সত্যের সেবা করি।

যদি তুমি সত্যসত্যই সত্যের সেবা করতে চাও তবে তুমি সত্যকে জানতেও পারবে।

প্রথমেই বিশ্বাস, পরে জ্ঞান।

সত্য কোন বাহ্য রূপের উপর নির্ভর করেনা, সকল কু-ভাব আর বাধা সত্বেও তার প্রকাশ হবে।

আপন চেতনায় যে সদ্ভাব বহন করে তার কাছে সর্ব্বত্র প্রকাশ পায় যে সচ্চিদ্‌ভা সকল বস্তুর মধ্যেই নিহিত।

নিজে যে সুখ তুমি গ্রহণ কর তার চেয়ে বেশি সুখ রয়েছে যে সুখ তুমি অপরকে দান কর তার মধ্যে।

অর্থ অর্থ-উপার্জ্জনের জন্য নয়। অর্থের সার্থকতা নূতন সৃষ্টির আগমনীর জন্য পৃথিবীকে প্রস্তুত করায়।

সহ্য করে চল—তোমার জয় হবে।

জয় তারই, যে সহ্য করতে পারে সবচেয়ে বেশি। ভগবৎ-করুণা ভগবৎ-প্রেমের কল্যাণে কিছুই অসম্ভব নয়।

আমার শক্তি আমার স্নেহ তোমার সঙ্গেই রয়েছে।

তোমাদের সকলকেই বহুপূর্বেই বলেছি যে তোমরা কখনও ভাববে না তোমরা মেয়ে কি ছেলে—তোমরা হলে মানুষ, সকলের সমান চেষ্টা হল ভগবানকে লাভ করা, ভগবান হয়ে ওঠা, ভগবানকে প্রকাশ করা।

মা কে

শ্রীঅরবিন্দ

(৩)

তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য গভীর সুখ এক ; হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে অনুভব করা অর্থ সারা জীবনকে পরম আনন্দে, এক অত্যাশ্চর্য্যে পরিণত করা।

যেখানেই তাঁর অপরূপ দৃষ্টি তিনি নিবদ্ধ করেন কিংবা তাঁর হাস্যের মাধুর্য্য ঢেলে দেন, অন্তরাত্মা সেখানে মোহিত হয়, বন্দী হয়, ডুবে যায় এক অতল আনন্দের গভীরে।

তাঁর হাতের স্পর্শ যাদুকর, তাদের অদৃশ্য সূক্ষ্ম প্রভাবে মন-প্রাণ-দেহ পরিশুদ্ধ পরিমার্জিত হয়ে ওঠে।

যেখানে তিনি তাঁর পদভার স্থাপন করেন সেখানেই প্রবাহিত হয় সম্মোহনী আনন্দের অপরূপ প্রবাহধারা।

যেখানে প্রেম নাই, সৌন্দর্য্য নাই অথবা তারা যেখানে আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছুক সেখানে তিনি এসে উপস্থিত হন না।

কৃচ্ছ্র তপস্যার রিক্ততা ও কঠোরতা কিংবা হৃদয়ের গভীরতর প্রবেগসকল নিগ্রহ করা অথবা অন্তরাত্মার কি জীবন-ধারার সৌন্দর্য্যময় দিকটি নিপীড়ন করা তাঁকে সন্তুষ্ট দেয় না।

প্রেমের আশ্রয়ে সৌন্দর্য্যের আশ্রয়ে তিনি মানুষকে পরিয়ে দেন ভগবানের শৃঙ্খল।

তাঁর সৃষ্টিনাধারো জীবনকে তিনি একখানা স্বর্গীয় শিল্প-রচনায় পরিণত করেন, পার্থিব আয়ুকে পরিণত করেন একখানি পুণ্য পুলকের কাব্যে।

হৃদয়ের মধ্যে যখন তাঁর আসন করে দেই আমরা, তখন জ্ঞানকে তিনি তুলে ধরেন পরমানন্দের শিখরে, ব্যক্ত করে ধরেন মনের অগোচর মহাজ্ঞানের গহন গুপ্ত তথ্যসব।

তাঁর দৃষ্টিতে অতিক্ষুদ্র বা আপাতঃ তুচ্ছ কিছু নাই।

অবহেলা, অমনোযোগ, আলস্য থেকে তিনি দূরে সরে যান।

সম্পূর্ণ সম্পূর্ণতার ন্যূনতম কিছু তাঁকে সন্তুষ্ট করে না, অনন্তকাল ধরে পরিশ্রমের পক্ষপাতী স্বয়ং তিনি, যদি তাঁর সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করে তোলবার জন্য তার প্রয়োজন হয়।

দ্বিমুখী মনকে তিনি সহ্য করেন না। তাঁর কৌতুকের হাসি নির্দয়ভাবে ব্যক্ত করে যত নাটকীয়তা, অভিনয়-বিলাস, আত্ম-প্রবঞ্চনা আর কপটতা।

সতর্ক থাকবে, তোমার ক্ষুদ্র পার্থিব মন দিয়ে ভাগবতী জননীকে বুঝতে বিচার করতে চেষ্টা করবে না।

শিশুকাল থেকেই যা ছিলেন মানুষী ভাবের উর্ধ্বে অন্তরে অন্তরে।

সাধনায় উন্নতি না হ'লেও মায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ থাকতে পারে।

সৌন্দর্য্যকে আধ্যাত্মিকতার, ভাগবতজীবনের অঙ্গ বলেই মা বিশ্বাস করেন।

মায়ের বিশ্বাস এই যে জীবন্ত সত্তার মত স্থূল বস্তুদেরও অন্তস্তলে রয়েছে ভাগবত চেতনা। *

---

* মূল ইংরাজী শ্রীমাধব পণ্ডিতের সংকলন

শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী

তৃতীয় পর্ব্ব

অনুপতি দেশ ও কাল অতিক্রম করে এসেছেন, বিশ্বের মধ্যে তাঁর অনুসন্ধান শেষ হয়েছে। জগৎ ভগবানের প্রকাশ বটে কিন্তু চেতনার তৃষ্ণা তাতে মেটে না। ভগবান সেখানে লুকিয়ে আছেন তাঁর নিজের কর্ম্মের পিছনে, পিছনে কি বস্তু রয়েছে অনুপতি এখনও ঠিক জানেন না, তবুও তাঁর চেতনা চলেছে সেই দিকে।

অনুপতির চোখে সৃষ্টি লোপ পেয়ে গেল। প্রথমে একটা রহস্যময় উপস্থিত যেখানে সব জিজ্ঞাসা আকাঙ্ক্ষা নির্ব্বাপিত, রয়েছে সেখানে এমন এক অদ্বিতীয় সৎ তার কাছে পৌঁছিতে হ'লে সব কিছু পিছনে ফেলে আসতে হবে।

"আপনার কাছে সে আপনি শুধু সত্তা...
অসীম অনন্ত অচিন্ত্য নিঃসঙ্গ—"

কিন্তু অন্তরাত্মা যখন পৌঁছেছে গিয়ে এই সঙ্গহীন নিশ্চলতার মধ্যে, পরমাত্মার এই সীমাহীন নীরবতার মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছে একাত্মতার আনন্দে, তখন যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তার যে ব্রত, তার যে শক্তি, অন্তরাত্মা কি করেছে সে সব নিয়ে?

"চিরন্তন বাণি শুধু এগিয়ে এসেছে
কিন্তু প্রেমের চিরন্তন অগ্নি কোথায়...
কোথায় মূর্ত্ত ওঙ্কার, পরম শীকৃতির বাণী কোথায়—
কোথায় আনন্দের আর প্রশান্তির সেতু
কোথায় সেই হাসি যা জীবনের রস,
কোথায় সোনার শিখর সব।"

অনুপতি উপনীত এখন সত্তার অন্তিম প্রান্তে। পরাৎপর হতে আনন্দের নির্ঝর নেমে আসছে পথ করে নিয়েছে তার হৃদয়-গহ্বর অবধি। চেতনায় এক শক্তি প্রকট, বিশ্ব-জননীর শক্তি, উভয় লোকের সেতু—

"অরূপ আর রূপ, তারই মধ্যে সংযুক্ত হয়েছে,
অসীমেরও ওপারে চলে গিয়েছে এক দৃষ্টি
কার আননে ফুটে উঠেছে প্রাচুর্য্যপূর্ণ অনন্ত—"

অনুপতি এখন বুঝতে পারলেন তাঁর জীবনের সত্তাকার হেতু। এতকাল তিনি কেবল ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এসেছেন, এখন তাঁকে রূপান্তরিত হতে হবে এই আনন্দকে শরীরী করবার

জন্যে, এই সুষমাকে, এই মহত্বকে আধারে মূর্ত্ত করার জন্যে। তবে মানুষীশক্তির আর কোন সামর্থ্য নেই, একমাত্র গতি তার একটা বিপুল আত্মদান, এই সর্ত্তেই যেন তার সমগ্র সত্তার মধ্যে নেমে আসতে পারে এই দিব্য সান্নিধ্য, এই দিব্যশক্তি। অশ্বপতি আবাহন করলেন এমন শক্তি এক, পৃথিবীতে কখনও যা প্রকট হয়নি।

সব সীমানা তাঁর হারিয়ে গেল এখন, অনন্তের সব প্রস্থানে সে সম্মিলিত, দেখলেন সেখানে সৃষ্টি নূতন করে রূপ নিয়েছে, তাঁর দিব্য সম্ভাবনা সব বাস্তব করে তুলেছে; বুকের মধ্যে প্রশান্তিত হয়ে চললো একটা জীবন্ত একত্ব,—সাগর যেন তার নিজের গভীরতা নিজে মাপ করে চলছে। তাঁর মধ্যে এখন দুটি সত্য স্থান পেয়েছে—একটি হল ঊর্দ্ধে মুক্ত বিশাল, আর একটি তীব্র, নিবিড় এখানকার সঙ্গেই সংযুক্ত। দুয়ের মধ্যে চাই একটি বন্ধন দুই জগৎকেই মিলিয়ে ধরবে।

তারপর এল এক অজানা স্পর্শ, দীর্ঘ স্পর্শ, প্রতি তন্ত্রী তার শিহরিত হয়ে উঠলো, এক হৃদয় তার হৃদয়ের সন্নিকটে এল, একটা অলৌকিক আকার তার আকারকে ঘিরে ধরল—নীরবতার নিবিড় ঘনত্ব ভেঙ্গে গেল, তার আরাধ্য দেবতা তার মধ্যে স্থান পেল।

"এক মহিমাময় মূর্ত্তি প্রকট হল
আগুনের মত শুদ্ধ তার দেহ, আকাশে গড়া অনকদাম
ওষ্ঠাধরে স্ফুরিত অমর বাণী
প্রশান্ত দুটি নয়ন, সীমাহীন চিন্তার আধার
দৃষ্টি মিলিয়েছে মানুষেরই দৃষ্টির সঙ্গে, দেখছে দেবতার আবির্ভাব।"

এক সমুচ্চ কণ্ঠ হৃদয়ের গোপন কক্ষে বলে উঠল : "তুমি যা লাভ করেছ তা তোমারই, তবে মানুষের জন্যে তুমি তা চাও কেন? মানুষের হৃদয় যে মূক! আমি যে বিপদ আনি, আমি যে আনন্দ নিয়ে আসি, তা অপরিসীম। ঊর্দ্ধের অদম্য অবতরণ অকালে আহ্বান করবে না। সর্ব্বজ্ঞ মহাশক্তিকে ছেড়ে দাও ধীরে ধীরে তাঁর নিজের পথ করে নিতে। ফিরে যাও মানুষের মধ্যে, তাদের সাহায্য কর তোমার একার মহাসাধনা দিয়ে"—

"তোমার যে সমুচ্চ আত্মা তার অনুগত হও
সৃষ্টি কর, সহ্য করে চল
কালের দীর্ঘ অন্তহীন কর্ম্মের সঙ্গে মিলিয়ে
ধর তোমার কর্ম্মকে।"

কিন্তু অশ্বপতির প্রার্থনা :

"কতকাল আমাদের অন্তঃপুরুষ রাত্রির সঙ্গে
যুদ্ধ করে চলবে?
একটা মৃত্যুহীন শক্তির দাস আমরা? ..."
"যে জ্ঞানময় জ্যোতির্ময় বিশ্বের জননী...

আর বিলম্ব কর না, প্রসারিত করে দাও তোমার
রূপান্তরকারী করকমল...
পৃথিবীর উপর পাঠিয়ে দাও তোমারই আপনার
জীবন্ত মূর্তি এক
এক অল্প সঞ্চালনে সমগ্র ভবিষ্যকাল পরিবর্ত্তিত করে দাও।"

এই আকূতি প্রথমে মনে হল যেন নিপতিত হল গিয়ে রজনীর অন্ধকার গহ্বরে, তারপর বাণী এক উঠল পূর্ণ সম্মতি নিয়ে :

"হে বীর পুরোধা, তোমার কণ্ঠ আমি শুনেছি
একজন অবতরণ করবে, বিধানের লৌহ-শৃঙ্খল
সে ভেঙে ফেলবে...
পরাজ্ঞান ধারণ করবে সে বিজয়ীর হাতে তরবারির মত,
তার দৃষ্টির ভিতর দিয়ে শাশ্বতের আপন আনন্দ দৃষ্টিপাত করবে,
নিয়তি পরিবর্ত্তিত হবে অপরিবর্ত্তনীয় সংকল্পের বশে।"

দ্বিতীয় খণ্ড

চতুর্থ পর্ব্ব

পৃথিবীর উপর ফিরে এলেন অশ্বপতি ; নিত্যকাল চলেছে সে সূর্য্যের অনুগমন করে, ঋতুর পর ঋতু অনুসরণ করে চলেছে, শেষে বসন্তের উৎসবে পরিপূর্ণ হল আশ্বাসবাণী : নেমে এলো এক চিন্ময় সত্তা, সব কিছুর ওপর বুলিয়ে দিল তার মহান্ প্রশান্ত দৃষ্টি। জন্ম নিল সাবিত্রী।

স্বয়ং রাজাও চিনে নিতে পারেননি তাঁর কন্যার স্বরূপ। কিন্তু এক স্বচ্ছ প্রসন্ন প্রভাতে তাঁর সাক্ষাৎ উপলব্ধি হ'ল সাবিত্রীর পশ্চাতে অজ্ঞাত এক মহান্ সত্তা। সাবিত্রী অন্তরে বহন করে এনেছে যে বাণী তার পরিচয় গ্রহণ করতে হবে। রাজা তাই সাবিত্রীকে দিলেন পরিব্রজনের নির্দ্দেশ। তাঁর কথায় সাবিত্রী উঠে চলল সেই পথে যেখানে অনিবার্য্যভাবে নিজের কাছে তার উদ্ঘাটিত হলো নিজের স্বরূপ আর কোন ব্রত তাকে উদ্যাপন করতে হবে।

পঞ্চম পর্ব্ব

সাবিত্রী অনুসরণ করে চলল একান্ত হতে আরও একান্তের পথ ; অবশেষে পৌঁছিল গিয়ে এক বনপ্রান্তে যেখানে তাকে অভিনন্দিত করল মূর্ত্ত শাশ্বত প্রেম। সম্মুখে অকস্মাৎ দেখতে পেল দাঁড়িয়ে এক ছায়ামূর্ত্তি দেবীর হাতে অসির মত ঋজু ও আত্মপ্রতিষ্ঠ। সত্যবান ও সাবিত্রী আবিষ্কার করল পরস্পরকে, উভয়েই উভয়ের মধ্যে দেখতে পেল আপন আপন পূর্ণতা, পরস্পরের কাছে করল তারা আত্মনিবেদন।

ষষ্ঠ পর্ব্ব

সাবিত্রী ফিরে এল রাজার সভায় ; তাঁকে জানাল আপন স্বয়ম্বরের কথা। দেবর্ষি নারদ কিন্তু দেখতে পেলেন সত্যবানের ভাগ্যে রয়েছে যে ধ্রুনিয়তি, তবে নির্ব্বাক হয়ে রইলেন তিনি। কিন্তু রাণীর অনুরোধে উপরোধে আর ইতস্তত: করতে পারলেন না এবং সব কথা বলবার জন্য প্রস্তুত হলেন। প্রথমে তিনি উত্থাপন করলেন দু:খের সমস্যা। এই সমস্যা যে সমাধান করতে চায় তাকে বরণ করতে হবে দু:খ এবং যাতে সে পরীক্ষা পূর্ণ সার্থক হয় সেজন্য সাবিত্রীকে তার সম্মুখীন হতে হবে, সাক্ষাৎভাবে, সজ্ঞানে।

দু:খ স্বয়ংসিদ্ধ লক্ষ্য নয় ; সূর্য্যকিরণ-উদ্ভাসিত পথ একটা আছে, সে পথ খুলে যায় একটা বৃহত্তর শক্তির একটা বিপুলতর জ্যোতির আত্মপ্রতিষ্ঠায় ফলে, এ পথ যে খুলে ধরবে তাকেও প্রতি পদক্ষেপে স্বীকার করে নিতে হবে তার দাবী। আর এই ব্রতে সিদ্ধিলাভ হতে পারে কেবল একক নি:সঙ্গতার মধ্যে, কারণ নি:সঙ্গতার মধ্যেই অন্তরাত্মা লাভ করে তার আপন পরিমাপ। নারদ তাই রাণীকে বললেন উদ্দীপনাময় কণ্ঠে

"একদিন আসবে হয়তো একা সহায়হীন তাকে দাঁড়াতে হবে
নিয়তির এক সংকটপ্রান্তে, বিশ্বের নিয়তি তার আপনার নিয়তি ;
মৃত্যুর সম্মুখে একাকী প্রলয়ের কিনারায় তাকে একা পার হয়ে যেতে হবে
মহাকালের ভীতিময় সেতুর উপর দিয়ে
একা তাকে জয় করতে হবে অথবা একা তার পতন
স্বর্গের কাছে ভিক্ষা করনা, একা সে রক্ষা করতে পারে
মহারাণী, নিদারুণ সে রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে যাও তুমি।"

সপ্তম পর্ব্ব

নিয়তির লেখা ফলতে চলল। সাবিত্রী আবার ফিরে গেল বনের মধ্যে। সত্যবানের সঙ্গে কিছুকাল বাস করল। তার জীবনের একমাত্র হেতু পরস্পরের প্রেম কিন্তু

এ অবসর স্থায়ী হলনা। বর্ষা যখন এগিয়ে এল, বনভূমিকে মন্ত্রিত করে তুলল, তার অন্তরও ভরে উঠল জগতের ব্যথায়। কঠোর নিয়তি সম্মুখে তার, একমাত্র সে-ই তা জানে। হৃদয়-বেদনা তার দাবী নিয়ে এল, কালের স্রোতে সে ভেসে চলল স্থির প্রতিমার মত। নিভৃত এক কণ্ঠ তখন তার অন্তরে বলে চলল :

"এই বধির পৃথিবীর উপর কেন এলে তুমি...
অসহায় বুকের মধ্যে বেদনাকে লালন-পোষণ করবার জন্য
অথবা, তোমার কঠিন অশ্রু দ্বারা মরনে আহ্বান করতে
তোমার নিয়তিকে ?
হে অমর আত্মা, জেগে ওঠ তুমি, জয় কর কাল আর মৃত্যু"

নীরব সাবিত্রীর হৃদয়, নিজেকে সে বুঝে দিল—তার মধ্যে আবির্ভূত এক শক্তির সম্মুখে। সাবিত্রীর শুরু হ'ল সজ্ঞান সাধনা। নবাবির্ভাব তাকে নির্দেশ দিল তার অন্তরাত্মাকে প্রথমে আবিষ্কার করতে।

"খোলো ভগবানের দুয়ার, তাঁর আত্মসমাধির মধ্যে গিয়ে প্রবেশ কর
দূর করে দাও চিন্তা যত, আলোর ঐ অলীক প্রতিধ্বনি
তাঁরই বিপুল স্তব্ধতার মাঝে স্তব্ধ করে দাও তোমার মস্তিষ্ক
তাঁর বিপুল সত্যকে অন্তরে জাগ্রত করো, জানো তাকে
দেখ তাকে।"

স্বপ্নে তবে সাবিত্রীর কাছে ব্যক্ত হল বিশ্বের সমস্ত অতীত ; আদিকালের আবহ্য বিবর্তন-ধারার সমস্ত সোপানাবলী যার শেষ হবে সেইদিন যেদিন মানুষের অন্তর-গুহায় নিহিত অন্তরাত্মা বের হয়ে আসবে, স্নান করে নেবে অবগুণ্ঠনমুক্ত হয়ে প্রকৃতির সম্মুখভাগে। কিন্তু তার আগে সাবিত্রীকে সচেতন হতে হবে তার নিম্নতন প্রকৃতির সকল স্তরাবলী সম্বন্ধে। একটা বন্ধকক্ষ দুয়ার ঠেলে খুলল সে, আপন গভীরে প্রবেশ করল সূক্ষ্মতর লোকে সব, দেহ চেতনার ভিতর দিয়ে পথ করে নিল অন্তরাত্মার অভিমুখে। প্রথমে সে এসে পড়ল একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে, তার পিছনে দেখল নিম্নতর প্রাণলোক কিন্তু সেটি ত্বরিতপদে সে পার হয়ে গেল, এড়িয়ে গেল স্থূল (দেহগত) মনের উৎপীড়ন সব। তারপর এল প্রকৃত প্রাণলোক, দাঁড়াল তার নিদারুণ শক্তি নিয়ে। সাবিত্রী তাকেও অতিক্রম করে চলে গেল, উপস্থিত হ'ল গিয়ে বুদ্ধি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার জগতে। কিন্তু এ-লোকও সাবিত্রীকে ধরে রাখতে পারল না। তারপর সাবিত্রী দেখল, সে একটা পথে উঠেছে যেখানে ঊর্দ্ধতন জগতের পথচারী চলছে সব। এ হল অন্তর্জ্ঞানের, অন্তর্ভাবের বাহিনী সব যারা নেমে চলেছে নিম্নতর লোক সব অনুপ্রাণিত করবার জন্য। সাবিত্রী আরো উঠে চলল নিঃসঙ্গ হতে আরও নিঃসঙ্গতর একটা সঙ্কীর্ণ পথ ধরে। সাবিত্রী এসে পৌঁছল তার অন্তরাত্মার সান্নীধ্যে।

সাবিত্রী তারপর অকস্মাৎ উর্দ্ধে উঠে চলে গেল উত্তরণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রখর প্রবেগে। দেখতে পেল সে পর পর শক্তির তিনটি স্তর : প্রত্যেক স্তরে রয়েছে এক এক মাতৃশক্তি, প্রত্যেকেরই দাবী যে সে পূর্ণ মাতৃশক্তি। কিন্তু প্রত্যেকেই হল অন্তরাত্মার শক্তির এক একটি দিক। পৃথকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা কোন যথার্থ সিদ্ধি এনে দিতে পারেনা। অন্তরাত্মার অভীপ্সার এই যে ত্রিমূর্ত্তি তাদের একত্ব রয়েছে আর এক উর্দ্ধতর শক্তির মধ্যে।

সাবিত্রী এখন তবে প্রবেশ করল এক রাত্রির মধ্যে যেখানে তার ব্যক্তিত্বের কোন সার্থকতা রইল না। এই যে শূন্য এর তবু রয়েছে একটা অপরিমেয় গাঢ়ত্ব। সে গাঢ়ত্বের অনুভূতি আসে তার অতল গভীরতা থেকে উত্থিত এক শিহরণে। কিন্তু পরা-আত্মার সন্নিধানে দিনের আলো ফুটে উঠল আনন্দযজ্ঞের পুরোহিতরূপে। সাবিত্রী চিনতে পারল— সোনার দুয়ার ভড়ের প্রসুপ্তির রাজ্যে, সেখানে রক্ষী হ'ল গরুড় আর সর্পের দল। সাবিত্রী প্রবেশ করল সেখানে। দেখল, সেখানে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে রয়েছে সব বিশ্বদেববৃন্দ। তারপর হঠাৎ সে সব অদৃশ্য হয়ে গেল একটা নৈঃশব্দ্যের মধ্যে, রূপবন্ধের উর্দ্ধে। একটা সঙ্কীর্ণ পথ ধরে সাবিত্রী এসে উপস্থিত হল অমর এক জ্যোতিকণার সম্মুখে, সকল সচল চঞ্চলতার উর্দ্ধে। সাবিত্রী দাঁড়িয়ে তার অন্তরাত্মার গুপ্ত দুয়ারের সম্মুখে—মর্ত্ত মানুষের মধ্যে অন্তর্যামী ভগবান যে।

"অসীম তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সসীম রূপাবলীর উপর...
সে জানে মনের প্রাণের কি কষ্টপ্রয়াস...
তাই সে আপনার এক ক্ষুদ্র অংশ প্রকট করে ধরে
অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ এক
হৃদয়-গহ্বরে সন্নিবিষ্ট...
আমাদের মধ্যে এইজনই হাসে কাঁদে আঘাত সহ্য করে
তবুও এই হল সেই অক্ষত অমর আত্মা
পার্থিব রঙ্গমঞ্চে মানুষী অভিনেতার পিছনে দাঁড়িয়ে"

প্রশান্ত অমর আত্মা, আর যে আত্মা প্রবয়পরায়ণ, অন্তর্যামী দেবতা আর তার মানুষী প্রতিনিধি দুয়ে এইভাবে পরস্পরের সম্মুখে অগ্নিগৃহের মধ্যে। তারপর ঘটে এক যাদুকর রূপান্তর, দুজনে পরস্পরের দিকে ধাবিত হয়, সম্মিলিত হয়ে এক হয়ে যায়।

সাবিত্রী নিজেকে দেখল আবার পৃথিবীর উপরে মানুষীরূপে। হৃদয়পদ্ম তার সব দল মেলে দিয়েছে, প্রকটিত করেছে তার নিভৃত আত্মাকে। এই তার আত্মা আর তার মনের মধ্যে, এই তার আত্মা আর জীবনের দাবীর মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তা ঘুচে গিয়েছে। ভাগবতী জননীর কাছে সে মিনতি জানাল তার এই দেহের মধ্যে এসে তিনি যেন বাস করেন। এক বিদ্যুৎ-লেখা তার হৃদয়কে স্পর্শ করল; কে এসে সেখানে অধিষ্ঠিত হল ; অন্তরের আকাশ

দুলে উঠল। একটা সর্পরূপী বহ্নিশিখা উঠে চলল তার শীর্ষ থেকে, একে একে স্পর্শ করে গেল আন্তরচক্র সব, তারা সব খুলে গেল, সেই শিখা পরিশেষে তার মাথার উপরে উঠে অনন্তপ্রসারের সঙ্গে মিশে গেল। এই আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল এক অবরোহণ। ভাগবতশক্তি সব নেমে এল, পূর্ণ করে দিল সব আন্তর-চক্র, তারা এখন প্রস্তুত, এখন তারা ধারণ করতে পারে সেই সব সত্য যারা জগতে হবে দিব্য প্রকাশের প্রতিষ্ঠা। একটা বিপুল রূপান্তর ঘটেছে, পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধির প্রথম পাদ লব্ধ হয়েছে, মানুষী কালধারার মধ্যে ভাগবত শিখির মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

*

সাবিত্রী এইভাবে পেল নিজের নিজেকে। সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল পথে সে চলেছে, তার চারিদিকে সবই এই রূপান্তরের স্পর্শ পেয়েছে। সাক্ষাৎ দেখতে পেল সে সত্যবানের অন্তরাত্মা। এই বৃহত্তর ক্ষেত্রে এসে দেখল নিয়তির দাবী নিরর্থক হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু তার সম্মুখে এল নূতন এক পরীক্ষা—তার প্রয়োজন আরও বৃহত্তর প্রসারণ—আপন আত্মাকে অধিগত করা পথের প্রয়োজন মাত্র, কিন্তু সিদ্ধি যদি ব্যক্তিগতই রয়ে যায় তবে তা ব্যর্থতামাত্র। অন্তরাত্মার বুকে নূতন একটা আবেগ ফুটে ওঠে, একটা আকস্মিক ও অনির্ব্বচনীয় আবির্ভাব, একটা অহেতুক বেদনা-গহ্বরের মত মূর্ত্ত সম্মুখে। এই শূন্যতা থেকে উঠে আসে একটা আঁধারের প্লাবন, একটা অব্যক্ত ভাবনা আনন্দকে নিহত করে, জগতের উপর, আপন আত্মার উপর ঢেলে দেয় একটা অনন্তির প্রলেপ।

"আমি সব সৃষ্টি করি, আমি সব ভক্ষণ করি
মৃত্যু আমি, ঘোরা, কৃষ্ণা জননী আমি জীবনের
কালী আমি, তামসী, উলঙ্গিনী, জগতের মধ্যে
আমি মায়া, সৃষ্টি আমার প্রতারণা—"

কিন্তু প্রতিধ্বনিরূপে এলো এক প্রত্যুত্তর, সাবিত্রীকে উৎসাহিত করল এই ছেদ অতিক্রম করে যেতে। সেইজন্যে তাকে সর্ব্বাগ্রে হ'তে হবে চিন্তালেশশূন্য, নামরূপ-বিহীন হতে হবে, ভাগবতশূন্য যার মধ্যে ভগবান আপনাকে প্রকাশ করতে পারেন। সাবিত্রী প্রবেশ করলো নিজের অন্তরে গভীরে—ক্রমে সে দেখল তার জীবনের কর্ম্মাবলী—তার চিন্তার যন্ত্র ক্রমে নিরস্ত হ'য়ে এল, লোপ পেয়ে গেল। আন্তর নির্ব্বাণের মধ্যে একটা সঘন আবরণের অন্তরালে অস্পষ্টভাবে অব্যর্থভাবে জেগে উঠছে, একটা শুদ্ধ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বমাত্রার নিজস্ব অনন্য আনন্ত্য ক্রমশ প্রকট ক'রে চলেছে। এই অসীম আস্তিক্য সাবিত্রীকে সকল রূপ হ'তে মুক্ত ক'রে দিল, রেখে গেল তার মধ্যে শুধু একটা স্মৃতির বীজ একদিন যা হ'য়ে উঠতে পারবে অনির্ব্বচনীয় মহাশক্তির অপরূপ যন্ত্র।

তারপর একদিন তার আপন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যখন তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা

চলেছিল যাতে সে 'সত্যকার সাবিত্রী' হ'য়ে চলতে পারে, এক কণ্ঠ, অপরের এক কণ্ঠ ; তার হৃদয়ের অভ্যন্তরে কথা বলে চলল, তার মস্তিষ্কে, তার ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে—

"কণ্ঠ কথা বলে চলল, সঙ্গে সঙ্গে অন্তর বাহির
তার পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল
সব অস্তি, সব ভাতি, সব এক অদ্বিতীয়...
এক চিন্ময়সত্তা দ্রষ্টারূপে স্রষ্টারূপে নিজেকে
গড়ে তুলছে অসংখ্য রূপাবলির মধ্যে
যা সে দেখছে, যা সে গড়ছে, সবই আবার নিজে সে"।

এ সেই একই শক্তি পূর্ব্বে যাকে সে দেখেছে অবর্ণনীয় অনধিগম্যরূপে, কিন্তু এখন সে আর সুদূরের নয়, এখন সে তার পূর্ণলব্ধ অন্তরাত্মার একান্ত সন্নিকটে, একান্ত অন্তরঙ্গ, তার জীবনের উৎস। সাবিত্রী পেয়েছে তার আত্মাকে, যে আত্মা আবার বিশ্ব-আত্মা তার সত্তা অপ্রত্যাশিত অদৃষ্টপূর্ব্ব শিখরে উঠে চলল, আবার আবিষ্কার করল অতল গভীরতা সব, জগৎ হতে জগতের বিশাল প্রসারে তার বাস এখন। সে চলে গিয়েছে দেশকালের ওপারে—

"অতিচেতনা এখন তার স্বদেশ, অসীমতার গভির
স্বচ্ছন্দ প্রসার
অনন্ত তার দৃষ্টি দিয়ে দৃষ্টি মেলেছে কালের ওপরে।"

ছন্দ-দোল

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

ছন্দ সম্বন্ধে আজ তোমাদের কিছু বলতে চাই—অর্থাৎ দেখাতে চাই ছন্দের দোল বা দোলা জিনিষটা কি। ছন্দ আসলে হ'ল কথার মধ্যে নিহিত যে সঙ্গীত বা সুর। আমি শুধু উদাহরণ দিয়ে যাব—কতরকম ভঙ্গীতে কথায় এই সঙ্গীত বা সুর ফুটে ওঠে।

প্রথমেই বলব আদিভাষা, ভাষার আদি জননী সংস্কৃত এবং সংস্কৃতের প্রতিনিধি-স্বরূপ মহাকবি কালিদাসের কথা। কবি কালিদাসের মেঘদূতের নাম তোমরা নিশ্চয় শুনেছ—এই সমগ্র মেঘদূত রচিত এক অপূর্ব্ব ছন্দে—ছন্দের নামটা কি সুন্দর—মন্দাক্রান্তা নামটিতেই তার ধ্বনিতে ভঙ্গীতে মেলিয়ে দেয় ছন্দের স্বরূপটি। মন্দাক্রান্তা অর্থ যে চলে ধীর মন্থর গতিতে কিন্তু তাই বলে কেবল যে গড়িয়ে চলা তা নয়, মাঝে মাঝে ঠিক ঠিক জায়গায় দ্রুত তাল দেওয়া হয়েছে এই মন্থরতাকে পরিস্ফুট করবার জন্যই, ফল হয়েছে চমৎপ্রদ। ছন্দে ধীরগতি হ'ল দীর্ঘস্বর বা দ্বিগুণ মাত্রা। শোন তবে মন্দাক্রান্তার চলন—

কশ্চিৎকান্তা / বিরহগুরুণা / স্বাধিকারপ্রমত্তঃ।

এ ছন্দের গড়ন হল প্রত্যেক ছত্রে বা লাইনে থাকবে ১৭টি অক্ষর বা syllable, তিনভাগে বিভক্ত ১৭টি অক্ষর। প্রথমে চারটি, তারপর ছটি, তারপর সাতটি। চারটির পরে থামতে হবে একটু, যাকে বলে যতি সেখানে—তারপর ছটির পরে, তারপরে শেষ পর্য্যন্ত। একে বলা যেতে পারে মাত্রাভেদ বা তাল, কিন্তু তারপর দেখতে হবে হ্রস্ব-দীর্ঘ বা গুরু-লঘু অক্ষর। এখানে গোড়াকার চারটা হবে দীর্ঘ, তার পরের পদে পাঁচটি হ্রস্বের দ্রুতবেগ, থেমে যেতে হবে ঘণ্টের দীর্ঘ টানে। তারপরের সাতটিতে গুরু-লঘুর বৈচিত্র্য রয়েছে যাতে সব ছত্রগুলি একই প্যাটার্নের, একঘেয়ে না হয়ে যায়—যেমন পাশী বা উর্দ্দু গজল, হিন্দী দোঁহা। সেইজন্য সাতটি বর্ণকে ভাগ করা হয় আবার বিবিধমাপে চারটি-তিনটি, পাঁচটি-দুটি, তিনটি-চারটি, দুটি-পাঁচটি শেষের দুটি সর্ব্বদাই গুরু হবে গ্রহণ করা হয়, বাস্তবিক তারা গুরু হোক বা না হোক। মজার কথা ছন্দের নামই ছন্দের প্রথম পাদের উদাহরণ—মন্দাক্রান্তা। চারটি দীর্ঘ সুদীর্ঘ স্বর। শোন তবে—

।। ।। ।। ।। । । । । । ।। ।। । ।। ।। । ।। ।।
ক শ্চিৎ কা ন্তা / বি র হ গু রু ণা / স্বা ধি কা র প্র ম ত্তঃ
শাপেনাস্তং / গমিতমহিমা / বর্ষভোগ্যেণভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে / জনকতনয়া / স্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়া / তরুষু বসতিং / রামগির্য্যাশ্রমেষু ।।

আরও একটু শুনতে পার—শুনতে খুবই মধুর—

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলা বিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়-ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট-সানুং
বপ্রক্রীড়া-পরিণত-গজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥

বাংলায় অনুরণন বা প্রতিধ্বনি এইভাবে দেখান হয়েছে

(১) প্রিয়ারে হারায়ে / বরষের তরে, / স্বকর্মে অবহেলার পাপে,
প্রভুশাপে এক / ভ্রষ্টমহিমা / যক্ষ অসহ / বিরহ বাপে।
সেই রামগিরি / আশ্রম সেই / ছায়া সুশীতল তরুবিতানে
যেথাকার জল / পূত-নির্মল / জনকদুহিতা / সীতার স্নানে ॥

মেঘদূত—কৃষ্ণলাল বসু

(২) কাননে অহি / সে প্রিয়াবিরহী / কতিপয় মাস / যাপিলে পর,
কর হতে তার / কনক-বলয় / খসিয়া যখন / রিক্ত কর,—
দেখে, আষাঢ়ের / প্রথম দিবসে / গিরি-সানুদেশে / রয়েছে নত
নব জলধর, / যেন গজবর / বপ্রক্রীড়া বিনাসে রত।

মেঘদূত—কৃষ্ণলাল বসু

সংস্কৃতে আর একটা ছন্দ খুবই পরিচিত—বলতে হয় এইটি হ'ল সংস্কৃতে ছন্দের মূল ঠাট—বেরুদণ্ড। রামায়ণ মহাভারত মোটামুটি এই ছন্দে রচিত। গীতা (মহাভারতের অন্তর্গত) প্রায় সবটাই এই ছন্দে—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥

এর গড়ন হল—৪টি পদ (দুটি লাইন বা ছত্র) এবং প্রত্যেক ছত্রে জোড়া জোড়া পদ প্রতিপদে আটটি অক্ষর। এই শোন—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে—প্রথম পদ
সমবেতা যুযুৎসবঃ—দ্বিতীয় পদ

প্রতিপদে এই আটটি নানাভাবে সাজান হয়।

৪+৪ ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ
পরে ৩+৫ মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব
বা ৫+৩ কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়

এতে হ্রস্ব-দীর্ঘের খুব বাঁধাবাঁধি নাই—বলা হয় শুধু পঞ্চমটা হবে হ্রস্ব আর ষষ্ঠ দীর্ঘ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদের সপ্তম বর্ণ হবে লঘু—এ ঠিক থাকলেই হ'ল। এ হল বিখ্যাত অনুষ্টুভ ছন্দ। অবশ্য অনুষ্টুভের নানা প্রকারভেদও আছে।

আমাদের বাংলা পয়ার জাতীয় ছন্দ এ। পয়ার হ'ল বাংলা ছন্দের মূল বনেদ, বা শিরদাঁড়া। এর নিয়ম তোমরা জান, জোড়া ছত্র (হিন্দী দোহা)—প্রতি ছত্রে ১৪টি অক্ষর গুণে। এই চোদ্দটি সাধারণতঃ ভাগ হয় আট+ছয় করে—বাংলা ছত্রে হ্রস্ব দীর্ঘ নাই, তা পুষিয়ে নেওয়া হয় অন্তের মিলে—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।

মহাভারতের কথা ৮, অমৃত সমান ৬ —প্রথম ছত্র
কাশীরাম দাস কহে ৮, শুনে পুণ্যবান ৬ —দ্বিতীয় ছত্র

'সমান'-অন্তে নান আর 'পুণ্যবান'-অন্তে বান এই হ'ল মিল। যা হোক বাংলা ছন্দের কথা পরে আরও বলছি।

বাংলার অনুরূপ হ'ল ফরাসীর এক পয়ারজাতীয় গঠন, কারণ ফরাসীতেও গুরু লঘু নাই।

বাংলার মত ফরাসীতে অক্ষর গুণে পদ গড়া হয়। আর বাংলারই মত সেখানে রয়েছে পদচ্ছেদ বা ছত্রবিভাগ (cesura)। বাংলার পয়ারে পদবিভাগ আট-ছয়। ফরাসীর মূল পদচ্ছেদ ছয়+ছয়=বার। এর নাম Alexandrine—ইংরাজীতে এর কাঠামোর অনুরূপ হ'ল Heroic couplet—উদাহরণ কবি Pope-এর বিখ্যাত

We call our father fools so wise we grow
Our wiser sons no doubt will call us so—

ফরাসীর নমুনা শোন মহাকবি Racine-এর করুণকণ্ঠে

Ariane, ma sœur, de quel amour blessé
Vous mourûtes au bord où vous fûtes laissée.

আরিয়ান, ভগিনী আমার, কোন সে প্রেম তোমাকে আহত করলে,
তোমাকে ফেলে রেখে গেল সাগরতীরে সেখানে দিতে হ'ল তোমার প্রাণ।

কিংবা অনুরূপ পদবীর কবি কর্ণেই (Corneille) তাঁর উদাত্তকণ্ঠে

Je suis jeune, il est vrai; mais aux âmes bien nées
La valeur n'attend point le nombre des années.

আমি তরুণ, সত্য বটে—কিন্তু মহৎ চিত্ত নিয়ে জন্মেছে যারা
তাদের বীর্য্য বয়সের সংখ্যার জন্য অপেক্ষা করেনা।

তবে একটা কথা এখানে বলা দরকার: অক্ষর গুণে কোথাও কবিতা হয় না—অক্ষরের পারম্পর্য্য যে ধ্বনির মূর্চ্ছনা তুলে দেয় তাই হ'ল ছন্দের দোল—গুরুলঘু হ্রস্ব-দীর্ঘ

ছাড়াও প্রত্যেক বর্ণের এবং প্রত্যেক বাক্যের আছে একটা আপন আপন বিশিষ্ট অনুরণন ; তরঙ্গনাসা—কবির শ্রুতি তাকেই আশ্রয় করে সৃষ্টি করে কাব্যের সুর। তাল হয়ত আসে অক্ষরের গণতি দিয়ে।

বাংলায় যেমন পয়ার, সংস্কৃতে যেমন অনুষ্টুভ, ইংরেজীতে তেমনি হ'ল **Iambic Pentametre**—এ কথাটির অর্থ হল প্রত্যেক ছত্রে থাকবে পাঁচটি পদ বা পর্ব্ব (**foot**) আর সংস্কৃতের হ্রস্ব-দীর্ঘের পরিবর্ত্তে আছে তার নিজস্ব এক গুরু-লঘু এবং ঝোঁকের তারতম্য। **Iambic** হ'ল দুটি বর্ণের পর্ব্ব বা পদ, প্রথমটি অঝোঁকালো, লঘু—দ্বিতীয়টি ঝোঁকালো। এই ধরণ যেমন—

The cur / few tolls / the knell / of part- / ing day

কিংবা **Pope**-এর পূর্ব্বে উল্লিখিত—

⏑ / ⏑ / ⏑ / ⏑ / ⏑ /

We call / our fath- / ers fools / so wise / we grow

অথবা গুরুগম্ভীর ভাবে, মিল্টনিক কণ্ঠে—

To reign / is worth / am- bi- / tion though / in hell.

অথবা চরম **tragic** সুরে (**Shakespeare**)—

It is / the cause / It is / the cause / my soul—

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "সাবিত্রী" আরম্ভ করেছেন পরিষ্কার এই ছন্দে—

It was the hour before the gods awake.

সংস্কৃত ছন্দের কথা বলেছি, তাহ'লে গ্রীক বা লাতিনের উল্লেখ কিছু করি। সংস্কৃতে যেমন আছে হ্রস্ব-দীর্ঘ এবং তারই উপর ছন্দ ও ছন্দের দোল প্রতিষ্ঠিত, গ্রীক বা লাতিন ছন্দ ঠিক তেমনি নির্ভর করে গুরু-লঘুর উপর কিন্তু পার্থক্য একটা আছে। গ্রীক বা লাতিন ছন্দের পদ (**foot**) বাঁধা তিনটি মাত্রায়—হ্রস্ব আর দীর্ঘ অক্ষর নিয়ে। ইংরাজীর **unit** মূল পদ হ'ল দুই বা তিন, প্রধানতঃ দুই মাত্রার। সংস্কৃতে মন্দাক্রান্তায় আমরা দেখেছি পদবিভাগ হ'ল ৪+৬+৭ অক্ষর নিয়ে, অনুষ্টুভ হ'ল ৪+৪। এ রকম বহুবিধ বিন্যাস হতে পারে। সংস্কৃতে অক্ষরই হ'ল মূল স্বর। লাতিনের কথা বলি। লাতিনের এবং গ্রীকের বিখ্যাত ছন্দ হ'ল **Hexametre** (ষট্‌পদী)। প্রত্যেক পদে তিনটি অক্ষর বা **syllable**, অবশ্য দুটি হ্রস্ব একটি দীর্ঘ বলে বিবেচিত হয় স্থানবিশেষে। **Hexametre**-এর দোল নির্ভর করে বিশেষভাবে তার একটি বিশিষ্ট গঠনের পদের উপর। সেই পদটির নাম **Dactyl**, অর্থাৎ এর গঠন হ'ল দীর্ঘ-হ্রস্ব-হ্রস্ব। ইংরেজী **anapaest**-এর বিপরীত। **Anapaest** হ'ল হ্রস্ব-হ্রস্ব-দীর্ঘ—

Not a drum was heard not a funeral note.

এখানে তিনটি **anapaest** মাঝে একটি **iamb**. **Dactyl**-এ তিনটি মাত্রা বা

অক্ষরের প্রথমটি দীর্ঘ, দ্বিতীয়-তৃতীয়টি হ্রস্ব। এই যেমন ইংরেজী 'wonderful' কি 'beautiful' শব্দটি (won-der-ful, beau-ti-ful)। আর একটি পদে dactyl-এর দুটি হ্রস্বস্বরের পরিবর্তে একটি দীর্ঘস্বর ব্যবহার হয়, তার নাম Spondee. আর শেষের পদটি অন্তে হ্রস্ব বা দীর্ঘ হতে পারে বৈচিত্র্যের বা শ্রুতি-মাধুর্যের জন্যে।

এখানে শ্রীঅরবিন্দের Who কবিতাটি উল্লেখ না করে পারি না। কবিতাটি সর্ব্বজনপ্রিয়, এত সহজ সরল মধুর—একান্ত সহজ, একান্ত সরল, একান্ত মধুর। আরম্ভেই কানে যেন মধু ঢেলে দেয়।

In the blue of the sky, in the green of the forest.

এর গড়নটি বড় চমৎকার কৌতূহলের। এর দোল সুরু anapaest দিয়ে—হ্রস্ব-হ্রস্ব-দীর্ঘ। anapaest-ই বলা যেতে পারে এর প্রধান সুর বা দোলার ভঙ্গি। আরো এই যেমন—

In the sweep of the worlds, in the surge of the ages

অথবা

He is strength that is loud in the blare of the trumpets

অথবা

It is He in the sun who is ageless and deathless

তবে এর পিছনের কাঠামো মূলঠাট pentametre iamb-ই—তা ফুটে উঠেছে সামনে এখানে ওখানে Counter-point-এর (প্রতিস্বর) মত, পাল্টা দোল যেন। এই counter-point-এর খেলা কবিতাটির বৈশিষ্ট্য—টানা anapaest-এর পরে।

Whose is the hand that has painted the glow

এই দ্বিতীয় ছত্রে রয়েছে দুটি dactyl, একটি trochee, iamb এর প্রতিপক্ষ এবং সর্ব্বশেষে একটি iamb.

Hexametre-এর কথায় ফিরে আসি এখন। তার দোল শোন তবে—

Ty tire / tu patu / lae recu / bans sub / teg mine / fagi.
You Tityrus, lie under your spreading beech's cover
(Wooing the woodland Muse on slender reed)

—বন্ধু তিতির, প্রশান্তিত পত্রপল্লবের চাঁদোয়া-তলে তুমি বেশ আরামে গা এলিয়ে বসে রয়েছ—

এই Hexametre-এ Homer তাঁর অপূর্ব্ব কবিত্ব ও অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করেছেন। Greek মূল তোমাদের শোনাই একটু—একটি লাইন যা দিয়ে Homer আরম্ভ করেছেন তাঁর Iliad (ইলিয়াদ)—

Mênin a / eide the / à Pê / lêia / deô Achi / lêos.

এর ইংরেজীটার সঙ্গে তোমাদের অনেকের নিশ্চয় পরিচয় আছে—

Sing heavenly Muse, the wrath of Achilles, Peleus' son.

—গাও দেবী, পিলিউ-পুত্র একিলিসের ক্রোধের কাহিনী।

এখানে তাহলে একটু তুলনা করে দেখাতে পারি লাতিন ও গ্রীক ছন্দ-দোলের পার্থক্য। লাতিনের হ'ল দৃঢ় গাঢ় সংহত গঠন, ওজস্বিতা তার বৈশিষ্ট্য। আর গ্রীকের হ'ল লীলায়িত তরঙ্গিত গতিধারা। লাতিনের—আবার বলি—

Tytire tu patulae recubans sub tegmine fagi

শুনি যখন, মনে হয় পাথরে কুঁদে মূর্ত্তি গড়া হয় হাতুড়ির আঘাতে—যেন ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত চাতুর্য্যে সমর্থ সংহত শ্রী ফুটে উঠেছে। আর শুনি যখন গ্রীকের

Mênin aeide theâ Pêlêia deô Achilêos

তখন স্বরবর্ণের আলাপ এনে দেয় স্রোতের লীলায়িত লাস্য, যেন তা ছড়ের বা তুলির টানা গতি। তবে লাতিনে ব্যঞ্জনের দৃঢ়তা আছে বটে কিন্তু তার রুক্ষতা নাই, জর্ম্মনের মত কঠোর মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনবর্ণের অবাধ সংঘাত নাই। শ্রীঅরবিন্দ বলতেন, "লাতিন ভাষার বৈশিষ্ট্য শক্তি, সামর্থ্য (strength) আর গ্রীকের বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্য্য (beauty) কিন্তু সংস্কৃতে রয়েছে শক্তি ও সৌন্দর্য্য দুই-ই।

এই Hexametre-এর (ষট্‌পদের) তবে ভ্রমরগুঞ্জনের চেয়ে—এ আরও স্বর্গীয় বস্তু—এ ষট্‌পদের দোলে ও রোলে মাধুর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে সব দেশে বিদ্বৎসমাজ চমৎকৃত মোহিত। ইংরেজরা বহু চেষ্টা করেছে ইংরেজীতে একে ঢেলে গড়তে। তবে সাফল্য লাভ করেনি তেমন কারণ ইংরেজীর হ্রস্ব-দীর্ঘ কি গুরু-লঘু এক ধরণের বস্তু, আর গ্রীক বা লাতিনে বা সংস্কৃতে তা অনেকখানি অন্য ধরণের। এ সব ভাষায় গুরু বা দীর্ঘ টেনে যত দীর্ঘ করা যায় ক্ষতি নেই, ইংরেজীতে দীর্ঘস্বর তেমন নেই আর তার গুরু, গুরুস্বর বেশি নির্ভর করে ঝোঁকের উপর। ইংরেজীর ছন্দ তার রোল বা দোল তুলে দেয় এই ঝোঁকের তালে। এই Hexametreকে ইংরেজীর গড়নে ঢেলে রচনা করতে চেয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, এক্ষেত্রে সাফল্যলাভ কিছু যদি হয়ে থাকে তা শ্রীঅরবিন্দই দিয়েছেন। এই যেমন সমস্ত Ahana কাব্যটিই এই ছন্দে গঠিত।

Vision de / lightful a- / lone on the / hills whom the silences / cover,
Closer yet / lean to mor- / tality ; / human, / stoop to their lover.

সমস্ত Ilion মহাকাব্য এই ছন্দে রচিত। Ilion কাব্যে ঠিক ঠিক Hexametre

অনুসরণ করা হয়েছে; কারণ Ahanaতে আমাদের পয়ারের মত কি ইংরেজী Heroic couplet-এর মত অন্তে মিল রয়েছে বরাবর। Ilion-এর আরম্ভ এই :

Dawn in her / journey e- / ternal com- / pelling the
labour of / mortals,
Dawn the be- / ginner of / things with the / night for their
rest or their / ending,

আমি ছন্দের দোল ও রোল—কলরোলের কথা বলেছি, এদিক দিয়ে শ্রীঅরবিন্দের আর একটি কবিতা আমাদের দৃষ্টি বা শ্রুতি (চলন ও বলন) আকর্ষণ করে বিশেষভাবে—The Mother of Dreams কবিতাটি তোমাদের সকলের নিশ্চয় পরিচিত এবং অনেকের হয়ত কণ্ঠস্থ। ছত্রের মধ্যে ছেদ বিন্যাস যত্নশিল, টানা খরগতি অপরূপ—

Goddess, supreme / Mother of Dream, / by the ivory doors
when thou standest,
Who are they then / that come down unto men / in thy
visions that troop
group upon group, / down the path of the shadows slanting? /
Dream after dream, / they flash and they gleam / with the
flame of the mars still around them ;
Shadows at thy side / in a darkness ride / where the wild
fires dance, / stars glow and glance / and the random
meteor glistens ;

ছন্দের কলতানে মাধুর্য্য আছে এখানে, সহজে শ্রুতিসুখকর ; আরও আছে ঔদার্য্য, যেন দূরের পাল্লার গতি এলায়িত তরঙ্গায়িত। আরও আছে ঐশ্বর্য্য। এই কটি গুণ হিসাবেই তুলনায় স্মরণ করতে পারি Bird of Fire :

Gold-white wings a throb in the vastness, the bird of flame
went glimmering over a sunfire curve to the haze of the west,
Skimming, a messenger sail, the sapphire-summer waste
of a soundless wayless burning sea.

এখানে পাই বীর্য্য আরো স্ফুটতর। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে একটি অনুরূপ কবিতা যার একটা স্থিরদৃষ্টিসম্পন্ন নয়নশক্তি মূর্ত্ত হয়েছে—"The Rose of God"—

Rose of God, vermilion stain on the sapphires of heaven,
Rose of Bliss, fire-sweet, seven-tinged with the ecstasies seven !
Leap up in our heart of humanhood, O Miracle, O Flame,
Passion-flower of the Nameless, bud of the mystical Name.

ফলতঃ ঝোঁকের উপর, মোটামুটি বলা যেতে পারে, ছন্দ ও ছন্দের দোল তার বৈশিষ্ট্যের জন্য নির্ভর করে দুটি জিনিষের উপর—স্বরের টান আর না হয় ঝোঁক, প্রলম্বিত কি দ্রুত-গতি। যে সব ছন্দের (অর্থাৎ যে সব ভাষার) মূল উপাদান (unit) হ'ল অক্ষর (প্রধানতঃ স্বরান্ত, গৌণতঃ বা অংশতঃ হসন্ত), তাদের হ'ল টানা বা প্রলম্বিত গতি—প্রাচীন গ্রীক লাতিন সংস্কৃত এই ধারায়। অর্ব্বাচীন ইউরোপে এক ফরাসী প্রধানতঃ এই ধারার জের টেনেছে। আমাদের এদিকে ভারতবর্ষে সংস্কৃত-ভাঙা বাংলা প্রধানতঃ এই পথ ধরেছে। ঝোঁকের বা দ্রুতগতির ছন্দ ইউরোপে গ্রহণ করেছে একদিকে জর্ম্মান ভাষা ও তার জ্ঞাতিভাই ইংরেজী (তার anglo-saxon গঠনে)। বিখ্যাত জর্ম্মান কবি বলছেন তাঁর সুখ্যাত

Warum sind denn die Rosen so blass
(Why are the roses so pale)—

তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই যেন ইংরেজীর—

The red rose was beaten
The white rose had won
The Queen was in hiding
with Edward her son.

তবে এই ঝোঁকালো প্রকৃতির জন্যই তার ছন্দে পদবিভাগ একান্ত অক্ষরগত হয়না। ঝোঁক হিসাবে সমান মাত্রার বিভিন্ন পদ ধারণ করতে পারে বিভিন্ন সংখ্যার অক্ষর বা syllable। এই ধর্ম্মের জন্যই ইংরেজী ছন্দে একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল যাকে বলা হয় sprung-rythm. কবি Hopkins এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে ফলিয়ে ধরেছেন। এই যেমন—

The heart rears wings bold and bolder.

এখানে rears, wings, একটিমাত্র ঝোঁকালো শব্দই সমগ্র পদের (foot) কাজ করছে। অথবা

Glory be to God for dappled things.

এখানে প্রথম পদে একটি ঝোঁকালো দীর্ঘ স্বরের সঙ্গে তিনটি হ্রস্ব মিলেছে এসে।

তবে ইংরেজীর মধ্যে লাতিন প্রভাবান্বিত ফরাসীভাষার প্রভাব প্রবেশ করেছে অনেক-খানি। ইংরেজীতে নরম্যান-ফরাসী প্রভাব প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেছে কয়েক শতাব্দী ধরে। এই হেতু ইংরেজী ছন্দ বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্যলাভ করেছে প্রচুর। কারণ ছন্দের মূল দুটি গতিধারাই তাতে স্থান পেয়েছে।

ঝোঁকালো ছন্দ, দ্রুতগতির ছন্দ বিশেষ জোরালো হয়েছে ইউরোপে উত্তরের চেয়ে দক্ষিণে বেশি। স্পেনীয় ভাষায়, ইতালীয় ভাষায় মূল লাতিনের টানা ধারা—প্রলম্বিত গতি—ভেঙে ভেঙে চূর্ণগতি লাভ করেছে। লাতিন থেকে গঠিত এই সব অপভ্রংশ ভাষা

আবার প্রভাবান্বিত হয়েছে জর্মানভাষীদের সংস্পর্শে এসে। তবুও ফরাসীভাষা বজায় রাখতে পেরেছে অনেকখানি তার পিতৃপুরুষ লাতিনের স্থির ঠাট। ইতালী ভাষার ঝোঁক প্রায় তার ছন্দের সবখানি। নমুনা দিচ্ছি একটু পরে—

বাংলায় তার ঝোকালো দিকটি জুড়ে আছে অনেকখানি, ফুটিয়ে ধরেছে একটা বিশেষ সৌন্দর্য্য। এর উৎস ও প্রতিষ্ঠা পল্লীগাথায়, ছড়ায়, লোকসাহিত্যে। আমি বলছি হসন্ত বর্ণগত ছন্দের কথা। আমরা সবাই জানি রবীন্দ্রনাথের

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান
শিবঠাকুরের বিয়ে হ'ল তিন কন্যে দান।

অথবা সত্যেন দত্তের

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল, কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি আজ মন্দ্র মন্থর বচন কও।

তবে বাংলার হোক বা ভারতীয় যে কোন ভাষার হোক (যেমন হিন্দী) এই ঝোঁক-প্রাধান্য যেখানেই দেখা দিয়েছে সেখানে একটা বৈশিষ্ট্য রয়ে গিয়েছে এই যে, সকল বর্ণগুলি ঝোঁকান হোক আর নাই হোক উচ্চারিত হয় সুস্পষ্ট। কিন্তু ইউরোপীয় প্লুত ছন্দে ঝোঁকান বর্ণটিই অতিরিক্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অন্য বর্ণগুলি প্রায় বা অনেকখানি উহ্য রয়ে যায়। ইতালীয় বা স্পেনীয় ভাষায় যতটা সম্ভব উদাত্তগুলি সম্মুখে দেখা দেয়, অনুদাত্তগুলি পর্দার আড়ালে যেন রয়ে যায়। এই যেমন—

Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per una selva oscura,
Chè la diritta via era smarrita.

Per me si va nella città dolente,
Per me si va nell'eterno dolore
Per me si va tra la perduta gente.

জীবনের অর্দ্ধপথে চলিতে চলিতে
সহসা হেরিনু মোরে ঘোর বনমাঝে
সরল সরণীখানি নাহি কোন ভিতে—

মোর পারে যায় সবে শোকভূমিতলে
মোর পারে যায় সবে অনন্ত সন্তাপে
মোর পারে যায় সবে ভ্রষ্টদের দলে

বাংলায় ছন্দের কলরোল অর্থ রবীন্দ্রনাথ। ইংরেজী একটা প্রসিদ্ধ বাক্যের অনুকরণে

বলতে পারি রবীন্দ্রনাথই ছন্দ এবং ছন্দই রবীন্দ্রনাথ। অন্য কোন কবির বা শিল্পীর উল্লেখ প্রয়োজন হয় না। প্রথম যুগের রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন

নব যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী—
সখি জাগ', জাগ'।
মেলি রাগ-অলস আঁখি, সখি জাগ' জাগ'।

কিংবা শ্রবণ-মনোহর আরও ধরতর কলরোল

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জল-সিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।

অথবা একটু স্থিরতর গাঢ়বদ্ধ তালের গতি

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে উষসী
হে ভুবনমোহিনী উর্ব্বশী
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা—
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ-আসনখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতিলঘুভার।

অথবা পরিণত চেতনার এই আরম্ভ পরিচ্ছন্নতা

কোন জ্যোতির্ম্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে, নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।
তাইত চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে—
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে।

রবীন্দ্রনাথের হাতের মাধুর্য্য অতুলনীয়—মাধুর্য্য শুধু নয়, মিষ্টত্ব, পর্ব্বরাসার তিনি যেমন বিতরণ করেছেন পরিমাণে বা মাত্রায় তা আর কেউ করেননি।

বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্য তার মাধুর্য্যের জন্যই বিখ্যাত হয়েছে—বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি। তবে কেবল মাধুর্য্য নয় বীর্য্য ও ঔদার্য্যের সম্ভাবনাও যে এই ভাষা ও সাহিত্যে রয়েছে তার উদাহরণ দিয়েছেন মধুসূদন। মধুসূদন ভাবগভীর

চিন্তাবীর নন, কিন্তু তাঁর ভাষার ভঙ্গি গতির ঠাট একটা আছে যা স্মরণ করিয়ে দেয় Virgil-এর সেই The stepping of the Goddess—স্বর্গদেবীর পদক্ষেপ "মেঘনাদ বধের" আরম্ভেই শুনি মেঘের নিনাদ যেন—

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি...
চলি যবে গেলা যমপুরে, কহ দেবি
অমৃতভাষিনী, কোন বীর বরে বরি...

অবশ্য মধুসূদন থেকে আমরা বহুদূরে সরে গেছি, যেমন রবীন্দ্রনাথ থেকেও। বাংলার ছন্দ—ছন্দরাজ্য—যথেষ্ট রকমে বিস্তৃত হয়ে গিয়েছে, বিস্তৃতিও হয়েছে, বৈচিত্র্যও হয়েছে প্রায় অপরিসীম। তবে সে আর এক কাহিনী—

এজরা পাউণ্ড (Ezra Pound) একটা মজার কথা বলেছেন এ প্রসঙ্গে। কবিতার ছন্দ বা সুর রয়েছে তার বাক্যের কথার এবং অর্থের বাইরে। এ সব ছাড়িয়ে সে প্রায় নিরপেক্ষ ও স্বাধীন। বিদেশী ভাষা, যে ভাষা জানিনা বুদ্ধি দিয়ে—তার কবিতা শুনতে হয়—অর্থ যখন বুঝিনা, বাক্যের রূপ যখন দেখিনা—'রূপ না দেখত, গুণ না শুনত'—তখনই বিশুদ্ধ ধ্বনিটি পাই। ধ্বনির রোল ধরতে পারি শ্রুতিতে। কিছুকাল থেকে শিল্প-জগতে, চিত্রশিল্প-জগতে বিশেষভাবে একটা কথা চল হয়েছে, "বিশুদ্ধ শিল্প", (Pure Art), অর্থ বিষয়বস্তু-নির্মুক্ত শুদ্ধ আকার বিলাস, অর্থাৎ জ্যামিতিক-রেখা-লীলা—এরই মধ্যে শিল্পের বিশিষ্ট ঐকান্তিক সৌন্দর্য্য অবিমিশ্র সুষমার পরিচয়। আমি যে এত বিদেশী ভাষা থেকে উদ্ধৃতি বিতরণ করেছি তার ভিতরের হেতুও হয়ত এইরকম কিছু—প্রবন্ধের পণ্ডিতম্মন্যতার কৈফিয়ৎ তাই এই দিক দিয়ে।

কঠিন ডানায় ওড়া

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বীরবাহু

ফ্লা: লে: চৌধুরী সাঁতার দিয়া ছেলেদের নৌকাগুলির নিকটে গিয়া ভালই করিয়াছিলেন। কেননা, দমদম হইতে আমাদের তিনখানা অনুসন্ধানকারী বিমানের পক্ষে বিশাল সমুদ্রে তাঁহাকে ও তাঁহার সাথীদের খুঁজিয়া বাহির করা প্রায় খড়ের গাদার মধ্যে সূচটি আবিষ্কারের মতো। তখন সলিল-সমাধি হইতে নিস্তার পাওয়া সম্ভব হইত না। দুই তিন দিন অনুসন্ধানের পর বিমানবহরের ভাষায় বলা হইত 'হারাইয়া গিয়াছে', 'খুব সম্ভব সমুদ্রে ডুবিয়া মৃত্যু হইয়াছে' (**Lost. Believed drowned in the sea.**)।

গোয়াদের কাজে—বিশেষত যখন সেই বিমান ভারতীয় বৈমানিকদের উড়াইতে হইতেছে—আমাদের খুব আস্থা ছিল না। এই ঘটনায় আমাদের আস্থা একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল। ভারতীয় বৈমানিকরা সাব্যস্ত করিল গোয়াদের বিমান-পরীক্ষা কার্য্য শেষ হইলে, তাহারা কোন একটা অজুহাত সৃষ্টি করিয়া পুনরায় বিমান পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইবে। গোয়াদের পক্ষে একজন ভারতীয় বৈমানিক বিনষ্ট হওয়া কিছুই নয়; কিন্তু আমাদের বেলায় সেটা গুরুতর লোকসান কেননা ভারতীয় বৈমানিক মানে আমরাই মুষ্টিমেয় কয়েকজন।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি একশত চার নম্বর ভারতীয় স্কোয়াড্রনের বিশাখাপটনম যাওয়ার হুকুম আসিল। তখন দক্ষিণ ভারতে, মাদ্রাজ ও কোচীন ছাড়া আর কোথাও বিমানবহর ছিল না। বাঙ্গালোরে বিমান মেরামতের কারখানা গড়িয়া উঠিতেছিল মাত্র। আর নানা জায়গায় বিমান-বন্দরগুলি তখন সবে প্রস্তুত করা হইতেছে।

এপ্রিল মাসের প্রথম দিবসে, দুইখানা ওয়াপিটি বিমানে আমরা চারজন বৈমানিক ও একটি শুকপক্ষী রওনা হইলাম। প্রথম বিমানে, অর্থাৎ ৩৪ নম্বর ওয়াপিটিতে বৈমানিক-দ্বয় স্কো: লী: সমল ও আমি। ও দ্বিতীয় ওয়াপিটিতে নবাগত বৈমানিক পাইলট অফিসার জগজিৎ সিং ও কর্পোরাল ক্রিচলো ও শুকপক্ষী।

শুকপক্ষী লওয়ার একটি কারণ ছিল। প্রত্যেক জঙ্গী বহরেই প্রতীক (Mascot) রাখার প্রচলন বরাবরই আছে, পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। প্রতীকের তাৎপর্য্য অনেকটা এইরকম যে যতক্ষণ প্রতীক খেলিয়া, নাচিয়া, কুঁদিয়া চলিবে, ততক্ষণ সেই জঙ্গী বহরও খেলিয়া নাচিয়া-কুঁদিয়া যুদ্ধ করিবে। প্রতীকের বিপদ উপস্থিত হওয়া অর্থ, সেই জঙ্গী

বহরেরই বিপদ। প্রতীক বিপন্নপ্রাণ হইলে, সেই বহরের প্রত্যেকেরই মহাবিপদ আসন্ন। প্রতীকের philosophy পুরাকালের গল্পে রাক্ষসদের প্রাণ মধুমক্ষিকা বা ভোমরার মধ্যে আবদ্ধ থাকার মত। গল্পের রাজপুত্র সেই ভোমরা বা মধুমক্ষিকা মারিতে পারিলেই রাক্ষসকুলের বিনাশ হইল—তখন রাজকন্যাকে লইয়া যাওয়াতে রাজপুত্রের আর কোন বাধা নাই। কলিকাতার হগ মার্কেট হইতে অনেক খোঁজাখুঁজির পর শুকপক্ষীটি সংগৃহীত হইয়াছিল। এবং এই শুকপক্ষীটি যে বহুগুণের আধার সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ একমত ছিলেন। এখন শুকপক্ষীর রক্ষা করার সম্পূর্ণ ভার পড়িল কর্পোরাল ক্রিচ্‌লের উপর। ভার দেওয়ার সময় শুকপক্ষীর আহার বিহার ব্যবহার সব রকম বিষয়েই আমাদের স্কোয়াড্রনের সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদগণ কর্পোরাল ক্রিচ্‌লেকে অবহিত থাকিতে সাবধান করিয়া দিলেন।

প্রত্যূষে রওনা হইয়া প্রথমে পৌঁছাইলাম বহুরভঙ্গ ষ্টেটের বারিপদা বিমানবন্দরে। সেখানে পূর্ব্বেও কয়েকবার গিয়াছি। কোন অসুবিধাই হইল না। উপরন্তু বিমানবন্দরের লোকজনের সহিত পূর্ব্বেকার আলাপ থাকায় বিমানে পেট্রল ভর্ত্তি করারও সুবিধা হইল। সেখান হইতে বেলা দশটা নাগাদ রওনা হইয়া মধ্যাহ্নের পর ভুবনেশ্বরে পৌঁছান গেল। আকাশে উড়িয়া আসিবার সময় ককপিট খোলা রাখায় গরমবোধ হয় নাই। কিন্তু ভুবনেশ্বরে নামা মাত্র অসম্ভব গরম বোধ হইতে লাগিল। সাথে দমদম হইতে আনীত বিমান-বহরের আহার্য্য কিছু ছিল। ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও তা আহার করা গেল না।

ভুবনেশ্বর হইতে বিশাখাপটনম পর্য্যন্ত আমাদের কাহারও পূর্ব্বে যাওয়া হয় নাই। এই উপকূলভাগের ম্যাপ প্রত্যেক বৈমানিকের নিকটেই ছিল। বিশাখাপটনম একেবারে সমুদ্রের উপরে। পূর্ব্বদিকে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমে সিমাচলম পাহাড়। কাজেই পথ ভুল হইবার কোন আশঙ্কাই আদৌ ছিল না। উদ্বেগের কারণ ছিল শুধু হাওয়ার চাপ কম-বেশি হওয়ার। যেখানে হাওয়ার চাপ কম, যেমন নদীর চড়ার ঠিক উপরিভাগের আকাশে, সেখানে পৌঁছান মাত্র, বিমানের গতি হ্রাস না হইয়া, হঠাৎ উচ্চতা করিয়া যাইবে, অর্থাৎ বিমান সোজা নীচের দিকে পড়িয়া যাইতে থাকিবে যতক্ষণ না সমচাপ অবস্থায় হাওয়ায় পৌঁছায়। অনেক সময়, এই কারণে বিমান হাজার দুই হাজার ফিট পর্য্যন্ত পড়িয়া যাইতে পারে। ইংরাজি ভাষায় এইগুলির নাম 'এয়ার পকেট'। এয়ার পকেটগুলিকে সকল বৈমানিকরাই সমীহ করিয়া চলে। আবার এয়ার পকেট পার হইলেই হাওয়ার চাপ বেশী হইবে; তখন সেই বেশী চাপের দরুণ, বিমান হঠাৎ ঠেলিয়া উর্দ্ধে উঠিয়া পড়িবে। হঠাৎ উর্দ্ধে উঠিলে, অনেক সময় শরীরের উর্দ্ধভাগ (যেমন মস্তক, চক্ষু, নাসিকা) হইতে রক্ত সরিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ও সেই কারণে এই সময় অনেকে অচৈতন্য অবস্থাও প্রাপ্ত হয়। আবার এয়ার পকেটে পড়িয়া যাওয়ার সময় বৈমানিকের পেটের ভিতরকার যন্ত্রপাতি উর্দ্ধে অর্থাৎ বুকের মধ্যে আসিয়া আরও উপরের দিকে চাপ দিতে থাকে।

এই অবস্থায় দর বন্ধ হওয়ার মত হয়। এই দুই অবস্থার কোনটাই বৈমানিকরা পছন্দ করে না।

সেইজন্য সামান্য আহার করা হইল।

এইবার বিমানে পেট্রল পুনরায় ভরা হইল। পেট্রল আমাদের সাথেই ছিল—বেআইনিভাবে। কতকগুলি চারগ্যালন টিনে পেট্রল ভর্ত্তি করিয়া বিমানের খোলের পিছনের দিকে, বিমানের সাথে রশি দিয়া বাঁধা ছিল। দড়ি খুলিয়া টিনগুলি বাহির করিবার পর একটা একটা করিয়া টিন তুলিয়া বিমানের ট্যাঙ্কে পেট্রল ভরিতে অনেক সময় লাগিয়া গেল। বেআইনিভাবে পেট্রল লওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। পথে অর্থাৎ বারিপদায় বা ভুবনেশ্বরে পেট্রল পাওয়ার নিশ্চয়তা ছিল না।

বিশাখাপটনম পৌঁছাইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। বিমান দুইটি সেই রাত্রির মত ক্যাসুরিনা বনে রশি দিয়া মাটিতে পোঁতা খোঁটার সাথে বাঁধিয়া রাখা হইল।

বিমান পৌঁছানর কিছুক্ষণের মধ্যেই মোটর গাড়ীতে সৈন্য বিভাগের একজন অফিসার আসিয়া বলিলেন যে রাত্রিবাসের জন্য কোষ্টাল ডিফেন্স ব্যাটারীর একটা ছাউনি আমাদের জন্য আলাদা করিয়া রাখা আছে। ব্যারাকটির অবস্থিতি খুব দূরে নয়, সামান্য পাঁচ মাইল মাত্র, আর সৈন্যবিভাগের নিয়ম অনুযায়ী এক কমাণ্ডিং অফিসার, অর্থাৎ স্কোঃ লীঃ স্বলে ছাড়া, অন্য সবাইকেই মার্চ করিয়া ব্যারাকে পৌঁছাইতে হইবে, এবং এয়ারফিল্ডেও হাঁটিয়াই ফিরিয়া আসিতে হইবে। গাড়ী পাওয়া যাইবে না।

একে সারাদিন প্রায় উপবাস, তাহার উপর সারা অপরাহ্ণ এয়ার পকেটের সাথে লড়িতে হইয়াছে, আর সর্ব্বোপরি আমরা যতশীঘ্র সম্ভব এখানে পৌঁছাইবার চেষ্টা করিয়াছি যাহাতে জাপানী নৌ ও বিমান বহরের হাত হইতে এই লোকগুলিকে রক্ষা করা যায়, তাহার পুরস্কার কিনা পাঁচ মাইল মার্চ করিয়া ব্যারাকে যাওয়া ও পরদিন প্রত্যুষে পুনরায় আসা। আমরা স্কোঃ লীঃ স্বলকে বলিলাম তিনি গাড়ীতেই যান, আমরা কয়েকজন ঐ ক্যাসুরিনা বনেই রাত্রি কাটাইয়া দিব। খানাপিনার আপ্যায়নের প্রয়োজন নাই। দমদম হইতে আনীত স্যাণ্ডউইচগুলি এখনও আছে। প্রয়োজন শুধু কিছু জলের। আমাদের প্রস্তাব শুনিয়া সৈন্যবিভাগের অফিসার নরম হইলেন। বলিলেন সেই রাত্রির জন্য গাড়ী করিয়াই তিনি আমাদের ব্যারাকে পৌঁছাইয়া দিবেন। ব্যারাকে অনেক সুবিধা; ঘর আছে, জল আছে, আরও আছে গরম গরম খাবার। স্কোঃ লীঃ স্বলের অনুরোধে আমরা সবাই গাড়ীতে করিয়াই ব্যারাকে যাইতে রাজী হইলাম। পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত ব্যারাকে পৌঁছাইতে প্রায় এক ঘন্টা সময় লাগিল। পৌঁছাইবার পর হাড়ে হাড়ে বুঝিলাম ক্যাসুরিনা বনে থাকাই এর চেয়ে ভাল ছিল। ব্যারাকে ঘর মানে ঘরই, উপরে করগেট টিনের ছাদ, তিন পাশে জানালাশূন্য দেওয়াল, সামনে বাঁশের ঝাপরী, আর ঘরের মেঝে তৈরি সমুদ্রতীরের বালু দিয়া। আসবাবের কোন বালাই নাই, চারপাই পর্য্যন্ত নাই, কারণ সৈন্য বিভাগে

এইগুলির প্রয়োজনবোধ তখন জাগিয়া ওঠে নাই। জলের বন্দোবস্ত ভাল; এক লাইনে তিন চারিটা জলের কল ও কল খুলিলে খুব তেজে জল পড়ে। স্নানের ঘর কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে কর্ত্তারা জলের কলগুলি দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু বিশেষরূপে ভাল বন্দোবস্ত দেখা গেল প্রাতঃকৃত্যের জন্য। দুই ব্যারাকের মধ্যখানে তিন দিকে ঘেরা, একদিকে খোলা, উপরে উন্মুক্ত আকাশ, নীচে সমুদ্রের বালুকারাশি—এই ঘর ব্যবহারের প্রমাণ চারিদিকে বর্ত্তমান। যাহা হউক খুব আরামে স্নান সারিয়া, ব্যারাকের এক কোণা পরিষ্কার করিয়া আমরা বালুকার উপর শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু এত আরামেও সে রজনী বিনিদ্রই যাপন করিতে হইল বালির মাছি ও মশা কামড়ানর উপদ্রবে। অগত্যা তিনজনে গল্প করিয়াই রাত ভোর করা গেল।

পরদিন কো: লী: সবলকে বুঝান হইল যে আমাদের পক্ষে বিমানের কাছে কাছে থাকাই সমীচীন। তাহাতে বিমানের প্রতি নজর রাখা ও প্রয়োজন হইলে অল্প সময়েই বিমান প্রস্তুত করিয়া উড়িয়া যাওয়া সম্ভব। এই ব্যবস্থায় শুধু কয়েকটা তাঁবুর প্রয়োজন হইবে। তিনি রাজি হইলেন। সৈন্যবিভাগ হইতে তাঁবু আসিল। আমরা তিন চারিটা তাঁবু খাড়া করিয়া লইলাম। বাঁশ কাটিয়া চারপাইয়ের মত করিয়া তাঁবুর ভিতর মাটিতে বসাইয়া ফেলা গেল। তাহার উপর দুইটা কম্বল ও চাদর বিছানর ফলে উত্তম আরামদায়ক শয্যা প্রস্তুত হইল। অনু সৈন্যবিভাগ হইতেই প্রথম কয়েক দিন আসিল। কিন্তু সে অনু খাওনে আমাদের চার জনেরই প্রথম দিন হইতেই অরুচি সুরু হইয়াছিল।

বিমান বন্দরের উড়নপথ তখনও প্রস্তুত সম্পূর্ণ হয় নাই। ক্যাসুরিনা জঙ্গল কাটিয়া একদিকে ছোট রানওয়ে তৈয়ারী হইতেছিল। অন্যদিকে বড় বম্বার উড়িয়া যাইবার উপযোগী চওড়া ও লম্বা উড়নপথের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করা হইতেছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই বিমানবন্দর হইতে বড় বড় বোমারু বিমান উড়িয়া গিয়া বর্ম্মায় ও বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে অবস্থিত জাপানী নৌবহরের উপরে বোমা ফেলিবে স্থির হইয়াছিল। সেইজন্য বড় রানওয়ে সম্পূর্ণ কংক্রীটের উপাদানে নির্ম্মিত হইতেছিল।

দুই একদিনের মধ্যেই একখানা অতি পুরাতন ফোর্ড ভ্যান আমরা পাইলাম। গাড়ী পাওয়ার পর অবসর সময় পাইলেই আমরা বিশাখাপটনম ও ওয়ালটেয়ার সহর ঐ গাড়ীতে পরিক্রমণ করিয়া আসিতাম। কয়েকদিনের মধ্যেই এই দুই স্থানের সকলেই আমাদের বিলক্ষণ চিনিয়া ফেলিল। ভাঙ্গা ফোর্ড ভ্যানের আওয়াজ পাইলেই, সকলে রাস্তা ছাড়িয়া দূরে সরিয়া যাইত। আমরাও বাহাদুরী করিয়া সেই ভাঙ্গা গাড়ী যত জোরে চালান উচিত নয়, তত জোরে চালাইয়া, ধুলা উড়াইয়া পথিক ও অন্য গাড়ীর আরোহীদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিতাম। ঐ জায়গায় পুলিস বিমানবাহিনীর লোকজন পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই; সেইজন্য বোধহয় আজব চিজ মনে করিয়া সম্মানের দৃষ্টিতে শুধু আমাদের দিকে তাকাইয়াই দেখিত, কিন্তু কিছু বলিত না।

এদিকে প্রত্যহ প্রত্যূষে, সূর্য্য উঠিবার কিছু পূর্ব্বে ও সন্ধ্যায় প্রাক্‌কালে, অর্থাৎ ডন্ ও ডাস্ক পেট্রল, আমরা সমুদ্রের উপরে, বিশেষত দক্ষিণদিকে সমুদ্রের উপকূল হইতে পনর বিশ মাইলের মধ্যে, করিতে লাগিলাম। বিমান দুইটি ও বৈমানিক চারজন। তাহার মধ্যে দুইজনকে আবার উড়িয়া আসিবার পর বিমান দুইটিকে পরীক্ষার কাজও সম্পন্ন করিতে হইত।

নিজস্ব মোটর গাড়ী থাকায় আমাদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। পাশের গ্রামে গুড্‌লু অর্থাৎ ডিম পয়সায় একটা ও পলু অর্থাৎ আনারস তিন চার আনায় একটা মিলিত। পাশের গ্রামের নাম নিন্দি। আমরা সবাই পরে "আমাদের নিন্দি গ্রাম" বলিতাম। গ্রাম-বাসীরা অতি সরল, কিছুতেই ঠকাইতে জানিত না। গ্রামের এক অবস্থাপন্ন কৃষক ক্যাম্পে আসিয়া আমাদের কি প্রয়োজন সব জানিয়া গিয়া ছেলেদের মারফৎ পাঠাইয়া দিতেন। এমন কি গ্রামের কি একটা উৎসবে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়াও লইয়া গেলেন। এই ভাবেই ৬ই এপ্রিল সকাল পর্য্যন্ত পার হইয়া গেল। সন্ধ্যার পেট্রল হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমরা একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। কারণ জাপানী নৌবহর দূরে দেখা গেল। তাহারা দক্ষিণপূর্ব্ব দিক হইতে ধীর গতিতে কোকোনদের দিকে আসিতেছিল। নৌবহরের সাথে বিমানবাহী জাহাজও একটা ছিল। বর্ম্মায় জাপানী জিরো বিমানের সাথে সাক্ষাৎ আমাদের হইয়াছিল; সেইখানেই জিরোর তেজের কথা অবগত হইয়াছিলাম। এখন আমাদের নিকট দুইখানি হোয়াট্-এ-পিটি বিমান ও জাপানীদের নিকট এক জাহাজ ভর্ত্তি জিরো ও বোমারু বিমান। জিরোর সাথে সাক্ষাৎ সমরে কি ফল হইবে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

জাপানী নৌবহর যে ভারতের পূর্ব্ব উপকূল ধরিয়া উত্তর দিকে আসিতেছিল, সে কথা আমরা অবগত ছিলাম। এই ডন ও ডাস্ক পেট্রল করার কারণও তাহাদের গতিবিধি আমাদের নজরে রাখা। আমাদের দুইখানা বিমান লইয়া তাহাদের বাধা দেওয়া সম্ভব ত হইবেই না, বরঞ্চ পরম নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় হইবে বিবেচনায় আমরা দূর হইতেই তাহাদের গতিবিধির উপর নজর রাখার চেষ্টা করিতেছিলাম। আমরা এমনভাবে উড়িয়া যেদিবার কাজ করিতেছিলাম যাহাতে জাপানীরা আমাদের কার্য্যকলাপের অস্তিত্ব টের না পায়। দূর হইতে জাপানীদের নৌবহর দেখিতে খুব সুন্দর দেখাইতেছিল। অনেকটা আঁকা ছবির মত, কিন্তু সেই ছবির মধ্যেই সব মারণাস্ত্র লুকান ছিল।

৬ই এপ্রিল তাহাদের বিমান কোকোনদে কয়েকটা বোমা ফেলে। বিশাখাপটনমে সে সংবাদ পাইতে আমাদের কয়েকদিন দেরী হয়।

৭ই এপ্রিল সকালের পেট্রলে তাহারা আরও কিছু উত্তর দিকে আসিয়াছে দেখা গেল। সেইদিন তাহাদের দুই তিনটা বিমান ওয়ালটেয়ার সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত সি ভিউ হোটেলের সন্নিকটে কয়েকটা বোমা ফেলে। বোমা সবগুলিই প্রায় সমুদ্রের জলের মধ্যে পাথরের উপরে অথবা উপকূলে বালুকার উপর পড়ে। এই অর্দ্ধনিমজ্জিত পাথরগুলি বিমান হইতে

অনেকটা ছোট ছোট জাহাজ বা সাবমেরিনের মত দেখাইত। আমরাও এই পাখরগুলি প্রথম যখন দেখি, তখন ডুবোজাহাজ বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম। জাপানী বৈমানিকরাও সেই ভুল করিল বলিয়াই আমরা মনে করিলাম। জাপানী বৈমানিকরা অনায়াসেই বিশাখা-পটনম ডকে বোমা ফেলিতে পারিত। অথবা জাপানী নৌবহর উপকূলের নিকটে আসিয়া জাহাজ নির্মাণের ডকে বিনা বাধায় গোলাবর্ষণ করিতে পারিত। তাহাদের বাধা দেওয়ার মত শক্তি তখন নিকটে ছিল না। তবু তাহারা কেন যে কয়েকটা বোমা উপকূলভাগে ফেলিয়া সরিয়া পড়িল তাহা এখনও জানা যায় নাই।

বোমা বিস্ফোরণের শব্দে মনে হয় এইগুলি পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের বেশী ছিল না। এবং কয়েকটা পাথর ফাটান ছাড়া আর কোন ক্ষতিও করে নাই।

এই বোমা ফেলার প্রতিক্রিয়া সেই দিন রাত্রি হইতেই শুরু হইল। সাধারণ সহরবাসীরা সব ভয়ে দলে দলে সহর ত্যাগ করিয়া পলাইল। পরের দিন সহরে গিয়া দেখা গেল যে কোন দোকান খোলা নাই। সব বন্ধ। ডাকাডাকিতে কেহই জবাব দেয় না। সহরে বাড়ীঘর সব বাহির হইতে তালাবন্ধ। মজাটা জমিয়া উঠিল যখন কোষ্টাল ডিফেন্স ব্যাটারী ও সেনাবিভাগও সহর এবং তাহাদের ক্যাম্প ত্যাগ করিয়া সিমাচলম পাহাড়ের পশ্চিমে চলিয়া গেল। এ কয়দিন আমাদের উদরপূর্তির রসদ প্রত্যহই আসিত কোষ্টাল ডিফেন্স ব্যাটারীর মারফৎ। কিন্তু কো: ডি: ব্যাটারী ক্যাম্প ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় আর, আই, এস, সিন্ধ (রয়াল ইণ্ডিয়ান সাপ্লাই কোর) দায়িত্ব ফুরাইয়া গেল। এতে আর কিছু না হউক, বিমান বাহিনীর আমাদের কয়েকজনের হইল সঙ্কট। কো: নী: স্মলের পরামর্শে খাদ্য এবার আমরা নিজেরাই সংগ্রহে মন দিলাম। সকালে ও বিকালে একখানা করিয়া বিমান উড়ান হইত ও অন্য বৈমানিকরা আহার্য্য সংগ্রহে রত থাকিত। এই আহার্য্য সংগ্রহ ব্যাপারে, আমাদের প্রতিযোগিতার নানারূপ ফল দেখা গেল। আমিষ আহার্য্য সংগ্রহে আমরা সকলেই সমান কৃতী ছিলাম। কিন্তু কো: নী: স্মল সকলকে হারাইয়া দিলেন যেদিন কয়েকটিন বিলাতি অশ্বমাংস লইয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে অশ্বমেধ যজ্ঞ হইত ও যজ্ঞেরপর অগ্নিপক্ক অশ্ব নিশ্চয়ই ফেলিয়া দেওয়া হইত না বিবেচনায় বিলাতি অশ্বের বিলাতে পক্ক মাংসও আমরা পরম আদরে গ্রহণ করিলাম।

এই সময়ের একটা সামান্য ঘটনার কথা বলি। একদিন পদব্রজে সহর অভিমুখে চলিয়াছি। পরণে সবুজ রংয়ের পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত ঢাকা পাৎলুন ব্যাট্‌ল্ ড্রেস ও পায়ে বোজা বুট; মাথায় বড় ফেল্ট হ্যাট্। গা সম্পূর্ণ খালি; ঘাড়ের নীচে রৌদ্রে ফোস্কা পড়িয়াছে। গালে অর্দ্ধ ইঞ্চি লম্বা কাল চাপ দাড়ি, আর গোঁপ জোড়াটি পাকাইয়া উপরের দিকে তোলা প্রায় চক্ষু পর্য্যন্ত। কোমরে বেল্ট, তাহাতে ছোট একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও হাতে ঝোলান টমশন্ সাব্ মেসিনগান। চেহারা সুন্দরই বলিব। আমি চলিয়াছি চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া। পিছনের দিক হইতে একটা ষ্টেশন ওয়াগন

আসিতে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইলাম। গাড়ী আসিয়া পাশে দাঁড়াইল। ভিতরে মাত্র একজন; তিনি নিজেই গাড়ীর চালক। সৈন্যবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। জিজ্ঞাসা করিলেন কোন দিকে যাইতেছি। বলিলাম সহরে খাদ্য সংগ্রহে। গাড়ীর ভিতরে উঠিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, তিনিও ঐ দিকেই যাইতেছেন; সহরে আমাকে নামাইয়া দিবেন। গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী চলিবার একটু পরেই উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীটি এক কুপ্রস্তাব করিয়া বসিলেন। আমিও সাবমেসিন গান তাঁহার দিকে ঘুরাইয়া ধরিয়া গাড়ী তৎক্ষণাৎ থামাইতে হুকুম করিলাম। আগ্নেয়াস্ত্র তাঁহার দিকে নিশানা করিতে তিনি একটু ভীত হইয়াই গাড়ী থামাইলেন। নামিয়া গিয়া তাঁহাকে বলিলাম এরূপ প্রস্তাব তিনি যেন আর কাহাকেও কখন না করেন। তিনিও বুদ্ধিমান লোকের মত দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেলেন। এখন আর সহরে না গিয়া সোজা ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিয়া সব কথা কো: লী: সকলকে জানাইলাম। তিনি কর্ম্মচারীটিকে চিনিতে পারিয়া বিশেষ উদ্বেগ বোধ করিলেন। যাহা হউক তখনই এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হেড্ কোয়ার্টারে পাঠাইলেন। উদ্বেগ কাটিয়া গেল যখন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীটি স্থানান্তরে বদলি হইয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে দমদম হইতে আরও কয়েকজন এঞ্জিনীয়ার বৈমানিক রেল গাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদের মধ্যে সার্জেন্ট হার্ডে ও এল, এ, সি, ল্যাফার্টিও ছিল। স্পেশাল ট্রেনে প্রায় দুইশত জন বৈমানিক আসিতেছে, সে সংবাদও পাওয়া গেল।

স্পেশাল ট্রেনের যাত্রীরা সবই আমাদের ডোরাডুনের বৈমানিক। কাজেই ট্রেন আমাদেরই বলা চলে। একজন বৈমানিক অফিসার ট্রেনের কমাণ্ডিং অফিসার নিয়োজিত হইয়াছেন। তাঁহার চকুমে দ্বিপ্রহরে ও সায়াহ্নে কোন ছোট ষ্টেশনের সাইডিংয়ে গাড়ী থামাইয়া, কিচেন কামরায় বা বাহিরে চুলা হাঁড়ি ডেক্‌চি নামাইয়া যাহা সহজে অল্পায়াসে সম্ভব, যেমন পলান্ন, সেই প্রকার রান্না করিয়া সকলে গ্রহণ করিত। সকলের আহার সমাপ্ত হইলে এঞ্জিন ড্রাইভারকে হুকুম দেওয়া হইত ট্রেণ চালাইতে। অনেক সময় আবার বিপরীত দিক হইতে গাড়ী আসার জন্য কয়েক ঘন্টা পর্য্যন্ত সাইডিংএ অপেক্ষা করিতে হইত। এই সব কারণে স্পেশাল ট্রেনের দমদম হইতে বিশাখাপটনম পৌঁছিতে প্রায় দিন দশেক লাগিয়া যায়।

স্পেশাল ট্রেনে দুইশত জন বৈমানিক আসিতেছে। এই বার বড় ক্যাম্পের প্রয়োজন। নানা জায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখার পর মিশি গ্রামের পাশে বালুকাময় প্রান্তরে ক্যাম্প করা সাব্যস্ত হইল। বড় তাঁবু, ছোট তাঁবু কোথায় কোনটা তোলা প্রয়োজন, কোথায় জলের পাম্প বসান উচিত; কোথায় কিচেন, কোথায় স্লিট ট্রেঞ্চ, মোটর গাড়ী চলার রাস্তা কোন দিক দিয়া বৈরারী করিলে কাজের সুবিধা হইবে ইত্যাদি পরিকল্পনার কাজের জন্য

কয়েকদিন খুব ব্যস্ত থাকিতে হইল। এ কয়দিন বিমানের দিকে কোন নজর দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

ইতিমধ্যে দুজন বৈমানিক আর একখানা ওয়াপিটি বিমান লইয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখন আমাদের কাছে তিনখানা বিমান হইল।

একদিন সকালে ক্যাম্পে শুনিলাম যে আমাদের একটি বিমান উড়িয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই ধপাস করিয়া পড়িয়া গিয়াছে। শীঘ্র বিমান বন্দরে আসিয়া বিমান পরীক্ষা করিতে গেলাম। চালক ছিলেন পাঃ অঃ জগজিৎ সিং। তিনি বলিলেন বিমান মাটি ছাড়িয়া ওঠা মাত্র প্রপেলারের ঘোরা বন্ধ হইয়া যায়। বিমান ও বৈমানিক দুইজনের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ তিনি বিমানকে বন্দরের দিকে ঘুরাইতে চেষ্টা করেন; কিন্তু যথেষ্ট উচ্চতা না থাকায় রানওয়ে পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারেন নাই। চারিদিকে ছোট বড় নানা আকৃতির গাছ ছিল। সেইগুলির মাঝখান দিয়া গোরুর গাড়ী চলিয়া চলিয়া একটা আঁকা-বাঁকা রাস্তা তৈয়ার হইয়াছিল। অগত্যা তিনি সেইখানেই বিমান অবতরণ করান। বিমানের নিকট গিয়া প্রপেলার ঘুরাইতে পারিলাম না। মনে হইল এঞ্জিনের ভিতর যেন কিছু শক্ত হইয়া আটকাইয়া গেছে। লোকজন সংগ্রহ করিয়া বিমান এক গাছের তলায় আনার পর এঞ্জিন ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলাম। পরীক্ষার ফল হৃদয়ঙ্গম হওয়ার সাথে সাথে মস্তক ও শরীরের উত্তাপ প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। এঞ্জিন পরিষ্কার করিবার এক খণ্ড কাপড় তৈলের ট্যাঙ্কের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। কাপড় খণ্ডের এক অংশ ট্যাঙ্ক হইতে এঞ্জিনে তেল যাওয়ার নলের মধ্যে আটকাইয়া গিয়া তেলের গতি রোধ করিয়াছে। যাহার ফলে এঞ্জিনের খানিকটা অংশ অতিমাত্রায় গরম হইয়া আটকাইয়া গেছে। খাতাপত্রে দেখিলাম এল, এ, সি, ল্যাফার্টি বিমান উড়িবার পূর্বে পরীক্ষা করিয়াছে, এবং তেল ও পেট্রল ভর্তি করিয়াছে।

পরীক্ষার ফল কাহাকেও কিছু না বলিয়া সোজা স্কোঃ লীঃ সবলের নিকট গিয়া তাঁহাকে সমস্ত ব্যাপার জানাইলাম ও সেই সাথে বলিলাম গোরা এঞ্জিনীয়ার বৈমানিকদের উপর আস্থা সম্পূর্ণ হারাইয়াছি। তিনখানা বিমানের মধ্যে একখানা এইবার গেল। এই সময় ওয়াপিটি বিমানের নূতন এঞ্জিন পাওয়া অসম্ভব হইবে। কাজেই দুইখানা বিমান দিয়াই আমাদের কাজ চালাইতে হইবে। কিন্তু এই ভুলের জন্য এল, এ, সি ল্যাফার্টিকে টেক্‌নিক্যাল কোর্ট মার্শালের জন্য চার্জ করিতে হইবে। না হইলে ভারতীয় বৈমানিকদের ডিসিপ্লিনে রাখা মুস্কিল হইবে। স্কোঃ লীঃ সবল সমস্ত কথা শুনিবার পর আমাকে লইয়া তাঁহার টেন্টে গেলেন ও এল, এ, সি ল্যাফার্টিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ল্যাফার্টি আসিয়া যে কৈফিয়ৎ দিল, তাহাতে আমার পিত্ত পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গেল, কিন্তু কম্যাণ্ডিং অফিসার স্বয়ং বর্ত্তমান, কাজেই ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলাম। ল্যাফার্টি বলিল, আমাদের স্কোয়াড্রনের বিমানগুলি অতি পুরাতন কালের ও বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য অযোগ্য। সেইজন্য তেলের ট্যাঙ্কে সে নিজেই কাপড়ের

খণ্ড রাখিয়াছে, যাহাতে বিমানের এঞ্জিন মাটির উপর চালাইয়া পরীক্ষার সময় তৈল অভাবে বন্ধ হইয়া যায়। তখন এই অযোগ্য বিমান আর আমাদের চালাইতে হইবে না। এই উপায়ে সবগুলি বিমান নষ্ট হইয়া গেলেই এয়ার হেড্ কোয়ার্টার আমাদের নূতন বিমান দিতে বাধ্য হইবে। সে আরও বলিল, বিমান উড়িয়া যাইবার পর যে এঞ্জিন বন্ধ হইতে পারে, এ কথা তাহার চিন্তায় আসে নাই। এ কথা চিন্তায় আসিলে সে কখনও অমন কাজ করিত না।

এই সব কথা শুনিয়া স্কো: লী: স্মল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর ল্যাফ্যার্টিকে টেক্‌নিক্যাল কোর্ট মার্শাল চার্জ করা কয়েকদিনের জন্য স্থগিত রাখিতে নির্দ্দেশ দিলেন। ল্যাফ্যার্টিকে তাহার বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে লিখিয়া দিতে বলিলেন। কম্যাণ্ডিং অফিসারের নির্দ্দেশ অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানিতে হইল।

চালু বিমান দুইখানার মধ্যে ৫৪ নম্বরের অবস্থা দেখিলে কষ্ট হইত। এই বিমান বিনা মেরামতে এতদিন ধরিয়া উড়িতেছে। এঞ্জিন চালু করিলে, অতি বৃদ্ধের আপনা হইতেই বস্তক আন্দোলনের মত কাঠামোর উপর এঞ্জিন এদিক হইতে ওদিক নড়িত। ক্রমে এই আন্দোলন এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে যেন এঞ্জিন কাঠামো হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তখন বাধ্য হইয়াই এই বিমানকে উড়িবার ছাড়পত্র দেওয়া বন্ধ করা হইল। এইবার রহিল মোটে একখানা বিমান। এই এক বিমানের জন্য দুইশতেরও অধিক বৈমানিক।

স্কো: লী: স্মল এইবার গ্রুপ ও এয়ার হেড্‌কোয়ার্টারে নূতন বিমানের জন্য জোর আবেদন জানাইলেন। দুই তিন দিনের মধ্যে সংবাদ আসিল, আমাদের স্কোয়াড্রনের প্রস্তুতি পরিদর্শন করার জন্য স্বয়ং জেনারেল ওয়াডেল আসিতেছেন। পরদিন সকালে প্রায় দশটায় একটি টুইন বীচ্‌ক্রাফ্‌ট্ বিমানে জেনারেল ওয়াডেল রানওয়েতে অবতরণ করিলেন —পরণে হাফপ্যান্ট ও বুস্‌সার্ট। তাঁহার বাম চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; কাজেই বামদিকের কোন বস্তু দেখিতে হইলে তিনি সেদিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেন। অবতরণ করার পর প্রথমেই বিমানের চারপাশ ঘুরিয়া একবার চারিদিক দেখিয়া লইলেন। প্রথমে স্কো: লী: স্মলের সহিত আলাপ করিয়া আমার সহিত সামান্য কিছু কথা বলিলেন। তখন উড়নপথে স্কো: লী: স্মল ছাড়া সার্জেন্ট হার্ভে ও আমি ছিলাম। কথা বলার ভঙ্গি বেশ তেজব্যঞ্জক। কিছুক্ষণ কথাতেই আমাদের উৎসাহ যথেষ্ট বাড়াইয়া দিলেন। বিমানে উঠিয়া বলিয়া গেলেন নূতন বিমান শীঘ্রই আমাদের জন্য পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন।

স্পেশাল ট্রেন পৌঁছিবার পর খুব হৈচৈ করিয়া প্রায় দুইশত বৈমানিক মিলি ভিলেজ ক্যাম্পে আসিয়া উঠিল। অনেকেই এর পূর্ব্বে টেন্টে রাত কাটায় নাই। এইবার টেন্ট-জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুবিধা তাহাদের মিলিল।

প্রথম অভিজ্ঞতা মিলিল একদিন বৈকালে বৃষ্টির পরে। বৃষ্টি যখন থামিল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হইয়াছে; সেই অন্ধকারে টেন্টের মধ্যে ও প্রান্তরে অসংখ্য কাল রংএর কাঁকড়া

চরিয়া বেড়াইতেছে দেখা গেল। টর্চের আলো জ্বালাইতে কাল কাঁকড়াগুলি বিরাট আকারের কাঁকড়াবিছায় পরিণত হইল। তখন সেগুলি ধরিয়া মারিয়া বা পেট্রল দিয়া বিনষ্ট করা হইল। সেই সময় অনেকেই জিজ্ঞাসা করিল এতগুলি কাঁকড়াবিছার হঠাৎ একসঙ্গে উৎপত্তি কেমন করিয়া সম্ভব হয়? বিন্দি গ্রামের লোকেদের নিকট পরে জানা যায় যে প্রান্তরে অবস্থিত তালগাছগুলিতে এই কাঁকড়াবিছাগুলির বাস। বৃষ্টির পরে তাহারা দলে দলে নামিয়া পড়ে। তখন সাবধান হইতে হয়, কেননা এর দংশন সবসময় মারাত্মক না হইলেও বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক।

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা হইল একদিন দ্বিপ্রহরে। আমার পাশের তাঁবুতে বড় চেঁচামেচি শুনিয়া কি ব্যাপার দেখিতে গেলাম। গিয়া দেখি, তাঁবুর এক কোণায় অদ্ভুত সুন্দরদর্শন একটি সর্প। লম্বায় প্রায় চার ফুট, সেই অনুপাতে ব্যাস খুব কম, এক ইঞ্চির বেশী হইবে না। কিন্তু রংয়ের কি অদ্ভুত সমাবেশ; লাল, সবুজ ও হলুদ বর্ণের টান সমস্ত পৃষ্ঠের উপর। মস্তক হইতে লেজ পর্যন্ত, শঙ্খিনী সর্পের মত ডোরাকাটা নয়। সাধারণ সপের গতিবেগ যথেষ্ট তৎপর হয়, কিন্তু সাধারণের তুলনায় এর গতিবেগ অনেক বেশী তৎপর। অনেক চেষ্টায় ও কৌশলে সেই রংয়ের সমাবেশকে আমাদের কাছে হার মানিতে হইল। কর্পোরাল ক্রিচলে ক্ষিপ্র হস্তে ই সর্পের চর্ম বাহির করিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিল, বিলাতে লইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে। সে দেশে দেখাইবে সর্প কত সুন্দর হইতে পারে। গ্রামবাসীরা জানাইল এই সর্পের নাম হরগৌরী; এর বিষে ভয়ানক তেজ, কিন্তু গ্রামের লোকেরা আক্রান্ত না হইলে এই জাতীয় সর্পকে আঘাত করে না, কারণ এইগুলি দেবাদিদেব হর ও গৌরীর প্রতীক।

দুইশত বৈমানিক আর বিমান মোটে একটা। সেইজন্য কাজের যথেষ্ট অভাব ছিল। এইবার পি, টি, অর্থাৎ ফিজিকাল ট্রেনিং ও প্যারেড পুনরায় শুরু করান হইল। সেই সাথে বেয়নেট প্র্যাকটিস, রুটমার্চ ইত্যাদি শিক্ষার অবতারণা করা হইল। আর গ্রামবাসীরা ও সহরের দোকানীরা ফিরিয়া আসায় নানা প্রকার সুখাদ্যও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত, এবং খুব সস্তায়। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা প্রায় ভুলিয়া গেলাম যে অন্য কোথাও একটা জীবনমরণ যুদ্ধ হইতেছে। এখানে বলা প্রয়োজন বোধ করি যে আমাদের হেঁসেল একটাই ছিল: সেখানে হিন্দু, মুসলমান ও গোরারা এক সাথে বসিয়া একই খাদ্য আহার করিত। কোন বিভেদ ছিল না।

কয়েকদিন পরে অনেক কাজ পাওয়া গেল। চার গ্যালন টিনে ভর্তি হাজার হাজার গ্যালন পেট্রল সাপ্লাই কোরের লরী পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। সেই সঙ্গে গ্রুপ হেড্ কোয়ার্টার হইতে হুকুম আসিল যে বিলম্ব না করিয়া এই পেট্রল শুদ্ধ টিনগুলি মৃত্তিকাগর্ভে লুকাইয়া ফেলিতে হইবে। এখন পি, টি, ও প্যারেডের বদলে কোদাল দিয়া মাটি কাটিয়া প্রায় চার ফিট গভীর খাল কাটায় সবাই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রত্যেক খালে, চারি লাইনে একশত

করিয়া টিন রাখিয়া মাটি চাপা দেওয়ার পর, সেই স্থানের নকসা করিয়া রাখা হইল, যাহাতে প্রয়োজন মত মাটি সরাইয়া খাল হইতে পেট্রলের টিন উদ্ধার করা যায়। আমার বিশ্বাস, এখনও যদি কেহ বিশাখাপটনম এয়ার ফিল্ডের পাশে খোঁজ করে, তবে একদুই সারি পেট্রলের টিন পাইবে। পেট্রল না পাওয়াই সম্ভব, এতদিনে টিন ফুটা হইয়া পেট্রল মাটিতে মিশিয়া গেছে।

একদিন একজন গ্রামবাসী চুপিসারে আমাদের সাবধান করিয়া গেল যে জাপানী চরেরা আমাদের বিষয়ে খোঁজ খবর চারিদিক হইতে লইতেছে। আমরা সাবধানই ছিলাম। এক রাত্রে সিমাচলম পাহাড়ে আগুন জ্বলিতেছিল দেখা যায় আগুণ জ্বলিতেছিল তীরের ফলার আকারে। তীরের ফলাটা আমাদের ক্যাম্পের দিকে নিশানা করা ছিল। পরদিন সেখানে গিয়া শুধু ছাই ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। এর পর একদিন শুষ্ক খড় তীরের ফলার আকারে দুই বিপরীত দিক হইতে ক্যাম্পের দিকে নিশানা করা আছে, বিমান হইতে দেখা যায়। এই দুই স্থানেরই দূরত্ব ক্যাম্প হইতে তিন চার মাইলের মধ্যে ছিল। এই সব ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ হইল যে, জাপানি বোমারু বিমানকে আমাদের আস্তানার নিশানা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই কেহ এগুলি করিতেছে। তখন এই নিশানাগুলির উপর নজর রাখার জন্য আমরা কয়েকজন করিয়া বৈমানিক পাঠাইলাম। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও কাহাকে ধরা সম্ভব হয় নাই।

এরপর একদিন দুপ্রহরের পূর্বে নামিল প্রচণ্ড বৃষ্টি। মাত্র কয়েক ঘন্টার বৃষ্টির দরুণ নিকটের পাহাড় হইতে জলের প্লাবন নামিয়া আসিল। শুধু নামিয়া আসিলই না, আমাদের মিল্ক ডেলেক্স ক্যাম্প একেবারে ভাসাইয়া লইয়া গেল : লইয়া গেল চারপাই, বিছানা, সুটকেস, বাক্স ও কিটব্যাগ। তাঁবুর মধ্যে যাহা কিছু ছিল সবই গেল। আর সেই সাথে কয়েকটা তাঁবুও ভাসিয়া গেল একেবারে সমুদ্রে। যাহা গেল, তাহা বরাবরের জন্যই গেল, ফিরিয়া পাওয়ার আশা খুব কম। বৃষ্টি বৈকালের পূর্বেই থামিয়া গেল। তখন স্কো: লী: স্মল এই দুইশত বৈমানিকদের থাকার মত আবাস স্থান খুঁজিতে সহরে গেলেন। পাইয়াও গেলেন অতি উত্তম বাসস্থান—বিশাখাপটনম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট প্রাসাদ। সেই রাত্রেই আমি ও দুই একজন ছাড়া আর সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট প্রাসাদে স্থানান্তরিত হইল। এখন হইতে আমাদের অর্ডার্লী রুম অর্থাৎ স্কোয়াড্রনের অফিসও ঐ প্রাসাদে স্থানান্তরিত হইল। বিরাট প্রাসাদের এক উইংয়ে আমাদের স্কোয়াড্রন ও অর্ডার্লী রুম ও অন্য উইংয়ে এয়ার কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ারের অফিস ও বাসস্থান (বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন ছুটি)।

এতদিনে জেনারেল ওয়াভেল কর্তৃক আমাদের ইউনিট পরিদর্শনের ফল ফলিল। ১৪ই মের হুকুমে আমি ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য হইতে আগত পা: অ: গিলবার্ট রাঁচীতে যাইবার জন্য আদিষ্ট হইলাম। হুকুমের উদ্দেশ্য রাঁচীর পাগলা গারদে আমাদের পাঠান নয়। সেখানে রয়াল এয়ার ফোর্সের আটাশ নম্বর স্কোয়াড্রন বর্ম্মা হইতে প্রত্যাগমনের পর বিশ্রামে

ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহাদের নিকট লাইসাণ্ডার বিমান ছিল। ঠিকুনে ছিল যে পা: অ: গিলবার্ট ও আমি দুই ক্ষেপে রাঁচী যাইয়া দুইখানা লাইসাণ্ডার বিমান আটাশ নম্বর স্কোয়াড্রনের নিকট হইতে লইয়া বিশাখাপটনম পৌঁছাইব। বিশাখাপটনমে একশত চার নম্বর স্কোয়াড্রন এই দুইখানায় লাইসাণ্ডার বিমান উড়াইবার কৌশল আয়ত্ত করিবে। উড়িবার কৌশল আয়ত্তে আসিলে, আটাশ নম্বর স্কোয়াড্রন হইতে কুড়িখানা লাইসাণ্ডার বিমানই একশত চার নম্বর স্কোয়াড্রনকে দেওয়া হইবে ও আটাশ নম্বর স্কোয়াড্রন পেশওয়ারে যাইয়া হারিকেন বিমানের ট্রেনিং লইবে।

১৪ই তারিখ রাত্রের ট্রেনে রওনা হইয়া ১৬ তারিখ সকালে মুরি জংশন ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। পথে ঝানসেদপুরে দাদার নিকটও কয়েক ঘন্টা কাটান সম্ভব হইল। সেই-দিনই সকাল আটটায় রাঁচী পৌঁছিলাম। আমাদের আগমন সংবাদ আটাশ নম্বরকে পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছিল। ট্রেন হইতে নামিতেই ফ্লায়ার এয়ার ফোর্সের গাড়ী মিলিল। মনে তখন খুব উৎসাহ। গোরা গাড়ীচালককে জিজ্ঞাসা করিলাম আমাদের জন্য বিমান প্রস্তুত করিয়া রাখা আছে কিনা? জবাবে সে হাঁ-না কিছুই পরিষ্কার করিয়া বলিল না।

এয়ার ফিল্ডে গিয়া মন বেশ দমিয়া গেল। আমাদের জন্য কোন বিমানই তাহারা প্রস্তুত করিয়া রাখে নাই। আমরা পৌঁছানর পর, তাহারা যে বিমান আমাদের দিবে মনস্থ করিয়াছিল, সেই বিমান আনাইয়া পরীক্ষার কার্য্য সুরু করিল। হিসাব করিয়া দেখিলাম পরীক্ষা ও মেরামতের কার্য্য শেষ হইতে অন্ততঃ পাঁচদিন সময় লাগিবে। সেইদিনই এই অবস্থার কথা আটাশ নম্বর স্কোয়াড্রনের বেতার বার্ত্তার সিগন্যালে বিশাখাপটনমে স্কো: লী: সমরকে জানাইয়া দিলাম।

আটাশ নম্বর বিশ্রামে ছিল, সেইজন্য খাওয়া দাওয়াও বেশ ভাল ছিল। উপরন্তু প্রায় প্রত্যহই ক্যাম্প সিনেমা হলে কোন ইংরাজী ছবি দেখান হইত। মে মাসে দিনের বেলায় রাঁচীতে বেশ গরম, কিন্তু ক্যাম্প বড় বড় আমগাছের তলায় হওয়ার জন্য গরম বোধ কম হইত। বিমানের কাজ কতদূর হইল তাহা সকালে দেখিতে যাইতাম। বৈকালে ক্ষুধা বেশী করিবার জন্য কিছুদূর পদব্রজে বেড়াইয়া আসিতাম।

রানওয়ে ক্যাম্প হইতে প্রায় দুই তিন মাইল দূরে ছিল। সিরেনাইকার যুদ্ধে ভারতীয় অশ্ব বাহিনী ইটালিয়ানদের নিকট হইতে কতকগুলি মিরাটকায় ট্রাক কাড়িয়া লইয়াছিল। সেইগুলির কয়েকটা আটাশ নম্বর স্কোয়াড্রনের নিকট ছিল। তাহারা এয়ারফিল্ডে যাতায়াত সেইগুলিতেই করিত। আমিও কয়দিন সেই ট্রাকেই এয়ারফিল্ডে যাওয়া আসা করিলাম।

বিমান প্রস্তুত হইয়াছে এই কথা বিশ তারিখ বৈকালে আটাশনম্বর স্কোয়াড্রনের এঞ্জিনীয়ার অফিসার ওয়ারান্ট অফিসার ব্রাউন আমাদের জানাইলেন। তখন পা: অ: গিলবার্ট,

অ: ব্রাউন ও আমি তিনজনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম, একুশে সকালে আটটার সময় আমরা দুইজন প্রথমে বিমান টেষ্ট ফ্লাইট করিয়া দেখিয়া লইব। বিমানে কোন গলদ না থাকিলে, আর অবতরণ করা হইবে না, সোজা ভুবনেশ্বর অভিমুখে রওনা হইয়া যাইব। যদি কোন গলদ থাকে তবে অবতরণ করিয়া, মেরামতের পর রওনা হইব। সেইজন্য বিশ তারিখ বৈকালেই বিমানে পেট্রল ভরিয়া ও যাত্রার পূর্ব্বে পরীক্ষার কার্য্য সমাপন করিয়া রাখা হইবে।

(ক্রমশঃ)

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রশ্নোত্তর]

৩১ মার্চ, ১৯৫১

প্রশ্ন : শরীরের সকল ব্যাধিই কি মনের বিকৃতি থেকে আসতে পারে ? (মায়ের কথাবার্তা পড়ার প্রসঙ্গে)

উত্তর : যে মানসিক বিকৃতি থেকে তা ঘটতে পারে সে হলো—ভয়।

তবে প্রত্যেকেই তা নিজ নিজ ধরনে পরীক্ষা করে দেখতে পারো। তোমার যখন হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে গেল, তখন তলিয়ে দেখবে যে তার আগের দিনে হয়তো তোমার মনটা কোনো কারণে খারাপ ছিল, তার থেকে ওটা এসেছে। কিংবা হয়তো তোমার মেজাজ খুব বিগড়েছিল, সব কিছুতেই বিরক্তি আর অসন্তোষ ঘটছিল, তার পরের দিনই দেখলে মাথায় ঠাণ্ডা আক্রমণ করেছে।...কোনটা থেকে কি হচ্ছে তা নিজেই জানতে পারবে।

(মা তাঁর বই থেকে পড়লেন) "দেহের প্রতিটি অংশই কোনো আভ্যন্তর ক্রিয়ার প্রতীক, ভিতর থেকে বাহিরে তা একটা সূক্ষ্ম যোগাযোগের ক্ষেত্র বলা যেতে পারে...দেহের যে বিশেষ অংশটি কোনো রোগের দ্বারা অবিকৃত, তার থেকে নির্দেশ পাবে যে তোমার কোথায় কিরূপ অসঙ্গতি আছে। জানা যাবে যে তার কারণ কি, তার মূল কোথায়। আর তোমার সমগ্র সত্তার দ্রুত অগ্রগতির পথে কিসে অন্তরায় ঘটছে তাও তুমি জানতে পারবে। তার থেকে নিরাময়ের কি উপায় তাও জানা যাবে। যদি বুঝতে পারো যে কোনখানে তোমার ত্রুটি রয়েছে, কোথায় গ্রহিষ্ণুতার অভাব রয়েছে, আর সেই অংশটিকে উপরের শক্তি ও আলোর অভিমুখে খুলে ধরতে পারো, তাহলে সেই অসঙ্গতি দূর হয়ে ক্রমশ সঙ্গতি ফিরে আসবে, রোগও তখন আর থাকবে না।"

প্রশ্ন : দেহের কোন অংশটি কোন আভ্যন্তর ক্রিয়ার প্রতীক তা বলে দিন না ?

উত্তর : আগেকার কালে যারা গুরুর কাছে দীক্ষা নিতো তাদের শুধু বলে দেওয়া হতো "এটা ভালো" আর "এটা অন্যায়", কারণ তাদের আগের থেকেই কতক জানা থাকত। এ-বিষয়ে তোমাদের নিজের নিজের কার কেমন অনুভূতি আছে তা আমাকে বলতে পারো ? অবশ্য দেহের কোনো অংশের সঙ্গে কোনো বিশেষ প্রকার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার কি যোগাযোগ দেখেছ, সেই কথাই বলবে।

প্রশ্ন আমি একবার আপনাকে জানিয়েছিলাম আমার একটা ব্যথার কথা, আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে দেহের কোন অংশে ব্যথা। যখন সে কথা বলেছি তখন জানতাম না যে তার সঙ্গে প্রাণ মনের কোনো সম্পর্ক আছে, শুধু বলতেই ব্যথাটা সেরে গেল।

উত্তর : এর মধ্যে কোনো পরস্পরবিরোধ তো দেখছি না। আধ্যাত্মিক প্রণালীতে রোগ সারাবার দুই উপায় আছে। এক হলো চেতনা ও সত্যের শক্তিকে দেহের সেই ব্যথা-কাতর অংশে প্রযুক্ত করা, তার ফল অবশ্য নির্ভর করবে লোকটির নিজের গ্রহিষ্ণুতার উপর। সে যদি গ্রহিষ্ণু হয় তাহলে চেতনাশক্তি তার চাপে সেখানে স্বাভাবিক অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। তোমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা বলতে পারে শ্রীঅরবিন্দ তাদের কি ভাবে আরোগ্য করেছিলেন। তারা এমন স্পষ্টরূপেই তা জেনেছিল যেন একটি হাত এসে ব্যথাকে সরিয়ে দিলে।

আর এক উপায় আছে যেখানে ওরূপ গ্রহিষ্ণুতা নেই বা থাকলেও খুব কম, সেখানে আগে দেখতে হবে যে কোন মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার সঙ্গে যে ব্যথার যোগ আছে, এবং তারই উপর ক্রিয়া করতে হবে। তবে যদি সেই মূল হেতুটিকে বশে আনা না যায় তাহলে সেখানে বিশেষ কিছু করা যাবে না। মনে করো যদি তার মূল থাকে প্রাণসত্তায় এবং প্রাণসত্তা যদি কোনো পরিবর্তন মানতে না চায়, সে যদি তার বর্তমান অবস্থাকে আঁকড়ে বসে থাকে, সে ক্ষেত্রে কোনো আশা নেই। সেখানে তুমি যত চাপ দিতে যাবে ততই অসুস্থতা আরো বেড়ে যাবে, কারণ প্রাণসত্তা সেখানে আরো জোরে রুখে দাঁড়াবে। তেমনি প্রাণসত্তা ছাড়া মন বা অন্য অংশও ঐরূপ অবাধ্য হতে পারে।

যদি তোমার চেতনাশক্তি সেই ব্যথার উপর সরাসরি গিয়ে কাজ করে তাহলে হয়তো তুমি সাময়িক আরাম পেতে পারো, কিন্তু কয়েক ঘন্টা বা কয়েকদিন পরে আবার তা ফিরে আসবে। কারণ প্রাণের ভিতরকার মূল কারণটি তুমি দূর করতে পারোনি, কেবল তার ক্রিয়াফলটিকে তুমি সরিয়েছিলে। কিন্তু যদি কারণ ও তার ক্রিয়াফল দুই দিকেই তুমি একযোগে শক্তি প্রয়োগ করতে পারো, আর যেখানে মূল কারণ রয়েছে সেই স্থান যদি পরিবর্তন মানে, তাহলে তুমি সম্পূর্ণই সুস্থ হবে।

প্রশ্ন একবার আমার এমন অসুখ হয়েছিল তা ঠিক যেন এক অনুভূতির মতো। আমার মনে একটা ঈর্ষা জাগাতে তাকে আমি দূর করতে চাই। সেদিন রাত্রে আমার দেহে খুব চাপ বোধ হতে থাকল, হাতের মসৃণগুলি পর্যন্ত ব্যথায় ভরে গেল। আমি ভাইকে দিয়ে আপনাকে খবর পাঠালাম। আপনি বললেন, কয়েক ঘন্টার মধ্যে আরাম না হলে ডাক্তার পাঠাবেন। সে এ-সব কথা আমাকে বলতে ভুলে গেল, কিন্তু পরে জানতে পারলাম যে ওকথা যখনই আপনি বলেছিলেন ঠিক তখনই ব্যথা সেরে গিয়েছিল।

উত্তর : আমি তা জানতাম।

প্রশ্ন : দেহের গ্রহিষ্ণুতা কেমন করে বাড়ানো যায় ?

উত্তর : দেহের অংশগুলির উপর তা নির্ভর করে। সত্তার সকল অংশে প্রায় একই রকমের ব্যাপার হয়। প্রথম কর্তব্য হলো যতদূর সম্ভব শান্ত অচঞ্চল হয়ে থাকা। তোমার সত্তার বিভিন্ন অংশে এটা লক্ষ্য করে থাকবে যে কোনো কিছু সেখানে এসে পড়লে তুমি যদি তাকে না চাও তাহলে তখনই কেমন আড়ষ্ট হয়ে ওঠো—প্রাণে মনে দেহে একটা কাঠিন্য এসে যায়। জায়গাটা গুটিয়ে গিয়ে সেখানে টনটন করে, অতে ব্যথাও বোধ হতে থাকে, প্রাণে মনে বা দেহে। তখন তোমার প্রথম কাজ হবে ইচ্ছাশক্তির জোরে সেই আড়ষ্টতাকে শিথিল করে দেওয়া, যেমন হঠাৎ শির টেনে ধরলে ক'রে থাকো ; সমস্ত আলস্য করে দিয়ে নিজেকে "ছেড়ে দিতে" শিখতে হবে, দেহের সকল অংশেই যাতে শিথিলতা আনতে পারো। মন প্রাণ বা দেহের শিথিলতা ভিন্ন প্রকারের হতে পারে, কিন্তু যুক্তির দিক থেকে জিনিসটা একই। টানের অবস্থা শিথিল হলে তখন লক্ষ্য করে দেখবে, অস্বস্তি যদি আর না থাকে তাহলে বুঝবে ব্যাপারটা ছিল সায়বিক ; কিন্তু ব্যথা যদি তখনও থাকে এবং সাহায্য পাবার জন্য তোমার গ্রহিষ্ণুতা বাড়ানো দরকার, তাহলে তখন নিজেকে শিথিল করে এলিয়ে দিতে চেষ্টা করবে, বোধ করতে থাকবে যেন আমি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে প্রসারিত হয়ে গেছি। এর পক্ষেও নানারকম পদ্ধতি আছে। কেউ বা মনে করতে থাকে আমি বিপুল জলরাশির মধ্যে একটা তক্তার উপর ভাসছি। তার পর বাড়তে বাড়তে তারা এতই বিস্তারলাভ করে যে সেই জলরাশির সঙ্গে সমান সমান হয়ে যায়। কেউ বা মুক্ত আকাশ ও আকাশভরা নক্ষত্রাদির সঙ্গে একাত্ম হতে চেষ্টা করে, আর নিজেকে উত্তরোত্তর তেমনি ভাবে প্রসারিত করতে করতে তারই মতো হয়ে যায়। আবার অন্যদের বেলা এ সবের দরকার হয় না, আপন চেতনা সম্বন্ধে সচেতন থেকে সেই চেতনারই ব্যাপ্তি ঘটাতে ঘটাতে শেষ পর্যন্ত তাকে অসীম করে তোলে। চেতনাকে বাড়াতে বাড়াতে তুমি তাকে এমন কি বিশ্বের মতো বিশাল করে তুলতে পারো। তা যখন হয় তখন তুমি প্রকৃতই গ্রহিষ্ণু হয়ে ওঠো। আগেই তাই বলেছি, এ কেবল শিখে নেওয়ার ব্যাপার। মোটের উপর উপস্থিত ক্ষেত্রে যখন দেখা যাচ্ছে যে দুর্দান্ত রকমের একটা কিছু এসে পড়ছে এবং তার ফলে ব্যথা ধরে উঠেছে ও অত্যন্ত চাপ বোধ হচ্ছে, সহ্য করা যাচ্ছে না, তখন ঐ উপায়ে চাপের উপর ক্রিয়া করে যেতে থাকবে। চিন্তাকে প্রয়োগ ক'রে শান্তি ও স্থিরতাকে সেখানে অনবরত আহ্বান করতে থাকবে এই বলে : "শান্তি, শান্তি, শান্তি...স্থির হও, নীরব হও," (শান্তির ভাবটি এলে চাপবোধ অনেকটাই কমে যায়)। অনেক রকমের অস্বস্তি, এমন কি দৈহিক বিকার পর্যন্ত, যেমন নাভিদেশের স্নায়ুগ্রন্থির (solar plexus) বিকৃতিও এতে দূর হয়ে যেতে পারে ; যখন সেই স্নায়ুগ্রন্থির বিপর্যয়ে বমনোদ্রেক হচ্ছে, বাধায় অবরুদ্ধ হয়ে যাবার মতো হচ্ছে, সেখানেও এতে কাজ করে (এই স্নায়ুগ্রন্থি সহজেই আক্রান্ত হয়ে থাকে)। ঐ স্নায়ুকেন্দ্রে যেমনি

দেখবে কোনো গণ্ডগোল হচ্ছে, অমনি মনে মনে বলতে শুরু করবে : শান্তি, শান্তি, শান্ত হও, ঠাণ্ডা হও" এই বলে যেতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার চাপ সরে না যায়।

চিন্তার ক্ষেত্রেও তাই। যেমন ধরো, এমন কথা তুমি বইতে পড়লে যার ভাবার্থ কিছু বুঝলে না—কারণ তা তোমার সাধ্যের অতীত। তোমার মাথাতে তা ইটের মতো কঠিন বোধ হলো। যতই বুঝতে চেষ্টা করছ ততই আরো বেশি কঠিন হয়ে উঠছে তবুও চেষ্টা করতে গেলে মাথা ধরে উঠছে। এমন অবস্থাতে শব্দগুলিকে নিয়ে টানাহেঁচড়া না করে এমনি ভাবে (যা হাত পা এলিয়ে স্থির শৈথিল্যের ভঙ্গী করলেন) নিজেকে এলিয়ে দিয়ে চেতনাকে মুক্ত করে ছড়িয়ে দেবে। বোঝবার চেষ্টা আদৌ তখন করবে না—শুধু নিজেকে শিথিল করে দাও, মাথা ধরাটা ছেড়ে যাক, সময়মত তার অর্থটা ধীরে ধীরে আপনিই তোমার মধ্যে এসে ঢুকুক। তুমি আর ঐ নিয়ে মোটেই ভাববে না, কিছুদিন কেবল অপেক্ষা করতে থাকবে, তারপর একদিন ভিতর থেকে আপনিই চেতন হয়ে বলবে : "ও, এ তো এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সেদিন মোটে এ বুদ্ধি আসেনি।" এমন সহজেই হয়ে যেতে পারে। যেমনি দেখবে যে কিছু পড়েও সেটা বুঝলে না—কারণ তোমার মাথার মধ্যে সে জিনিস জমা নেই—তখন তুমি এই কাজই করবে। সেটা একবার, দুবার, তিনবার পড়বে, তারপর চুপ করে থেকে মাথাকে না ঘাঁটিয়ে নীরব করে রাখবে। একপক্ষ কাল বাদ দিয়ে আবার সেটা পড়ে দেখো, তখন দেখবে তার অর্থ জলের মতো সোজা হয়ে গেছে। সব কিছুই মাথার মধ্যে তার আপন স্থান করে নেয়, ইতিমধ্যে মস্তিষ্কের তন্তুগুলির মধ্যে যে জিনিসের অভাব ছিল তার পূরণ হয়ে যায়, তখন ধীরে ধীরে বোধটা এসে যায়। আমি এমন অনেককে জানি যারা সকল কথাতেই তর্ক শুরু করে দেয়, কিন্তু কিছু না বুঝেই। অর্থাৎ তারা তাদের মনের মধ্যে যে গণ্ডী দিয়ে রেখেছে তার মধ্যে অন্যরূপ চিন্তা স্থান পাচ্ছেনা বলেই তারা জোরের সঙ্গে তাকে প্রত্যাখ্যান করছে। সে ক্ষেত্রে তোমার যেটুকু বলবার ছিল তা বলা হয়ে গেলেই তারপর ছেড়ে দেবে, তোমার বক্তব্যটি বলা হয়ে গেছে তাই যথেষ্ট। দরকার হলে দ্বিতীয়-বারও বলতে পারো কিন্তু জোর করতে যেওনা। এক সপ্তাহ বা এক মাস কেটে যাক, তারপর তারাই এসে তোমাকে বলবে, "ও-কথাটা আসলে এইরকম, আপনি ঠিক বুঝতে পারেননি।" অথচ তারা সেই কথাই বলছে যা আগে তুমিই বলেছিলে। কিন্তু তারা বলবে, "আমি পরে ভেবে দেখলাম, ওটা এই রকমই হওয়া উচিত"। কিন্তু তুমি যদি তখন বলে ফেল, "আমিই তো সেদিন ঔরকম বলছিলাম," তাহলে তাদের মুখের ভাব যে কেমন হবে। আবারও তারা তোমাকে বুঝবে না।

প্রশ্ন : রোগ লোকে আগে সূক্ষ্মদেহ ভেদ করে, নয় কি ? কেমন করে তা আটকানো যায় ?

উত্তর : আ, এ বেশ কথা। যদি তুমি সংবেদনশীল হও, অর্থাৎ খুবই সূক্ষ্মানুভূতি-সম্পন্ন, তাহলে রোগ যেমনি এসে সূক্ষ্মদেহকে ছুঁয়েছে মাত্র অমনি তখনই তা জানতে পারবে। সেটা ঠিক স্পর্শবোধের মতো নয়, কেবল একটা অনুভব আসে। সেই মুহূর্তে জানলে তখনই তোমার তাকে বলবার ক্ষমতা থাকে "না, এসোনা", এতে তাকে সরে যেতে হয়। কিন্তু এর জন্য তোমার সেই সূক্ষ্ম অনুভবটি থাকা চাই। তা অবশ্য অর্জন করা যায়। যে সব জিনিস নিয়ে তোমাদের বলছি সকলই নিয়মিত প্রচেষ্টায় অর্জন করা যেতে পারে। তোমার সূক্ষ্মদেহের আবরণটি সম্বন্ধে যথেষ্টই তুমি সচেতন হতে পারো, আর সে গুণ এসে গেলে তখন আর তোমায় খুঁজে দেখতে হয়না, আপনিই তুমি টের পেয়ে যাও যে কিছু একটা তোমাকে ছুঁলে। কেমন হয় তার একটা দৃষ্টান্ত বলি, এমন অনেক আছে।

একজন মহিলার নিরন্তরের চেষ্টা ছিল যে তার অন্তর্দেবতার সঙ্গে নিত্য সংযোগ রেখে সে চলবে, কেবল চৈত্যসত্তা নয় কিন্তু ভিতরে ভগবানের উপস্থিতির সঙ্গে, তাই তার সংকল্পই ছিল যে অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে নিজেকে সে লিপ্ত হতে দেবেনা, অর্থাৎ বাইরে কাজ যদিও সব কিছুই সে করে যাবে, কিন্তু ভিতরে সর্বদা একাগ্র থাকবে ঐ একমাত্র লক্ষ্যের দিকে, এমন কি রাস্তায় চলবার সময়েও। সে বাস করত এক বড় শহরে, যেখানে গাড়ি ঘোড়া ট্রাম বাসের খুবই ভিড়, রাস্তা পার হতে হয় খুবই হুঁশিয়ার হয়ে, নতুবা চাপা পড়ার আশংকা থাকে। কিন্তু সে তখনও তার সেই একাগ্রতা বজায় রাখত। একদিন সে একটা চৌরাস্তার মোড় পার হতে যাচ্ছে সেইভাবেই তন্ময় থেকে, হঠাৎ এক হাত দূর থেকে কিসে যেন তাকে একটা ধাক্কা দিলে, আর তাড়াতাড়ি যেমনি সে পিছু হটে গেল অমনি দেখলে বড় এক মোটরগাড়ী তার গায়ের কাছ ঘেঁষে সোঁ করে বেরিয়ে গেল। যদি সে তখন ঐভাবে কিছু হটে না যেতো তাহলে গাড়িটা নিশ্চয়ই তাকে চাপা দিত। এ বললাম একটা চরম রকমের দৃষ্টান্ত, কিন্তু অতটা পর্যন্ত সূক্ষ্মানুভবে না পৌঁছলেও একটা কিছু অস্বস্তি টের পাওয়া যেতে পারে (ভোরে ধাক্কা লাগার মতো না হলেও)—সামনে, পিছনে, উপরে বা নিচের দিকে কোনো একটা অংশে কিছু অস্বাভাবিক বোধ। তখন যদি সতর্ক থাকো তাহলে "না" বলে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, তাহলেই কাজ হবে। কিন্তু যদি সেই মুহূর্তে বা তার পরেও কিছুক্ষণের মধ্যে সচেতন না হও, তখন হয়তো টের পাবে যে পেটের মধ্যে কিছু গোলমাল বোধ হচ্ছে, পিঠের দিকটা কেমন শির্‌শির্ করছে, দেহটা যেন ম্যাজ্‌ম্যাজ্ করছে, কোথাও সুস্থবোধের ব্যতিক্রম হচ্ছে। তখনও যদি তুমি ইচ্ছাশক্তির একাগ্রতা এনে এই বিশ্বাসের উপর জোর দাও যে কোনো কিছুই তোমার তেমন কিছু অনিষ্ট করতে বা তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না, তাহলে তখনও তুমি আসন্ন রোগটিকে তাড়াতে সক্ষম হবে। কিন্তু তখনই সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভাবটি আসা চাই। যদি বেশি বিলম্ব করে ফেল আর দেহের কোথাও বাস্তবিক অসুস্থতা বোধ করতে থাকো, অর্থাৎ রোগ ঢুকে পড়েছে বলে মনে হয়, তাহলে যেখানে

তার কাজ শুরু হয়েছে সেখানে একাগ্রতাকে কেন্দ্রীভূত করতে পারলে তাতেও কাজ হবে। কিন্তু যদি কিছুই না করো তাহলে রোগ তোমাকে চেপে ধরবে। তখন তোমায় রোগের নির্ধারিত গতির অনুসরণ করতেই হবে, তারপর তাড়াবার সুযোগ এলে তখন তাকে তাড়াতে পারবে। আমি আগে কোথাও বলেছিলাম যে দৈহিকের ক্ষেত্রে সবই নির্ভর করে বাঁধা নিয়মের উপর। রোগ যদি স্থূলদেহকে আক্রমণ করে থাকে তাহলে নিয়ম অনুসারেই তাকে তাড়াতে হবে। ডাক্তারি শাস্ত্রে তাকেই বলে "রোগের মেয়াদ শেষ করতে হবে।" আধ্যাত্মিক শক্তির জোরে সে মেয়াদ কমিয়ে আনতে পারো, কিন্তু নিয়মকে মানতেই হবে। অতএব রোগ তাড়াবার চারটি বিভিন্ন ধাপ আছে : প্রথমটি হলো যা তৎমুহূর্তেই করণীয়, দ্বিতীয়টি করা যায় কয়েক মিনিট বা কিছুক্ষণের মধ্যে, তৃতীয়টিতে কয়েক ঘন্টা সময় লাগে, আর চতুর্থটিতে লাগে কয়েক দিন। আর সে জিনিস যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তখন সবই নির্ভর করে কেবল গ্রহিষ্ণুতারই উপর নয়, কিন্তু আক্রান্ত অংশটির সুস্থ হবার শুভেচ্ছার উপর। বাইরের থেকে যা আসে তার দিকে ভিতরের কিছুর একটা টান থাকে। সেই টান থাকার কারণেই তোমার অজ্ঞাতে রোগটি ভিতরে ঢুকতে পারে, তখন সত্তার সেই রোগস্পৃষ্ট অংশে অনুকূল সহযোগিতার সাড়া জাগাতে হয়।

আমি কয়েকটি অসাধারণ ঘটনার কথা জানি, যদি তৎমুহূর্তেই এ চেষ্টা করা যায়... মনে করো প্রখর রোদের তাপ লেগে সানস্ট্রোক (sunstroke) ঘটে যাওয়া। এ এক গুরুতর অসুস্থতা যাতে শারীরক্রিয়ার সবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, মাথায় রক্ত উঠে যায় এবং প্রবল জ্বর হয়। এ অবস্থা তখন তোমার সূক্ষ্মদেহের রক্ষাবরণ ভেদ করে দেহের মধ্যে ঢুকে পড়ে—সেই সময় তুমি যদি কোনো নির্জন স্থানে চলে গিয়ে হাত পা ছড়িয়ে সটান শুয়ে পড়ে নিজে সেই দেহকে ছেড়ে বেরিয়ে আসো (তা অবশ্য শিক্ষা করতে হয়, কেউ বা সহজেই তা পারে আর কাউকে বা বহু প্রয়াসে শিখতে হয়), এবং তার পরে উপরে উঠে গিয়ে দেহটিকে দেখতে থাকো (দেহের বাইরে বেরিয়ে দেহকে দেখা, এটি ইচ্ছা করলে হতে পারে)—তোমার দেহ হয়তো কোনো শয্যাতে বা ভূমিতে পড়ে আছে, তাতে কিছু যায় আসে না ; অতঃপর উপরের শক্তিকে আহ্বান করো, যথেষ্ট অভ্যাস ও আশ্রয় থাকলে সে শক্তি সাড়া দেবে, এবং তাকে তুমি দেহের উপর নিরন্তর প্রয়োগ করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত দেহ তাকে গ্রহণ করতে না পারছে (প্রথমে তা প্রবেশ করে না, কারণ দেহ সংকোচপ্রাপ্ত ও বিকৃত হয়ে থাকাতে তার গ্রহণশক্তি তখন নেই), কিন্তু তুমি অবিচল ভাবে দেহের উপর ধীরে ধীরে তাকে প্রয়োগ করে যেতে থাকবে। সে সময়ে কেউ যেন সেই দেহকে নাড়াচাড়া না করে, তাহলেই বিপদ হতে পারে। স্থির ও শান্তভাবে এ কাজ করতে হবে, সুতরাং সকলকে বলে দেবে যে কেউ যেন কিছু না করে, কিংবা এমন জায়গাতে গিয়ে শোবে যেখানে কেউ যেতে না পায়। ধীরে ধীরে একাগ্রতার সঙ্গে ঐরূপ করবে (দশ মিনিটা আধ ঘন্টা বা অবস্থা অনুসারে দুই এক ঘন্টাও লাগতে পারে) যতক্ষণ না দেখ যে দেহ তাকে গ্রহণ করছে,

শক্তি সেখানে প্রবেশ করছে, আর রোগ সেরে আসাতে দেহ যথেষ্ট নরম হয়েছে। এমন দেখলে তখন তুমি তার মধ্যে আবার প্রবেশ করবে এবং ক্রমশ তুমি আরোগ্য হয়ে উঠবে। এইরূপ সান্‌ট্রোক, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে এটা ক'রে দেখা হয়েছে। কোনো কারণে লিভার বিগ্‌ড়ে গেলে (হজমের দোষ নয়, লিভারই যেখানে কাজ করছে না) সে রোগও এই উপায়ে সারানো যায়। একবার কলেরাও এই প্রকারে সেরেছে—সবে যখন সুরু হয়েছিল তখন এতেই তা সেরে গেল। তাই বলছি যে আধ্যাত্মিক শক্তির উপর দখল থাকলে এবং সে শক্তিকে ঠিক ভাবে প্রয়োগ করতে জানলে এমন কোনো রোগ নেই যাকে আরোগ্য করা যায় না ; আমি এ কথা আকাশ থেকে বলছি না, বস্তুত অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। অবশ্য তোমরা বলবে যে দেহ ছেড়ে বেরিয়ে আসা, উপরের শক্তিকে টেনে এনে তাকে যথাস্থানে প্রয়োগ করা, তার উপর দখল রাখতে পারা, এ সব কেমন করে করা যায় তা তোমরা জানো না...কাজটা সহজ তো নয়ই, কিন্তু অসম্ভবও নয়। আর সাহায্য মিললে সে বিশ্বাস আসতে পারে...তা কিন্তু অনেক সহজ, সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করা।

কিন্তু সকল ব্যাপারেই ঐটি চাই—নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করেই করো বা অন্যের সাহায্য নিয়েই করো—প্রথম কথা, ভয় থাকলে চলবে না, আর দ্বিতীয়ত শান্ত ও স্থির হয়ে থাকতে হবে। উদ্বিগ্ন হলেই সব মাটি, তখন আর কিছুই করতে পারবে না। রোগ সারানোই হোক বা আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করাই হোক, শান্ত নিরুদ্বিগ্ন হয়ে থাকা নিশ্চয় চাই।

২ এপ্রিল, ১৯৫১

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন (কথাবার্তা প্রসঙ্গে)—"রূপান্তর প্রক্রিয়া জগতে এমনিই হয়ে চলেছে খুব মন্থর গতিতে, যোগের কাজ হলো তাকেই জোরালো ও ত্বরান্বিত করে আনা, তবু সেখানে বাহ্য রূপান্তরের কাজ সাধারণ জীবনে যেমন ছিল প্রায় তেমনিই থেকে যায়। এর ফলে যে ব্যক্তি যোগ করছে তার আভ্যন্তর ও বাহ্য সত্তার মধ্যে অমিল আরো বেশি বেড়ে যায়, যদি তার জন্য সবিশেষ সতর্কতা না গ্রহণ করা হয়।"

কেমন ধরনের হবে সেই সতর্কতা ?

উত্তর তা নির্ভর করবে সেই ব্যক্তিবিশেষের উপর। সেটা প্রত্যেকের বেলাতেই স্বতন্ত্র। যার যেমন ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া ঘটবে, যার যেমন অসুবিধা থাকবে, যার পক্ষে যেমন বাধাবিপত্তি দেখা দেবে, তাই বুঝে প্রত্যেককে যে প্রণালী অনুসরণ করতে হবে সে তার

একান্ত নিজস্ব। ওর কোনো সাধারণ বিধি নেই। মিষ্টান্ন বিতরণের মতো তা সবাইকে সমানভাবে বিতরণ করবার নয়। তবে যদি কেউ ব্যক্তিগত ভাবে এসে জিজ্ঞাসা করে "আমি কিরূপ করব?" সেখানে তা বলা যায়।

প্রশ্ন : দুর্ঘটনা আসার কারণ কি? তা কি আসে ভারসাম্যের অভাবে?

উত্তর : গভীরের দিক থেকে দেখলে সে হলো আলাদা কথা...বাইরের দিক থেকে অনেক রকম কারণ থাকতে পারে, কিন্তু গভীরের দিকেও কিছু কারণ থাকেই। সেদিন বললাম যে তোমার স্নায়বিক আবরণ যদি অটুট থাকে, তাহলে দুর্ঘটনাকে এড়ানো যায়, আর তা ঘটলেও তাতে বিশেষ কিছু হানি হয় না। কিন্তু সে আবরণ যদি হঠাৎ কোথাও ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে তারই মাত্রা অনুযায়ী প্রতিরোধ-শক্তি যতটা হ্রাস পাবে সেই পরিমাণের দুর্ঘটনাও তখন ঘটতে পারবে। বোধকরি প্রায় সকলেরই মনে একটা আন্দাজ থাকে, যখনই একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব আসছে, নিজে পুরোপুরি আত্ম-সচেতন অবস্থায় নেই, আত্মপ্রসন্নতার অভাব ঘটেছে, তখনই একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। মোটের উপর যখন তুমি সম্পূর্ণ আত্মস্থ হয়ে নেই, ভিতরকার চেতনা সম্পূর্ণ জাগ্রত নয়, যা-কিছু করছ তা সম্পূর্ণ সজ্ঞানে করছ না, তখনই দুর্ঘটনা আসে। চেতনা জাগ্রত থাকলে তা হতে পারে না, দুর্ঘটনাকে এড়াতে যা করা দরকার তা আপনা হতেই তুমি করে থাকো। সুতরাং দুর্ঘটনা ঘটতে পারে চেতনার শৈথিল্যের ফলে। কিংবা এও হতে পারে যে চেতনা তখন কোনো উচ্চতর ক্ষেত্রে কাজ করছে; আধ্যাত্মিকের কথা ছেড়ে দিলেও কেউ হয়তো কোনো মানসিক সমস্যা নিয়ে একাগ্র হওয়াতে বাহ্যিক বিষয়ে অমনোযোগী হয়ে আছে, সে সময়ে রাস্তায় বা ভিড়ের মধ্য থেকে যতটা সতর্ক হওয়া উচিত তা হতে পারছে না, তাতেও দুর্ঘটনা ঘটে যায়। খেলাধূলার ক্ষেত্রেও তাই। সহজেই লক্ষ্য করবে যে তোমার চেতনা যখন শিথিল রয়েছে, মনোযোগ না দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে হয়তো অন্য কিছু বিষয়ে ভাবছ, উপস্থিত ক্রিয়াটির দিকে সম্পূর্ণ সচেতন নেই, কিছু একটা দুর্ঘটনা তখনই ঘটেছে।

তাই বলছিলাম যে কোনো অস্বাভাবিক কারণে হয়তো সেদিন ভালো ঘুম হয়নি কি বিশ্রাম পাওনি, কোনো দুর্ভাবনা লেগে থেকে তোমাকে ক্লিষ্ট করেছে আর তোমার সূক্ষ্ম আবরণটি অটুট না থাকায় তার প্রতিরোধীশক্তিও ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তখন বাইরের কোনো বিরোধী শক্তি এসে তাকে ভেদ করে দুর্ঘটনা এনে ফেলতে পারে। মোটের উপর সকল দুর্ঘটনাই আসে এমন অবস্থায় যেখানে মনোযোগের অভাব আছে, চেতনার শৈথিল্য আছে। এমন দিনে এসে পড়ে যখন তোমার স্বস্তি নেই, যা-কিছু ধরতে যাচ্ছ আর কোনোটাই ধরতে পারছ না, নিজেকে ঠিকভাবে রাখতে পারছ না, যেন জলবেশানোর মতো পাতলা হয়ে গেছ; এই সব দিনেই দুর্ঘটনাও এসে উপস্থিত হয়। তাই সব সময়েই সতর্ক থাকা দরকার। তার

মানে এমন কথা বলছি না যে ঐ রকম অবস্থাতে ঘরে দরজা এঁটে বসে থাকো। তা নয়, তবে একটু হুঁশিয়ার হবে, সতর্ক থাকবে, অবনোযোগী হবেনা, চেতনার শৈথিল্য আসতে দেবেনা।

প্রশ্ন : এমন দুর্ঘটনা কি হয়না যা নিতান্ত অপরিহার্য? অলোকদৃষ্টিসম্পন্ন (clair-voyant) একজন আমেরিকানের লেখা একটি ঘটনার কথা সেদিন পড়লাম। একটি ছোটো ছেলে বিপজ্জনক অবস্থায় রেললাইনের উপরে খেলা করছিল। ভয় পেয়ে ঐ ব্যক্তি কিন্তু দেখলে যে একটি ছায়ামূর্তি তার পাশে রয়েছে, তাতেই আশ্বস্ত হয়ে সে ভাবলে যে ছেলেটিকে সে রক্ষা করবে। কিন্তু সেই ছায়ামূর্তি ছেলেটির চোখে হাত চাপা দিয়ে ট্রেনের তলাতেই তাকে ফেলে দিলে। সে তাকে ভেবেছিল কোনো রক্ষাকারী সত্তা, কিন্তু কেন যে সে ছেলেটিকে অমন করে মারলে তা কিছুই সে বুঝতে পারলে না।

উত্তর : এ কথা সত্য হতে পারে, কিন্তু নিজে না দেখে কিছু বলা যায়না।

এখানে দুই রকমের সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিস হয়ে থাকতে পারে। হয়তো ওটাই তার নিয়তি ছিল, অর্থাৎ তার চৈত্যসত্তার পক্ষে তখন জীবন শেষ হওয়াই দরকার ছিল, কোনোরূপ অছিলায় তার মৃত্যু হবে এই ছিল পূর্বনির্দিষ্ট। কিংবা ছায়ামূর্তিটি ছিল কোনো বিরোধী শক্তি, ঐ ব্যক্তি তাকে আলোকের দূত বলে ভেবেছিল,—ওরূপ ছায়ামূর্তি দেখলে অনেকেই তাকে মনে করে স্বর্গের কেউ। স্বর্গের হতে পারে, কিন্তু কোন স্বর্গের তা জানা চাই।

এ এক আশ্চর্য ঘটনা বটে, তবে...হাঁ, কিন্তু তোমার অচেতনা বা শিথিল চেতনাতে তখন এই অর্থ মনে হয় যে কেউ হয়তো ওর চোখে হাত চাপা দিয়ে ফেলেছিল। এমনি অনেক ছোটো ছোটো ক্ষতিকারক সত্তা আছে যারা মানুষের আবহাওয়ার মধ্যে থেকে মানুষদের নিয়ে মজা উপভোগ করে, তাদের একটা কাজই হলো তোমাকে এমন অন্ধ করে দেওয়া যে তোমার সামনে যেটা রয়েছে সেটা তুমি দেখেও দেখতে পাবেনা! এমন নিত্যই তারা করে। যতই তুমি চারিদিক ঘুরে খোঁজাখুঁজি করোনা কেন, সে জিনিস দেখাই যাবেনা। তুমি যদি খোঁজা ছেড়ে দাও, তাহলে কিছুক্ষণ পরে (যখন তার হাত চাপা সরে গেছে) আবার সেই জায়গাতে ফিরে গেলেই দেখবে জিনিসটা ঠিকই সেখানে রয়েছে, সেখান থেকে একটুও সরেনি! কেবল তুমি অচেতন হয়েছিলে বলেই তা দেখতে পাওনি। এমন খেলা ওরা প্রায়ই খেলে। আবার তারা জিনিস সরিয়েও নেয় আর পরে ফিরিয়ে এনে দেয়, কখনো বা ফেরায়ও না (ফেরালেও পেতে দেয়না)! নানা ভাবেই তারা বিব্রত করে, হয়তো তা অসহ্যও হয়ে ওঠে। নাদান ম্লাভাদুকি এদের নিয়ে অনেক কিছু করতেন, কিন্তু কেমন করে এদের বাধ্য করতেন জানিনা, কারণ এরা খুব অবাধ্য।

অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে আমি দুটি বিপরীত রকমের দৃষ্টান্তের কথা বলতে পারি, যদিও সে দুটি একই রকমের সত্তা নয়। পরীদের মতো অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তা আছে যারা বেশ সুন্দর এবং বাধ্য, কিন্তু তারা সব সময় আসেনা, মাঝে মাঝে এসে দেখা দেয় যখন খুশি। আমার মনে আছে এক সময় আমি শ্রীঅরবিন্দের জন্য রান্না করতাম আর সেই সঙ্গে আরো অনেক কিছু কাজ আমাকে করতে হতো ; উননে দুধ চড়িয়ে রেখে প্রায়ই আমি অন্যত্র চলে যেতাম কিংবা হয়তো তাঁরই কাছে আমাকে যেতে হতো, কারো সঙ্গে হয়তো কথা বলতে বলতে সময়ের ঠিক থাকতোনা, দুধ যে উননে চড়ানো আছে তা ভুলে যেতাম। তখন হঠাৎ টের পেতাম ছোট্ট একটি হাত যেন আমার শাড়ির প্রান্ত ধরে টানছে (তখন শাড়িই আমি পরতাম)। অমনি ছুটে গিয়ে দেখতাম যে দুধটা উননে প্রায় উথলে পড়ার মতো হয়েছে। এমন একবার নয়, বহুবারই হয়েছে, একটি ছোটো শিশুর হাত আমায় যেন টানছে।

আর একটা গল্প বলি, শ্রীঅরবিন্দ তখন নিজের ঘরটির মধ্যে ঘোরাঘুরি করে বেড়াতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি একই ভাবে অনবরত ঘুরতেন, ওরই মধ্যে তাঁর ধ্যান চলত। কেবল মাঝে মাঝে জানতে চাইতেন যে সময় কত, সেইজন্য তাঁর প্রত্যেক ঘরেই একটি করে ঘড়ি রাখা থাকত, যাতে চোখ তুলে দেখলেই তিনি সময় জানতে পারেন। এমনি মোট তিনটি ঘড়ি ছিল। একটি ছিল যে ঘরে আমি কাজ করতাম, ওখান থেকেই তাঁর চলে বেড়ানো শুরু হতো। একদিন এই ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "সময় কত ?" ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। পাশের ঘরে যেতে যেতে বললেন, "আচ্ছা ঐ ঘরে গিয়ে দেখছি"। সে ঘরেও দেখলেন ঘড়ি বন্ধ। ঠিক একই সময়ে সেটাও বন্ধ হয়েছে, মাত্র কয়েক সেকেণ্ড তফাৎ। তারও পাশের ঘরে গিয়ে দেখেন সেখানকার ঘড়িও বন্ধ। তিন বার তিন ঘরে গিয়ে দেখা গেল...সব ঘড়িই একসঙ্গে বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি আবার ঘরে ফিরে এসে বললেন, "এ যে বিশ্রী রকম ঠাট্টা।" যেমনি বলা, অমনি ঘড়িগুলো একে একে চলতে শুরু করল। এ আমি স্বচক্ষেই দেখেছি। মজার গল্প নয় ? যেমনি তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, "এটা বিশ্রী রকমের ঠাট্টা।" অমনি সব ঘড়িই আবার যথারীতি চলা শুরু করে দিলে।

প্রশ্ন : শোনা যায় যে জড়জগৎ অচেতন হয়ে ভগবানকে ভুলে গেল। একেবারে প্রথম থেকেই কি ভুলেছিল ?

উত্তর : দুইই একত্রে হয়েছে। এমন বলা যায়না যে বাস্তব জগৎ তমসা ও অজ্ঞানতা হতেই সৃষ্টি। আবার এমনও বলা যায়না যে এই জগৎ থেকেই তমসা ও অজ্ঞানতার সৃষ্টি। দুইই একত্রে ঘটেছে, অর্থাৎ দুইই এসেছে একই কারণ থেকে। যাকে আমরা

জড়জগৎ বলি তা তমসা ও অজ্ঞানতার সাথে সাথেই দেখা দিয়েছে আর দুইই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, একটা এসেছে আগে ও তার থেকে অন্যটা, এমন কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। অন্য-রূপ কারণ থেকে দুইই একত্রে ঘটেছে—যে ক্রিয়াতে তমসা ও অজ্ঞানতা জন্মেছে সেই ক্রিয়াতেই বস্তুজগৎ জন্মেছে।

৫ই এপ্রিল, ১৯৫১

মা পড়লেন (কথাবার্তা হতে)..."এখানে সব কিছুরই পশ্চাতে আছে অতিমানস মনের ক্রিয়াই বলো, প্রাণের ক্রিয়াই বলো, আর বাস্তবের ক্রিয়াই বলো, বিশ্বলীলার সব কিছুরই মধ্যে একটা গভীরতর উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। এই ভিতরকার উদ্দেশ্য ও বাইরেকার দৃশ্যলীলার তফাৎটা কেমন জানো, যেমন পুতুলনাচের খেলা দেখ। খেলোয়াড় তার একটা মতলব নিয়ে দড়ি ধরে পুতুল নাচাচ্ছে আর তাদের দিয়ে যা করাতে চায় তাই করাচ্ছে, কিন্তু যারা দর্শক তারা পরের পর কি হচ্ছে তাই শুধু দেখে যাচ্ছে, ভিতরের রহস্যটা কিছু জানছেনা। সেটি না জানাতে তাদের ঔৎসুক্য যায়ো প্রখর হয়ে উঠছে, আগ্রহের সঙ্গে তারা ঘটনার অনুসরণ করছে আর কেবল প্রত্যাশা করছে এবার কিছু নাটকীয় ব্যাপার ঘটবে ; কিন্তু যে দড়ি ধরে নাচাচ্ছে তার কোনো ঔৎসুক্য নেই, সে রয়েছে নিরুদ্বিগ্ন নিরপেক্ষ হয়ে। যেখানে অজ্ঞানতা থাকে সেখানেই এমন তীব্র ঔৎসুক্য জন্মায় যা ভ্রান্ত মোহের সঙ্গে জড়িত, অজ্ঞানতা ঘুচলেই তা চলে যায়। মানুষের সকল জিনিসের প্রতি যে আগ্রহ দেখা যায় তার মূলে রয়েছে এই ভ্রান্ত মোহ ; এ মোহ ঘুচে গেলে আর লীলার দিকে কোনো আগ্রহই থাকবেনা।...ঐ কারণেই অজ্ঞানতা ও মায়া মোহ এখনও টিকে আছে ; মানুষ তাইই চায়, তাকেই আঁকড়ায়, ওর মধ্যে এমন কিছু আকর্ষণ আছে যাতে ওকে ছাড়া যায়না।"

প্রশ্ন ; কিন্তু মোহকে ভিত্তি করে আগ্রহ কেমন ক'রে জন্মায় ?

উত্তর : তুমি কি ভাবো যে তুমি নিজেও এই মোহের মধ্যে জড়িয়ে নেই ? তুমি কি ওর বাইরে সারা জগৎ এখন ওতেই ভরে আছে। হয়তো সেটাই সুবিধার কিন্তু তুমি কেবল ওর উপরের দিকটাই দেখছ। হয়তো অল্প একটু অন্য আভাসের অংশ চোখে পড়ে কিন্তু ওর তলদেশ পর্যন্ত, ওর কেন্দ্র পর্যন্ত নজর যায়না, মূল কারণটি তুমি দেখতে পাওনা। কাল কি হবে তা কি আজ জানো ?...আন্দাজ করে বলতে পারো যে হয়তো

এমনি কিছু হবে, কিন্তু সবগুলো সঠিক জানো না। কাল কি হবে তাও নয়, একমাস পরে কি হবে তা তো নয়ই, এক বছর পরে কি হবে তা একেবারেই নয়। গত জন্মে কোথায় ছিলে তা কি জানো? মৃত্যুর পরে কি হবে তাও কি জানো?....কি হবে তা জানা নেই বলেই এমন আগ্রহের সঙ্গে কাজ করছ। যদি তা জানা থাকতো তাহলে হাজারের মধ্যে ৯৯৯ জন তারই প্রত্যাশায় চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকতো। তাহলে তোমার সকল উৎসাহই একেবারে উবে যেতো, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তুমি বলে বসতে, "ঐ জিনিসের জন্যে আমি এত এত খেটে মরব? কখনই না।"

প্রশ্ন : তাহলে এই মিথ্যা মোহটা থাকারই দরকার?

উত্তর দরকার বলছি না, কিন্তু হয়ে রয়েছে তাই, সেটা এক কথা নয়। দরকার হলো একে বদলানো। সব চেয়ে দরকার এই যে সমস্ত জেনেশুনেও এমনি আগ্রহ ও প্রবেগ ও উৎসাহের সঙ্গে কাজগুলি করে যেতে থাকা, এবং তার ফল যদি হয় তোমার প্রত্যাশার বিপরীত তবুও তাই করে যাওয়া। এ সহজ কথা নয়, কিন্তু এটাই অপরিহার্য।

প্রশ্ন : অপরিহার্য কেন হবে তা বুঝলাম না।

উত্তর : অর্থাৎ এমন অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া যে ফল কি হবে তা জেনেও ও এমন কি বিপরীত ফল হবে জেনেও সব কিছু কাজ সমানে করে যাবে অনাসক্তভাবে, মিথ্যা মোহ না রেখে...এটাই অপরিহার্যরকমে দরকার।

(না আবার পড়লেন), "একজন জিজ্ঞাসা করেছিল যে তার রোগ সারানোতে কি করা উচিত ; সে কি নিজের ইচ্ছাকে প্রয়োগ করবে, না এই বিশ্বাস নিয়ে থাকবে যে তা সারিয়ে দেওয়া হবে, তাই ভগবৎ-শক্তির উপর সম্পূর্ণই নির্ভর করে থাকবে। মা তার জবাবে বলেছিলেন, 'সবই এক জিনিসের বিভিন্ন পন্থা।...কিন্তু তুমি যাই কেন চাও, যেদিক দিয়ে যে ভাবেই প্রয়াস করো, জ্ঞানশক্তি ও চেষ্টাশক্তি প্রয়োগ করতে করতেও এই কথাই জানবে যে তার ফল একমাত্র ভগবৎ-কৃপাতেই নির্ভর করে'।"

কিন্তু সবার গোড়াতে দরকার তার জন্য ইচ্ছা করা। এটাই প্রথম দরকার, আর ওর একটি মাত্র রাস্তাই নয়।...আমি যে কথাটা পড়লাম তা শুনে কজন খুশি হলে জানতে চাই। জগতে এত যে জড়বাদ ও প্রত্যক্ষবাদের উদ্ভব হয়েছে তার কারণ লোকে ঐটি মানতে চায়না যে আসলে ওখানে ভগবৎ-কৃপারই প্রশ্ন। যখন কেউ রোগ থেকে সেরে ওঠে তখন সে বলে, "আমি নিজে সেরেছি।" যখন কিছু উন্নতি করে অমনি ভাবে, "আমিই নিজে এই উন্নতি করেছি"। যখন কোনো কিছু গড়ে তোলে তখন বলে বেড়ায়, "আমি নিজের থেকে এটা গড়ে তুললাম।" অনেকেই যখন অন্যরকম কিছু করতে যায়, তখন কতটুকু সময়ের জন্য

তারা অন্তরের সঙ্গে মনে করে (মুখে বলা উচিত কিংবা বলা ফ্যাশন হিসেবে শুধু বলা নয়) কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে তারা ভাবে যে নিজের দ্বারা তা হয়নি, হয়েছে ভগবৎ-শক্তির দ্বারা ; যখনই কিছু উন্নতি তুমি করবে, নিজের মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনবে, কিছু শিক্ষালাভ করবে, তখন ভেবেচিন্তে নয় বা "তাই ভাবা উচিত" মনে করে নয়, কিন্তু আপনা হতেই তোমার জানা চাই যে ভগবৎ-শক্তি ব্যতীত তা হতে পারত না। নিজের মধ্যে প্রবেশ করে দেখবে, এটা খুবই উপভোগ্য হবে, দেখবে যে দিনের মধ্যে কতবার তোমার মনে হয় (নিজেকে না শুনিয়েও) যে, "আমিই এটি করলাম," "আমি এ কাজ সফল করতে পারলাম", "আমি এ-কাজে সার্থক হয়েছি", "আমি ওটাতে সফল হতে পারিনি"? যখন তুমি চেষ্টা সহকারে কিছুতে কৃতকার্য হতে পেরেছ, তখন একটু থেমে নিজেকে শুনিয়ে এই কথাই বলবে, "ভগবৎ শক্তি সাহায্য না করলে হয়তো এটা আমি পারতাম না"। কিন্তু তার বদলে আপনা হতেই যে কথা মনে আসে তা হলো এই, "হাঁ, আমি এটি পেরেছি।" তাই নয় কি? তোমার মনের একটা অংশ অবশ্য শিখে জেনে ভেবে এবং বুঝে বোধ করতে থাকে যে তাইই ঠিক কথা কিন্তু সে মনের একটি অংশ মাত্র এবং তা সব সময় ঠিক সক্রিয় থাকেনা। তারই সঙ্গে পরামর্শ করবে, "কোন ভাবটি গ্রহণ করা সব চেয়ে ভালো?" "কেমন কথা ভাবা উচিত?" যারা যোগের পথ নেয় তারা যদি ঐকান্তিক হয়, তাহলে তারা একবার ভেবে দেখে তারপর বলে, "আমি নিজে লক্ষ্য না করলেও আমি যে সফল হতে পেরেছি তার কারণ হয়তো ভগবৎ শক্তি আমাকে সাহায্য করেছে, নতুবা পারতাম না।" এটা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এমন সময় আসে যখন তুমি নিশ্চিত জানো যে সেই শক্তি ব্যতিরেকে তুমি তোমার আঙুলটি পর্যন্ত হেলাতে পারো না। কিন্তু সে হলো অনেক পরের অবস্থা। আপাতত গোড়ার দিকে যদি একটু লক্ষ্য রাখো, তাহলে কতবারই ধরে ফেলবে যে তুমি বলছ "এটা আমি করলাম, আমি।" কখনো বা নিজেকে বাহবা দিয়েও বলো, "তাহলে আমি পারি কিছু করতে, আমার সে যোগ্যতা আছে।" এবার একটু অন্যভাবে এগিয়ে গিয়ে বলি, এ কথা বলার আনন্দ যদি তোমার না থাকে যে, "আমি এটা করতে পারলাম, এটুকু উন্নতি আমি করলাম, এ খেলাটা আমি ভালোই খেললাম", তাহলে কজনই বা একটা কিছু কাজ ভালোভাবে করতে সক্ষম হয়? ঐ আত্মপ্রসাদটুকু না থাকলে ক'জনই বা সত্যিকার কোনো কাজ করতে পারে? আমি এমন লোকের কথা জানি যাদের মনের অংশ সত্তার অন্যান্য অংশের চেয়ে অনেকখানি উন্নত। তারা যথেষ্টই বোঝে (হয়তো কিছু বেশি বোঝে)। তারা যেমনি ধ্যানে বসল অমনি সমস্ত প্রাণশক্তি খেয়ে গিয়ে একটা স্তম্ভিত শান্তির ভাব এসে পড়ল, সেটা আনন্দের বটে কিন্তু তা একেবারে অনড় নিশ্চল অবস্থা। তখন আর কিছু করণীয় নেই, বিন্দুমাত্র নড়াচড়া নেই, কেবলই স্বপ্ন দেখা,...গাছতলায় হাত পা গুটিয়ে বসা, যা করবার ভগবানই করুন, খাবার দরকার হলে তার ব্যবস্থাও তিনি করুন। ভালো জিনিস হয়তো এটা, কিন্তু এর অর্থ হচ্ছে এই যে ভগবানের কোনো কাজ করতে যন্ত্রটি প্রস্তুত নেই, কেবল সেখানে অহংই তুষ্ট হচ্ছে,

সেই অহংবোধও যখন চলে যাবে তখন আর কিছুই করবার থাকবে না। সুতরাং যতক্ষণ তুমি অহংএর মধ্যে আছো ততক্ষণ ঐ বোধটিও তোমার থাকা চাই ; কাজ চালিয়ে যাবার জন্য ওর প্রয়োজন আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি পূর্ণ রূপান্তর বা অন্তত সত্যচেতনা না পাচ্ছ।

তাই আমি এখানে বলেছি (মা বই থেকে পড়ে শোনালেন) "যাই কেন করো আর যে প্রণালীই অনুসরণ করো, এমন কি যদি তোমার কর্মপটুতা খুব বেশি থাকে, তবু সে কাজের ফলের ভারটা ছেড়ে দেবে ভগবানের হাতে। চেষ্টা সম্পূর্ণই করবে, কিন্তু তার ফল দেওয়া না দেওয়া তাঁরই উপর নির্ভর করবে। তোমার ব্যক্তিগত শক্তির প্রয়াস সেখান পর্যন্ত গিয়েই থামবে ; ফল যদি কিছু মিলল তা সম্পূর্ণই ভগবৎ-শক্তির দ্বারা, তোমার শক্তির দ্বারা নয়।" এ কথা প্রায় সকল বর্মেই শেখানো হয়, তাই কেউ কেউ নাস্তিক হয়ে দাঁড়ায়, তারা রেগে উঠে বলে, "বটে। আমি কেউই নয়।" এই যে "আমি" এ যে কতখানি প্রকাণ্ড বড়ো, তা যদি জানতে। কতখানি স্থানকে জুড়ে নিয়ে সে থাকে। সকল বস্তুআশ্রিকতার মূলে রয়েছে এই "আমি"।

প্রশ্ন : নীরব ধ্যানে তো নিজেকে শূন্য ক'রে দিতে হয়। তাহলে যে ধ্যান করছে তার নিজের উপর আর তা কেমন করে নির্ভর করবে?

উত্তর : এখানে মনের নীরবতা আর সত্তার শূন্যতার সঙ্গে গণ্ডগোল করা হচ্ছে ; ও দুটি হলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। এ ছাড়া সত্তাকে একেবারে শূন্য করা কেমন করে হয় তা জানিনা—তাহলে তুমি তো নিজেই আর রইলে না।

(মা আবার পড়লেন) "ধ্যানের মধ্যে নিজেকে ফাঁকা অবস্থায় আনতে পারলে একটা আভ্যন্তরীণ নীরবতা আসে ; তার মানে এই নয় যে তুমি অস্তিত্বহীন বা মৃত বা অসাড় অড়পিণ্ড হয়ে গেলে। নিজেকে তুমি শূন্যপাত্র ক'রে উপরের জিনিসকে আহ্বান করো তাকে পূর্ণ ক'রে তুলতে। অর্থাৎ তোমার ভিতরের চেতনাকে সব চাপ থেকে মুক্ত ক'রে উপরের উপলব্ধির দিকে তাকে উন্মুখ করে রাখো। কিন্তু তোমার চেতনার কেমন প্রকৃতি ও তার ভিতরকার স্বাভাবিক চাপের মাত্রা কতখানি তারই উপর নির্ভর করবে সেই আহূত শক্তির সাফল্য ও কেমনভাবে তা ক্রিয়া করবে ; সেই অনুসারে তা সার্থকতাও আনতে পারে, ব্যর্থতাও আনতে পারে, অথবা বাধাও দিতে পারে।"

প্রশ্ন : "স্বাভাবিক চাপের মাত্রা" এ কথার অর্থ কি?

উত্তর : আস্পৃহা ও ইচ্ছার বেগ সত্তার মধ্যে একটা চাপের সৃষ্টি করে। তার "মাত্রা"র কথা বলছি কারণ তার অল্পবিস্তর একটা সীমিত স্থান থাকে যার উপরে চাপটা গিয়ে পড়ে।

নিজেকে ফাঁকা করে রাখা মানে সেই চেতনার চাপকে নিজের দিক থেকে সরিয়ে লক্ষ্যের দিকে উন্মুখ করে দেওয়া। "চাপ" মানে হলো কোনো বিশেষ লক্ষ্যসীমার উপর একাগ্রতার বেগ। সত্তার ভিতরকার ব্যক্তিগত চেতনাই সেই চাপকে প্রয়োগ করে। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত এনে এখানে বলা যায়, মনে করো তোমার একটা পুরানো ব্যাধি আছে, দেহের মধ্যে কোনো বিকৃতি বা দোষ রয়েছে। তোমার চেতনা, তোমার আত্মীয়তা ও ইচ্ছার বেগ তাকে আরোগ্য করতে নিত্য সেখানে চাপ প্রয়োগ করছে। ধ্যানের সময় যখন তুমি অন্তরকে ফাঁকা রাখতে চাইছ (তাও একরকম ধ্যান) তখন তুমি ইচ্ছার সেই একাগ্রতাকে থামিয়ে দিলে—তোমার চেতনা তখন প্রশমিত ও নিরপেক্ষ হয়ে গেল। সেই বিশেষ অংশ থেকে চাপটি তখন সরে গেল (বাস্তব বা বিবিক্ত সব কিছুর উপরেই চাপ প্রযুক্ত হতে পারে), তুমি তখন যেন বেদাগ কাগজের সাদা পাতার মতো হয়ে গেলে। একেই আমি বলছি "নিজেকে ফাঁকা ক'রে রাখা," যাতে ইচ্ছার কোনো দিকে কোনো কাজ থাকবে না। আর তার পরে বলছি যখন ঐভাবে তুমি ফাঁকা অবস্থায় গেলে, সে সময় চাপ জিনিসটা সরে গেলেও তোমার নীরব আত্মীয়তাতে সেই শক্তির সঙ্গে তা সম্পর্কযুক্ত হবে যাকে সাধারণ অবস্থায় মনের চাপ দিয়ে আকর্ষণ করছিলে। সেইজন্যই আমি বলছিলাম যে সব কিছুই নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের উপর, যে যেমন আত্মীয়তাতে অভ্যস্ত তার উপর, স্বভাবত যে যেমন সার্থকতা চায় তার উপর, কারণ যে শক্তি তার আত্মীয়তাতে সাড়া দেবে তারই সঙ্গে স্বভাবতই সে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারবে। অতএব কোনো সময় যদি তোমার আত্মীয়তার ক্রিয়া থামিয়ে দিয়ে নীরব নিষ্ক্রিয় গ্রহিষ্ণুতা নিয়েই থাকো, তাহলে অভ্যস্ত আত্মীয়তার ফলে সেই শক্তিকেই তুমি আকর্ষণ করবে যা তোমার আত্মীয়তার ডাকে সহজে সাড়া দিতে পারে।

প্রশ্ন : আপনি বললেন যে জগৎ ও তার অন্ধ অজ্ঞানতা একত্রেই ঘটেছে। এ দুইএর এমন সহানুষঙ্গিকতার কারণ কি ?

উত্তর : কারণের কথা...আলো যেমনি হলো অন্ধকার, চেতনাও তেমনি হলো অচেতনা। কেমন করে তা বোঝানো যায় ? একে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া বলতে পারো, যদি তাতে তোমার মন খুশি হয়। সেটাই হয়তো ঠিক কাজ হলো, জানিনা। সবই নির্ভর করছে যেমন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তুমি দেখবে। নিশ্চয়ই তখন কোনো এক চেতনা ছিল যে আগের থেকেই সব জানতো, সে যখন জেনেশুনেও এটাকে এড়ায়নি, তখন নিশ্চয়ই এটি ছিল নির্ধারিত নির্ঘন্টের অন্তর্গত।...তবে মানুষের দৃষ্টি নিয়েই এমন সব কথা বলা যায়, কিন্তু ওখানকার রাজ্যে এমনভাবে কাজগুলো হয়না। এই বিষয়বস্তুকে নিয়ে তুমি গল্প তৈরি করতে পারো, জমকালো নাটক বানাতে পারো, কিন্তু তা শুধু গল্পই হবে।

গল্পের মূল্য সেইখানে যেখানে তোমাকে তা সহজে বুঝে নিতে সাহায্য করে।

হাঁ, গল্প বেশ চিত্তাকর্ষক হয় বটে....অর্থাৎ সহজেই তোমার মনে লাগে। গল্পের মতো ভাষারও মূল্য সেইখানে যেখানে সে তোমাকে বাস্তবের বোধে পৌঁছে দেয়। বিজ্ঞানও একরূপ ভাষা, আর্টও একরূপ ভাষা, সবই ভাষা যার দ্বারা কিছু ব্যক্ত করা হয়। আর তার মূল্যও ততখানি যতখানি সে তার বক্তব্যের সঙ্গে তোমাকে জড়াতে পারছে। এ হলো মোটামুটিভাবে সাধারণ সংজ্ঞা ; এর মধ্যে তুমি সব কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারো এবং দেখবে যে তা ঠিকই হচ্ছে।

সব জিনিসের বেলাতেই তাই। বিশ্বকে ও বিশ্বসত্যকে যে প্রকারে দেখবে তাও একটা ভাষা হবে, তার ফল নির্ভর করবে সেই দ্রষ্টার উপর এবং যাকে তাই বোঝাতে চেষ্টা করা হচ্ছে তার উপর। যে ভাবেই ব্যক্ত করো, তা যদি বোধগম্য হয় তাহলেই হলো। আর যদি তুমি তা বুঝতে না পারলে, তাহলে তা যত বড়োই বিস্ময়কর ব্যাপার হোক, সে যত বড়োই সত্য হোক, তোমার কাছে তার কোনো মূল্য নেই। বিশ্বের সম্বন্ধে আসলে এই হলো ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী ; সব কিছুরই দাম ততখানি যতখানি তার অস্তিত্বের কারণ বোঝা গেল, আর জগতের যত সব শ্রেষ্ঠ দর্শনজ্ঞান আছে তা যারা বুঝতে পারেনি তাদের কাছে তার কোনো মূল্য নেই। তেমনি অতি উৎকৃষ্ট আর্ট বা ললিতকলার কোনো মূল্য তাদের কাছে নেই যাদের মধ্যে সত্যের সঙ্গে তা না মিলছে। তেমনি আবার অতি নিখুঁত ধরণের যোগও তাদের কাছে নিরর্থক যদি তাদের সিদ্ধিতে তা পৌঁছে দিতে না পারে। এই আপেক্ষিক বোধটি যদি তোমার মধ্যে আসে, তাহলে সকল প্রকার গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতা তোমার লোপ পাবে, তখন আর তুমি এমন কথা বলবেনা যে আমি এতে ফল পেয়েছি অতএব এটাই সব চেয়ে খাঁটি সত্য''—কারণ তোমার বেলাতে তা সত্য হলেও তোমার প্রতিবেশীর বেলাতেও যে তাই হবে এমন কথা নয়। সে যাকে সত্য মনে করে তার পক্ষে তাই সত্য, যদিও তুমি তাকে বলবে ''ওটা বোকার মতো কথা, ওতে কোনো ফল হয়না'',—যদি তার দিক থেকে সে তাতেই ফল পেয়ে থাকে, তাহলে সত্য উপলব্ধির পক্ষে তার বেলাতে তাই সর্বোৎকৃষ্ট। পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই এমনি। তুমি যদি মুখের উপর মুখোস এঁটে সংকীর্ণ দৃষ্টিটুকু নিয়ে কেবল আপন নাকের ডগা পর্যন্তই দেখে খুশি হতে না চাও, তাহলে এ কথা তোমাকে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে যে যে বিশ্বের সব কিছু চলেছে কোনো লক্ষ্যের দিকে, আর সেই জিনিসের মূল্য হবে ততখানি যতখানি তা ঐ লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করবে। আর সকল মূল্যই হলো আপেক্ষিক, যা একের পক্ষে খুব ভালো তা অন্যের পক্ষে তেমন নয়, যা এক মুহূর্তের পক্ষে ভালো তা অন্য মুহূর্তের পক্ষে নয়, সুতরাং কোনো গোঁড়ামি মাত্রই অর্থহীন।

এ কথা বলা খুবই সহজ, ''এটিকে আমি নিজে যখন সত্য বলে জেনেছি তখন অন্য কোনো কথা আর ভাবতেই চাইনা'' ; তোমার পক্ষে তা সত্য হয়েছে ঠিকই, হয়তো তাই থেকেই হঠাৎ আলো পেয়ে গেছ, কিছু অনুভূতি মিলে গেছে, নিজের সম্বন্ধে চেতনা পেয়ে

নিজেকে ছাড়িয়ে তুমি সত্তার সত্য উপলব্ধিতে গিয়ে পৌঁছেচ, অতএব তোমার কাছে তা সঠিক ও অভ্রান্ত। কিন্তু তাই বলে তুমি লোকের দোরে দোরে, শহরে শহরে, দেশে দেশে গিয়ে বলে বেড়াবেনা যে, "আমি যাঁটি সত্যের কথা ঘোষণা করছি," কারণ কেবল তোমার কাছে তা সত্য হলেও অন্যের কাছে তা না হতে পারে। তুমি যেটি দেখেছ তার মধ্যে তার নিজস্ব সত্য অবশ্য আছেই—সবেরই মধ্যে তা আছে—কিন্তু সত্যের যাথার্থ্যের একমাত্র প্রমাণ এই যে তোমাকেই তা সত্তার সত্যের উপলব্ধিতে সাহায্য করেছে, কিন্তু অন্য কাউকে তা সাহায্য নাও করতে পারে; যদিও তুমি তোমার নির্বন্ধাতিশয্যের জোরে তোমার দৃষ্টিতে তাকেও তাই দেখতে বাধ্য করতে পারো, কিন্তু তবু তার দাম বেশি হবেনা।

এ কথা যখন বুঝবে তখন আর বলবেনা, "জগতে এত দৃষ্টিবৈচিত্র্য কেন, এত বেশি রকমারি কেন, এত এলোমেলো ব্যাপার কেন, কেন সব এমনতরো···?" তা এইজন্যই এমন এলোমেলো যে তোমরা সবটা বোঝোনা, আর সব কিছু তার যথাস্থানে থাকেনা। যদি তাই থাকতো তাহলে কোনো গণ্ডগোলই হতো না। এখন একটা কথা জেনে রাখো: এ জগৎ থেকে এর এক টুকরো অ্যাটমকেও তুমি সরাতে পারোনা, তা করতে গেলেই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। যা কিছুই এখানে আছে তা দরকার ছিল বলেই আছে—নতুবা থাকত না। সব কিছুই সমগ্রতাবে অপরিহার্য, ভগবানের অভিব্যক্তির জন্য। একটু কিছু সরে গেলেই সেখানে ছিদ্র পড়ে যাবে। কেবল বস্তুর দিক থেকেই নয়, আমি সর্ববিধ গভীরতার দিক থেকেই বলছি।

সুতরাং যখন তোমরা সাধারণ মানুষদের মতো বলো, "আহা, এই জিনিসটা যদি জগতে মোটে না থাকত তাহলে এ জগৎ কতই না সুন্দর হতে পারত," তখন তা নিছক তোমাদের অজ্ঞানতারই পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়।

জাপানে থাকতে একবার আমার টলষ্টয়ের এক পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সে মানব ঐক্য প্রচার করবার জন্য সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে। তার বাপের কাছ থেকে এই ঐক্যের আদর্শটি গ্রহণ করে জগতের সর্বত্র সেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে সে বদ্ধপরিকর। কোনো এক বন্ধুর বাড়িতে তার পরিচয় পেয়ে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই মানব-ঐক্যের আদর্শকে তুমি কেমন করে সফল করবে?" সে তাতে কি বললে জানো? বললে, "ও, সে তো খুব সহজেই হতে পারে। জগতের সকল মানুষই যদি এক ভাষাতে কথা বলে, সকলেই যদি এক রকমের পোষাক পরে, একই রীতিতে জীবনধারণ করে, তাহলেই জগতের সব মানুষই মিলে এক হয়ে যাবে।" আমি তখন বললাম, "তেমন জগতে কিন্তু বাস করা যাবেনা।" কথাটা সে বুঝতেই পারলে না। *

* Bulletin of S. A. I. C. E. থেকে। অনুবাদক—শঙ্করীপ্রসাদ বসু

প্রসঙ্গত

১১৩

"বিরাগ হলো প্রচ্ছন্ন অনুরাগেরই এক লক্ষণ যা নিজের কাছ থেকে পালাতে চাইছে আর আপন অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে গিয়ে প্রচণ্ড হয়ে উঠছে। এও ভগবানের সৃষ্ট জীবদের মধ্যে তাঁর এক লীলা।"

এরও একরকম শাসন আছে—যে ব্যক্তি ঘৃণা করছে তার থেকে আসে। সে শাসন মূলতঃ প্রেমের শাসন হতে অভিন্ন। তলায় তলায় থাকে একই রকমের সংবেদন। যদিও বাইরে দেখতে সম্পূর্ণ বিপরীত, কিন্তু ভিতরে একই জিনিস তার অবলম্বন। এমন কি এ কথাও বলা যায় যে তুমি যেমন অনুরাগের দাস হও, তেমনি বিরাগেরও দাস হও, বরং তার চেয়েও হয়তো বেশিরকম। ও জিনিস তোমাকে আঁকড়ে ধরে, আবিষ্ট করে রাখে, আর ওর আবেগকে তুমি লালন করতে থাকো, কারণ ওর প্রবেগের মধ্যে যে উষ্ণতার আকর্ষণ রয়েছে তা প্রেমের উষ্ণতার মতোই জোরালো। কেবল বাইরের অভিব্যক্তিতে তা ঐরূপ বিকৃতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

যেখানে তুমি ভালোবাসো তার আবেগের চেয়ে যেখানে তুমি ঘৃণা করো তার আবেগ তোমার কাছে বেশি তীব্র। সেই তীব্রতার আবেশ আসে ভিতরের শাসন হতে। এই সকল "অনুভবের" (আর কি নাম দেওয়া যায়?) মধ্যে এক ধরণের শাসন জাগে যার মূল রয়েছে কেন্দ্রে, অনেক স্তর আবরণ দিয়ে ঢাকা। সেই কেন্দ্রস্থ শাসন একই প্রকৃতির, কিন্তু বাইরে বেরোবার জন্য যখন "স্ফীত" হয়ে ওঠে তখন নানাভাবে বিকৃত হয়ে দাঁড়ায়। প্রেমের বেলাতে তা বেশ সুস্পষ্ট; অধিকাংশ স্থলে তা বাইরে যেমন দাঁড়ায় তা ভিতরের জিনিস থেকে একেবারে স্বতন্ত্র, কারণ তা কঠিন হয়ে ওঠে কেবল স্বার্থের দিকে ঝোঁকে অধিকার লাভের মতলবে। তখন তুমি চাও তারই ভালোবাসা পেতে। মুখে বলো "আমি ওকে ভালবাসি" কিন্তু মনের ভাবটি হয় "আমাকে ও ভালোবাসুক"। সে বিকৃতি ঘৃণারই অনুরূপ হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে ভালোবাসে সেখানে সেটিকে নষ্ট করে ফেলে, যাতে নিজে বাঁধা না পড়তে হয়। এমন কি তোমার শ্রেয়াস্পদের কাছে যা চাইছ তা যখন পাচ্ছনা তখন নিজে মুক্ত হবার জন্য তাকে বিনাশ করতে চাও; ভিতরের ক্ষোভে তুমি কঠিন হয়ে ওঠো, যেহেতু তুমি যাকে ভালোবেসেছ তাকে আত্মসাৎ করতে পারছ না। সত্য কথা বলতে কি (মা হাসলেন) গভীরতর সত্যের দিক থেকে ওর মধ্যে তফাৎ কিছু নেই। কেবল যখন কেন্দ্রের শাসন বিশুদ্ধ ও অবিকৃতরূপে প্রকাশ পায় তখনই হয় প্রকৃত উন্মীলন

(কি নাম দেবো ?)···তার বিকিরণ হয়ে সে হয় আপন গৌরবে উদ্ভাসিত, তখনই তার সত্য স্বরূপ। এবং বাস্তবে তা হয় আত্মদান, আত্মবিস্মরণ, আত্মিক বদান্যতায় পর্যবসিত। তাই একমাত্র ওর সত্য ক্রিয়া। কিন্তু যাকে "প্রেম" বলে থাকো, তা কেন্দ্রস্থ আসল প্রেম থেকে এতই তফাৎ যে তা ঘৃণারই অনুরূপ; কেবল একটির বেলাতে হয় নীরব সংকোচন, কাঠিন্য, আর অন্যটিতে হয় বিস্ফারণ। এবং তা ভাবরূপে নয়, দেখা দেয় স্পন্দনরূপে। এটাই উল্লেখযোগ্য।

আমি এই নিয়ে সম্প্রতি কিছু গবেষণা করেছি। স্পন্দনগুলিকে দেখার সুযোগ আমার ঘটেছিল: তার বাহ্য ফল অবাঞ্ছনীয় হতে পারে, এমন কি ব্যবহারিক হিসাবে তা নিন্দনীয়, এ ধরণের স্পন্দন হানিকর ও বিনাশেরও হতে পারে, কিন্তু গভীরতর সত্যের দিক থেকে তা অন্যরূপ স্পন্দন অপেক্ষা গুরুতর নয়, কেবল আক্রমণাত্মক, ও নীরব।

আরো যদি গভীরে গিয়ে এ-স্পন্দনকে একাগ্রভাবে লক্ষ্য করো তো দেখবে যে মূলে এটি সৃষ্টিক্রিয়ারই স্পন্দন, তাই এখানে রূপান্তরিত ও বিকৃত হয়ে গেছে। ওর মধ্যে এক সর্বগ্রাসী উষ্ণতা আছে (ঠিক মাধুর্য নয় কিন্তু কড়া রকম মাধুর্যের ভাবযুক্ত) যার মধ্যে হাসিও আছে অশ্রুও আছে, হাসির ভাগই বেশি...সে বিকৃতি ন্যায্য না হলেও মানুষের মন ও তার নীতিবোধ একটা ছেড়ে অন্যটাকে বেছে নেয়, তারই বিরুদ্ধে ঐরূপ প্রতিক্রিয়া আসে। এক পর্যায়ের বিকৃতিকে লোকে বলে "মন্দ", আর অন্যটিকে প্রশ্রয় দেয় এবং প্রশংসাও করে। অথচ আসলের দিক থেকে দেখে একটি যে অন্যটির চেয়ে বেশি মূল্যবান তা নয়—এখানে শুধু পছন্দের কথা।

মোটকথা প্রথমে লক্ষ্য করবে কেন্দ্রস্থ স্পন্দনকে ও তার অনুপম সৌন্দর্যকে, যাতে সবরকম বিকৃতি হতে তুমি আপনিই তফাৎ থাকো, তা বাইরের দিকে ভালোই হোক বা মন্দই হোক।

অতএব আমরা একই স্থানে একই সন্ধানে এসে পড়ছি—প্রকৃত যা সত্য তাকেই আয়ত্ত করো এবং তাকেই আঁকড়ে থাকো, মৌলিক প্রেমের মৌলিক সত্যকেই ধরে থাকো।

২৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৫ শ্রীমা

পথের কথা

২৭শে নভেম্বর, ১৯৬৫

(মা ১৯৬৫ নভেম্বরের দর্শন উপলক্ষে যে বাণী বিতরণ করেন সেই প্রসঙ্গে)

"উপরের আলোকে টানাহেঁচড়া করে নামিয়ে আনতে চাওয়া খুবই ভুল। অতিমানসের উপর জোর খাটেনা। সময় উপস্থিত হলে সে আপনিই নিজেকে খুলে ধরবে কিন্তু তার আগে অনেক কিছুই করতে হবে যা ধৈর্যের সঙ্গে ধীরে সুস্থে করা চাই।"

বুদ্ধিমান লোকেরাও তাই চায়। তারা বলবে, "ঠিক কথা, বিরেকুল্ হবে এমন কিছু বলা হচ্ছে না।"

প্রশ্ন এ কথা কেন? কজনই বা তাকে জোর করে "টেনে নামিয়ে আনতে" চায়?

উত্তর : লোকে তাই চায় যে তাড়াতাড়ি সব হয়ে যাক, ফলটা এখনই যেন দেখতে পাই। তখন তারা ভাবে যে অতিমানসকে আমরা এখন টেনেই আনি—এই ভেবে তারা টানতে থাকে কোনো ক্ষুদ্র প্রাণসত্তাকে, যারা ওদের নিয়ে খানিকটা খেলা করে, শেষে ওদের দিয়ে একটা বিশ্রী প্রহসনের সৃষ্টি করে। শতকরা নিরানব্বুই স্থলে তাই-ই হয়ে থাকে।

ক্ষুদ্র কোনো প্রাণময় সত্তা প্রচুর আলোর ঝলকানি দেখিয়ে এই জবকালো রকমের খেলার সূত্রপাত করে; তখন যে বেচারা টানাটানি করছিল সে সেই আলোর ধাঁধায় পড়ে, "এই তো, এই হচ্ছে অতিমানস" বলতে বলতে সে তার ফাঁদে পড়ে যায়।

কেবল যখন তুমি তার সত্য স্পর্শটি পেয়েছ, যথার্থ আলোটির সংস্পর্শ যখন কোনো প্রকারে ঘটেছে এবং তাকে দেখেছ, তখনই পার্থক্যটা বুঝতে পারো, তখন জানতে পারো যে ঐ প্রাণসত্তার আলো একেবারে কৃত্রিম, থিয়েটারের ষ্টেজের আলোর মতো। বাকী সকলে আলোর ঝলমলানি দেখে প্রভাবিত হয়ে বলতে থাকে "অতি আশ্চর্য, কি চমৎকার।" কিন্তু যে সত্য দেখেছে, যে তার স্পর্শ পেয়েছে, সে শুধু স্মিতহাসি হাসে।

ওটা শুধু জানবিদ্যা, কিন্তু সত্যকে জানা থাকলে তবেই তা ধরতে পারবে। শেষ পর্যন্ত সব কিছুর বেলাতেই তাই। প্রাণের রাজ্য যেন ভেল্কি দেখাবার ষ্টেজের মতো—খুবই চমকপ্রদ, ঝল্‌মলে এবং ছলনাময়; সত্য বস্তুকে যে জানে সে তখই তা ধরে ফেলবে, না কিছু ভেবেচিন্তে আপনা হতেই বলে উঠবে, "না না, ও আমি চাইনা"। সব জিনিসের বেলাতেই এমনি। মানুষের জীবনে যা খুবই একটা দামী স্থান অধিকার করে আছে, তা হলো প্রেম। প্রাণের আকর্ষণ, প্রাণগত মোহের আবেগ প্রায় সর্বত্রই আসল প্রেমের স্থান নিয়েছে যা স্বভাবতই নীরব ও শান্ত, কিন্তু এ-প্রেম তোমাকে প্রবল রকমে ফেনায়িত করে তোলে, তুমি ভাবো যে একেই বলে "বাঁচা"। কিন্তু তা যে নিতান্তই ছলনা এ কথা

তুমি জানতে পারোনা, ভাবতে পারোনা, সত্যবস্তু কেমন তা না জানা থাকলে মিথ্যাকে স্পষ্টভাবে চিনতেই পারোনা। চৈত্য ও দিব্য মিলনের দ্বারা যদি তার স্পর্শ একবার পেয়ে থাকো, তখন দেখবে যে ও-জিনিস কতই ফাঁপা, কত হাল্কা, অন্তঃসারশূন্য,—কেবল আপাতদৃষ্ট সুন্দর, মিলনানন্দের চেয়ে বিরোধান্তই বেশি।

ও-প্রেমের কথা যতই কেন বলো, যতই কেন বোঝাও, তাতে কিছু ফল হয়না, কারণ পুরুষ বা স্ত্রী যেই কেন তার খপ্পরে পড়ে যাক, সে তখনই বলবে, "হাঁ, তাহলেও আমাদেরটা অমুকদের মতো নয়",—অর্থাৎ তোমরা যেটা হয়েছে সেটা কখনই অন্যান্যদের মতো হয়নি। আসল জিনিস অনুভব করলে তখনই বুঝবে ওটা প্রেমের ছদ্মানুযোগ—তৃপ্তিকর নয়।

আর যখন তুমি সত্য জিনিসকে টানতে যাও, তখন শতের মধ্যে কেন, লাখের মধ্যেও হয়তো একজনের পক্ষে একবার তা আসতে পারে যদি সে ঠিক প্রস্তুত থাকে। নতুবা ঐ প্রাণসত্তাকেই তুমি টানো, সে এসে নাটকের খেলা দেখায়, আসল জিনিস আসেনা।

টানতে যাওয়া মানেই তা অহংএর ক্রিয়া। যা বিকৃত আস্পৃহা। প্রকৃত আস্পৃহা কেবল দিতেই চাইবে, সে কেবল আত্মদান করবে, কিন্তু টানতে যাওয়া মানে তুমি নিজের জন্যই টানছ। মনে যদি তোমার খুবই বড়ো উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে—পৃথিবীকে নিয়ে, বিশ্বকে নিয়ে—তাতেও কিছু বদলায় না, সবই তোমার মনের কাজ হয়।

(অনেকক্ষণ নীরব থেকে)

দর্শনের দিনে তুমি কি বিশেষ কিছু লক্ষ্য করেছিলে?

প্রশ্নকারী না।

মা বললেন : শ্রীঅরবিন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

আর, হাঁ, এক ঘন্টারও বেশি সময় সেইরূপ মানব জগতের মধ্যে বাস্তব ও জীবন্ত দৃষ্টি দিয়ে আমাকে অবস্থান করিয়ে রাখলেন, যেখানে মানবকুল নতুন অতিমানস সৃষ্টির মধ্যে তদনুরূপ অবস্থায় থেকে তাদের আপন আপন বিভিন্ন স্তরে চলাফেরা করছে। সেই সব মানুষের মধ্যে পশুত্ব আর একেবারেই নেই, সমূহ মানসিক উন্নতির ফলে তাদের জীবনে এসেছে একটা অপূর্ব সঙ্গতি—প্রাণগত কলারুচিগত ও সাহিত্যগত সঙ্গতি—যার মধ্যে অধিকাংশই জীবনের আনন্দ নিয়ে জীবনধারণ করছে। সুসভ্য পরিবেশের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে সঙ্গতি রেখে যেমনভাবে থাকা উচিত তেমনি ভাবেই তারা আছে, সকলেই ভদ্র ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন ও মার্জিত আচরণে অভ্যস্ত; তাদের সেই জীবনের মধ্যে একটা সৌন্দর্য প্রকাশ পাচ্ছে, আর হঠাৎ কোনো বিপদ আপদ এসে না পড়লে সাধারণত বেঁচে থেকে তারা সুখী ও সন্তুষ্ট। এরা এমন উন্নত বুদ্ধি ও উন্নত দৃষ্টি পেয়েছে যে নতুন শক্তির ও নতুন আদর্শের ছাঁচ নিয়ে তারা উন্নততর ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে, মনোগত ও বুদ্ধিগত ভাবে শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য হতে পারে। কিন্তু স্থূলজীবনে পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন

তারা বোধ করেনা, কারণ তা করতে গেলেই তা সময়োপযোগী না হওয়াতে অনাবশ্যক একটা বিশৃঙ্খলা এসে পড়বে।

এ পর্যন্ত বেশ স্পষ্টই দেখা গেল।

কিন্তু এ ছাড়া বিশেষ কয়েকটি বিরল ব্যক্তিকে দেখা গেল যারা রূপান্তর ও নবশক্তি লাভের জন্য প্রস্তুত, তারা জড়কে মানিয়ে নিতে পারে, অতিব্যক্তির বিকাশ করতে পারে, ইত্যাদি। এরা শ্রীঅরবিন্দের যোগ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। সংখ্যায় তারা খুবই অল্প। এমন কি তারা আত্মোৎসর্গ করতে এবং কঠিনতর কঠোর জীবন গ্রহণ করতেও প্রস্তুত, যদি তাতে ভবিষ্যৎ রূপান্তরের কিছু সাহায্য হয়। কিন্তু তারা জানে অন্য কাউকে তাদের দলে টানতে চেষ্টা করা উচিত হবেনা, তাতে বিশৃঙ্খলার হানি ঘটবে এবং পৃথিবীতে ধীরে ধীরে যে কাজ হচ্ছে তার সহায়তার পরিবর্তে বিপর্যয় ঘটানো হবে।

কিন্তু যা দেখলাম তা এতই বাস্তব ও প্রাণবন্ত যে আমার সমগ্র মনোভাব (যদিও সক্রিয় নয় নিষ্ক্রিয়) ও কর্মপদ্ধতিই বদলে গেল। ওর থেকে এসে পড়েছে একটা প্রশান্তি ও স্থিরতা ও পরিবর্তন সম্বন্ধে নিশ্চয়তা। আর আগে যেগুলিকে মনে হতো একঘেঁয়েমি, মৃত্যু, নিশ্চেতনা, সব কিছুই এখন ঘুচে গেছে। এ যেন এক বিরাট বিশৃঙ্খল চলেছে যার সমগ্রতার মধ্যে সব কিছুই স্থান পেয়েছে তার যথাস্থানে আর সব কিছুই নির্ভুল। আর খুব অল্প-সংখ্যকের মধ্যে এই যে রূপান্তরের প্রয়াস এতেই তার দাম অনেক বেড়ে গেছে এবং সুসিদ্ধ হবার পক্ষে তা খুব জোরালো হয়েছে। নতুন সৃষ্টির জন্য যারা হবে অগ্রদূত তাদের যেন এইভাবে আলাদা করে বেছে নেওয়া হয়েছে। আর জড়বস্তুকে নিয়ে এই যে সব "আলোড়ন" ও "বিশ্লেষণ" ও প্রস্তুতীকরণ", এ সব হলো ছেলেমানুষী, মানুষের অস্থিরতার পরিচয়।

যা দেখলাম তার সৌন্দর্য এমন মহিমাময় ও স্নিগ্ধ হাস্যোদ্ভাসিত....যা দেখলেই মনে হয় যে আহা, এ যে দিব্য প্রেমে পরিপূর্ণ। আর সে দিব্যপ্রেম "ক্ষমাশীল" নয়, কোনো ত্রুটিকে তার ক্ষমা করার প্রয়োজন নেই, কারণ সব কিছুই রয়েছে তার যথাস্থানে, সব কিছুই চলেছে নিখুঁত এক আভ্যন্তরীণ ছন্দ মেনে।

এ এক অতি সুন্দর রকমের দান।

কিন্তু এ জিনিসের কতক কতক অনেকের বুদ্ধিতে ও ধারণাতে এমনিই আসে। তারা জানে এসব কথা, কিন্তু সে জানা একেবারে অনর্থক হয়। দৈনন্দিন জীবনে তারা অন্যভাবে চলে, তারা তখন বাস্তবের দিক দিয়ে ভোগে। কেবল উচ্চভাবের অবস্থাতেই তারা এমন দেখেছে, এ জিনিসের স্পর্শ পেয়েছে।

এ জিনিস আমি দেখেছিলাম উদ্ভিদ্‌রাজ্যের স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্য দেখার পরে (তাও অতি আশ্চর্য), এবং তার পরে দেখলাম পশু জগতেরও অতি সঙ্গতিপূর্ণ জীবনধারা (মানুষ যদি সেখানে হস্তক্ষেপ না করে), সেখানেও সবই রয়েছে তার যথাস্থানে। ওর পরে দেখলাম প্রকৃত মানবজীবন, অর্থাৎ তার মানসিক সমৃদ্ধির চূড়ান্ত, যার দ্বারা সে এমন সৌন্দর্য, সঙ্গতি,

জীবনের রম্যতা ও সৌষ্ঠব, জীবনের সৌন্দর্যময় ও মধুময় আস্বাদ এনে ফেলতে পারে যাতে সকল হীনতা ও কদর্যতা আপনিই দূর হয়ে যায়। এ এক অপরূপ মানবজাতি, যা তার চূড়ান্তে উঠেও কত রমণীয়, মানুষ হওয়াতেই পরম পরিতৃপ্ত, সুসঙ্গত জীবন যাপনে পরম তুষ্ট। নতুন সৃষ্টির ফলে মানবজাতি প্রায় সমগ্রভাবেই কি হয়ে দাঁড়াবে এ যেন তারই একটা মূর্ত অঙ্গীকারস্বরূপ। আমি জানলাম যে অতিমানস চেতনা এলে এমনই হয়ে দাঁড়াবে। মানুষ যে পশুজাতিকে নিয়ে কি করে তুলেছে এখানে তারই যেন একটা তুলনাও মেলে (অবশ্য তা বিশ্রিত জিনিস, তবে অনেকটা উন্নত করে এনে তাদের কাজে লাগিয়েছে)। মানুষের মনের প্রভাবে পশুত্ব অন্য জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে, যদিও স্বভাবতই তা বিশ্রিত, কারণ মানুষের মনও তো অপূর্ণ; তেমনি ভারসাম্যযুক্ত উন্নত মানুষদের মধ্যেও সুসঙ্গত মানবতার দৃষ্টান্ত রয়েছে, যার থেকে বোঝা যায় যে অতিমানসের প্রভাবে মানুষ কি হবে।

তবে তার এখনও অনেক দেরি আছে। এমন প্রত্যাশা কোরোনা যে এখনই তা হয়ে যাবে, হবে অনেক দেরিতে।

এখনও কেবল মধ্যবর্তী অবস্থাই চলেছে যা সুদীর্ঘ ও যথেষ্ট কষ্টকর হতে পারে। কিন্তু কষ্টকর হলেও লক্ষ্যের দিকে চেয়ে তার ক্ষতিপূরণ মিলতে পারে, যদি জানো তা অতি সুনিশ্চিত। তা হবে এমন জিনিস যার থাকবে সকল ভ্রান্তি, সকল বিকৃতি, মনোময় জীবনের সকল কদর্যতাকে ঘোচাবার শক্তি, তখন সারাজীবন হবে অতি সুখের, মানুষ হওয়াতেই তা আনন্দ পাবে, তখন তারা মানুষ ছাড়া আর কিছু হতে চাইবে না, মানবীয় সৌন্দর্য ও সঙ্গতিই হবে কাম্য।

যে দৃশ্য দেখলাম তা খুবই মনোরম, আমি যেন তারই মধ্যে বাস করতে থাকলাম। সকল বিরোধ ঘুচে গিয়ে আমি যেন সেই পূর্ণতার মধ্যেই অবস্থান করছি। অতিমানস চেতনা এলে যে অবস্থা হবে তার আদর্শের সঙ্গে যেন মিলে গেল। খুবই ঠিক ঠিক জিনিস বলে মনে হলো। তাতে একটা বিশ্রাম বোধ করলাম। যত কিছু চাপ, সংঘর্ষ, অধৈর্য, কিছুই রইল না, সব একেবারে মুছে গেল।

প্রশ্ন : অর্থাৎ আপনি নিজের কাজকে সর্বত্র ছড়িয়ে না দিয়ে ঐখানে কেন্দ্রীভূত করতে চান?

উত্তর : না, বাস্তবের দিক দিয়ে ছড়াতে হবেই, কারণ মানুষগুলি তো একজায়গাতে জড়ো হয়ে নেই। যদিও তারা সংখ্যায় খুব অল্প। কিন্তু এই মানুষকে নতুন সৃষ্টির জন্য "প্রস্তুত" করে তোলার যে আগ্রহ তা দূর হয়ে গেছে।

প্রশ্ন কিন্তু আগে তা কয়েকজনের মধ্যে আসা চাই।

উত্তর : ঠিক কথা। তাই সেই রকম বাস্তবের চোখেই আমি দেখছিলাম। রূপান্তরের জন্য অতিমানস সিদ্ধির জন্য খুব কম সংখ্যক লোক হলেও, সাধারণ মানুষদের মধ্যেও উত্তরোত্তর উচ্চতরের মানুষ তৈরি হওয়া চাই যারা হবে ভবিষ্যতের অতিমানস সত্তা, অর্থাৎ যেমন মানুষের দিকে পশুদের এখন যেরূপ ভাব থাকে। যারা রূপান্তরের উপযোগী হয়ে তার জন্য কাজ করছে তারা ছাড়াও একরকম উঁচুদরের মধ্যবর্তী অবস্থার মানুষরা থাকবে যারা এই মানব সঙ্গতিকে উপলব্ধি করবে, তারা সবিশ্বাসে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে "কোনো কিছুর" কাছে আত্মনিবেদন করবে যা এমন বেশি উচ্চ জিনিস যে তাকে বোঝবার চেষ্টা না ক'রে কেবল অনুভবই করবে যে তার প্রভাব পেয়ে তার আশ্রয়ে তারা রক্ষা পাচ্ছে এবং সেই আনন্দই তাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে। কিন্তু এই উদ্বেগ ও কোনো কিছু অবলম্বন না পাওয়ার যন্ত্রণা তাদের থাকবে না, কারণ তাকে খুঁজে পাওয়ার অবস্থা তাদের তখনও আসেনি—সে জীবনে প্রস্তুতির জন্য তাড়াতাড়ি করতে গেলে আরো বিশৃঙ্খলা ও বেদনা ঘটবে।

এ সমস্যা নিয়ে একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত সামনেই রয়েছে : মানুষের যে যৌন প্রবৃত্তিটি রয়েছে তা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও একভাবে বলা যায় ন্যায্য। এই প্রবৃত্তি কালক্রমে পশুত্বের সঙ্গে আপনা হতেই লোপ পাবে (আরো অনেক কিছু লোপ পাবে, যেমন খাওয়ার প্রয়োজন, এখনকার মতো ঘুমের প্রয়োজন), কারণ যে প্রবৃত্তি এখনও আনন্দদায়ক না হলেও সুখ ও আরামদায়ক হয়ে আছে, তার প্রয়োজন তখন আর প্রকৃতির মধ্যে থাকবে না, কারণ ঐভাবে সৃষ্টিরক্ষার প্রয়োজনই আর হবে না, তখন সেই যৌন প্রবৃত্তিও চলে যাবে। সুতরাং জীবনের আনন্দের ব্যাপার অন্য ধাপে উঠে গিয়ে অন্য দিক দিয়ে প্রকাশ পাবে। কিন্তু পূর্বে যে যৌন ত্যাগের কথা বলা হতো তা অর্থহীন, যারা ওর উপরে উঠে গিয়ে পশুত্বের সীমা পার হয়ে গেছে তাদের পক্ষেই তা সম্ভব। সে জিনিস তখন বিনা দ্বন্দ্বে আপনা হতেই খসে পড়বে। তাই নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে যাওয়া বোকামি। মানবীয় চেতনা ছেড়ে গেলেই তা সহজে ছেড়ে যাবে। একটা মধ্যবর্তী অবস্থা থাকে যেটা কষ্টকর হয় কারণ তার ভারসাম্য ঠিক থাকে না, কিন্তু ভিতরে যে শিখাটি জ্বলছে তারই আত্মসাতে সে কষ্ট আর কষ্টদায়ক হয় না, হাসিমুখে তা সওয়া যায়। কিন্তু যে প্রস্তুত নয় তার উপর জোর করে এই নিরোধাজ্ঞা চাপানো ভুল। এ হলো সহজবুদ্ধির কথা। যে মানবধর্মী, তাকে তা নয় বলে বোঝানো সাজেনা।

যখন আপনা হতেই ঐ প্রবৃত্তি অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে, যখন ওকে কষ্টের জিনিস বলে মনে হবে, তখনই তা সহজ হয়ে আসবে। তখন বাইরের বাঁধনও কেটে দেবে।

এই এক বাস্তব দৃষ্টান্ত। তেমনি খাদ্যের বেলাতেও তাই হবে। পশুত্ব চলে গেলে খাদ্যের নিতান্ত প্রয়োজনও চলে যাবে। তার মধ্যে একটা মধ্যবর্তী অবস্থা আসবে, যখন

উত্তরোত্তর খুব কমই স্থূল খাদ্য খাবে। হয়তো তখন শুধু ফুলের গন্ধ থেকেই পুষ্টি মিলে যাবে। আমি এটা দেখেছি, খুব সূক্ষ্ম রকমের খাদ্যেই পুষ্টিলাভ হতে পারে।

কিন্তু দেহ এখনও প্রস্তুত নয়। তাই দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সে নিজেই নিজেকে খেয়ে ফেলে। তাই বোঝা যায় যে সময় এখনও আসেনি—এখন চলেছে গবেষণা পরীক্ষা —তাতে এই শিক্ষা মিলছে যে জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে তফাৎ করে রাখা চলে না (তা করাও অসম্ভব), কিন্তু তথাপি উচ্চতর স্তরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে।

(নীরব থেকে)

যারা উঠে গেছে বুদ্ধির উচ্চমার্গে অথচ মনকে বশে আনতে পারেনি, তারা সোজাসুজি এটাই মনে করে যে সকলেই তাদের মতো চিন্তা করতে জানুক এবং নিজেরা যা বুঝেছে তারাও সেটা বুঝুক, কিন্তু যখন অন্যেরা সেটা বুঝতে না পারে তখন তারা খুব অধীর ও বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, "কী বোকা এরা।" কিন্তু বোকা তারা নয়, তারা ভিন্ন রকমের, তারা ভিন্ন জগতের। কোনো পশুর কাছে গিয়ে তাকে কখনই বলোনা যে "এটা বোকা!" তুমি বলো যে "এটা পশু"। তেমনি তুমি বলবে "এ-একজন মানুষ"। কিন্তু এমন অনেকে আছে যারা ঠিক মানুষও নয় আবার দেবতাও নয়, তারা আছে এক অব্যবস্থিত অবস্থায়। কিন্তু আমি যাদের দেখলাম তারা এমন মধুর এমন মনোরম, এমন আশ্চর্য, সবই অতি সহজে নিজেকে বিকাশ করছে।

সব মিলিয়ে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এমন এক অনুকম্পা উপস্থিত রয়েছে যা সব কিছুই বোঝে—সে অনুকম্পা ছোটোর প্রতি বড়োর দয়া নয়. সে হলো ভগবৎ-অনুকম্পা, যা সমগ্রভাবেই জানে যে যা কিছু হওয়া দরকার তা সকলই হচ্ছে।

শ্রীমা

---

* S. A. I. C. E. Bulletin থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

শ্রীঅরবিন্দের যোগ*

সুধা বসু

ঈশোপনিষদ বলছেন "জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ", এবং তা 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি'—কর্ম করতে-করতেই একশ বছর বেঁচে থাকবার সঙ্কল্প করবে। এই হচ্ছে প্রাণের তাগিদ। জিজীবিষা হল will to live বা শতায়ু হয়ে 'দেবহিত আয়ু'কে সম্ভোগ করা। কিন্তু এই অনুশাসনের মধ্যে শুনতে পাই বিজর বিমৃত্যু আদিত্যরূপী প্রাণের প্রচোদনা ; নিজের ভিতর থেকে এক প্রচণ্ড সঙ্কল্পের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমাদের বাঁচার মত বাঁচতে হবে একশ বছর দেহের জরা ও প্রাণের অবক্ষয় সত্ত্বেও আমাদের মনোজ্যোতি যেন প্রজ্বল থাকে শেষ পর্যন্ত। এবং এরই জন্য প্রাণকে হতে হবে প্রজ্ঞাশাসিত। সমস্ত জীবনকে যোগ করে তুলতে হলে ওই প্রবল জিজীবিষাকে সার্থক করতে হবে ঈশের ঈপনায় ও প্রসাদে তাকে প্রবুদ্ধ করে। কেননা, অপ্রবুদ্ধ জিজীবিষার অপরিহার্য অঙ্গ কামাহত চিত্তের জ্বালা। তাইতে যোগজীবনের প্রগতিতে একদিকে যেমন থাকবে প্রাণের তাগিদে এগিয়ে চলার প্রবল প্রবেগ, অপরদিকে তেমনিই থাকবে প্রজ্ঞার প্রেরণায় অপ্রতিবোধের অপসারণ। এই প্রজ্ঞা ও প্রাণের যুগ্ম যোগশক্তিই আত্মবোধের উল্লাসে বীর্যবত্তর হয়ে উঠবে সাধকের আধারে, দেহে প্রাণে মনে, এবং সব ছাপিয়ে বিজ্ঞানে ও আনন্দে।

*

সংসারে মানুষের সাধারণ জীবন পশুজীবনেরই উচ্ছিষ্ট গতানুগতিক এক জড় জীবন। বাইরে থেকে প্রকৃতিকে দেখতে গেলে মনে হয় তার সমস্তটাই যেন এক জড়পিণ্ড। কিন্তু তাতেই আবার প্রাণ জাগলে সে-ই জড়কে নিয়ন্ত্রিত করে, আবার মন জেগে প্রাণকে সমৃদ্ধ করে এবং মন-প্রাণ মিলে আনে অভ্যুদয়। কিন্তু এতেও প্রগতির তো শেষ হয় না। এরও পরে মনের ওপার থেকে ডাক আসে নিঃশ্রেয়সের। অন্নদামঙ্গলের কবি দেবীকে ঈশ্বরী পাটনীর নায়ে বসিয়ে তাকে তাঁর স্বরূপ দেখিয়েও তার চাওয়াকে 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'—এর বেশী উজিয়ে নিতে পারেননি। এই দুধে-ভাতে তুষ্ট থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রাকৃত জীবনের অপরিহার্য প্রথম পর্ব। কিন্তু মানুষ পশুই তো নয়, প্রাণের পরেও তার মন আছে, আছে বুদ্ধি। তাই নিয়ে সে চিন্তা করে, আর এগিয়ে চলতে চায়। এই প্রগতির আকাঙ্ক্ষা হতেই মনোময় জীবনের শুরু। মন উদ্যমন ও সমর্থ হলে অনুগত প্রাণের পরিতর্পণেই মানুষ তুষ্ট হয়না। অজানার ডাক শুনে সে আরও এগিয়ে চলতে চায়, তার

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

প্রাণ বলে—'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনখানে'। এই ঘোড়সওয়ার তাগিদেই অধ্যাত্ম-জীবনের সূচনা। আত্মবোধের গভীরে তলিয়ে সে নিজেকে বুঝতে চায় বলে জিজ্ঞাসু হয়, আর উর্ধ্বতন রহস্যের হাতছানিতে আলোর আভাস পেয়ে নিজের আত্মপরতার গণ্ডি কেটে বেরিয়ে পড়তে চায়। এই অধ্যাত্মপিপাসা মানুষের মধ্যে যে কবে থেকে জেগেছে, কালের হিসাবে তা নির্ণয় করা যায়না। তাই চলার পথে ভুক্ত জীবনকে পরিপাক করে করে সে কেবলই পথে ভাসে আর বলে "হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।"

এমনি করে দেখতে পাই জড়াশ্রিত জীবন আর মনোময় জীবনের সঙ্গে অধ্যাত্ম-জীবনের এক ওতপ্রোত সম্পর্ক। সমস্ত মানুষের মধ্যেই ধর্মবোধের একটা উন্মেষ গোড়ায় দেখা দেয়। ধর্মবোধ ও তা থেকে একটা নীতিবোধ—কোন না কোন রকমে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই থাকে। এটা তাকে মন্দির, মসজিদ গির্জা পর্যন্ত নিয়ে যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা প্রাণের একটা গতানুগতিক এবং দায়সারা গোছের ভাব হয়ে দাঁড়ায়। যেমন দেখি দ্বিজের সাবিত্রী দীক্ষাও এখন একটা সমাজগত অনুষ্ঠান মাত্র হয়ে পড়েছে। তাইতে বেদময়ে দীক্ষা পেয়েও সেটাকে সমর্থ আর জীবনে কার্যকরী করার দায়িত্ব যেন কেউ বোধও করে না। সমাজের অনুশাসনে বৈদিক দীক্ষার পর তাই আবার তান্ত্রিক দীক্ষার প্রয়োজন হয়। সাবিত্রী দীক্ষায় যদি আধারের সবটাই উত্তম অধিকারীর মত প্রাণের আগুনে জ্বলে উঠত, তাহলে আবার নতুন করে দীক্ষা গ্রহণের প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু সমাজের সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে আমাদের তাল দিয়ে চলতে হয় এবং সাময়িকভাবে সমষ্টির ধর্মবোধকে স্বীকৃতি দিতে হয়। এতে প্রাণের পিপাসা মিটল না, অথচ প্রবুদ্ধ অগ্নি স্তিমিত হয়ে পড়ল, এমন একটা নির্বেদ কারও কারও মধ্যে আবার দেখা দেয় অধ্যাত্মপিপাসা জাগলে পর। তখন মহাপুরুষ সংস্রবের প্রয়োজন হয়। দীক্ষা নিয়ে সাধক আবার তার সঙ্কল্পকে পরিশুদ্ধ করে নতুন করে। প্রাণের আগুনে বীর্য সঞ্চারিত হয়, আলোর দিগন্ত আবার উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সামনে।

কিন্তু সবার মধ্যে এ বোধ তো জাগে না। দীক্ষার প্রেষণায় যোগ জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হল, সমাজে সর্বজনীন কর্মরূপে তা স্বীকৃতিও পেল। কিন্তু মন বুদ্ধির সায় না পেলে প্রাণ এতে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। অধ্যাত্মবিদ্যার বা রহস্য বা উপনিষদ, তাকে অধিগত করতে শ্রদ্ধার উন্মেষ যেমন প্রয়োজন, জীবনে তার প্রয়োগবিধিতে কুশল হওয়াও ঠিক তেমনিই প্রয়োজন। এ যুগে মনের যে শিক্ষা তাতে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য প্রতিফলিত হয়ে মনোময় জীবনে বিদ্যার বহুমুখী চর্চা ও প্রসার হয়েছে। বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা পরীক্ষা ও দার্শনিক অন্বীক্ষা দিয়ে এক আঁটসাঁট যুক্তিবাদকে সহায় করে মানুষ জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করছে। অন্তরে, বাইরে তাকে ব্যবহারে ফলিতও করছে বিচিত্র উপায়ে। নানা দিক দিয়ে নব-নব আবিষ্করণ

সম্ভোগের উপকরণ জড় করে ঐহিক জীবনকে ঐশ্বর্যে ভরে দিয়েছে। তাতে জীবন যথেষ্ট কৃত্রিম ও জটিল হয়ে পড়েছে। কিন্তু আত্মা না জাগলে প্রাণ তো ভরতে পারে না জড়ের এই উপকরণ বাহুল্যে। শতরূপা মনঃশক্তির এই মোহিনী মায়াকে সামলানোও মনের এক বিরাট ব্যায়োমা হয়ে পড়েছে। বর্তমান সভ্যতার এই ভয়াবহ দিকটি মনস্বীদেরও ভাবিত করে তুলেছে। এদের সাধনা যে অভ্যুদয়ের, তাতে সন্দেহ নাই। জগতের এই যজ্ঞসভায় বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, শিল্পী, কবি মনীষী সকলেই আমন্ত্রিত, কেবল যোগী আজও অনাহূত। তাঁদের কোনও আসন নেই, যজ্ঞভাগ নেই। বর্তমান মনীষা আজ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা অনুভব করে না। কিন্তু এই অভ্যুদয়কে পূর্ণাঙ্গ করবে যে নিঃশ্রেয়স—যার বাড়া শ্রেয় আর নেই,—তাকে বাদ দিলে কোনও শিক্ষা কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। প্রাচীন ভারতের আর্যবিদ্যায় কিন্তু অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্রেয়সও ভালভাবেই অনুশীলিত। ঔপনিষদ বিজ্ঞানের সাধনায় দেহ প্রাণ মনের প্রতি উপেক্ষার ভাব আসতে পারে ভেবে আমরা আবার এ যুগে নিঃশ্রেয়সের আকর্ষণকে ভয় করতে শিখেছি। ধারণা করে বসে আছি অধ্যাত্মসাধনা বুঝি এক রিক্ততার, শূন্যতার সাধনা। তা কিন্তু সত্য নয়। আজ বিজ্ঞানের যুগে অভ্যুদয়ের সাধনা প্রবল ও উদ্দাম। একে শাসনে আনতে মনের চাইতেও উন্নততর একটা তত্ত্বের একান্ত প্রয়োজন। সে হল বিজ্ঞান ও আনন্দের তত্ত্ব। জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞানের সাধনাকে যুক্ত না করলে অযোগী চিত্ত স্বৈরাচার জীবনের সব কিছু শ্রেয়কে নষ্ট করে দেয়। নিঃশ্রেয়স জীবনকে পঙ্গু না করে সমৃদ্ধতর করতে পারে, এটাই শ্রীঅরবিন্দের যোগের একটি মূল তত্ত্ব।

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স এই দুইকেই একটি বৃহৎ সত্যে উত্তীর্ণ করতে হবে। পাশ্চাত্য ভাবনার সংঘাতে আমাদের যেমন মন জেগেছে, তেমনি তাতে নানা বিক্ষোভও দেখা দিয়েছে। ফলে আমরা জীবনের সব সমস্যাকে যুক্তি দিয়ে যাচাই করে তার সত্যাসত্য নির্ণয় করতে চাই। একে কিন্তু মন্দ বলতে পারি না। জীবন থেকে সরে যাওয়াই অধ্যাত্ম জীবনের আদর্শ, আমাদের জীবনদর্শনের এই গলদকে দূর করতে হবে। সব দেশে সব ধর্মেই এই ধরণের ইহবিমুখীনতা আছে, এবং তা থেকেই অধ্যাত্মসাধনায় সন্ন্যাসবাদের প্রসার। সব ছেড়েই সবকে একান্ত করে পেতে হয়, একথা সত্য। কিন্তু সেই লোকোত্তরকে জীবনধর্মে অনুস্যূত করতে আবার এখানে ফিরেও আসতে হয়, তা না হলে সিদ্ধি পূর্ণ হয় না। আমাদের সাধনশাস্ত্রগুলিতে এ দিকটা যেন তত ভাল করে চিন্তা করা হয় নি। ইহ ও পরত্রকে নিয়ে অপক্ষপাতী মননের দ্বারা অখণ্ড জীবন দর্শনের একটা আদর্শ সবারই সামনে রাখা দরকার। এই অখণ্ড জীবনের নায়ক হবে মনের ঊর্ধ্বতন সত্য। নিম্নতত্ত্বকে থাকতে হবে লোকোত্তরের প্রশাসনে, তবেই এইখানে তার সার্থকতা—সমষ্টির কল্যাণে এবং ইহজীবনেই।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'বিত্তে পূর্ণ সমস্ত

পৃথিবী পেলে আমি কি অমৃত হব?' বস্তুত অমৃতপিপাসাই মানুষকে আকর্ষণ করে নিঃশ্রেয়সের দিকে। সব কিছু চাওয়া ও পাওয়ার পরিপূর্ণতাও এইখানে। মৈত্রেয়ীর প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—বিত্তের দ্বারা অমৃত লাভের আশা নেই। জীবনে যারা উপকরণ জড় করে, তাদের জীবন যেমন তোমার জীবনও তাই হবে, তুমি অমৃতা হবে না।' তাই শুনে মৈত্রেয়ীর সেই প্রসিদ্ধ উক্তি যাতে ভারতাত্মার চিরন্তন ঘোষণা শুনতে পাই—"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম?" যা দ্বারা আমি অমৃত হব না তা নিয়ে আমি কি করব? এই উদাত্ত জিজ্ঞাসা যখন জীবনকে মথিত করে ব্যাকুলভাবে বেরিয়ে আসে, তখনই ঊর্ধ্বলোকের অভীপ্সায় শ্রদ্ধার আবির্ভাব হয়। এটাই যথার্থ দ্বিজত্ব—যেমন দেখেছি কঠোপনিষদে নচিকেতার বেলায়। উপনিষদ বলছেন প্রেয় ও শ্রেয় দুইই মানুষের কাছে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু যিনি প্রেয় হতে শ্রেয়কে বেছে নিতে পারেন তিনিই বুদ্ধিমান ও ধীর। তিনি সম্যক আলোচনা করে দুটিকে পৃথক করে দেখতে পারেন। কিন্তু যিনি অল্পবুদ্ধি তিনি প্রেয়কেই শুধু বরণ করেন যোগক্ষেমের টানে। নচিকেতা একেবারেই শ্রেয়কে বরণ করেছিলেন; তাই তিনি যমের কাছ বর পেয়েও শ্রেয়কে অপিদিত করে যে প্রেয়ের সুখ, তাকে প্রত্যাখান করলেন। বললেন, "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ"—শুধু বিত্তের দ্বারা মানুষের কামনার তর্পণ হতে পারে না। এই অতৃপ্তির বোধ মানুষের মধ্যে জাগলে পর তার আচ্ছন্ন ভাব অনেকটা কেটে যায়; ঊর্ধ্বলোকের এষণার যেন একটি রশ্মিপাত হয়। তখন নিজের ক্ষুদ্রতার ক্ষুদ্রতার গণ্ডির বাইরে আসার জন্য তার মন-প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বৃহতের প্রতি এই যে আকর্ষণ, এটাই অধ্যাত্মজীবনের মূল সুর। অন্তশ্চক্ষু না খুললে একে ঠিক বোঝা যায় না। কেননা প্রকৃতিপরিণামের নিয়মে এটা ধরা দেয় না। বস্তুত এ যেন এক আবির্ভাব—উষার আলোর মত। অভ্যুদয়কে যদি বলি প্রকৃতির ধারা, এই আবির্ভাবকে বলতে পারি পুরুষের প্রতিবোধ, যার পরিণাম হল স্বারাজ্যসিদ্ধি।

পাশ্চাত্যদেশে দু'হাজার বছর আগে খৃষ্টের অমৃতবাণী শোনা গিয়েছিল,—'My father in heaven and I are one'—তদনন্তর পরপারে সেই যে পরমপিতা, তিনি আর আমি এক। কিন্তু তারপর এতদিনে ওদেশে আর একটি পুরুষের কণ্ঠে এ ঘোষণা শোনা গেল না। অথচ আজ ওরা সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করে সবদিকে অভ্যুদয়ের দ্বার খুলে দিয়েছে। সমস্ত পৃথিবী সে-অভ্যুদয়কে গ্রহণও করেছে। কিন্তু কোথায় সেই মহান্ত পুরুষ—নিঃশ্রেয়সকে যিনি জীবনে সত্য করে তুলবেন? অথচ এদেশে আমরা কখনও তাঁর অভাব অনুভব করিনি। এই আমাদের মহনীয় উত্তরাধিকার ও পরম সুকৃতি। মহাপুরুষের আবির্ভাবে মহাপ্রাণের ডাক এসে আঘাত করেছে প্রাণসাগরের কূলে। তাতে অকূলের টান প্রবল হওয়ায় আমরা কূলধর্ম খুইয়েও ফেলেছি অনেক সময়। তার প্রতিক্রিয়ায় সাধারণ জীবনে অবক্ষয় এসেছে,—এমন যেমন অবস্থা। এতে অমৃতপিপাসাও আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তবুও অমৃতময় সেই পরম লগ্নটি ঘুরে ফিরে বারে এসে আঘাত করে

—কখনও মধুর মিনতি ভরা পরম স্বরে, কখনও বা ঋষভের বজ্রনির্ঘোষে—"এই যে, প্রস্তুত।"

আত্মজাগরণের পথে বাধা অনেক। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সাধনায় লোকোত্তরকে জানতে ও পেতে জীবনের সব কিছু ছাপিয়ে যেতে হয়, কিন্তু সেই সত্যকেই লোকায়ত ও লোকায়ত জেনে ও বুঝে তা সার্থক করে না তোলা পর্যন্ত সে বিজ্ঞানের সাধনাও হয় বন্ধ্যা। ব্যষ্টির অনুভবকে সমষ্টির প্রত্যয়ে আনতে হবে। প্রাকৃত জীবনের মূলেও কাজ করছে যোগশক্তিই। সে-শক্তিই জীবনের মূলা ছাপিয়ে মৃত্যুবিজ্ঞানের রহস্যাগারে এনে সাধককে উপনীত করে। কিন্তু সেখানেও হারিয়ে গেলে চলবে না। মৃত্যুকে জেনে তার আঁধারকে যেমন পার হতে হবে, তেমনই ভাঙতে হবে তার আলোর আড়ালকে। কঠোপনিষদে নচিকেতা বৈবস্বত যমের কাছে চেয়েছিল, সে যেন ওপার হতে আবার এপারে ফিরে আসতে পারে। নচিকেতার প্রশ্ন ছিল যে 'প্রেতি'র পর কি কিছু থাকে কি থাকে না। যা না থাকল তা ফুরিয়ে গেল, আর যা থাকল তা জীবনেই আবার সঞ্চারিত হল। এই নেতিবাচক ও ইতিবাচক দুই ইঙ্গিতই জীবনের সিদ্ধি ও সমৃদ্ধিকে পোষণ করে। নির্বাণের অনুভব হয়েছিল ভগবান বুদ্ধের দেহে, তাঁর জীবৎকালেই। তিনি তাঁর জীবন দিয়েই তা প্রচার করেছেন পরম করুণায় মহানির্বাণের বরণডালা ছাড়িয়ে ফিরে এসে। সমষ্টি-জীবন যে তাতে আশ্চর্যভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল, মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তার সাক্ষ্য আজও বর্তমান। যোগের যে কোনও সিদ্ধি জীবনে বা জীবন দিয়েই লাভ করতে হয়। তাই জীবনের দাবী প্রত্যাখ্যান করা যায় না। তাকে স্পষ্ট করে তুলতেই হবে অনুভূতির শেষ পর্যন্ত সাবিত্রীর মৃত্যুঞ্জয় প্রেম সাধনার ভাস্বর মহিমায়। তবেই সেই সত্য শিব সুন্দর ঘটে-ঘটে দিব্যজীবনের মহিমায় স্বভাবে প্রতিষ্ঠা পাবেন, মানুষ অমৃত হবে।

পূর্ণযোগ জীবনের যোগ। সাধনার ফলে এতকাল ধরে যুগে-যুগে যে বিত্ত সঞ্চয় করেছি, তার সমস্ত কিছুর সমাহরণ করে এগিয়ে যাবার দায় আমাদের। তা করতে হলে আগে কি পেয়েছি তা দেখতে হবে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানসাধনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সচেতনভাবে এদেশে যেমন হয়েছে, অন্যত্র কোথাও সেভাবে হতে পারেনি। জগতে যত ধর্মমত ও পথ প্রচলিত তাতে যদাসত্য রয়েছে। কিন্তু সে-সত্যকে প্রজ্ঞামণ্ডিত করে মনের ঐশ্বর্যে রূপ দেওয়া ভারতে ছাড়া আর কোথাও সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে ওদেশে বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের মাঝে সন্ধ্যাতের ফলে বৈজ্ঞানিকেরা অনেকে দার্শনিক হয়ে উঠেছেন, কিন্তু সে দর্শন মনের বা বুদ্ধির পরাবৃ বৃত্তিতে। আত্মদর্শনের আভাস তাতে মেলে না বললেই হয়। এদেশের দর্শন শুধু যে প্রতিবোধবিদিত অনুভবই শ্রুতিগোচর করানো হয়েছে মাত্র এমন নয়, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও বিচারণা দিয়ে বোধির অনুগত বিশ্লেষণও করা হয়েছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে। এই অধ্যাত্মমনীষার ধারা সম্প্রদায়ক্রমে আজও জীবন্ত। বেদ উপনিষদ তন্ত্রের পরে বৌদ্ধ যুগের অধ্যাত্মদর্শনও আমাদের এক অমূল্য সম্পদ। অতি আধুনিক

বিজ্ঞানবিদ্যার সঙ্গে তুলিত করা যায় এমন যোগপন্থাগুলির আবিষ্করণ হয়েছিল এদেশে, যেমন পতঞ্জলির যোগে। এই কারণেই প্রচলিত সাধনসম্প্রদায়গুলির স্বরূপ সম্বন্ধে মোহমুক্ত এক আলোচনের বিশেষ প্রয়োজন। তাহলে আমরা বুঝতে পারব, পূর্ণযোগের সাধনায় তাদের উপযোগিতা কতখানি।

এ দেশে পাঁচটি মুখ্য যোগসাধনাকে যথাক্রমে হঠযোগ, রাজযোগ ও কর্ম জ্ঞান ভক্তির যোগত্রয়ী এইভাবে চিহ্নিত করা হয়। আর একটি এই পাঁচটির সমন্বয়যুক্ত এবং সর্বাধিক প্রচলিত, সেটি হচ্ছে তন্ত্র। তন্ত্রের মূলে সাধনার যে ঐতিহ্য, সে হল 'বেদ'। বৈদিক সাধনার মূল ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে উপনিষদে। তাকে অধুনা প্রচলিত জ্ঞানযোগে যে রূপ দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়াও কিন্তু তাকে আশ্রয় করে আর একটি প্রাণবন্ত সাধনধারা ছিল। সেটা বাইরে প্রায় লুপ্ত হলেও মরমীয়া সাধনায় আজও ফল্গুধারায় বয়ে চলেছে। ঐ পাঁচটি যোগের সাধন ধারার সঙ্গে বৈদিক ও তান্ত্রিক সমন্বয়ের সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করে মূল সার্বভৌম ও সনাতন তত্ত্বগুলি কি ভাবে গ্রহণীয় তা বুঝে নিতে হবে। মানুষের এই আধার নিয়েই তো সব সাধনা, তাই সবার আগে আধারকে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। মানুষের আধারে দেহ প্রাণ ও মনে চিৎশক্তির যেটুকু উন্মেষ ঘটেছে, তার চালক হচ্ছে বুদ্ধি। ব্যবহারিক জীবন বুদ্ধিকে পুরোধা করেই চলে যায়। কিন্তু বুদ্ধিকে ছাপিয়ে ও তাকে ঘিরে রয়েছে বিজ্ঞান। সেটিই যোগসাধনার প্রমুখ সহায় ও লক্ষ্যও। জীবনের লক্ষ্যকে এইভাবে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। কিন্তু বৈদিক যুগে সাধনার লক্ষ্য ছিল পূর্ণাঙ্গ; তা হল জীবনকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা। সবকিছুকেই জ্যোতির্ময় বলে ভাবনা করা তার একটি মুখ্য সঙ্কেত। বোধি তার সহায়। সেটি হৃদয়ের গভীরের বৃত্তি, বুদ্ধি তারই প্রতিভূ—এটি বুঝে নিতে হবে। আদিত্যমণ্ডলের নীচে দাঁড়িয়ে আছি, আলোর ঝরণাধারা দেহপ্রাণমন প্লাবিত করে আমাকে ঘুয়ে শুচি শুভ্র ও উজ্জ্বল করে তুলছে, এই আমি বৃহৎ হয়ে উঠছি, সব কিছু যেন ভরে আছি: এই সহজ ভাবনার যোগ প্রাচীন যুগে এদেশে সত্য হয়ে উঠেছিল। আজ আবার শ্রীঅরবিন্দের যোগে আমরা তাকে নতুন করে সমৃদ্ধভাবে ফিরে পেলাম। বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে বোধির অনুগত হয়ে চললে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জীবনের সমন্বয় এনে দেবে যে-যোগ, তা গীতার ভাষায় দেবদত্ত বুদ্ধিযোগ।

[ক্রমশ]

Statement about ownership and other particulars about Newspaper (Vartika) to be published in the first every year after last day of February

Form IV

(See Rule. 8)

1. Place of Publication:	Pondicherry
2. Periodicity of its publication:	Quarterly
3. Printer's Name: Nationality Address	Amiyo Ranjan Ganguli Indian Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry-2.
4. Publisher's Name: Nationality Address	H. K. Niyogi Indian Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry-2.
5. Editor's Name: Nationality Address	Nolini Kanta Gupta Indian Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry-2.
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital	Sri Aurobindo Ashram Trust, Pondicherry-2

I, H. K. Niyogi, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date: 24th April, 1966

H. K. Niyogi
Signature of Publisher

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

CALCUTTA
UNIVERSITY

১৫ই আগস্ট ১৯৬৬

বর্ষ—২৬ সংখ্যা—৩

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৬)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

বাক্‌বাণী		৩
উর্বশি চাক্রায়ণ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৭
ভারত কি সত্য	শ্রীঅরবিন্দ	১১
বিলাতের ডায়েরীর কয়েক পাতা	এ বি পুরাণী	২৩
শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী		২৯
কঠিন ডানার ওড়া	নীরবাক্ত	৩৩
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	৪৬
প্রসঙ্গত	শ্রীমা	৬২
পথের কথা	শ্রীমা	৭২
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু	৭৩

বর্ত্তিকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা-শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

শাখা :

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

দাম—দেড় টাকা

Published by : Sri Aurobindo Pathmondir,
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12

Edited by : NOLINI KANTA GUPTA

Printed by : AMIYO RANJAN GANGULI
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

PRINTED IN INDIA

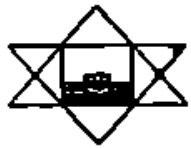

১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৬

জড়-সর্ব্বস্ব জীবন-ধারার অন্ধ নিত্য-আবর্ত্তন কেবল নয় অথবা পার্থিব জীবনের বিষু-বিপত্তি থেকে সরে গিয়ে অবাক্তের নীরবতার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ নয়—একটা মহত্তর ভাগবত সত্তা ও চেতনার শান্তি, জ্যোতি, শক্তিকে নামিয়ে এনে জীবনের পরিবর্ত্তন সাধনই হ'ল বর্ত্তমান ভারতে তার শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-অন্বেষণের প্রয়াস। আর আমাদের এখানেই রয়েছে এই প্রয়াসের হৃৎকেন্দ্র—বহু বৎসর ধরে, একাগ্র লক্ষ্য নিয়ে, একটা সর্ব্বগত শান্তির প্রতিষ্ঠা নিরন্তর আশ্রয় করে আসন্ন জ্যোতির ও শক্তির ক্রমবর্দ্ধমান অবতরণের অনুভূতি নিয়ে চলা হয়েছে, পথ তাই ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। ভারতের অন্তঃপুরুষ আজ প্রস্তুত তার উত্তরাধিকারে পূর্ণ অধিষ্ঠিত হবার জন্যে—এক অভূতপূর্ব্ব মাহাত্ম্যের দিন তার এসেছে—তার মৃত্তিকা থেকে প্রস্ফুরিত হবে সেই বাণী, সেই নির্দ্দেশ, সমস্ত জাতিকে যে নিয়ে চলবে তার মহত্তম ভবিতব্যের দিকে।

—শ্রীঅরবিন্দ

মাতৃবাণী

একেবারে কথা না বলার চেয়ে কথা বলায় উপর সংযম রাখা বেশি প্রয়োজন। বলতে শিক্ষা করতে হবে যতটুকু বলা দরকার আর যতটা সম্ভব সবচেয়ে নিখুঁতভাবে সবচেয়ে সত্যভাবে।

*

"ইচ্ছা হয় করতে পার" অর্থ স্পষ্টই যে যা তুমি করতে চাও তার ফল তোমার সাধনার পক্ষে শুভ না হওয়ার সম্ভাবনা আছে; আরও অর্থ এই যে এখনও হয় ত' তুমি তৈরি নও সেই আর এক পা এগিয়ে যাবার জন্যে যার কল্যাণে তুমি যা করতে চাও তা না করলেও পার।

*

অপরের দোষ দেখিয়ে বলা নিশ্চয় খারাপ, সকলেরই দোষ আছে, মনের মধ্যে কেবল সেইগুলির উপর জোর দেওয়া তাদের দূর করবার পক্ষে নিশ্চয় সহায় হয় না।

*

আনন্দের উৎস হ'ল ভগবানের আদেশ মেনে চলা।

*

পরস্পরের মধ্যে সহযোগের ফলেই কাজ সফল হয়। প্রধান কথা হ'ল সেই সিদ্ধান্তটি আবিষ্কার করা যেখানে সকলে একমত; সেটি স্থির প্রতিষ্ঠিত হ'লে প্রত্যেককেই আপন আপন ইচ্ছাকে কিছুটা দমনে রাখতে হবে যাতে মিলনক্ষেত্রটি অটুট থাকে।

*

সাধক শান্তি লাভ করে ভগবান থেকে। সে শান্তি কোন বাহ্য অবস্থার উপরে আদৌ নির্ভর করে না।

ভগবানের দিকে ফিরে দাঁড়াও, চাও সত্যকার আন্তর শান্তি, তাহ'লেই তুমি যে শান্তি পাবে তা তোমার কাজ অবিচলিত হয়ে করবার, নির্ঝঞ্ঝাটে করবার পক্ষে যথেষ্ট।

*

নীরব ধ্যানের ভিতর দিয়েই বুদ্ধির সামর্থ্য বেড়ে ওঠে।

*

মানুষের ভিতরে আত্মশুদ্ধির বীজ যদি সত্যকার আধ্যাত্মিক জল দিয়ে অভিসিঞ্চিত হয় তবেই সে ভাগবত সত্তায় গড়ে উঠবে।

বাধা-বিপত্তি সব রয়েছে তা অতিক্রম করে আনন্দলাভের জন্য। চল এগিয়ে, বিশ্বাস রাখ, সব ঠিক চলবে।

*

তুমি নিঃসঙ্গ এরকম অনুভব কর কারণ তুমি ভালবাসা চাও। কোন দাবী না করে ভালবাসার যে আনন্দ তাই চাও, শুধু ভাল বাসার যে আনন্দ (জগতের মধ্যে সবচেয়ে অপরূপ যে আনন্দ), তাহলে কখনও তুমি অনুভব করবে না যে তুমি নিঃসঙ্গ।

প্রেমের সোপান

প্রথমে, ভালবাসা যায় কেবল ভালবাসা পেলে পরে।

পরে, ভালবাসা যায় স্বতঃই কিন্তু প্রত্যাশা করা হয় ফিরে ভালবাসা পাবার জন্য।

তারও পর, ভালবাসা যায় ভালবাসা না পেলেও, তবুও তখন এই প্রত্যাশা থাকে যেন ভালবাসা গ্রহণ করা হয়।

পরিশেষে, ভালবাসা শুধুই ভালবাসার জন্যে, ভালবাসা ছাড়া আর কোন প্রয়োজন বা তৃপ্তির জন্য নয়।

*

জীবনে কেবল সেই শান্তিই পাওয়া যায় যা যতন করা হয় নিজের অন্তরে।

সর্ব্বপ্রথম নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এক অচল শান্তি, কোন জিনিষের, কোন মানুষের সাধ্য নাই যাকে টলাতে পারে। এমন শান্তি যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখনই কেবল তা ক্রমে সংক্রমিত হয়ে চলে, বাইরের অবস্থার পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রত্যেকের দেখতে হবে নিজের নিজের শান্তি, অন্যের শান্তি তার ব্যাপার নয়, তা নিয়ে ব্যস্ত হবার কোন অধিকার তার নাই।

*

যে কেউ যোগ সাধনা করে আন্তরিকভাবে, প্রয়োজনীয় শান্তি ও শক্তি সে পাবেই যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্যে।

তবে এমন লোকেরাও সংখ্যায় অগণিত যারা নিজেদের প্রতারিত করে, বিশ্বাস করে যে তারা যোগ সাধনা করে, হয়ত যোগ সাধনা করে কিন্তু একান্ত আংশিকভাবে, তা অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ।

উষস্তি চাক্রায়ণ

শ্রীমলিনীকান্ত গুপ্ত

(ছান্দোগ্য উপনিষদ)

চক্রপুত্র উষস্তি। কিন্তু চাক্রায়ণ অর্থ চক্রচালক নয় ত? যেমন শকটচালক শাকটায়ন? কিংবা কমলসেবী কামলায়ন? চক্র, কুলাল চক্র বা কুমোরের চাক হতে পারে, কি তন্তুচক্র বা চরকাও হতে পারে। আমরা যেমন কম্বল-পরিহিত সাধুকে বলি কম্বলিওয়ালা, সেইরকম কিছু? সে যা হোক, তাঁর কাহিনী এই—

উষস্তি চাক্রায়ণের দেশ কুরুস্থান প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত। গৃহহীন অন্নহীন হয়ে তিনি ভ্রমণে বহির্গত হলেন তরুণী পত্নীকে সঙ্গে করে। উপস্থিত হলেন গিয়ে ইভ্য নামক গ্রামে।

তিনি দেখলেন সেখানে একস্থানে গ্রামবাসী একজন বসে মাসকলাই আহারে নিমগ্ন। তারই একটু ভিক্ষা করলেন তিনি দারুণ ক্ষুধায় প্রপীড়িত হয়ে। ব্যক্তিটি বলল, "আমার ভোজন-অবশিষ্ট এইটুকু পাত্রে লেগে রয়েছে, আর ত কিছু নাই।" উষস্তি উত্তরে বললেন, "তাই আমাকে দাও।" গ্রামবাসী যা দিল উষস্তি তাই গ্রহণ করলেন। খাওয়া হলে গ্রামবাসী জিজ্ঞাসা করল, "জল দেব কি?" উষস্তি উত্তর দিলেন, "তবে ত তোমার যা উচ্ছিষ্ট তাই আমার পান করা হবে।" গ্রামবাসী বলল, "এই যে মাসকলাই আহার করলেন, তাও ত উচ্ছিষ্ট।" উষস্তি উত্তর দিলেন, "ওটি খেয়েছি প্রাণের দায়ে, না হলে বাঁচতাম না। তা বলে জল? না হলেও চলে।" উষস্তি কিন্তু সবখানি মাসকলাই খেয়ে ফেলেননি, কিছু বাঁচিয়ে রাখলেন, তাই নিয়ে স্ত্রীর কাছে এলেন এবং তাঁকে দিলেন। স্ত্রী কিন্তু তাঁর চেয়ে চতুরা বা ভাগ্যবতী। ইতিমধ্যে তিনিও বেশ কিছু ভিক্ষা করে যোগাড় করেছিলেন আর স্বামীর কাছে থেকে যা পেলেন, তাও নিজে তুলে রেখে দিলেন। পরের দিন সকালে উঠে উষস্তি স্ত্রীকে বললেন, "ভয়ানক খিদে পেয়েছে, যদি কিছু পেতাম খেয়ে নিতাম; তাহলে গায়ে জোর পেতাম, রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত হতে পারতাম। রাজা যজ্ঞ করছেন, আমাকে ঋত্বিকরূপেও বরণ করতে পারতেন।" তাঁর পত্নী সহাস্যে সপ্রতিভভাবে বললেন, "এই ত, নাও—খেয়ে নেন।" উষস্তি পত্নীর কৃপায় খেয়ে দেয়ে সজীব সবল হয়ে চললেন রাজার যজ্ঞস্থলে। গিয়ে বসলেন ঋত্বিক অর্থাৎ মন্ত্রপাঠকারীদের দলে গিয়ে। স্থির হয়ে শুনলেন খানিকটা, তারপর প্রস্তোতাকে ডেকে বললেন—প্রস্তোতা অর্থ যিনি প্রস্তাবনা বা আরম্ভের মন্ত্র পাঠ করেন।

"হে প্রস্তোতা, যে দেবতা প্রস্তাবনা মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী তাকে না জেনে প্রস্তাবনা মন্ত্র পাঠ করলে মন্ত্র-পাঠকের মস্তক স্খলিত হয়ে যায়।"

ওই একই কথা উষস্তি বললেন উদ্‌গাতাকে যিনি উদ্‌গীথ বা মধ্যভাগের মন্ত্র পাঠ করেন।

"হে উদ্‌গাতা, উদ্‌গীথ মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে না জেনে যে উদ্‌গীথ-মন্ত্র পাঠ করে, তারও মস্তক স্খলিত হয়।"

তারপর প্রতিহর্ত্তাকেও ডেকে—প্রতিহর্ত্তা হ'ল যিনি প্রতিহার বা উপসংহারের মন্ত্র পাঠ করেন—বললেন,

"হে প্রতিহর্ত্তা, প্রতিহারমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রীকে না জেনে যে প্রতিহার-মন্ত্র পাঠ করে, তারও মস্তিষ্ক স্খলিত হয়।"

উষস্তির এই বাক্য সকল ঋত্বিকেরাই নতমস্তকে নিষ্ঠাসহকারে গ্রহণ করলেন।

উষস্তির বিজ্ঞতায় চমৎকৃত হয়ে যজমান—যিনি যজ্ঞের আয়োজন করেন, যাঁর জন্য যজ্ঞ করা হয়—তিনি বললেন,

"ভগবন্, আপনি কে? আপনাকে জানতে ইচ্ছা করি।"

উষস্তি উত্তর দিলেন, "আমি চাক্রায়ণ উষস্তি।" যজমান তখন বললেন, "আপনাকেই আমি খুঁজেছি, আপনার সন্ধান পাইনি বলে এঁদের সকলকে বরণ করেছি। আপনিই তবে এখন ঋত্বিকের ভার গ্রহণ করুন।"

উষস্তি বললেন, "বেশ তাই হবে। এরা সকলে এখন আমার নির্দ্দেশ অনুসারে মন্ত্রপাঠ করুক।"

এই রকমে উষস্তি ঋত্বিকের কাজ গ্রহণ করতে স্বীকৃত হলেন তবে সেইসঙ্গে এইটুকু যোগ করে দিলেন, "তোমার কাজের ভার ত' গ্রহণ করলাম, তবে দক্ষিণার কথা ভুলবে না; এঁদের যে পরিমাণ দক্ষিণা দিতে আমাকেও ঠিক সেই পরিমাণে দেবে, তার বেশি চাই না।" যজমান সানন্দে স্বীকার করে নিল উষস্তির বাক্য।

তখন প্রথম ঋত্বিক—প্রস্তোতা—উঠে জিজ্ঞাসা করলেন উষস্তিকে, "ভগবন্, আপনি বলেছিলেন প্রস্তাবের দেবতাকে না জেনে যে প্রস্তোতা প্রস্তাব-মন্ত্র পাঠ করে তার মস্তক স্খলিত হয়। কোন সে দেবতা তবে?" উষস্তি উত্তর দিলেন, "প্রাণই সেই দেবতা। প্রাণ হতেই সকলের উৎপত্তি, প্রাণেই তাদের বিলয়। প্রাণই হ'ল প্রস্তাবের দেবতা, প্রাণকে না জেনে প্রস্তাব পাঠ করে যে তার মস্তক নিশ্চয় স্খলিত হয়।" তারপর উদ্‌গাতা তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হ'ল এবং প্রশ্ন করল, "ভগবন্ আপনি বলেছিলেন উদ্‌গীথের দেবতাকে না জেনে উদ্‌গীথ-মন্ত্র যে পাঠ করে মস্তক তার স্খলিত হয়। ভগবন্, কোন সে দেবতা আমায় বলুন।" উষস্তি উত্তর দিলেন—"আদিত্যই সেই দেবতা। আদিত্য যখন ঊর্দ্ধে উঠে চলেছেন, সকল জীবেরা তাঁর স্তুতিগান করে, এই আদিত্যই উদ্‌গীথের দেবতা। আদিত্যকে

না জেনে তুমি যদি উদ্গীথ-গান কর তবে আমি যেমন বলেছি, তোমার মস্তক নিশ্চয় স্খলিত হবে।" শেষে প্রতিহর্তা ঋষিক এসে তাঁকে বললেন, "ভগবন্, আপনি বলেছিলেন প্রতিহারের দেবতাকে না জেনে তুমি যদি প্রতিহার-কর্ম কর, তবে তোমার মস্তক নিশ্চয় স্খলিত হবে। ভগবন্, আমি জানতে চাই কোন সে দেবতা?" উষস্তি উত্তর দিলেন, "অন্নই সেই দেবতা। এই সমস্ত জীব অন্ন আহরণ করেই জীবন ধারণ করে, তাই অন্নই প্রতিহারের অধিষ্ঠাত্রী। অন্নকে না জেনে প্রতিহার-মন্ত্র তুমি যদি পাঠ কর, তোমার মস্তক স্খলিত হবেই।"

উষস্তি দিলেন চিরপরিচিত ত্রয়ীর শিক্ষা—ত্রয়ী অর্থাৎ প্রাণ-মন-দেহ, ভূর্ভুবঃস্বর্ অথবা পৃথিবী-অন্তরিক্ষ-স্বর্গ। আধারের এই তিনটি স্তর, জগতের এই তিনটি লোকের নির্দেশ তিনি দিলেন, বললেন এই ত্রয়ীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথা। সকলের প্রথম হ'ল প্রাণ-দেবতা, যাবতীয় কর্মে, যাবতীয় অনুষ্ঠানে—আন্তর-সাধনায় পর্যন্ত সর্বাগ্রে আবাহন করা হয়, করতে হয় এই দেবতাকে। ইনি সৃষ্টিকর্তা—'সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'। প্রাণ যখন স্পন্দিত তখনই সকল সৃষ্টির সুরু। প্রারম্ভে প্রয়োজন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। দেব-বিগ্রহের পূজা যখন আমরা করি, তখন অনুষ্ঠান সুরু করি এই প্রাণের প্রতিষ্ঠা দিয়ে। যে মূর্তি মাত্র, তা জীবন্ত জাগ্রত হয়ে ওঠে প্রাণের অনুপ্রবেশে। প্রথমেই প্রাণ, প্রাণ শক্তি। তারপর চাই চেতনা, জ্ঞান, আলোক অর্থাৎ সূর্যদেব, আদিত্য, আর সাধারণভাবে মনই হ'ল এর ক্ষেত্র। কিন্তু শক্তিও যথেষ্ট নয়, জ্ঞানও যথেষ্ট নয়, এই শক্তি, এই জ্ঞানকে শরীরী হতে হবে, সমূর্ত হতে হবে, জড়কে আশ্রয় করে বাস্তব আকার গ্রহণ করতে হবে, অন্নময় পৃথিবীর অঙ্গরূপে। শক্তি, জ্যোতি ও ভূতি এই তিনটি তত্ত্ব এবং এদের অধিপতি তিনটি দেবতা তাদের সম্মিলনে জাগ্রতে প্রতিষ্ঠিত করে মানুষের পূর্ণ সর্বাঙ্গ সার্থকতা।

একটা লক্ষ্য করবার বিষয়, উপনিষদের ঋষিরা অনেকেই মাঝে মাঝে ভয় দেখাতেন, যদি কিছু নিয়মানুগত কি সত্যসঙ্গত না হত, এই বলে যে তোমার মাথা খসে পড়বে। আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের পথে যদি কিছু ভুল বা ত্রুটি হয় এবং সেই ভুল বা ত্রুটি স্বীকার না করে সেই ভাবেই চলা হয় তবে তার অর্থ সত্যের বা ঋতের বিরুদ্ধে ব্যভিচার এবং এই প্রত্যবায়েই মস্তিষ্ক-বিচ্যুতির সম্ভাবনা আছে। এক জিজ্ঞাসুর পক্ষে এ দুর্ভাগ্য সত্যসত্যই ঘটেছিল, শাকল্যের জীবনে—সে আখ্যায়িকা আমরা জানি। আধুনিক যুগে হয় ত' এ রকম অঘটন বাস্তবিকই আমরা চাক্ষুষ দেখিনা নিশ্চয় কিন্তু দেখি অনুরূপ কিছু, মস্তক-বিচ্যুতির পরিবর্তে মস্তিষ্ক-বিকৃতি। শ্রীমা বলেছেন, আধ্যাত্মিক শক্তি হ'ল একটা আগুন, আগুন নিয়ে খেলায় আন্তরিকতা, নিষ্ঠা না থাকলে এ ধরণের বিপদ আছে।

পরিশেষে এই কাহিনীতে একটি বড় কৌতুককর ব্যাপার আছে—কৌতুককর এবং শিক্ষণীয়, তার প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উষস্তির উদাহরণে আমরা দেখলাম একদিকে যে ব্যক্তি ঋষি, সত্যকার ব্রহ্মজ্ঞ এবং শক্তিমান সিদ্ধপুরুষ অন্যদিকে তেমনি অশক্ত

এবং অসহায়, অন্তর্জীবনে তিনি যেমন সবল, বহির্জীবনে তেমনি অসমর্থ। জীবনে একান্ত ভিক্ষুকের পর্য্যায়ে নিজেকে নামিয়ে আনতে হয়েছে, তার প্রতিপদে প্রয়োজন অর্দ্ধাঙ্গিনীর সাহায্য যাঁর সংসর্গ বিনা জীবন-ধারণের জন্য সামান্য তণ্ডুল-কণাও সংগ্রহ করা দুঃসহ ব্যাপার। অবশ্য এ থেকে এমন কিছু অনুমান করা উচিত বা যুক্তিসিদ্ধ হবে না যে ঋষিদের পক্ষে ঋষিপত্নীদের এই একমাত্র বা প্রধান প্রয়োজন ছিল, যদিও জীবন-সঙ্গিনী অর্থ জীবন-ধারণের সহায় বা উপায় হলেও তা কম মর্য্যাদার নয়।

তখনকার যুগে অনেক ক্ষেত্রে ছিল বাহ্য জীবনের উপর ঔদাসীন্য। ফলে সেখানে একটা দৌর্ব্বল্য ও দৈন্য এসেছিল, হয়ত' তা হয়েছিল অন্তর্জীবনের উপর একান্ত অভিনিবেশ ও তদ্গতচিত্ততার প্রয়োজনে। অন্তর্জীবনের সঙ্গে বাহ্যজীবনেরও সমান সবলতা ও সার্থকতা চেয়েছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যের মত দু'একজন ঋষি—তিনি ত' স্পষ্টাক্ষরে দৃঢ়কণ্ঠে সর্ব্বসমক্ষে বলেছিলেন এই মহাবাক্য "উভয়ম্ এব"। অন্তরে রাজত্ব ঋষিদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল, একে তাঁরা বলতেন স্বারাজ্যসিদ্ধি। তবে বাহিরের জীবনেও একটা পরিপূর্ণতা তাঁদের একান্ত লক্ষ্য-বহির্ভূত ছিল না, তার নাম সাম্রাজ্যসিদ্ধি। এই স্বারাজ্য ও সাম্রাজ্য নিয়েই পূর্ণ মানুষের পূর্ণ সিদ্ধি।

ভারত কি সভ্য

শ্রীঅরবিন্দ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কিন্তু আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত এই যে সমস্যা তা আর উগ্র ক্রোধোদ্দীপক ভাষায় সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের প্রশ্ন হিসাবে পরিচয় ধরে না ! তখন তা গভীর অর্থবহ সমস্যা ; এমন এক নিবিড় ভাবনা যা শুধু আমাদের নয় সকল সভ্যতার লোককে ভাবিয়ে তুলেছে।

সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্পর্কে আমাদের প্রত্যুত্তর হবে অতীতের দৃষ্টিকোণ থেকে, যার নানা সংস্কৃতির মূল্যায়ন হল মানবজাতির ক্রমোন্নতিতে স্বোপার্জিত অবদান. ভারতীয় সভ্যতা অপরাপর যে-কোন ঐতিহাসিক মানব-সভ্যতার মতোই এক বৃহৎ সংস্কৃতির আধার ও অভিব্যক্তি,—ধর্মে মহান, দর্শনে মহান, বিজ্ঞানে মহান, বিচিত্র চিন্তায় মহান, সাহিত্য শিল্প কাব্যে মহান, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনে মহান, কারুকর্ম ব্যবসা বাণিজ্যে মহান। অবশ্য কলঙ্কের ছায়াপাত এখানে ওখানে আছে, আছে প্রত্যক্ষ অপূর্ণতা, দারুণ ত্রুটিবিচ্যুতি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ষোলোআনা নিখুঁত কোন সভ্যতা, কার মধ্যে নেই কালিমার চিহ্ন আর নিষ্ঠুর অন্ধকূপ ? অনেক ঘাটতি থেকে গিয়েছে অনেক অন্ধ গলি—অনেক অনাবাদী বা অপব্যবহৃত জমি ; তবে কোন সভ্যতায় নেই ফাঁকা জায়গা, তার নন্দনকানন দিক ? কিন্তু আমাদের প্রাচীন সভ্যতা পুরাতন বা মধ্যযুগের সঙ্গে কঠিনতম তুলনায় উত্তীর্ণ হতে পারবে। সে-সব গ্রীকের চেয়ে বেশি উন্নত, সূক্ষ্ম, বিচিত্র, আশ্চর্যকর ও গভীর, রোমকের চেয়ে বেশি অভিজাত মানবতাপরায়ণ, মিশরীয়ের চেয়ে বেশি উদার ও আধ্যাত্মিক, অন্য আর যে-কোনো এশীয় সভ্যতার চেয়ে বৃহত্তর ও মৌলিক, অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে য়ুরোপীয়ের চেয়ে বেশি মনীষা-দীপ্ত, এ-সমস্ত এবং অধিকন্তু নিয়ে আমাদের সভ্যতা সকল অতীত সভ্যতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান, আত্মস্থ এবং উৎসাহ ও প্রভাবে সেরা স্থান অধিকার করে ছিল।

এখন যদি বিচার করতে হয় বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ক্রমোর্ধ্বগামী মহাকালের সার্থক ক্রিয়ার দিক থেকে তাহলেও বলব সেক্ষেত্রে অধঃপতন সত্ত্বেও সবই লোকসানের অঙ্কে পড়ে নি। আমাদের সভ্যতার অনেক অঙ্গ অযোগ্য অকেজো হয়ে পড়েছে, আবার অনেকের আমূল সংস্কার ও প্রসাধন দরকার। তবে সে-কথা য়ুরোপীয় সভ্যতার বেলাও বেশ বলা চলে ; অধুনা যতই তার রগু হয়ে থাকুক প্রগতিপ্রীতি এবং দ্রুত নিজেকে খাপ

খাওয়াতে পারা. তারও অনেক অঙ্গে ইতিমধ্যে পচন ধরেছে এবং তারা কালানুপযোগী। হাজার ত্রুটি সত্ত্বেও, অধঃপতন সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিভা. তার মূলভাব. তার শ্রেষ্ঠ আদর্শাবলি এখনও বিশ্বমানবের কাছে অমৃতের বাণী বহন করে আনছে. শুধু ভারতবর্ষের কাছেই নয়। ভারতে আমরা আরো বিশ্বাস করি যে এগুলি নূতন প্রয়োজন ও নূতন ভাবের সংস্পর্শে এসে নিজেদের গণ্ডী পার হয়ে যাবে এবং আমাদের বর্তমান সমস্যায় য়ুরোপ-প্রদত্ত উচ্চিংড়ের চেয়ে উৎকৃষ্টতর সমাধান এনে দেবে। অধিকন্তু, অতীতের সঙ্গে তুলনা এবং বর্তমানের দাবি ছাড়াও আদর্শ ভবিষ্যতের একটা দৃষ্টিকোণ আছে। অন্য দূরস্থাপিত গন্তব্য আরো আছে যেদিকে চলেছে মানবজাতি. বর্তমান সেই দিকেই একটা অস্ফুট অভীপ্সা. অদূর যে ভবিষ্যৎ আমরা স্বপ্নে দেখছি ও বাস্তবে রূপায়িত করতে সচেষ্ট তা শুধুই তার সামান্য গোড়াপত্তন। অলব্ধ ভাব-ভাবনার একটা আদর্শ আছে কালবদ্ধ মনের কাছে যা আকাশ-কুসুম বলে বোধ হয়, তবে তা অধিকতর পরিণত মানবমনের কাছে ছাড়িয়ে যাবার দৈনন্দিন ব্যাপারের সাধারণ জিনিসেরই মতো পরিচিত বর্তমান জিনিসের মতোই লাগতে পারে। জাতির এই এখনো অলব্ধ ভবিষ্যতের দিকে ভারতীয় সভ্যতার কোনো আশা আছে কি? তার মুখ্য ভাবধারা ও প্রবল শক্তিরাজি এদিকেই পথ দেখায় এবং নিয়ে চলে কি, কিম্বা আগামী যুগে পৃথিবীর বিবর্তন সম্ভাবনায় কোনো আশা না দিয়ে নিজের মধ্যেই তাদের শেষ?

অনেকের কাছে প্রগতির ব্যাপারটাই একটা মায়া তাঁরা মনে করেন মানবজাতি অনবরত বৃত্তাকারে ঘুরে চলেছে। তাঁরা এমন পর্যন্ত মনে করেন যে প্রায়শ মহত্ত্ব দেখা দিয়েছে অতীতেই, আর আমরা চলে এসেছি অধঃপাতের রেখা ধরে, পতনের টানে। কিন্তু এটাও একটা দৃষ্টিভ্রম যার হেতু আমাদের অতিমাত্র দৃষ্টি দেওয়া অতীতের গৌরবময় চিহ্নগুলির উপর এবং ভুলে যাওয়া তার অন্ধকার স্থানগুলি কিম্বা বর্তমানের কালো চিহ্নগুলির উপর অত্যধিক নজর দেওয়া এবং জ্যোতির্আভাস ও আশার ইঙ্গিতগুলি এড়িয়ে যাওয়া। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর প্রগতিপথের থেকে একটা ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তও এর কারণ। প্রকৃতির বিবর্তনের সিঁড়ি উঠে গিয়েছে এগুনো-পেছুনোর ছন্দে, দিবা-রাত্রির ও নিদ্রা-জাগরণের ছন্দে; কতকগুলি স্বল্পকাল্য ফল বলি দিয়ে পরম পূর্ণতার জন্য আর কতকগুলি পরিণামকে সফল করে তুলতে হয় এবং ক্ষীণদৃষ্টির কাছে তাই আমাদের প্রগতির মধ্যেও দেখা দেয় পতন। প্রগতি সত্যিই তো চেনা-পথে হাঁটার মতো পথিকের নির্বিঘ্নে সোজা চলে যাওয়া নয় কিম্বা সেনাবাহিনীর প্রতিবন্ধকহীন ও সুবিবেচিত বেদখল জমির উপর দিয়ে জয়যাত্রা নয়। মানব-প্রগতি অজানার মধ্যে দিয়ে অভিযানের মতোই, সে-অজানা বিস্ময়ে ও দারুণ বিঘ্নে কণ্টকিত. প্রগতি এখানে চলতে গিয়ে হোঁচট খায় বারংবার, বহু জায়গায় যাত্রা ভুল করে, এখানে ছাড়ে ওখানে লাভের জন্য, বহুবার পিছিয়ে আসে ব্যাপক অগ্রগতির জন্য। অতীতের সঙ্গে তুলনায় বর্তমান সর্বদা পেরে ওঠে না; জয়গণের মধ্যে তার উন্নতি এলেও আমাদের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের কাছে তা নীরেস। তবে পৃথিবী

এগিয়ে চলেছেই—eppur si muove—পতনের মধ্যেও তার উত্থান-সাফল্যের বীজ বোনা হয় : রাত্রির বুকেই উজ্জ্বলতর উষার রহস্য নিহিত। ব্যক্তিগত প্রগতির বেলা এটা সুপরিচিত অভিজ্ঞতা, আবার সমবেত প্রগতির ইতিহাসও ওই একই। প্রশ্ন হল কোন লক্ষ্যের দিকে চলেছি আমরা, এবং আমাদের জলযাত্রার কোনগুলি অভ্রান্ত পোতাশ্রয় ও সঠিক পথ।

পাশ্চাত্য সভ্যতা তার সকল আধুনিকতা নিয়ে গর্বিত। কিন্তু লাভের ব্যগ্রতায় অনেক কিছুই সে হারিয়েছে এবং এমন অনেক কিছুর জন্য সে চেষ্টাও করে নি যার জন্য পুরাণী প্রজ্ঞাবানরা এত শ্রদ্ধাস্বীকার করছিলেন। নিজের দারুণ লোকসান ঘটিয়ে, নিজের প্রাণের ক্ষতি করে, আপন সংস্কৃতির পূর্ণতার হানি করে অনেক কিছু সে চাপল্যবশে অধীর হয়ে কিম্বা অবজ্ঞায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। পেরিক্লিসের কিম্বা পার্থনিক্ যুগের কোনো প্রাচীন গ্রীক এ-যুগে হঠাৎ এলে দেখে অবাক হবে যে বুদ্ধির কি বিস্তার হয়েছে, মনের কত প্রসার হয়েছে, যুক্তির কি আধুনিক বহুমুখিতা কি অনন্ত বিজীগিষা, সর্বগামী সূত্রে পৌঁছবার এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রে অসীম নজর দেবার ক্ষমতা। সে হতভম্ব হয়ে দেখবে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি ও বিরাট সব আবিষ্কার, তার প্রয়োগে প্রচুর শক্তি সমৃদ্ধি সূক্ষ্মতা, তার উদ্ভাবনশীল প্রতিভার যাদুকরী ক্ষমতা। আধুনিক জীবনের বিরাট আন্দোলন ও স্পন্দন দেখে সে বুদ্ধ বিস্মিত হবার চেয়ে বিমূঢ় বিভ্রান্তই হবে বেশি। আবার সেই সঙ্গে ঘৃণায় পেছিয়েও যাবে সে যখন দেখবে এখানকার অসৌন্দর্য ও অশ্লীলতার স্তূপ, কার্যকারিতার অমার্জিত খোলস, লালসার উন্মত্ততা, অস্বাস্থ্যকর অতিপরতা এবং অনেক দিকে সমৃদ্ধির সন্দেহজনক ভিত্তি। এর ভেতরে সে দেখতে পাবে অপটুহস্তে চাকা বিজয়ী বর্বরের গা বাঁচিয়ে আসার অনেক চিহ্ন। এর বুদ্ধি এবং জীবন-যন্ত্রে চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক বিচারের সতর্ক প্রয়োগ সে দেখবে, কিন্তু পাবে না তার নিজেরই যে প্রয়াস শেষের দিকে হয়েছিল অন্তর্জীবন মন ও অন্তরাত্মার সেবায় আদর্শ বুদ্ধির স্বচ্ছ মহৎ নিয়োগ সেটি। সে দেখবে এই সভ্যতার সৌন্দর্য হয়েছে বিদেশী পরগাছা এবং কয়েক ক্ষেত্রে জ্যোতির্ময় আদর্শ মানস নিগৃহীত নিপীড়িত ক্রীতদাস, আবার কোথাও অবজ্ঞাত পরদেশী।

আর অতীতের উত্তম অধ্যাত্মজিজ্ঞাসুরা, তাঁরা এই প্রাণ ও বুদ্ধির বিরাট কর্মকাণ্ডে একটা শূন্যতা বোধ করবেন। সবের মধ্যে একটা মায়া ও অবাস্তবতা প্রতি পদে তাঁদের পীড়া দেবে, কারণ মানুষের অন্তরে যা শ্রেষ্ঠ এবং যা তাকে নিজের গণ্ডীর ঊর্ধ্বে তুলে ধরে সেটিই এখানে অবহেলিত। একটা মহত্তর সন্ধানের ও প্রাপ্তির, অন্তরাত্মার মুক্তি আবিষ্কার আদর্শ থেকে অবনতি—দীর্ঘকালের জন্য তা একেবারেই নাস্তি হয়ে ছিল—স্থূল প্রকৃতির কর্মধারা আবিষ্কারই তাদের কাছে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ মনে হবেনা।

তবে অনাসক্ত দৃষ্টি এই সভ্যতার যুগকে বিবর্তনের একটা সাময়িক অবস্থা বলে দেখবে, মানব-প্রগতির পথে একটা অসম্পূর্ণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। তখন দেখা যাবে লাভ হয়েছে প্রচুর শেষের সম্পূর্ণতার জন্য যার দাম অনেক, যদিও খেসারৎ দিতে হল মর্মান্তিক।

শুধু যে জ্ঞান জনতার মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছে, বুদ্ধির ক্ষমতা ও ক্রিয়ার বহু ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রয়োগ হচ্ছে তা নয়। শুধুই যে বিজ্ঞানের অগ্রসর এবং পরিবেশ জয়ে তার প্রয়োগ চলেছে, এসেছে একটা কার্যোদ্ধারের বিরাট কল, ফলদায়ী বিপুল কর্মোদ্‌যাপন, অসংখ্য খুঁটিনাটি আরামব্যবস্থা, একটা অপ্রতিহত যন্ত্র, নানা শক্তিকে কাজে লাগাবার অপ্রান্ত আয়োজন, তা নয়। আবার গড়ে উঠছে খুব উঁচু পর্দায় না হলেও পরাক্রান্ত আদর্শ এবং একটা চেষ্টা চলেছে—যদিও বাহ্যত এবং সেই জন্যই অপূর্ণাঙ্গ—সেই আদর্শে গোটা মানবসমাজকে ঢেলে সাজবার। অনেক কিছু মিইয়ে অথবা হারিয়ে গিয়েছে, তবে সেসব শেষ পর্যন্ত পুনরুদ্ধার করা যাবে, সহজে না হলেও। মন্ত্রজীবনটির ছন্দ পুনঃস্থাপিত করতে পারলেই দেখা যাবে এর মধ্যে উপাদানের ও নমনীয় শক্তির সমৃদ্ধি ঘটেছে, এসেছে এক নূতন গভীরতা ও প্রসার। তখন পাব কল্যাণকর বিচিত্র বহুদর্শিতার অভ্যাস, উচ্চতম আদর্শের ছাঁচে স্থূল সবকেত জীবনটি সার্থক গড়বার আন্তরিক উদ্যম। বিশাল আভ্যন্তরীণ ব্যাপৃতির আগে এই উত্তাল-তরঙ্গ যুগের সাময়িক অপহ্নবগুলি তেমন ধর্তব্য নয়।

অন্য দিকে ঔপনিষদ, বৌদ্ধ কি শেষের দিকে ক্লাসিকাল যুগের—স্মরণ রাখা উচিত এখানে জীবনের অনেকখানিতে এসে গেছে অধঃপতন—কোনো প্রাচীন ভারতীয়কে যদি এই পরিবেশে ডেকে উপস্থাপিত করা যায় তাহলে অধিকতর মনঃক্ষুণ্ণ হবে সে, একটা জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ই প্রত্যক্ষ করবে, উচ্চতম শিখর থেকে নৈরাশ্যজনক পাতালে পতন। তার মনে প্রশ্ন উঠবে হতভাগা উত্তরসূরীরা প্রাচীনের বিরাট সম্ভাভার এ কী হাল করেছে। সে অবাক হবে বৃহত্তর সার্থকতা ও সীমা উত্তরণের পথে এত উৎসাহ উদ্দীপনা দেবার ও উন্নীত করবার থাকতে কেমন করে তারা এই ক্লীব নিষ্ক্রিয় বিশৃঙ্খলায় ডুবে গেল, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রেরণাকে গভীরতর প্রশস্ততর উদ্দেশ্যের দিকে তুলে না ধরে কদর্য আভরণের বোঝা মাথায় নিয়ে পচে গলে বিনাশের পথে চলল। দেখবে তার স্বজাতিরা অতীতের কঙ্কাল, খোলস আর ছিন্নচীর আঁকড়ে ধরে আছে, অথচ নব-প্রশস্ততর মহত্তর মর্যাদা হারিয়ে। ঔপনিষদ ও দার্শনিক বীর যুগের (heroic ages) আধ্যাত্মিক আলো ও তেজের সঙ্গে সে তুলনা করবে আমাদের পরবর্তীকালীন দার্শনিক চিন্তার জড়তা ও ক্ষুদ্র ভগ্ন অংশাবিষ্ট আনুমানিক ক্রিয়ার। ক্লাসিকাল বা কুলীন যুগের মানসিক অনুসন্ধিৎসা, বৈজ্ঞানিক উন্নতি, সৃজনশীল সাহিত্যিক ও শৈল্পিক মহত্ত্বের ও রাজকীয় ঊর্বরতার পরে এই পরবর্তী অধঃপতনের মাত্রা দেখে, এর মানসিক দৈন্য, জড়তা, অচল পুনরাবৃত্তি, সৃষ্টিক্ষম সম্বোধির দুর্বলতা, নিষ্ফল সুদীর্ঘকাল বন্ধ্যাত্ব, বিজ্ঞানের নৈষ্কর্ম্য দেখে হতবাক হবে। এই অজ্ঞানের ঢালু পথে নামা, প্রাচীনের সেই দুর্দম মনোবল ও তপস্যার এমন স্খলন, একটা প্রায় ক্লীব ইচ্ছায় এই প্রাধান্যকে সে ধিক্কার দেবে। পুরাকালের সেই সরলতর এবং অধিকতর আধ্যাত্মিক সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার স্থানে এখন সে দেখতে পাবে কেন্দ্রহীন ও মৈত্রীবন্ধনকারী কোনো মহৎ-ভাবহীন একটা বিস্রাবিকর বিশৃঙ্খল অবস্থা ব্যবস্থা। কোনো

সভ্যতার সমাজব্যবস্থা নেই, আছে কিছুটা খেয়ে কিছুটা এগিয়ে একটা পচন। সেই মহান নমনীয় সভ্যতা যা সবলে গ্রহণ করেছে এবং যা গ্রহণ করেছে তার দশগুণ প্রতিদান দিতে পেরেছে তার জায়গায় সে দেখবে একটা অসহায়তা যা শুধু নিষ্ক্রিয়ভাবে বহন করে কিম্বা বহির্বিশ্বের শক্তিধারার সংস্পর্শে এবং প্রতিকূল অবস্থার চাপে যারকরেক নিষ্ফল হাত-পা ছোঁড়ে। দেখা যাবে এক সময়ে এমনভাবে বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় চলে গিয়েছিল যে দেশের বুদ্ধিজীবীরা প্রলুব্ধ হয়েছিলেন প্রাচীন ভাব ও আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে বিদেশী সংস্কৃতি আমদানি করতে। চোখে পড়বে একটা পরিবর্তনের শুরু, তবে সন্দেহ জাগবে কত গভীর তা অথবা প্রিয় আলস্য এবং দুর্বলতার কবল থেকে গোটা দেশকে বাঁচাবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিমান কিনা এবং তাকে তুলে ধরবার পক্ষে যথেষ্ট বীর্যবান কিনা, প্রাচীন আত্মাকে নবনির্মিত এক অর্থপূর্ণ আধারে ধারণ করবার পক্ষে একটা প্রবল কর্মৈষণায় উদ্দীপিত করতে যথেষ্ট প্রবুদ্ধ কিনা।

এ-বিষয়েও তাড়াহুড়ার উপর-দেখা-জনিত হতাশার চেয়ে একটা সম্যক-বোঝা আশার দিকেই ইঙ্গিত করে। ভারতীয় ইতিহাসের শেষ যুগটি জাতির বিবর্তনকালে দীর্ঘতম উদ্‌গমনতম দিনের পরে রাত্রির স্বস্থানে ঠিক ফিরে আসার দৃষ্টান্ত। তবে এই রাত্রিতেও প্রথমে ভরে ছিল নীহারিকা, অন্ধকার যখন চরম ও দারুণ তখনও তা, কালিদাসের ভাষায়—বিচ্ছেদ তারকা প্রভাতকল্পের শর্বরী—কয়েকটি অস্ফুট তারা দিয়ে রাত্রির প্রভাত কল্পনা। অবনতি এলেও সব তখন হারিয়ে যায়নি; রয়ে গিয়েছে প্রয়োজনীয় বিবিধ সমৃদ্ধি, ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ মূল্যবান আধ্যাত্মিক ও অন্যবিধ নানা প্রাপ্তি। দারুণতম অধঃপতন ও অবনতির মধ্যেও ভারতের অন্তরাত্মা মরে যায়নি, মুমূর্ষু, আবৃত, শৃঙ্খলিত হয়ে থেকেছে মাত্র এখন ক্রমাগত শক খেয়ে প্রত্যুত্তরে আত্মোন্মুক্তির জন্য জেগে উঠে সে দেখছে তন্দ্রা-বরণের অন্তরালে তার এই ঘুম এক নূতন মহাকর্মের প্রস্তুতি। প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক সমুচ্চ মন এবং আধ্যাত্মিক এষণার প্রবল শক্তি—তপস্যা—এখানে তেমন চোখে না পড়লেও পূর্বে যা দেখা যায়নি সেই চেতনার নিম্নতর স্তরে আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিক প্রবেগ ও অনুভূতির দিকে আগ্রহ এসেছে। স্থাপত্য, সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রাচীনের মহিমা হারিয়েছে বটে, তবে পেয়েছে সূক্ষ্মতাপূর্ণ লাবণ্যময় জীবন্ত অন্যান্য শক্তি ও বৃত্তি। শিখর থেকে নীচেই নামা হয়েছিল বটে, কিন্তু এই অবতরণের পথে সঞ্চয় হয়েছিল অপরিহার্য কত আধ্যাত্মিক আবিষ্কার ও অভিজ্ঞতা। আমাদের অতীত সংস্কৃতির অবনতিকে ধরা যেতে পারে পুরাতন আকার-আধারের ক্ষয়ক্ষতি যাতে শুধু নূতনই আসতে পারে নয়, আমরা চাইলে আসতে পারে আর এক মহত্তর পূর্ণতর সৃষ্টি।

বস্তুত জীবের ভিতরে ইচ্ছাই বাহিরে অবস্থার মূল্য দেয়, আর প্রায়শ সে-মূল্য অপ্রত্যাশিত; প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বাস্তবতার রং সঠিক নিশানা নয়। জাতির অথবা সভ্যতার ভিতরে ইচ্ছা যদি চায় মৃত্যু, যদি চায় ক্ষয়ের শৈথিল্য এবং বরণোন্মুখের নিশ্চেষ্টতা,

কিম্বা চায় সেই মন যার প্রবৃত্তি ধ্বংসের দিকে, যদি চায় ভবিষ্যতের শক্তিদের সরিয়ে রেখে শুধু মৃত কালের মনধারা, ভবিষ্যের জীবনের চেয়ে অতীতের জীবন বেশি কামনা করে, তাহলে কিছুই না—প্রচুর শক্তি সম্পদ ও বুদ্ধি, জীবনের নিরন্তর আহ্বান ও চিরন্তন সুযোগ তাকে অনিবার্য ধ্বংস ও পতন থেকে বাঁচাতে পারবে না। তেমনি আবার তার যদি ফিরে আসে আত্মবিশ্বাস, ফিরে আসে এক প্রবল জিজীবিষা, যদি ভবিষ্য সব জিনিসের দিকে থাকে উন্মুখ, ভবিষ্যৎকে তার দাতব্য বিষয়ের সঙ্গে আবার গ্রহণ করতে সমান আগ্রহী, এবং সেখানে যা প্রতিকূল তা বশীকরণে সমর্থ, তাহলে সে প্রতিকূলতা ও পরাজয় থেকে পাবে অবোধ জয়ের শক্তি, আপাত অসহায়তা ও ক্ষয়ের মধ্য থেকে পুনর্জন্মের এক লেলিহান অগ্নিশিখায় উঠে আসবে উজ্জ্বলতর জীবনের আলোকে। এই ব্রত নিয়েই ভারতীয় সভ্যতা আজ আবার উঠছে, আবার শাশ্বত শক্তির বলে এই কাজই সে চিরকাল করে এসেছে।

অতীতে আদর্শের মহত্ত্ব ভবিষ্যৎ আদর্শেরই মহত্ত্ব ইঙ্গিত করে। অতীত প্রয়াস ও সামর্থ্যের অনবচ্ছিন্ন ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধি একটা জীবন্ত সংস্কৃতির অবিসংবাদী অনুমোদন। এর থেকে আরো বোঝা যায় যে সভ্যতা ও বর্বরতার অর্থ একান্তই আপেক্ষিক। বৈবর্তনিক ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোণ থেকে য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সভ্যতা তাদের পরাকাষ্ঠায় অর্ধসিদ্ধি, যে প্রদীপ্ত সৌরকর আসবে তারই ইঙ্গিতবাহক শিশু প্রত্যূষ। ভারতবর্ষ বা য়ুরোপ নয়, কোনো জাতি দেশ মহাদেশ এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে পুরো সভ্য হয়নি ; সত্যকার নির্দোষ জীবনযাত্রার সমগ্র রহস্যটি কেউই ধরতে পারে নি, এর সামান্য একটু যা তাদের অধিগত হয়েছিল তা-ও কেউ পরিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি এবং অখণ্ড সমাগ নিষ্ঠা দিয়ে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে নি। সভ্যতার সংজ্ঞা যদি আমরা বলি আত্মা মন দেহের সৌমনস্য তবে কোথায় সেই সৌমনস্য পরিপূর্ণ বা একান্ত বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে ? কোথায় দেখা যায়নি জাজ্বল্যমান ত্রুটি এবং দুঃখকর অমিল ? মিলনের পূর্ণ রহস্য সর্বাংশে কোথায় গৃহীত হয়েছে কিম্বা কোথায় এক বিজয়ী আবাসের সন্তোষজনক স্থায়ী ক্রমোচ্চ সম্মিলনে উঠে গিয়েছে পরিপূর্ণ জীবন-সংগীত ? মানুষের জীবনে শুধুই সর্বত্র যে প্রত্যক্ষ কুশ্রী, কুৎসিৎ পর্যন্ত, কলঙ্কের প্রলেপ রয়েছে তাই নয়, পরন্তু অনেক কিছু যা আমরা নির্বিচল মেনে নিই, অনেক কিছু যা নিয়ে গর্ব করি, সে-সব হয়ত একদিন ভবিষ্যতের মানুষ বর্বরতা অথবা নিদেনপক্ষে আধা-বর্বরতা এবং কাঁচা বলে ধরবে। যে-সিদ্ধি আমাদের মনে হচ্ছে আদর্শোচিত, তাই তখন নিজে ত্রুটি বিষয়ে যন্ত্র যাক-সন্তুষ্ট অপূর্ণতা বলে বিবেচিত হবে ; যে-সব ভাব ধারণাকে আমরা জ্ঞানজ্যোতি বলে দেখি তা-ই তখন অর্ধালোক ও অনালোক বলে প্রতীত হবে। প্রাচীন এবং শাশ্বতের—যেন কোনো বস্তুকেই শাশ্বত বলা চলে—দাবি নিয়ে আমাদের জীবনে ছিল যে সব বস্তু তারা শুধু ঘেরে উবে যাবে তাই নয় ; আমাদের শ্রেষ্ঠ সব নীতি আদর্শের যে রূপ দেওয়া হয়েছে অন্তর্জীবনে ভবিষ্যৎ

তাদেরও বড় জোর দেখবে সহানুভূতির চোখে। সাধারণ কিছুই আছে যার দরকার হবে না প্রসার ও পরিবর্তন, এমন পরিবর্তনই যে চেনা যাবে না, রাজী হতে হবে না এক নব সমন্বয়ে রূপান্তর গ্রহণে। সেযে আগামী যুগ আজকের য়ুরোপ ও এশিয়াকে দেখবে সেই দৃষ্টিতে যেমন আমরা দেখেছি বর্বর উপজাতি ও আদিম অধিবাসীদের। আর যদিও পাওয়া যায় ভবিষ্যতের থেকে এই দৃষ্টি, তবে তাই হবে সবচেয়ে জ্ঞানদীপ্ত ও সক্রিয় দৃষ্টিকোণ যেখান থেকে বিচার করব বর্তমানকে, অথচ তাতে অতীতের সঙ্গে বর্তমান সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা নিরর্থক হয়ে যাবে না।

কার্যত এই অতীত আর বর্তমান গড়ে তুলছে ভবিষ্যতের সোপানাবলী এবং নূতনের মধ্যেও সে স্থান পাবে অনেকখানি। আমাদের অসম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক বৃত্তিধারার পিছনে রয়েছে অবিনশ্বর আত্মা ; রয়েছে কতকগুলি মৌল বৃত্তি বা মুখ্য ভাব যাদের ফেলে দেওয়া চলে না, তারা যেমন আমাদের সত্তার মূলতত্ত্বেরই অঙ্গ তেমনি আবার আমাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির লক্ষ্যেরও—আমাদের স্বধর্মের। দেশের হোক কি মানবজাতির হোক, এই সব বৃত্তি, এই ভাব সংখ্যায় কম এবং সারার্থে সরল, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের পরিবর্তন ও প্রগতি চলে। বাকী যা তা আমাদের সত্তার গভীরতর স্তরের নয়—পরিবর্তনের দাবি তাদের মানতে হবে, মহাকালের এগিয়ে যাবার আদেশ শুনতে হবে। সর্বভূতে রয়েছে এই অজর অমর আত্মা, আর রয়েছে এই আমাদের প্রকৃতির দুর্বার ধর্ম, স্বধর্ম ; অন্যদিকে রয়েছে ক্রমানুসরের পরম্পরার শিথিলতর নিয়ম,—আত্মার ছন্দ, প্রকৃতির রূপাবলী ভঙ্গি স্বভাব—এ সবই যুগধর্মের অদল-বদলের হাত থেকে মুক্ত। মানবজাতিকে এই ক্ষর-অক্ষরের দ্বৈতনীতির শাসন মেনে চলতে হবে, নতুবা প্রাণকেন্দ্র খেয়ে ফেলে যে ক্ষয়ক্ষতি তারই কবলে পড়তে হবে।

ধ্বংসকর ক্ষতিকর সব আক্রমণ আমাদের প্রতিহত করতে হবে নিশ্চয়, তবে তার চেয়েও বেশি জরুরী আমাদের অতীত গৌরব, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিজস্ব সত্য ও স্বাধীন মত গড়ে তোলা,—আমরা কী ছিলাম, কী হয়েছি আর কীই বা হতে পারি। আমাদের অতীতের মধ্যে দেখতে হবে কী ছিল মহৎ, সারবান, উন্নয়নকারী, প্রাণদায়ী, আলোদায়ী, জয়ী, ফলপ্রসূ। তার মধ্যেও আবার দেখতে হবে কোন জিনিস ছিল শাশ্বত গুহাহিত অন্তরাত্মা এবং আমাদের সংস্কৃতিসত্তার ধ্রুব নিয়মের আধীন, তার থেকে আলাদা করে ধরতে হবে কোন জিনিস ছিল সাময়িক ও কালোপযোগী। সত্যিই তো, অতীতের মহৎ সব জিনিস হুবহু ধরে রাখা যাবে না বা চিরকাল পুনরাবৃত্তি করে যাওয়া চলবে না ; আমাদের সম্মুখে নূতনের দাবি, নূতন নির্দেশ। তবে সেই সঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে কোনখানে ছিল অভাব, কী ঠিক আরব্ধ হয় নি, নির্দোষ রূপায়িত হয়নি অথবা কী বহু কালের সীমাবদ্ধ প্রয়োজন কিম্বা প্রতিকূল অবস্থার দাবি মাত্র মিটিয়েছে। কারণ এ দাবি নিরর্থক যে অতীতের সবই, একেবারে পরমাশ্চর্য হয়ে থাকলেও, ছিল ষোলো-আনা নিখুঁত, মানষী

মন ও অন্তরাত্মার এতেই এসেছিল পরমোৎকর্ষ। তারপর এই অতীতের সঙ্গে আমাদের বর্তমানের তুলনা করতে হবে, বুঝতে হবে আমাদের অবনতি কী কী কারণে, চেষ্টা করতে হবে আমাদের যত ত্রুটি ও ব্যাধি সারাবার। আমাদের অতীতের মহত্ত্ববোধ যেন নারাত্মক নিশ্চেষ্টতায় আচ্ছন্ন করে না রাখে; তা যেন হয় নূতন ও মহৎ সিদ্ধির দিকে চলবার প্রেরণা। তেমনি বর্তমানের সমালোচনায় আমাদের একদেশদর্শী হলে চলবে না, আমরা যা এবং যা আমরা করেছি সব মূঢ় অপক্ষপাতিত্বের বশে যেন বাতিল করে না বসি। অবনতিকে মিথ্যা-স্তুতি কিম্বা অবজ্ঞা করে মেনে চলবে না, কিম্বা বিদেশীর হাততালির মোহে নিজের নাক কাটলে হবে না, আমাদের প্রকৃত সব দুর্বলতা ও তাদের মূল খুঁজে বের করতে হবে, এবং সেই সঙ্গে আরও একাগ্র দৃষ্টি দিতে হবে কোথায় আমাদের শক্তির অনুপান উপাদান, আমাদের চির-স্থায়ী সম্ভাবনা, পুনর্জাগরণের সক্রিয় প্রবেগ।

প্রতীচ্য ও ভারতের মধ্যে আর একটি তুলনা দরকার। য়ুরোপের অতীত এবং ভারতের অতীতের মধ্যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আমরা লক্ষ্য করি প্রতীচ্যের সাফল্য, মানুষের জন্য তা এনেছে কত উপহার, আর সেই সঙ্গে তার মধ্যে প্রকাণ্ড ফাঁক, প্রত্যক্ষ গলদ, সাংঘাতিক ও 'কর্ম্য' পাপ এবং বিফলতা। তুলাপাত্রের অন্যদিকে রাখতে হবে মধ্যযুগীয় ভারতের লাভ-লোকসান, এখানে দেখতে পাব য়ুরোপের কাছে মাথা নত করবার মতো কিছু নেই, বরং অনেক কিছুতে বেশ উঠে দাঁড়াতে পারি এবং কয়েকক্ষেত্রে তার মাথা ছাড়িয়েও বহু উর্ধ্বে। কিন্তু পরে খুঁটিয়ে দেখতে হবে তার প্রবল সাফল্য, প্রাণবন্যা, অপরাজেয় ঔদ্ধত্য নিয়ে পশ্চিমের বর্তমানকে। তার যা মহৎ তা সমর্থন করব, তবে ত্রুটি, বন্ধুরতা এবং বিপদেরও কড়া হিসাব রাখব। এই বিপজ্জনক সাফল্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে ভারতের বর্তমানকে, তার পতন ও সেটির হেতু, তার পুনর্জাগরণের বাসনা, যেসব উপাদান তাকে মহত্ত্ব দিয়েছে বর্তমানে ও দেবে ভবিষ্যতে। দেশেশুনে বিচার করা যাক যা-কিছু পাশ্চাত্যের হাত থেকে গ্রহণ করতেই হবে, কী করেই বা তাকে আমাদের মজ্জায় আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারব। তবে এও দেখা চাই, আমাদের ভিতরেই রয়েছে নিজস্ব শক্তির কোন উৎস যার থেকে নানে পাশ্চাত্যের সবকিছু দানের চেয়ে গভীরতর সজীবতর সবুজতর জীবনীশক্তির সহস্র ধারা। প্রতীচ্যের রূপাবলী ও প্রবৃত্তির চেয়ে এটিই বেশি সাহায্য করবে, কারণ ঐটিই হবে আমাদের পক্ষে বেশি চরিত্রানুগত, আমাদের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের পক্ষে বেশি উৎসাহদায়ক, প্ররোগের শক্তিক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে অধিকতর সহজে গৃহীত ও অনুসৃত হওয়া।

অবশ্য এ সবস্ত প্রয়োজনীয় তুলনার চেয়ে অনেক বেশি উপকারী হবে আমাদের অতীত ও বর্তমান থেকে সামনে কোনো বিদেশী আদর্শের পরিবর্তে নিজেরই ভবিষ্যৎ আদর্শের দিকে দৃষ্টি মেলা। বস্তুত আগামীর দিকে বিবর্তনের প্রবেগই আমাদের অতীত ও বর্তমানের যথার্থ মূল্য ও মর্যাদা দেবে। ভারতের প্রকৃতি, তার উদ্দেশ্য, তার কর্তব্য, পৃথিবীর ভাগ্যনির্ণয়ে

তার অবদান, যে বিশেষ শক্তির প্রতিভূ সে, তা তার অতীত ইতিহাসে অনন্ত লিপিবদ্ধ এবং তাই তার বর্তমান নিগ্রহ ও নির্যাতনের রহস্যের মূলে। আমাদের অন্তরাত্মার এক নবধারা গ্রহণ প্রয়োজন; অতীতের আকার-আধারের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন এই অন্তরাত্মাকেই বেছে নিয়ে বজায় রাখতে হবে, একেই দিতে হবে নূতন প্রবল ভাবসম্পদ, সাংস্কৃতিক মূল্য, নূতন ব্যবহার, বহত্তর রূপায়ণ। এই আসল বস্তুগুলিকে যতক্ষণ আমরা স্বীকার করব, যতক্ষণ তাদের আন্তর সত্তার অনুরাগী থাকব ততক্ষণ দারুণ মানসিক ও স্থূল পরিবর্তনে পর্যন্ত ক্ষতি নেই, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চরম রূপবদলে ভয় নেই। তবে এসব পরিবর্তন ভারতের অন্তরাত্মার তাপে ও ছাঁচে ঢালাই করে নিতে হবে, অন্য কিছুতে নয়—আমেরিকা বা য়ুরোপের গতিগতির ছাঁচে নয়, জাপান বা রুশের ছাঁচেও নয়। আমরা কী হয়েছি এবং আমরা কী হতে পারি বা কী হওয়ার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত—উভয়ের মধ্যেকার গভীর পার্থক্যটি প্রথমে বোঝা চাই। তবে এটি করতে হবে কোনো নিরুৎসাহের মনোভাব বা আত্মলাঞ্ছনার বা আমাদের অন্তরাত্মাবর্জনের মনোভাব নিয়ে নয়, কতখানি সম্মুখে যেতে হবে তা পরিমাপের জন্য। কারণ তার সঠিক মাত্রা তো বের করতে হবে, নিজেদের ভিতরে আবিষ্কার করতে হবে আস্পৃহা ও প্রেরণা, তাদের ভাবনায় ফলিত এবং কর্মে প্রকট করে ধরবার জন্য যথোপযুক্ত অগ্নি ও তেজ।

এই মত ধরতে হলে ও এই আন্দোলন চালাতে হলে সত্যান্বেষী মৌলিক একটা চিন্তা চাই, চাই একটা দৃঢ়প্রসূত সংবোধি, একটা অটুট আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিগত সততা। প্রথমে দরকার অন্ধ পাশ্চাত্য সমালোচনার বিরুদ্ধে আমাদের সংস্কৃতি রক্ষা করবার এবং আধুনিক বিপুল চাপের বিরুদ্ধে তাকে অক্ষত রাখবার সাহস, কিন্তু আবার এ সাহসও থাকা দরকার যে য়ুরোপের আদর্শে নয়, আমাদেরই দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের সংস্কৃতির ভুলত্রুটি দেখে স্বীকার করা। অবনতি ও ক্রমধ্বংসের ব্যাপার ছাড়াও উন্নাসিক অস্বীকৃতি ঠেলে বরং জানা ও মানা ভাল কোন জিনিস আমাদের জীবনধর্মে ও সমাজ প্রতিষ্ঠানে প্রবাহক ও তাদের মধ্যে কোন কোনটি রক্ষার অযোগ্য, কী জিনিস জাতীয় জীবনে দুর্বলকর, আমাদের সভ্যতায় অবমাননাকর, আমাদের সংস্কৃতির পক্ষে অসম্মানজনক। একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত জাতিচ্যুতদের। এমন অনেকে আছেন যারা সাফাই গেয়ে বলবেন এটা অতীত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে অপরিহার্য ভ্রম; অনেকে বলেন ওটা তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সমাধান। আরও এক শ্রেণীর লোক এর সমর্থন করবেন কিছু অদলবদলের দ্বারা, আমাদের সমাজ-সমন্বয়ে প্রয়োজন হিসাবে ধরে রাখবেন। ছুতো হয়তো ছিল, তবে ধরে রাখবার জন্য তা সমর্থক হতে পারে না। এ-মত দারুণ বিতর্কের বিষয়। যে-সমাধান অস্পৃশ্যতার অজুহাতে দেশের এক ষষ্ঠাংশ লোককে উর্ধ্বে তুলে ধরার পরিবর্তে এক চির-অবমাননার পঙ্কে, এক আন্তর ও বাহ্য কলঙ্কে, এক নিষ্করুণ পাশব জীবনধারায় ডুবিয়ে রাখতে পারে তা কোনো সমাধানই নয়, তা বরং দুর্বলতাকেই বরণ, তা সমাজদেহ এবং তার সমষ্টিগত আধ্যাত্মিক, মানসিক, নৈতিক ও পার্থিব

কল্যাণে একটা পচা ক্ষত। যে-সমাজসমন্বয় শুধু সহবাসী ও স্বদেশবাসীদের অবমাননা থেকে টিকতে পারে তার কানে ক্ষয়-ধ্বংসের ডাক এসে গেছে। ফসলগুলি হয়ত অনেককাল চেপে রাখা যাবে, এবং একমাত্র কর্মফলের অলক্ষ্য সূক্ষ্ম ধারায় কাজ চলবে; কিন্তু কালো জায়গায় একবার যেই আলো আসতে দেওয়া হয়েছে, তখন কালোকে ধরে রাখার অর্থ ধ্বংসের জীইয়ে রাখা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ মুক্তির সম্ভাবনাকে বানচাল করা।

আবার, আমাদের সাংস্কৃতিক ভাবধারা ও সামাজিক গঠনের উপর দৃষ্টি দিতে হবে, দেখতে হবে কোথায় প্রাচীন রসটি বা আসল তাৎপর্যটি হারিয়ে গিয়েছে। অনেক অংশ এখন মলীক কুলজুরি, আশ্রিত অর্থের সঙ্গে কোনো সামঞ্জস্য নেই, বাস্তব জীবনের সঙ্গে নেই মিল। আর যা আপনা-আপনি ভালো কিম্বা কালোপযোগী হিতকর, তা-ও আমাদের সংবৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট নয়। এ-সমস্ত হয় রূপান্তরিত নয় বর্জন করতে হবে, পরিবর্তে আনতে হবে সত্যময় ভাবধারা, উন্নততর আধার। নূতন যে-অর্থ আমরা দেব তা যে সেই প্রাচীন তাৎপর্যই হবে এমন কোনো কথা নেই। যে সক্রিয় সত্য আমাদের আবিষ্কার করতে হবে তাকে অতীত আদর্শের সীমানায় বাঁধলে চলবে না। আমাদের অতীত ও বর্তমান আদর্শের উপর অন্তরাত্মার সন্ধানী আলো ফেলতে হবে, দেখতে হবে তাদের ছাড়িয়ে যাওয়া বাড়িয়ে নেওয়া দরকার কি না, নূতন বৃহত্তর আদর্শের অনুযায়ী করে তোলা প্রয়োজন কি না। আমাদের কর্ম আমাদের সব সৃষ্টিকে ভারতের ধ্রুব অন্তঃপুরুষের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে, তবে তার যেন স্থান হয় বৃহত্তর মৈত্রীর ছন্দে, আরো আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের আহ্বানে উৎসুক। আত্মবিশ্বাস এবং আমাদের সংস্কৃতির অন্তঃপুরুষের প্রতি নিষ্ঠা যদি নিরবচ্ছিন্ন ও প্রবল জীবনের শর্ত হয় তবে বৃহত্তর সম্ভাবনাকে মানাও কম অপরিহার্য শর্ত নয়। প্রেরণার অনুশ না করে নিয়ে অতীতকে যদি গড্ডলিকা বানিয়ে পূজা দেই তাহলে সুস্থ বিজয়ী পুনর্জীবনের আশা সুদূরপরাহত।

আমাদের সভ্যতার রূপ ও রস কোনো উকিলের ঠেকার অপেক্ষা করেনা, মজ্জায় ও শ্রেষ্ঠাংশে তারা অমূল্য। তাদের জন্য অন্তর্জগতে ও ব্যক্তির মধ্যে ভারতের অনুসন্ধান আন্তরিক, সবল, সফল। কিন্তু সমাজের সমষ্টিগত জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে এসেছে সঙ্কোচ। জনতার জীবনীশক্তিতে যখন ভাঁটা পড়ল তখন, কদাপি সাহসী ও সর্বদর্শী নয় বলে, তা দ্বিধাচ্ছন্ন ও সংকীর্ণ হয়ে উঠল। এই ত্রুটি, আদর্শ ও সমবেত প্রয়াসের মধ্যে এই ফাঁক মানুষের চিরসঙ্গী, শুধু ভারতেরই বিশেষত্ব নয়; অবশ্য কালের ব্যবধানে তা প্রত্যক্ষ প্রকট হয়ে উঠেছিল, আমাদের সমাজের গায়ে এঁকে দিয়েছিল দুর্বলতা ও ব্যর্থতার চিহ্ন। একেবারে গোড়ার দিকে অন্তশ্চারী আদর্শ ও বহির্ম জীবনের একটা সমন্বয়সাধনের মহৎ প্রয়াস হয়েছিল; শেষ পরিণতি যদিও তার দাঁড়িয়েছিল সমাজের একটা অচল নিয়ন্ত্রণে। একটা আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের মূলনীতি, একটা অলঙ্ঘ্য ঐক্য ও সহায়ক পারস্পরিকতার অটুট বাঁধ বরাবরই ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জনতার মধ্যে বাড়ল কঠিন বন্দীত্বের একটা

উপাদান, একটা বহু বিভাজন, একটা উচ্ছৃঙ্খল জটিলতা। মুক্তি, ঐক্য ও জীবে ব্রহ্মের বৈদান্তিক আদর্শ থাকল শুধু ব্যক্তির আন্তর আধ্যাত্মিক প্রয়াসের উপর। সম্প্রসারণ এবং স্বীকরণের শক্তি হ্রাস পেল, আর যখন বাহিরের থেকে প্রবল আক্রমণাত্মক শক্তির বন্যা এল—ইসলাম ও য়ুরোপ—তখন পরবর্তীকালের হিন্দুসমাজ এক স্থাণু বর্মীজীবনে তৃপ্ত হল, শুধুই বেঁচে থাকবার পরোয়ানা। জীবনধারা সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়ে উঠল, প্রাচীন মনীষার একটানা একটা ক্ষুণ্ণ প্রকাশ ধারণ করে। স্থায়িত্ব পাওয়া, বাঁচা গেল বটে, তবে এ স্থায়িত্ব নিবিষ্ট ও আসল নয়, একটা বহৎ বলবীর্যময় বিজয়ী উৎক্রমণের নয়।

আর এখন তো সম্প্রসারণ ছাড়া বাঁচাই অসম্ভব। আদৌ যদি জীবন রাখতে হয়, ভারত-ধর্মের শুদ্ধ প্রচেষ্টা আবার শুরু করতে হবে ; ব্যক্তির মধ্যে এবং সমাজে, ঐহিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনে, দর্শনে এবং ধর্মে, শিল্পে এবং সাহিত্যে, চিন্তায়, রাজনীতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক আয়োজনে আমাদের নির্ভয়ে গ্রহণ এবং পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে হবে ভারতের সমুচ্চ অধ্যাত্ম ও জ্ঞানের অসীম অনন্ত সম্পদ। তা যদি পারি তাহলে দেখব প্রতীচ্যের যেন ধরে শ্রেষ্ঠ যা আমাদের কাছে এসেছে তা আমাদেরই পুরাণী প্রজ্ঞায় নিহিত ছিল, ছিল বৃহত্তর অর্থ নিয়ে, একটা গভীরতর সত্তা ও আত্মজ্ঞান নিয়ে, মহত্তর এবং আরো আদর্শোচিত রূপকৃতির দিকে প্রবর্তনার সামর্থ্য নিয়ে। যা শুধু চেতনায় জানা হয়েছিল তা জীবনের অণুতে অণুতে ফুটিয়ে তুলতে হবে। আমাদের অতীত সংস্কৃতির মূলার্থ এবং ভবিষ্যৎ-পরিবেশের দাবির মধ্যে প্রয়োজন যে সামরস্য তার গোপন রহস্য এখানেই, আর কোথাও নয়।

এই দৃষ্টি পূর্ব-পশ্চিম সাক্ষাতের যে বর্তমান সাংঘাতিক রূপ সেই সংস্কৃতি-সংঘর্ষের উর্ধ্বে আর একটা সম্ভাবনা খুলে দেয়। সকল মানুষের মধ্যে ভগবানের এক লক্ষ্য ; নানা মহাদেশ নানান জাতি তারই দিকে চলেছে নানা পথে, বিভিন্ন রূপ ও রূপকের আশ্রয়ে, বিভিন্ন ভঙ্গিতে। অন্তঃসলিলা এই ঐক্যের পরম ভাগবত উদ্দেশ্য না বুঝে পরস্পরে যুদ্ধে মাতে প্রত্যেকেই বলে গলা কাটায় তাদের পন্থাই মানুষের একমাত্র পন্থা। যে সভ্যতায় তাদের জন্ম সেইটিই আসল ও নির্দোষ, অন্য সব ধ্বংসে হবে বা জাহান্নমে যাবেই। অথচ নিখুঁত সভ্যতায় এখনো দেখা পাওয়া যায়নি ; মনুষ্যজগতের নয়-দশমাংশ এখনো বর্বর, আর এক-দশমাংশে সংস্কৃতিপন্ন। য়ুরোপীয় মন সংঘাতের মধ্যে দিয়ে সমৃদ্ধির নীতিকে প্রথম স্থান দেয় ; দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই একটা কিছু মিলে সে এসে পৌঁছায়। কিন্তু এই মিল প্রতিযোগিতা, আক্রমণ ও আরো-যুদ্ধের আশ্রয়ে সমৃদ্ধির জন্য একটা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই যে শান্তি তা নিজের ভিতরে পর্যন্ত ক্রমাগত দ্বন্দ্বে পরিণত হচ্ছে নানা নীতির ভাবের, স্বার্থের, জাতির, শ্রেণীর অভিনব সংঘর্ষে। এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি এবং কেন্দ্র ভঙ্গুর, কারণ যে অর্থসত্যের উপর তার আসন তা তলিয়ে যায় পূর্ণ মিথ্যায়, তাহলেও এটি এ-পর্যন্ত, অন্তত অদ্যাবধি, নিরন্তর প্রাপ্তির উদ্যোক্তা হয়েছে, সবল হয়ে উঠে গ্রাস ও হজম করতে

পেয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি মিলের এমন এক মূলনীতি ধরে চলেছে যার গোড়ায় থাকবে ঐক্য আর ছড়িয়ে প্রকাশ হয়ে শেষে পৌঁছাবে এক একতায়। তার লক্ষ্য ছিল সেই স্থায়ী প্রতিষ্ঠান যা কমিয়ে আনবে বা দূর করে দেবে দ্বন্দ্বনীতি। কিন্তু বহিষ্করণ, খণ্ডন, অচলের স্থাণুত্ব দ্বারা সে পৌঁছুল এসে একটা শান্তি ও স্থিতাবস্থায়; একটা মন্ত্রপূত নিরাপদ গণ্ডী এঁকে তার মধ্যে নিজেকে চিরতরে বন্দী করল। পরিশেষে সে হারিয়ে বসল আক্রমণের শক্তি, দুর্বল করে ফেলল আত্মস্বীকরণের ক্ষমতা, নিজের খোড়ার মধ্যে ক্ষয় পেতে লাগল। এটা স্থাণু সংকীর্ণ মিলনী—ঠিক নিজেকে ছড়িয়ে চলা নয়, নমনীয় রাখা নয়, আমাদের অপূর্ণ মানুষী অবস্থায় এতে গড়ে ওঠে কারাগার, কিম্বা শয়নঘর। মিলনীর চেহারা সাময়িক এবং অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য,—সে তার প্রাণোল্লাস বজায় রাখতে পারে অন্তিম লক্ষ্য সার্থক করে তুলতে পারে যদি সর্বদা নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়, আত্মপ্রসার করে, এগিয়ে যায়। ক্ষুদ্রতর ঐক্যগ্রন্থিদের আরো প্রশস্ত আরও সর্বগ্রাহী একতার দিকে যেতে হবে, বিশেষ করে যাঁটি আধ্যাত্মিক একতার দিকে। সাদা কথায় বলতে গেলে এক সভ্যতায় ও সংস্কৃতির উদ্‌যাপনে আমরা উদ্যোগী,—আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক ঐক্যের একটা বৃহত্তর বাহ্য প্রকাশ,—তবে সেই নানাত্ব নিয়ে যাকে য়ুরোপীয় যান্ত্রিক পদ্ধতি বরদাস্ত করেনা, এইটিই হবে তার মুখ্য ভাব। একটা মিলনী, বিশ্বমানবের সঙ্গে একটা ঐক্য, যেখানে অক্ষত বজায় রাখতে পারব আমাদের আধ্যাত্মিক ও বাহ্য স্বাধীনতা—এ হবে আমাদের আর এক প্রয়াস। এখন যাকে সংগ্রাম বলে মনে হয় তা হয়ত প্রথম প্রয়োজনীয় ধাপ, এর পর চিন্তায় ধরা যাবে মানব-ঐক্যের চিত্র যাকে পাশ্চাত্য শুধু কল্পনায় দেখেছে কিন্তু তার অন্তরাত্মাকে ধরতে পারেনি বলে সার্থক করতেও পারেনি। তাইতো য়ুরোপের প্রয়াস বিরোধী স্বার্থগুলিকে আপোষে বেঁধে এবং নানা প্রতিষ্ঠানের চাপে ফেলে ঐক্য স্থাপন; এ প্রয়াসে কিছুই গড়া যায় না কিম্বা বড় জোর গড়া যায় বালির প্রাসাদ। ইতিমধ্যে তার অভিলাষ অন্য সব সংস্কৃতি মুছে ফেলা, যেন তারই সত্তা একমাত্র সত্তা, জীবনের সকল সত্য এবং অন্তরাত্মার সত্য বলতে অন্য কিছু নেই। অন্তরাত্মার সত্যের বাহক ভারতবর্ষকে এই উদ্ধত দাবির ও আক্রমণের বিরুদ্ধতা করতে হবে, নিজের গভীরতর সত্যকে ঘোষণা করতে হবে দারুণ প্রতিকূলতা ও বহিরাগতের সকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও। এর সংরক্ষণেই একমাত্র আশা মানুষ নবপ্রলয়ের মধ্যে না চলে গিয়ে, পুরাতনের বৃত্তে অন্ধের মত আবর্তিত হয়ে বর্বর আদিকাণ্ডে না ফিরে শেষ পর্যন্ত আলোর উত্তীর্ণ হবে, প্রগতির প্রৈতিকে সার্থক করবে—তাতে পার্থিব বিবর্তনকে ভাগবত ক্রমবিকাশের পরবর্তী ধাপে তুলে ধরবে।

বিলাতের ডায়েরীর কয়েক পাতা

(ব্যক্তিগত বিবরণী)

এ. বি. পুরাণী

আমি ইংলণ্ডে যাই ১৯৫৫ সালের আগষ্টে। যাওয়া স্থির হয় মাত্র জুলাইএর শেষে। ইতিপূর্বে ব্রিটিশ কাউন্সিল আমাকে আমন্ত্রণ করেছিল অক্সফোর্ডে সমসাময়িক দর্শন সম্বন্ধে আলোচনায় যোগ দিতে। আমি আমাদের আশ্রমের পরিচিত তাদের প্রতিনিধিকে জানালাম যে ভারতীয় সক্রিয় চিন্তাধারা সম্বন্ধে আমি দুই দফাতে বলতে চাই, প্রতিবার ২০।২৫ মিনিট সময় নেবো। সেখানে মোট ২৬টি ভাষণের ব্যবস্থা ছিল। যে জবাব আমি পেলাম তা খুব অনুকূল নয়, তথাপি তা মায়ের কাছে পাঠালাম। মা যাবার অনুমোদন করলেন না, সুতরাং তাদের লিখে পাঠালাম যে আমি যেতে অক্ষম। ওখানকার ডিরেক্টর তখন স্বয়ং বিশেষ অনুরোধ জানালেন, প্রোগ্রামে ব্যবস্থা না থাকলেও তিনি আমার প্রস্তাবিত ভাষণের জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা করবেন।

সে চিঠিও মাকে পাঠালাম। মা এবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু তখন জুলাই-এর শেষ; ইতিমধ্যে পাসপোর্ট সংগ্রহ করা, জাহাজের বার্থ রিজার্ভ করা, টাকার সংস্থান করা, প্রভৃতি সবই সারতে হবে। আগষ্টের গোড়াতে যখন পণ্ডিচেরী ছাড়লাম তখন অনেকেই বলেছিল বোম্বাই পৌঁছে জাহাজে স্থান পাব কিনা সন্দেহ, কারণ কয়েক মাস আগের থেকেই তার ব্যবস্থা করে রাখতে হয়। কিন্তু আমার মনে হলো যাহোক কিছু হয়েই যাবে। ১২ই আগষ্ট তারিখে আমি জায়গা পেয়ে গেলাম 'কার্থেজ" জাহাজে।

সমুদ্রে কয়েকদিন খুব ঝড়বৃষ্টি হলো। এমন কি জাহাজের নাবিকরাও কেউ কেউ সমুদ্রপীড়ার কাতর হলো, যাত্রীদের তো কথাই নেই। আমি খাড়া হয়ে উঠতে পারলাম ২।৩ দিন পরে। "কার্থেজ" জাহাজের নামটা শোনা থেকেই মনে হচ্ছিল যে শ্রীঅরবিন্দ ১৮৯৩ সালে এই নামের জাহাজেই ভারতে ফিরেছিলেন। এডেন পার হবার পর আমি কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই জাহাজ ১৮৯৩ সালে বিলাত থেকে ভারতে এসেছিল কিনা। কাপ্তেন তার লগ্-বুক বের করে দেখালে যে ১৯২৬ সালে সেই পুরোনো জাহাজকে আমূল পরিবর্তন করে নতুন করে গড়া হয়েছে, তবে এ সেই একই "কার্থেজ" জাহাজ বটে। আমিও যে এখন সেই জাহাজেই চলেছি শ্রীঅরবিন্দের ও মায়ের কিছু কাজ

করতে এতে একটা গৌরব বোধ করলাম। এমন যোগাযোগ আমার একাধিকবার ঘটেছে।

ওখানে গিয়ে আমার তিন রকম কাজ থাকবে, এই সংকল্প নিয়েই আমি ইংলণ্ডে যাচ্ছি—(১) শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে ইংরেজ জাতিকে কিছু জানিয়ে দেওয়া, (২) ওদের ইউনিভার্সিটিগুলিতে ও বিদ্বজ্জন সমাজে তাঁর চিন্তাধারা ও তত্ত্বগুলির দিকে একটা বোধ জাগিয়ে তোলা, (৩) শ্রীঅরবিন্দ ১৮৭৯ থেকে ১৮৯৩ পর্যন্ত যখন ইংলণ্ডে ছিলেন তখনকার তাঁর জীবনেতিহাস সম্বন্ধে যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করা। বস্তুত আমি যাচ্ছি তীর্থযাত্রীর মতো, শ্রীঅরবিন্দ যেখানে ১৪ বছর বাস করেছিলেন সে স্থান আমার কাছে তীর্থ হিসাবেই গণ্য। লোকে সুদূরযাত্রা করে হাওয়া বদলাতে, বা বিশ্রাম পেতে, বা কিছু শিখতে কিংবা ব্যবসা সম্পর্কে। আমার তেমন কিছু উদ্দেশ্য নেই। ষাট বছর বয়সে আমি বিদেশে যাচ্ছি এক গুরু দায়িত্ব নিয়ে। আর সেই দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে আমার একা একা সুটকেস গোছানো, কর্মতালিকা ঠিক করা, টিকিট কেনা, স্থান রিজার্ভ করা, সবই করতে হচ্ছে।

এডেনের পর থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ থেকেই ইংলণ্ডে পৌঁছলাম। ওখানকার ইণ্ডিয়া অফিসের নামে পরিচয়পত্র সঙ্গে ছিল, কিন্তু লণ্ডনে সেখানকার চিলেচালা ব্যাপার দেখে সে পত্র আর দেখালাম না। সেখানে কোনো কর্মশৃঙ্খলা নেই, পরিচ্ছন্নতা নেই, "স্বাধীন ভারতের" প্রতিনিধিদের উপযুক্ত কোনো লক্ষণই নেই। তবে ব্রিটিশ কাউন্সিল যথেষ্টই সাহায্য করলে।

প্রথমেই আমি দমে গিয়ে আবিষ্কার করলাম যে ইংলণ্ডে শ্রীঅরবিন্দের নাম ও তিনি যে ইংরেজী ভাষাতে কত সাহিত্য রচনা করেছেন তা খুব কম লোকই জানে।

ইংলণ্ডে আমার কাজ শুরু হয় ৩০শে আগষ্ট আর তা সমাপ্ত হয় ২রা ডিসেম্বর—মোট তিন মাস তিন দিন। এরই মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে আমি ভাষণ দিই—

৪।৯।১৯৫৫—হাউস সার্কেলে
৬।৯।১৯৫৫—ওয়াই. এম. সি. এ. লণ্ডন
১১।৯।১৯৫৫—ইউরোপ হিন্দু এসোসিয়েশন
২।১০।১৯৫৫—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন
১৭।১০।১৯৫৫—কিলিপ ব্যাগ্‌রির গৃহবৈঠক
২১।১০।১৯৫৫—ইণ্ডিয়া ইনষ্টিট্যুট অফ কাল্‌চার
২২।১০।১৯৫৫—গুজরাটি মণ্ডল
২৩।১০।১৯৫৫—হাউস সার্কেলে
২৮।১০।১৯৫৫—রয়্যাল ভারত পাকিস্তান ও সিংহল সোসাইটি
৯।১১।১৯৫৫—বি. বি. সিতে

২০।১১।১৯৫৫—ষ্টাডি সার্কেলে

ঐ সন্ধ্যায়—মিস্ এলিসন বার্ণাডের আধ্যাত্মিক মণ্ডলে

২৫।১১।১৯৫৫—কেম্ব্রিজ গ্রুপে

১।১২।১৯৫৫—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে

এ-ছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে প্রায় ৮০।৯০ জন গুণী ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করি, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, লীড্স্ ও ডারহাম ইউনিভার্সিটিতে যাই, কেম্ব্রিজ ও লীড্স্ ইউনিভার্সিটিতে শ্রীঅরবিন্দের ছবি ও এক সেট করে গ্রন্থ দিয়ে আসি। বি. বি. সি.তে ভাষণ দিই; তা ১৯।১২।১৯৫৫ তারিখে সর্বত্র প্রচারিত হয়। আর অক্সফোর্ড ও অন্যান্য ইউনিভার্সিটির আলোচনা কক্ষে অনেক দার্শনিক অধ্যাপকের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলি।

ইংলণ্ডে শ্রীঅরবিন্দের পূর্বাবস্থান সম্বন্ধে নানা খবর আমি দৈবাৎ বিভিন্ন সূত্রে পেয়ে যাই। তিনি কোন কোন বাড়িতে ছিলেন সে খবর পাই তাঁর ভাই মনোমোহনের বন্ধু লরেন্স বিনিয়নকে লেখা পত্রাবলী থেকে। এ পত্রালাপ সম্বন্ধে আগেই জানা ছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কতকগুলি চিঠি ছিল যা জাপানী হামলার সময় খোয়া যায়। শ্রীমতী বিনিয়নের ঠিকানা জেনে তাঁকে চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করলাম মনোমোহনের কিছু চিঠিপত্র তাঁর কাছে আছে কি না। তিনি মাস দুই পরে জবাব দিয়ে তাঁর সঙ্গে কয়েকটি চিঠি পাঠিয়ে দিলেন যার থেকে আমি লণ্ডনের চারটি বাড়ির ঠিকানা পেলাম যেখানে যেখানে তাঁরা গিয়েছিলেন। লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল থেকেও তার সমর্থন পেলাম।

৩০ আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখের বিকেলে আমি 'কার্থেজ' জাহাজ থেকে প্রথম টিলবেরিতে পদার্পণ করি আর সন্ধ্যায় নিরামিষগৃহে স্থান পাই—পেম্ব্রিজ ভিলাজ।

৩১শে ব্রিটিশ কাউন্সিলে যাবার তারিখ নির্ধারিত ছিল, কিন্তু তার ঠিকানা জানতাম না। শ্রীমতী ভিভিয়ান মর্টন ও মিস্ ডোরিস টমলিনসন দুজনেই ফোন করেছিলেন, শ্রীমতী বললেন যে তিনি সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত খালি আছেন। ফোনের ভঙ্গীতে আন্দাজ পেলাম যে এরা সকলেই মহা কর্মব্যস্ত, যেন কোনো অদৃশ্য চাবুকের তাড়ায়। আবার তখন মনে হলো যে এ যেন আমি কোন অজানার অভিযানে এসেছি, তথাপি এ এক নতুন অ্যাডভেঞ্চার ধরে ভেবে উৎসাহী হয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম এই মনোভাব নিয়ে "দেখাই যাক না কি হয়।" লণ্ডনের পথে সোজাই অগ্রসর হয়ে চললাম।

কুইন্স্ গেট টেরেসে পৌঁছলাম ৭।। টায়। মিস্ ডোরিস দ্বারপ্রান্তেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—পিটার কি এখানেই থাকতেন? পিটার ক্রস্টন চক্ ছিলেন আমার বিশেষ বন্ধু এবং শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের ভক্ত, পণ্ডিচেরীতেও ছিলেন তিনমাস, তাঁকে আমি আফ্রিকা থেকে ইংলণ্ডে যাবার কথা লিখেছিলাম, কিন্তু কোনো

উৎসাহসূচক জবাব পাইনি। তিনি ১৯৫৩ নভেম্বর ১২ তারিখে মারা যান। সেই পিটার এখানে থাকতেন জেনে বললাম তাঁর ঘরটি একবার দেখতে চাই। একটি সরু বারান্দা দিয়ে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন সেই ঘরে। সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর অভাব বিলক্ষণ অনুভব করলাম, তিনি থাকলে সহকর্মীরূপে কত সাহায্যই পেতাম। ডোরিসকে বললাম "পিটার থাকলে যে কাজ হৃদয় দিয়ে করত সেই কাজই করতে আমি এসেছি। তাঁর আভ্যন্তর সাহায্য নিশ্চয় আমি পাব, তাঁর অভীপ্সিত কাজকে আমি নষ্ট হতে দেব না।" তিন মাস যাবৎ লণ্ডনে থেকে ও সেখান থেকে নানা স্থানে ঘুরে সেই চেষ্টাই আমি করেছি।

৩১শে ইণ্ডিয়া অফিসে গেলাম শ্রীঘোষের পরিচয়পত্র নিয়ে। কিন্তু তখনকার কমিশনার শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী ইংলণ্ডে অনুপস্থিত ছিলেন। শিক্ষাবিভাগের মিঃ রোজেরিওর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি খুব সহানুভূতি দেখিয়ে ওয়াই, এম্, সি,-এর ওয়ার্ডেন এব্রাহামকে ফোন করে ৬ই সেপ্টেম্বর ধার্য করলেন সেখানে অভ্যাগত শ্রোতাদের কাছে ভাষণ দেবার জন্য।

৬ই সেপ্টেম্বর নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়ে দেখি বোর্ডে কোনো নোটিশই নেই। এব্রাহামও উপস্থিত নেই। আমি নিচে গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে টেবিল-টেনিস খেলতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ভারতীয় ছাত্র খুব কম ছিল। বিলিয়ার্ড টেবিলে কয়েকজন জুয়া খেলছিল ও কলহ করছিল। তখন ৬টা ৪৫ মিঃ, আমার ভাষণের সময় হয়েছে। আমি টেলিফোন মেয়েটিকে গিয়ে বললাম, "মিঃ এব্রাহাম এলে তাঁকে বোলো যে পুরাণী ভাষণ দিতে এসেছিল টেলিফোনে ব্যবস্থা অনুসারে, তিনি নেই দেখে ফিরে যাচ্ছি।"

মেয়েটি তখন ব্যস্ত হয়ে বললে, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি দেখছি। দুই মিনিটের মধ্যে এব্রাহাম এসে নানা কৈফিয়ৎ দিতে সুরু করলে। আমাকে বললে, "ওয়াই, এম্, সি,-এর নতুন বাড়িটা দেখতে চান?"

আমি বললাম—"ইট কাঠ অনেক দেখেছি এখন তার সময়ও নেই। আমার প্রয়োজন এখানকার মানুষদের নিয়ে, আমার মিটিংএর সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।"

তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে একটু পরে ফিরে এসে আমাকে নিয়ে গেলেন সান্ধ্য ভোজের ঘরে, সেখানেই ভাষণ দেবার কথা ছিল। ৪০।৫০ জন ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিল: পরিস্থিতি খুবই হাল্কা ও কৃত্রিম, ভারতীয় চরিত্রের লক্ষণই নেই। বিদেশে এক ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের এই অবস্থা দেখে মনটা দমে গেল, এখানেও সেই অনুকরণকারী দাসমনোবৃত্তি! এরাই দেশে ফিরে বিলেত ফেরত বলে পরিচয় দেবে। কেবল মোটা বেতন পাবে আর চাকরিতে প্রমোশন পাবে! ভারতীয় সংস্কৃতির কোনো মূল্যই নেই এদের কাছে।

সেখানে আমি খেলাম না কিছু। টেবিলে টেবিলে ঘুরে ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করলাম,

যদিও দেখলাম তাদের ওতে কোনো উৎসাহ নেই। নিজের মনে বললাম, তা হোক, আমার যেন ভিতর ঠিক থাকে।

ছাত্রদের প্রেসিডেন্ট মিঃ বর্মা পোষ্টগ্রাজুয়েট ডাক্তারির ছাত্র, সে আমার পরিচয় দিয়ে বললে আমি ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। কিন্তু আমি বললাম—"যদিও উনি দর্শন সম্বন্ধে বলতে বলছেন, কিন্তু এখন তোমাদের আহারাদির পরে হজমের কাজটাই দরকার। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে পেটের রক্ত মাথায় তুলতে চাইনা। দর্শন নয়, আমি জীবন সম্বন্ধেই দু এক কথা বলব।

যা বলেছিলাম তার সারমর্ম এই : "ইংলণ্ডে আসতে আমি চাইনি। তোমরা হয়তো বুঝবে না যে তোমাদের ঐ বয়সে আমি কতখানি হৃদয়াবেগের সঙ্গে ভারত-স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতাম। মনশ্চক্ষে দেখেছি ষোলো শতাব্দীর আগে বিদেশী বণিকেরা এসে কেমন করে বণিক হয়ে দাঁড়াল, তারপর অর্থের প্রতিপত্তির জোরে ইংলণ্ড ভারত দখল করলে। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা কিছু তাদের সংস্কৃতিও দান করলে। তাদের শিক্ষাতেই ভারতে আন্দোলন জাগল, শেষে ভারত স্বাধীন হলো। অতএব সেজন্য ভারত এই দ্বীপটির কাছে ঋণী—ইংলণ্ডের কাছে সে মুক্তিকামনা ছাড়া আরো কিছু শিখেছে। এখন ভারত স্বাধীন, ইংলণ্ড তার কাছে কিছু আদায় করতে পারেনা। তাহলে ভারত কি ভাবে ইংলণ্ডের ঋণ শোধ করবে?

জগতের সমস্যা নিয়ে দুটি বিভিন্ন রকম দৃষ্টিভঙ্গী আছে; বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতিদের মত এই যে অ্যাটম শক্তির সুচিন্তিত সদ্ব্যবহার ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে জীবনের ক্ষেত্রে কাজে লাগালেই এ সমস্যার সমাধান হবে। অপরপক্ষে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি নানাভাবে বলছেন যে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন হওয়াই সকল সমস্যার প্রকৃত সমাধান। শিল্পোন্নতি, বা আর্থিক উন্নতিতে কিছুই হবেনা, এখানে মানুষের মনোভাব নিয়েই কথা, সকল বিপত্তির মূলেই তাই। যতকাল মানুষ এমনি মন নিয়ে থাকবে, ততকাল তাকে সকল দুর্ভাগ্যই ভোগ করতে হবে। যারা উন্নতি যতই হচ্ছে বিরোধের আগুনও ততই জ্বলে উঠছে, ঐক্যের ধার দিয়েও তা যাচ্ছে না। ওর চেয়ে এখন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকেই মন দিতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই তার প্রমাণ দিয়েছে। প্রথমে সীমানা নিয়ে ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য নিয়ে শুরু হয়ে যুদ্ধ যখন ঘোরালো হয়ে উঠল, তখন মিত্রশক্তিরা বললে বাক্য-স্বাধীনতা চাই, বিশ্বাস চাই। এটল্যান্টিক চার্টারও তাই বললে।

সেই বৃহত্তর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ক্ষেত্রে যে জিনিস চাই তা মানুষের নিজের মধ্যেই অন্তর্নিহিত হয়ে আছে। মানুষ যেমন আবিষ্কার করছে জড়ের ভিতরকার সম্ভাবনাকে, তেমনি আবিষ্কার করতে হবে তার অন্তরের সম্ভাবনাকে। তোমরা বলবে যা অদৃশ্য ধরা ছোঁয়ার জিনিস নয়, তাকেই বিশ্বাস করতে হয়, কিন্তু সে তো বাস্তব নয়। বস্তুই একমাত্র বাস্তব। কিন্তু জেনো যে মানুষের আত্মাও বাস্তব, তারই মধ্যে রয়েছে অনন্ত শক্তি।

মানুষকে এর চেয়েও বড়ো হতে হবে, নিজেকে ছাড়িয়ে উঠতে হবে। তারই ছাঁচে জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে। তোমরা যারা এখানে এসেছ তাদের উচিত অন্তরের মধ্যে সেই পূর্ণতা আনা, নিজের দেশের আধ্যাত্মিকতাকে জীবনে মূর্ত করা। তাই দিয়েই আমরা ইংলণ্ডের ঋণ শোধ করতে পারি। তোমরাই আমাদের দেশের সংস্কৃতির দূত। এটা কি বেশি বলা হলো? প্রত্যেকেই জানবে যে নিজের অন্তরে এক দেবতা আছেন যাঁকে জাগাতে পারলে আসল সত্যে গিয়ে পৌঁছবে।"

ছাত্রেরা অবাক হয়ে শুনছিল, এমন কথা তারা প্রত্যাশাই করেনি। কিন্তু আমি যখন বাসে উঠতে গেলাম তখন অনেকেই আগ্রহের সঙ্গে আমাকে উঠিয়ে দিতে গেল।*

---

* অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী

অষ্টম পর্ব্ব

সাবিত্রী প্রস্তুত। নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট দিনে সত্যবানকে সে বললে—সত্যবানের সঙ্গে সে যাবে বনে। সত্যবান হাতে কুঠার নিয়ে কাঠ কেটে চলল, অকস্মাৎ নিজেই এক 'অশরীরী কুঠারধারী'র আঘাতে ভূপতিত হ'ল। সাবিত্রী প্রশান্ত হৃদয়ে সত্যবানকে শয়ন করালো এবং নিজের বুকের উপর তুলে রাখলো—কোনও কিছুই যেন তাদের বিচ্ছিন্ন করতে না পারে। অনতিবিলম্বে তার অনুভব হ'ল যে তারা নিঃসঙ্গ নয়, আর একটা চেতনা বিপুল নির্ম্মম তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মৃত্যুদেব এখন প্রকট হলেন, তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

তৃতীয় খণ্ড

নবম-পর্ব

মহানাট্যের অভিনেতারা। সাবিত্রী উঠে দাঁড়ালেন ঋজু হয়ে, সম্মুখে তাদের—

"হঠাৎ তার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন এল,
আমাদের জীবনের সঙ্কুল মুহূর্ত্তে মাঝে মাঝে যেমন এসে পড়ে
মানুষী আত্মার অন্তরে,
তাকে তুলে ধরে তার জ্যোতির্ম্ময় উৎসের অভিমুখে
সাবিত্রীও তুলে ধরল তার মহিমোজ্জ্বল শীর্ষ
তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, সম্মুখে কে একজন
দাঁড়িয়ে, তার উপরে ;
অপার্থিব ছায়াময় বিশাল
সকল সত্তা তার সীমাহীন নাস্তি যেন,
ধারণ ক'রে আছে অশরীরী এক ভীতি ও বিস্ময়।"

উচ্চকণ্ঠে বলল সে—

"মুক্ত ক'র তোমার এ আধিভৌতিক দৃষ্টিমুষ্টি,
অশ্রুবর্ষণ কর, ভুলে যাও।

তোমার প্রেমাবেগে প্রোথিত কর তার জীবন্ত সমাধির মধ্যে...
ফিরে যাও একা নিঃসঙ্গ পৃথিবীর উপর
তোমার ব্যর্থ জীবনে।"

"তারপর মৃত্যুদেব বিশ্বসম্রাট যেন আনত হলেন
সব সীমা অতিক্রম করে;
রাত্রি যেমন শান্ত পৃথিবীর উপর নেমে আসে
ধূসর সন্ধ্যার...
ছায়ারূপী ভীষণ মূর্তি উঠে দাঁড়ালো ঋজু হয়ে
স্বপ্ন যেমন জেগে ওঠে স্বপ্নের ভিতর থেকে...
তারপর উঠে দাঁড়ালো সত্যবান, আর এক সত্যবান
জ্যোতির্ময়
প্রণত পৃথিবীর বুকের উপর থেকে উঠে দাঁড়ান ঋজু দেহ...
জ্যোতির্ময় সে চলল আলো ছড়িয়ে; পিছনে তার মৃত্যু
ধীর শব্দহীন পদক্ষেপে—স্বপ্নে যেমন দেখা যায়
স্বপ্নে গড়া মাঠ পার হয়ে নিঃশব্দে চলেছে
এক ছায়ামূর্তি পশুপালক
যদুবংশ তার এক পশুর অন্বেষণে।
সাবিত্রীও চলেছে শাশ্বত মৃত্যুর পিছনে
তার দৃঢ় পদক্ষেপ সমতালে চলেছে দেবতার
পদক্ষেপের সঙ্গে।
নিঃশব্দে তার প্রিয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে
তার প্রিয় যেখানে যেখানে পা ফেলেছে সেও
তেমনি তার পা ফেলেছে।
চলেছে অরা ভীতিসঙ্কুল নীরবতার অঙ্কে।"

তিনজনেই অতিক্রম করে চললেন অজানা হতে আরো অজানা দেশ-দেশান্তরে। অদৃশ্য এক বেষ্টনীর ওপারে চলে গেলেন। অদৃশ্য এক আকাশ পথে সাবিত্রী পা রাখবার জন্য যেন ঠাঁই পেলেন না, বিলুপ্তির কবল থেকে তিনি বেঁচে গেলেন, তাঁর পুরোবর্তী এক জ্যোতির্মণ্ডলকে আঁকড়ে ধরেছিলেন বলে।

মৃত্যুদেব নিশ্চিত ছিল যে সাবিত্রী নিজে থেকেই মিশে যাবে এই শূন্যতার মধ্যে, মিশে যাবে এই শূন্য স্বপ্নের মধ্যে, শূন্যতাকে সে স্পর্শ করেছে, শূন্য স্বপ্ন দিয়েই সে তৈরী, অন্য

কিছু সে আর চাইবে না ; কিন্তু যাত্রা শুরু করবার আগেই তার দুঃসাহসের পুরস্কারস্বরূপ যম স্বীকার করলে সাবিত্রীর তিনটির একটি বর দান করতে। সাবিত্রী চাইল পৃথিবীর উপর ফিরে আসে যেন আবার যে-সব জিনিষ সত্যবানের অতিপ্রিয় ছিল। দ্যুমৎসেন তাই ফিরে পেল তার দৃষ্টি এবং তার রাজ্য। তারপর সাবিত্রী তবুও যখন যমদেবের সঙ্গ নিয়ে চলল, যমদেব তাকে ভয় দেখিয়ে বললেন, "যে-সব নিয়ম তুমি অবজ্ঞা কর তারা কিন্তু জেগে উঠতে পারে, তাদের পাষাণদৃষ্টি তোমার উপর নিক্ষেপ করতে পারে। জাননা কি যে-স্বর্গে তোমার উদ্দাম আবেগ নিয়ে তুমি যাবে মনে করেছ, অজ্ঞেয়ের অশনি জ্বলে উঠতে পারে সেখানে, ভীত, ত্রস্ত একক তোমার পিছনে ছুটে চলবে স্বর্গের ক্রুদ্ধ জনতা, তুমি আহত হয়ে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকবে, তোমার ভাগ্যে হবে শুধু যুগযুগান্তর ধরে সুদীর্ঘ উৎপীড়নভোগ।" সাবিত্রী স্বীকার করল না অন্ধকারের অসীম শক্তি :

"কে এই ভগবান, তোমার রাত্রি যাকে কল্পনা করেছে, যে ঘৃণাভরে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে জগৎ সব সৃষ্টি করেছে, প্রোজ্জ্বল নক্ষত্র সব গড়েছে মিথ্যা লীলার জন্য ? সে তো নয় আমার মনের মধ্যে যিনি তাঁর মন্দির গড়ে তুলেছেন, আমার মানুষী হিয়াকে তাঁর পুণ্য প্রাঙ্গণ করেছেন। আমার ভগবান ইচ্ছাময়, সর্ব্বজয়ী তিনি তাঁর পথে—কে তাঁর যাত্রা বন্ধ করবে, ঘিরে আটকে রাখবে ? আশ্চর্যবৎ তিনি, তিনি সারথি, অবাধ গতি তাঁর। তোমার জগৎকে, হে মৃত্যু, নতুন করে গড়বেন তিনি।"

যম তখন যুক্তি আরম্ভ করলেন :—"সাবিত্রী, জানবার, শেখবার তোমার এখনও বাকী রয়েছে। তুমি যদি অমরত্ব চাও, আমার নিঃসঙ্গতায় প্রবেশ কর। আমার মহামৃত্যু জীবন থেকে তোমাকে মুক্তি দেবে।"

সাবিত্রী অটল বিশ্বাসে উত্তর দিল :—"কালের অন্ত অবধি ভালবেসে চলব যখন, তখন আমি জানবো—জ্ঞান হল বিপুল আলিঙ্গন—অতিকায় তারকামণ্ডলী-মাঝে মানুষও জন্মগ্রহণ করলো, তার মন নিয়ে, তার হৃদয় নিয়ে তোমাকেই জয় করবার জন্য।"

দশম পর্ব্ব

কিন্তু অন্ধকারের আরো গহনে সাবিত্রীকে প্রবেশ করতে হবে, নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে সমস্ত ব্যক্তিগত প্রবেগ, এমন কি নিজেকে ঈশ্বরসম্ভূত শিখা বলে অভিহিত করাও চলবে না আর। চেতনায় যে আদি ভ্রম, কালের পরিক্রমায় আপনাকে পৃথক বলে দাবী করা—এ ভ্রান্তির সম্যক প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। যে নিশ্চেতনাকে সে স্বীকার করে নিয়েছিল তা চেতনাতীতেরই সৃষ্টি। মৃত্যু সেখানে আবির্ভূত শাশ্বত জীবনেরই যন্ত্ররূপে—

"একটি সোপান, একটি দ্বার, বিপুল অথচ অনিশ্চিত এক পদক্ষেপ"

আর রাত্রি সে ত কৃষ্ণা সেই জননী যাঁর কোলে ক্ষণতরে মানুষ পায় আশ্রয়।

এই তমসার গভীর থেকে ছুটে আসে এক আলো রেখা, তার সূক্ষ্ম সূচ্যগ্র মুখ অন্ধকার ফুঁড়ে ধীরে ধীরে চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করেছে নিশ্চেতনার বুকে, রাত্রির মধ্যে জ্যোতিকে। উদিত হয়েছে দেবতাদের প্রত্যূষ নবজন্মের স্নিগ্ধতা নিয়ে। প্রভাতী এক স্বচ্ছ বাষ্পের জালে প্রবেশ করল সাবিত্রী—সেখানে ক্ষণস্থায়ী কত না আকারের অহং-আকৃতি, সেখানে নূতনভাবে নূতনরূপে দেখা দিল সত্যবান।

আবার ধ্বনিত হল অতল সেই স্থিরকণ্ঠে :

"এই ত' বহু ঈপ্সিত সেই জগৎ। আশায় ডাকে আশাই এখানে সাড়া দেয়, মেঘের ডাকে মেঘ। প্রেম এখানে অসংখ্য জীবকোষের আর্তি মাত্র, প্রেম এখানে নিভে যায় অচিরেই, চেতনা এখানে—জড় চেতনা—যন্ত্র নৃত্যরত, আত্মহারা নির্বাণজাত ছায়ামাত্র। স্থান কোথায় এখানে আত্মার? স্থান কোথায় ভগবানের?" বাহ্য পরাজয়ের মাঝেও দৃষ্টি-গোচর যে জ্যোতিস্ফুলিঙ্গ, তাকেই আবাহন করলে সাবিত্রী—"I cherish God, the Fire, not God, the Dream" "অগ্নিময় ভগবানের পূজারী আমি, স্বপ্নময় ভগবানের নয়"। এ ভগবানের কণ্ঠে আশা, এ ভগবানের স্থিতি শাশ্বত আনন্দে। তবে কালধারায় তাঁর গতি অনিশ্চিত তাই তাঁর জগৎ হয়েছে মৃত্যুর দাস। মানুষ এখনও রয়ে গিয়েছে শিশু কিন্তু পরাশক্তির ক্রিয়া কি সুস্পষ্ট নয়? বস্তুর গঠনে সূর্য্য নক্ষত্রের মধ্যে তরুলতায় ফুলে-ফলে চিন্তায় ভাবনায় ঘটন কি ঘটে ওঠেনি? কোটি কোটি ধারার সঙ্ঘর্ষ চলেছে। পদস্খলন অর্থ ক্রম-অগ্রসর, অপূর্ণ পঙ্গু রূপের মধ্যেও জীবন-প্রতিভা বয়ে চলেছে। জ্যোতি রয়েছে সেখানে, প্রকৃতির দুয়ারে আঘাত দিয়ে চলেছে, স্থূল জীবকোষের মধ্যেও সে জেগে উঠবে, অন্তরে অন্তরে হৃদয়ের মধ্যে চিন্তার মধ্যে বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়ে উঠছে।

প্রেম—প্রথমে দেহের ক্ষুধা, তারপর চঞ্চল হৃদয়ে উষ্ণ মত্ততা, আরো পরে প্রসন্ন মনবুদ্ধির সখা সহচর : এখন তা আত্মগুপ্ত অন্তরাত্মার ব্যোমপ্রসার, এককের জন্যে একজনের একমুখী প্রবেগ। একদিন অগ্নিশিখা মাথা তুলে চলবে তার চরম প্রখরতা নিয়ে, খুলে ধরবে পথ। সাবিত্রী বলে চলল—

"আমি তোমার কাছে দাবী করেছি জীবন্ত সত্যবানকে,—তার কাজের জন্য, আমার কাজের জন্য নয়, আমাদের উভয়ের ব্রতসাধনের জন্য...নারী আমি, ভগবানের শক্তি, আর সে হল মানুষের মধ্যে শাশ্বত পুরুষের একমাত্র প্রতিনিধি...আমাদের প্রেম পুরুষোত্তমের দিব্য সম্মতি...প্রেম হ'ল পরাৎপরের কাছে মানুষের প্রতিশ্রুতি।"

মনরাজ্যের আত্মপ্রত্যয় টলে উঠল এই প্রথম আর এইভাবে আপন প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা করে সাবিত্রী নিজের মধ্যে নিজে আবার আরব্ধ হলেন। সাবিত্রীকে খুঁজে লাভ করতে হবে তাঁর অন্তরাত্মার শক্তি পূর্ণভাবে সমগ্রভাবে। নিজেকে পিছনে সরিয়ে রাখল সে, তবুও অগ্রগতির পথ সেই দেখিয়ে চলল।

ধূসর এক নিম্নগামী পথ বেয়ে চলেছে তারা যন্ত্রবৎ—চিন্তাধারা নেবে যায়, নীচে

থেকে নীচের স্তরে, ফিরে যায় পৃথিবীর কাছাকাছি। চোখের সামনে ভেসে ওঠে আবছায়া প্রান্তর-পর্ব্বত নগরী ; কত না চিন্তার বিশৃঙ্খল ঘূর্ণি, লাঞ্ছিত আশার বিচ্ছিন্ন স্বপ্ন, কাব্যের দর্শনের কত না ভগ্নাবশেষ ! চক্রাকারে আসে আর চলে যায়।

যমরাজ স্মরণ করিয়ে দেন "দেখ মানবের যা কিছু সবই অলীক অকিঞ্চিৎকর। কোথায় চলেছে সৃষ্টির এই বহাবৃত্তরেখা, দেখছ না ভগবান যদি আদৌ থাকেন তবে এই পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁর কোনই দুশ্চিন্তা নেই। সে-ভগবানকে স্মরণ নিতে পার কিন্তু তা হলে পিছনে ফেলে রেখে এস সব কিছু, নিজেকে বিলীন করে দাও তাঁরই চিরস্থির শান্তির পারাবারে।"

উত্তরে সাবিত্রী বলল, "হে রাজন্, তোমার বর সব দাও গিয়ে তাদের, যাদের মন-প্রাণ ভারাক্রান্ত, যারা কালের আঘাত সহ্য করতে পারেনি—কিন্তু আমি কি করকে চিরন্তন শান্তির মধ্যে চাইব বিশ্রাম ? আমার বুকের মাঝে আশ্রয় যে পেয়েছে ভাগবতী মাতৃশক্তির অদম্য প্রবেগ, তাঁরই দৃষ্টি যন্ত্রচালিত জগতের উপর গিয়ে পড়েছে তার রহস্যোদ্‌ঘাটনের জন্যে ; তাঁর ইচ্ছাশক্তি শাণিত হয়েছে পরাজ্ঞানের সূর্য্যতাপে আর প্রেমাপ্লুত প্রজ্বলিত হৃদয়ের নৈঃশব্দ্যের মধ্যে।"

সহসা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন যমদেব প্রাণবন্ত এই শক্তি প্রত্যক্ষ করে। সাবিত্রীকে তিনি অনুরোধ করলেন মানুষী অনুরাগ দিয়ে দেবতাদের প্রশান্ত সর্ব্বজ্ঞানকে সে যেন কলুষিত না করে, বিধির বিধান লঙ্ঘনের প্রয়াসে সে উদ্যত না হয়। সাবিত্রী বলে চলল "নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয় এই যদি হয় সব কথা ও শেষ কথা তবে ত অন্তরাত্মার কোন আশা থাকে না...কিন্তু তোমার বিধানকে আমার এই জীবন্ত পায়ে দলিত করে চলে যাই আমি... আমি যদি হই শক্তিময়ী তবে আবরণ ছিন্ন করে এসে দাঁড়াবে আমার সে শক্তি, সকল সনাতন শক্তিদের সমকক্ষ সহচর সে ; তা যদি না হয় তবে যেন আমার অন্তরাত্মা ব্যর্থ হয়ে ডুবে যায়...আদি সুষুপ্তির মধ্যে"।

ক্রমে ক্রমে সাবিত্রীর মৃত্যুবশীভূত বাহ্যসত্তা মিলিয়ে গেল, এক দিব্য সত্তায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখমণ্ডল, যম কথঞ্চিৎ বিমূঢ় হয়ে পড়লেন, তাঁর বুদ্ধিতে পার পায় না—জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন সত্য ঘোষণা করতে চাও তুমি, কি সে দর্পিত ভয়ঙ্কর শক্তি ভেঙ্গে দিতে চায় যে আবহমানের ধর্ম্ম ?"

সাবিত্রী ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলে, বিবর্ত্তনের পর্ব্বে পর্ব্বে আলোকের যে আরোহণ, তারই বাস্তবরূপ এই সত্য। এই আরোহণীর শেষ শিখর ছাড়িয়েও, দিব্য সৃষ্টির লক্ষ্যকে পর্য্যন্ত অতিক্রম করে, অন্তিম নৈঃশব্দ্যেরও ওপারে রয়েছে শাশ্বত বাল-ভগবান দিব্য জননীর অঙ্কে, অপেক্ষায় রয়েছে সেই মুহূর্ত্তের জন্যে যখন সে উদাত্ত কণ্ঠে বলবে নিয়তিকে—

"স্বাগত, আমাদের সমগ্র আশার মূর্ত্ত স্বরূপ পরম এই সত্য যার কাছে তুচ্ছ জীর্ণ অকিঞ্চিৎকর আর সব সত্য"—

কিন্তু এই যে সত্য যম তাকে দেখতে পারবে না আপনাকে বিলুপ্ত না করে :

"কে তোমাকে দেখাবে সেই মহিমোজ্জ্বল মূর্তি ?
জ্ঞান যদি তুমি লাভ কর, তুমি নিজে তবে আর থাকবে না।"

শেষ বারের মত মৃত্যুদেব মুখ খুললেন তাঁর—

"এই যে জ্ঞান বলছ তুমি তাকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হলে প্রয়োজন শক্তি সামর্থ্য। সামর্থ্য বিনা তরাট করা যাবে না এ ব্যবধান, কারণ আলো দিয়ে নয়, সামর্থ্য দিয়েই দেবতারা শাসন করে চলেছেন বিশ্ব-চরাচর। শক্তিরই সাহায্যে নিয়তি সব কিছুর উপর তাঁর স্বাক্ষর উৎকীর্ণ করেছেন। উদ্‌ঘাটন কর ত' তোমার শক্তি-স্বরূপ ! সর্ব্বশক্তিময়ী জননী যদি তোমার সহায় হ'ন দেখাও আমায় তাঁর মূর্ত্তি, তাঁর অনল দৃষ্টি এসে বিদ্ধ করুক মৃত্যুকে।"

নীরবে সাবিত্রী তাঁর দৃষ্টি দিলেন যমের দিকে—আলোকের অভ্যুদয়ে তমোময় দেবতা উদ্যত হলেন তাঁর সম্মতি দিতে। সাবিত্রী আপনাকে রূপান্তরিতা করলে, তার মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধে আসীন শক্তি নেমে এল, একের পর এক চিন্ময় চক্রগুলিতে অধিষ্ঠান করল, শরীরের নিভৃতে গুহাগত বিশ্বশক্তিকে জাগিয়ে দিল। জ্যোতির্ম্ময় আধার আশ্রয় করে ধ্বনিত হ'ল পরববাণী—"স্বাগত তুমি, হে সর্ব্বজয়ী সর্ব্বশক্তিময় মৃত্যু...পূন্য তুমি, ভবিষ্যতে যা কিছু হবে তার জন্যে তুমি স্থান করে দাও...ক্ষুধা তুমি, বিশ্বকে ক্ষয় করে চলেছ, গ্রাস করে চলেছ প্রাচীন সব সূর্য্যের হিমশীতল চূর্ণাবশেষ ...নিশ্চেতনা তুমি, চিন্তার বীজ বপন করে চলেছ...তুমিই আমার ছায়া, আমার যন্ত্র ; আরো কিছুকাল বেঁচে থাক তুমি, হে মৃত্যু, হয়ে ওঠ আমার বাহন...একদিন মানুষও জানতে পারবে তোমার অতল হৃদয়ের নীরবতাকে, রাত্রির ধ্যাননিমগ্ন শান্তিকে, শাশ্বত বিধানের প্রতি তোমার সসম্ভ্রম আনুগত্যকে...কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে সরে দাঁড়াও, পথ করে দাও প্রবুদ্ধ শক্তির জন্যে...মুক্ত করে দাও জগতের যন্ত্রপুরুষকে যার নাম সত্যবান...সে নিজে হবে নিজের জীবনে আপন নিয়তির প্রভু...শাশ্বত সতীর সে হবে শাশ্বত পতি।"

তখন আবার বাধা দিতে চেষ্টা করলেন যমদেব, বিপুলকায় তিমিরাচ্ছন্ন দুর্গের মত। কিন্তু তার উপর প্রবল উচ্ছ্বাসে উৎপতিত হল জীবনের স্রোত। তার শিরায় ধমনীতে ছুটে চলল আলোর প্রবাহ, স্পর্শ করল তার সত্তার মূলদেশ পর্য্যন্ত। যে নিশ্চেতনা ছিল তার একমাত্র সম্বল, বিলীন হয়ে গেল তা, যেন নিজেরই গ্রাসে—দুর্দ্ধর্ষ অন্ধকার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ঐ বিলিয়ে যায় তার উৎসস্বরূপ নিরাকারে—যে আলো-আঁধারে চলেছিল তারা এতক্ষণ হঠাৎ তা হেসে উঠল শুভ্র আলোকে ; স্পষ্ট হয়ে উঠল আবার সব কিছুই। সাবিত্রী দেখল একা সে সত্যবানের পাশে—তবে তাদের মাঝে মাথা তুলে দাঁড়াল এক প্রাচীর স্বচ্ছ মুক্ত। নীরবে তারা প্রতীক্ষা করে রইল সেই মুহূর্ত্তের জন্য যখন হবে দুর্লঙ্ঘ্য সঙ্কল্পের অনিবার্য্য আত্মপ্রকাশ।

কঠিন ডানায় ওড়া

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বীরবাহু

পরদিন সকালে আটাশ নম্বর স্কোয়াড্রনের এঞ্জিনীয়াররা বিমান উড়িবার পূর্ব্বের পরীক্ষা সমাধা করিয়া বিমান উড়িবার ছাড়পত্র সহি করিয়া দিল। পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী ওয়ারান্ট অফিসার ব্রাউন বিমান বন্দরে নিজে উপস্থিত থাকিয়া বিমান হস্তান্তরের কাগজ-পত্র সব প্রস্তুত করিলেন। এই কথা সাব্যস্ত হইল যে বিমান আকাশে উড়িবার পর আমরা বিমান বন্দরের চারিপার্শ্বে এক চক্কর ঘুরিব, এবং বিমানে কোন গলদ না থাকিলে কন্ট্রোল টাওয়ারের উপরে আসিয়া বিমানবন্দরকে বৈমানিক পদ্ধতিতে নমস্কার জানাইয়া, সোজা ভুবনেশ্বর অভিমুখে রওনা হইব। এই অল্প সময়ের টেষ্ট-ফ্লাইটে যদি কোন গলদ ধরা পড়ে, তখন ঐ গলদ মেরামতের জন্য বিমান অবতরণ করাইতেই হইবে। তাহা হইলে বিমান মেরামতের পর পূর্ব্বাহ্নে রওনা না হইয়া পরাহ্নেই রওনা হওয়া যাইবে, এবং রাত্রিযাপন ভুবনেশ্বরে।

সম্মুখের ককপিটে পাইলট্ অফিসার গিল্‌বার্ট ও পশ্চাতের ককপিটে আমি, দুইজনে কেদারার উপর বসিয়া সমস্ত জিনিষ ও যন্ত্রপাতি তালিকা অনুযায়ী মিলাইয়া লইতেছি ও নূতন বিমানের কলকব্জা ও সেইগুলি ইচ্ছামত চালাইয়া ব্যবহার করিবার পন্থা ভাল করিয়া দেখিয়া মনে মনে কল্পনা করিতেছি, যাহাতে সহজে আয়ত্তের মধ্যে আসে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই এঞ্জিন চালু করা হইবে। এই সময় একজন গোরা বৈমানিক সামনে আসিয়া, 'কর্পোরাল' সম্বোধন করিয়া দাঁড়াইল। তাহার কোন কাজে লাগিতে পারি জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল যে, যদিও সে তিন বৎসর হইল রয়াল এয়ার ফোর্সে যোগ দিয়াছে তবু আজ পর্য্যন্ত তাহার ভাগ্যে বিমানে আকাশ-বিহার একবারও ঘটে নাই। তাহার আবেদন যে আমরা যেন অনুগ্রহ করিয়া এই বিমানে তাহাকে আকাশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অবকাশ দেই। এই আকাশ-বিহারের কথা সে চিরকাল মনে রাখিবে। সে আরও বলিল, এই বিমান মেরামত কাজের কিছু অংশ সে স্বহস্তে করিয়াছে। কাজেই টেষ্ট ফ্লাইটের সময় বিমানে থাকা তাহার পক্ষে অনুচিত হইবে না।

ওয়ারান্ট অফিসার ব্রাউন নিকটেই ছিলেন। এই বৈমানিকটিকে তাঁহার নিকট গিয়া টেষ্ট ফ্লাইটে যাইবার অনুমতি লইতে বলিলাম। আরও বলিলাম, "এই বিমান এখন উড়িবার সময় যদি কোন দুর্ঘটনায় পড়ে ও সেইজন্য তাহার যদি কোন অঙ্গহানি বা প্রাণহানি হয়,

তাহা হইলে সেই দুর্গতির জন্য অন্য কাহাকেও দায়ী করা যাইবে না, সে নিজেই দায়ী থাকিবে এবং অন্য কেহ সেই ক্ষতির জন্য দাবি করিতে পারিবে না।" এই কথা কাগজে লিখিয়া সহি করিয়া ওয়ারান্ট অফিসার ব্রাউনের নিকট গচ্ছিত রাখিতে বলিলাম। কাগজ-পত্র দপ্তর হইতে সে সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিল, আর ওয়ারান্ট অফিসার ব্রাউন অদূরে থাকায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কাগজপত্র (Risk bond) প্রস্তুত হইয়া গেল, এবং ওয়ারান্ট অফিসার ব্রাউনের অনুমতিও তাহার কপালে মিলিয়া গেল।

প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, ফক্স্ অল্ নামক গোরা বৈমানিকটিকে পশ্চাতের ককপিটে একলা ছাড়িয়া দিব। কিন্তু পাইলট অফিসার গিলবার্ট এর সহিত কথায় তাহা সমীচিন হইবে না বলিয়া স্থির হইল। কারণ মেরামতের পর বিমান এই প্রথম চেষ্ট ফ্লাইটে লওয়া হইতেছে, এবং আমাদের দুইজনের কাহারো একক এই বিমান উড়াইবার কৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্তে নাই। আমার বেলায় ত' শুধু একবার আরোহী হিসাবে দমদমার এক নম্বর ভারতীয় স্কোয়াড্রনের এই বিমানে আকাশভ্রমণ সম্ভব হইয়াছিল। যদিও পাইলট্ অফিসার গিলবার্টের কয়েক ঘন্টা এই বিমানে উড়িবার অভিজ্ঞতা হইয়াছে—কিন্তু তাহা খুব যথেষ্ট নয়। এই বিবেচনায় পশ্চাতের ককপিটে ফক্স্ অল্কে লইয়া আমাকে উঠিতে হইল।

প্রত্যেক বিমানেই, আকাশে উঠিবার সময় ও আকাশ হইতে অবতরণের সময়, এবং কম-বেশী চাপ হাওয়ায় প্রবেশের সময় বৈমানিক বা আরোহী নিজেকে বিমানের খোলের সাথে পেটি দিয়া বাঁধিয়া রাখে, না হইলে অঘটন ঘটিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ জঙ্গী বিমানে, নিজেকে বিমানের খোলের সাথে বাঁধিয়া রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। বিমানের সঙ্গে এই বন্ধন না থাকিলে বা তাহা শিথিল হইলে উল্টান-পাল্টানর খেলার (acrobatics) সময় বিমান-চ্যুত হওয়া স্বাভাবিক; তখন উড়ন্ত অবস্থা হইতে বক-কচ্ছপের গল্পের মত 'পপাত ধরণীতলে'ও হইতে হয়।

লাইসাণ্ডার বিমানে, সম্মুখের ককপিটে পেটি দিয়া বৈমানিককে কেদারার সহিত বাঁধিবার বন্দোবস্ত ছিল। পশ্চাতের ককপিটের ব্যবস্থা অন্যরূপ। প্রথমে ঘোড়ার জীনের মত হারনেস দিয়া বৈমানিকের শরীর বাঁধিয়া লইয়া, সেই হারনেসকে সরু শক্ত লোহার তারের রশি দিয়া বিমানের খোলের সাথে বাঁধা হইত। এই অতিরিক্ত ব্যবস্থা পশ্চাতের ককপিটে করা ছিল, কেননা আক্রমণকারী শত্রুবিমান যেদিক হইতেই আসুক না কেন, তাহার দিকে স্বচ্ছন্দে নিশানা করিতে হইলে সহজে এদিক হইতে ও ওদিক বা উপর হইতে নীচে সরিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন; সেইজন্যই বিমানের খোলের সাথে যথেষ্ট ঢিলাভাবে বৈমানিককে বাঁধিয়া রাখার এমন বন্দোবস্ত।

ফক্স্ অল্কে পশ্চাতের ককপিটের কেদারায় বসাইয়া হারনেস বাঁধিয়া দিলাম ও হারনেসটি তারের রশির সাথে লাগাইয়া দিলাম। বিমান বহরের ভাষায় এই তারের রশির নাম মঙ্কি-চেন—বাঁদরের শিকল। বিমানের খোলের মধ্যে দাঁড়াইয়া দুইপাশে দুই হাত দিয়া

ককপিটের কিনারা শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখা আমার ব্যবস্থা হইল। শুধু একটি অতিরিক্ত প্যারাস্যুট লইয়া পায়ের নিকট বিমানের এক পকেটে রাখিলাম—যদি কখনও প্রয়োজন হয়। অন্য দুইজনের প্যারাস্যুট তাহাদের হারনেসের সাথে সাধারণ ব্যবস্থা অনুযায়ী রহিল।

বিমানের ককপিটে প্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, এঞ্জিন চালু করিয়া পরীক্ষা করা, বেতার বার্তায় কন্ট্রোল টাওয়ার হইতে উড়িয়া যাইবার জন্য অনুমতি লওয়া, এবং আকাশে উঠিবার পর পুনরায় বেতারবার্তায় টাওয়ারকে বিমানের অবস্থা ও গতির দিক ও উচ্চতা জ্ঞাপন করা প্রভৃতি একটা বিশেষ ধরণের প্যারেড্। প্রত্যেকটি কাজ করিবার পূর্বে, আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ করিয়া লইতে হয়, এবং কার্য্যের ধারা সুশৃঙ্খল না হইলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য প্রতিপদে কন্ট্রোল টাওয়ারের সাথে বেতারে সংযোগ রাখিতে হয়, সংবাদ আদান-প্রদান ও অনুমতি লইবার জন্য। এই ব্যবস্থায় বিমানের মধ্যে একটি বা দুইটি প্রাণী যাহারা আছে, তাহাদের বিমানচালনায় কোন ভুল বা ত্রুটি যদি হয়, তাহা হইলে সেই ভুল ত্রুটি সময়মত শুধরান সম্ভব। এঞ্জিন পরীক্ষা করার পর কন্ট্রোল টাওয়ারকে বিমান আকাশে উড়াইবার জন্য অনুমতি লওয়ার সময়, বিমানে তিনজন আরোহীর কথা এবং ফকস অল্ যে দায়িক-দলিল সহি করিয়াছে তাহা জানান হইল। তখন কন্ট্রোল টাওয়ার আকাশে উড়িয়া যাইবার অনুমতি দিল।

বিমান যেমন অক্লেশে ভূমি ত্যাগ করিয়া আকাশে উঠিল, তাহাতে আমরা বেশ আনন্দ বোধ করিলাম; অর্থাৎ এঞ্জিন ও বিমানের অবস্থা বেশ ভালই। বন্দরের চারিপাশে এক চক্কর ঘুরিয়া আসিবার পর কন্ট্রোল টাওয়ারকে জানান হইল যে বিমান খাসা উড়িতেছে এবং আমরা আরও কিছুক্ষণ আকাশ ভ্রমণ করিয়া বিমান ভাল করিয়া পরীক্ষা করিব। এইবার বিমানকে একদিকে লইয়া ধীরে ধীরে আরও উচ্চে উড়িবার ব্যবস্থা করা হইল। মিনিট দশেক উড়িবার পর, বিমান তখন প্রায় দুই তিন হাজার ফিট উচ্চে, বিমানের এঞ্জিনের গতিবেগ হঠাৎ কমিয়া গেল। কমিতে কমিতে বিমান মাটির উপর থাকার সময় যত ধীরে চলে, সেই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছাইল। আমাদের দুইজনের নানা চেষ্টা সত্ত্বেও এঞ্জিনের গতিবেগ বাড়ান গেল না। তখন কন্ট্রোল টাওয়ারকে আমাদের দুরবস্থার কথা জানাইয়া, শীঘ্র অবতরণ করার জন্য অনুমতি চাওয়া হইল এবং উড়ন-পথ হইতে অন্য বিমান অপসারণ করিয়া আমাদের অবতরণের সুবিধা দিতে অনুরোধ করা হইল।

এঞ্জিনের গতি ধীরে হওয়ার সাথে সাথেই আমাদের উচ্চতা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। এই কয়েক মিনিটে আমরা অনেকটা দূরে পৌঁছিয়াছিলাম; কিন্তু উচ্চতায়, পূর্বেই বলিয়াছি দুই তিন হাজার ফিট মাত্র উপরে উঠিয়াছিলাম। সেই জন্য আর সময় নষ্ট না করিয়া সোজা উড়ন-পথের দিকে বিমান ঘুরাইয়া চালনা করা হইল, যাহাতে কোনরূপে বিমানবন্দর পর্যন্ত পৌঁছান যায়।

উড়ন-পথের একদিকে একটা টিলা পাহাড়, অন্যদিকে এক পাহাড়িয়া নদী।

পাহাড়িয়া নদীতে সাধারণতঃ বৃষ্টির সময় জল থাকে, অন্য সময় শুধু বালুর চর। এই সময় নদীতে জল ছিলনা। আমরা নদীর দিক হইতে উড়ন-পথের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিলাম, যাহাতে আর না ঘুরিয়া, সোজা অবতরণ করা যায়। নদীর অপর পারে যখন পৌঁছাইলাম, তখন আমাদের উচ্চতা বিশ পঁচিশ ফুটের উপরে ছিল না। নদীর মধ্যে শুষ্ক উত্তপ্ত বালুকারাশির উপরে পৌঁছান মাত্র বিমান এয়ার-পকেটে পড়িল, এবং ধপাস করিয়া নদীর মধ্যে পড়িতে পড়িতে উড়ন-পথের নিকট খাড়া পাড়ের সাথে ধাক্কা লাগিয়া ভূতলশায়ী হইল।

ধাক্কা লাগিবার সাথে সাথেই মনে হইল যে আমার দেহ শূন্যের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে, এবং কিছুটা দূরে শুষ্ক নদীর বালুর উপর চিৎপাত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ, বোধ হয় কয়েক মিনিট, সব কিছু ভুলিয়া গেলাম। কোথায় আছি, কি হইতেছে, সব কথাই মন হইতে অবলুপ্ত হইল। কিন্তু মনের নিভৃত অন্তরালে বোধ ছিল যে বিমান ধপাস করিয়া পড়িলে সাধারণতঃ বিমানের তৈল পেট্রলে আগুন জলিয়া ওঠে, ও সেই নরককুণ্ড অগ্নিকাণ্ডের মধ্য হইতে বাহির হওয়া সহজ নয়। কতক্ষণ বুদ্ধি-বিভ্রমের এই অবস্থায় ছিলাম জানি না, কিন্তু ঐ মূর্ছাগ্রস্ত অবস্থায় অগ্নিকাণ্ডের কথা পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হইতে না হইতেই উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং বিমানের দিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলাম যে আগুন জলিয়াছে কিনা। তখনও অন্য দুইজন বৈমানিকের কথা পরিষ্কার ভাবে মনে পড়ে নাই। কি করিব ইতস্ততঃ করিতেছি, হঠাৎ পরিষ্কারভাবে পাইলট অফিসার গিল্‌বার্ট ও গোরা বৈমানিক ফক্‌স জনের কথা মনে পড়িল; অমনি টলিতে টলিতে বিমানের দিকে দৌড়াইয়া গেলাম। বিমানের নিকট পৌঁছিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে টলন আরও বাড়িয়া গেল। সেই সময় একজন শিখ ক্যাপ্টেন ও তাঁহার সাথে কয়েকজন গোরা পদাতিক প্রায় আট দশ জন হইবে—বিমানের পাশে গিয়া পৌঁছাইল। এরা বিমানবন্দর পাহারার কাজে নিযুক্ত ইয়র্কস্ এবং লাঙ্কস্ লাইট ইন্‌ফান্ট্রির রেজিমেন্টের একটা প্লেটুন।

শিখ ক্যাপ্টেন উড়ন-পথের এই অংশেই তাঁহার প্লেটুন লইয়া আমাদের বিমান অবতরণের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। বিমানকে যখন নদীর উপর আসা মাত্র হঠাৎ পড়িয়া যাইতে দেখেন, তখনই তিনি দলবল লইয়া নদীর দিকে দৌড়াইয়া যান। খুব সম্ভব বিমানের পতন ও সেই সাথে একজন বৈমানিক বিনা বিমানে আকাশ-ভ্রমণে রত ছিল, তাহাও দেখেন। তিনি আসিয়া প্রথমে আমাকে ধরিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছি। উদ্দেশ্য বোধ হয় শরীরে কোন আঘাত লাগিয়াছে কিনা জানিয়া লওয়া ও সেই সাথে পড়িয়া যাওয়ার অব্যবহিত পরেই উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছি, কাজেই বুদ্ধিবিভ্রম বা মস্তিষ্ক-বিকৃতি হইয়াছে কিনা তাহাও জানিয়া লওয়া। আমাকে সুস্থ দেখিয়া ছাড়িয়া দিলেন এবং বিমানের দিকে অগ্রসর হইলেন।

নদীর প্রায় খাড়া পাড়ের সাথে ধাক্কা লাগার সাথে সাথেই বিমান তিন টুকরা হইয়া

ভাঙিয়া গিয়াছিল। সম্মুখের ককপিটের মধ্যখানে ভাঙিয়া এঞ্জিন আলাদা হইয়া গিয়া সামান্য কয়েক গজ দূরে গড়াইয়া গিয়াছে, আর পশ্চাতের ককপিটের মধ্যখানে ভাঙিয়া গিয়া বিমানের পশ্চাতের অংশ নদীর পাড় হইতে জলহীন নদীগর্ভে প্রায় দশ পনর ফুট নিচে পড়িয়া কয়েক গজ আগাইয়া গিয়াছে। বৈমানিকদের দুইজনের মধ্যে পাইলট অফিসার গিল্‌বার্ট তখনো বাঁচিয়া আছেন। বাঁ হাঁটুর নীচে ভাঙিয়া গিয়াছে, ডান হাত ভাঙিয়া গিয়াছে আর বুলেট প্রুফ কাঁচে কপাল ঠুকিয়া ফাটিয়া গিয়াছে, খুব রক্ত ক্ষরণ হইতেছে; জ্ঞান নাই, কিন্তু অসীম যন্ত্রণায় তিনি কাতরাইতেছেন। আর ফক্‌স্‌য়ল—তাহার পাঁজরার হাড় সব কয়খানাই চূর্ণ হইয়া বুক পিঠ প্রায় এক হইয়া গিয়াছে। তাহার এই প্রথম বিমান-ভ্রমণ শেষ বিমান-ভ্রমণে পরিণত। মৃত্যু যাতনা ভোগ করার সময়টুকুও সে পায় নাই। তৎপূর্বেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। ককপিট ড্রিল তাহার জানা থাকিবার কথা নয়। বিমান হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ার মুহূর্তে নক্সি-চেন হারনেস হইতে খুলিয়া ফেলার নির্দেশ ককপিট্ ড্রিলে দেওয়া আছে। খুলিয়া ফেলিতে পারিলে বুকের হাড় কয়খানা হয়ত বাঁচিত ও সেই সাথে জানটাও হয়ত হারাইতে হইত না। কিছুদিন পর্যন্ত চক্ষু বন্ধ করিলেই ফক্‌স্‌য়লের সেই চেহারা মনশ্চক্ষে ভাসিত।

শিখ ক্যাপ্টেন এইবার আমাদের হাঁসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবস্ত শীঘ্র করিলেন। হাঁসপাতালের পরীক্ষাতে জানা গেল নদীতে পতিত হওয়ার সময় আমার শির দাঁড়ার একেবারে নীচের ত্রিকোণাকৃতি হাড়ে সামান্য আঘাত লাগিয়াছে। সে চিহ্ন এখনও হাড়ে রহিয়া গিয়াছে।

পাইলট অফিসার গিলবার্টকে অনেকদিন পর্য্যন্ত রাঁচির হাঁসপাতালে থাকিতে হইয়াছিল। আরোগ্যের পর, তাঁহার শরীর বিমানচালনার জন্য অযোগ্য বিবেচনায়, বিমানবাহিনীতে তাঁহাকে সাধারণ কাজে বহাল করা হয়।

বিমানখানি তিনখণ্ডে এমনভাবে ভাঙিয়াছিল যে আর কখনও মেরামত করা অসম্ভব। কিন্তু ভাঙা বিমানের অংশগুলি নদীর পাড় হইতে সরাইয়া লওয়ার পূর্বে কেন এঞ্জিন বিকল হইল, সেই বিষয় অনুসন্ধান করা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া বারে বারে মনে হইতেছিল। কারণ গোরাদের ব্যাপারে, আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে আমাদের অনুপস্থিতিতে যদি কোন অনুসন্ধান করা হয় তবে সে অনুসন্ধানে এই প্রতিপন্ন হইবে যে ভারতীয়দের ভুলের জন্যই বিমান ভূপাতিত হইয়াছে, অন্য কোন কারণে হয় নাই।

আটাশ নম্বর স্কোয়াড্রনের দপ্তরে আসিয়া বেতার-বার্তায় বিমান চৌই-ফ্লাইটে এঞ্জিন বিকল হইয়া ভূপতিত হওয়ার কথা ও পাইলট অফিসার গিল্‌বার্টের মারাত্মক আঘাত লাগার কথা বিশাখাপটনমে স্কোয়াড্রন লীডার স্মলকে জানাইলাম। সেই সঙ্গে বিমান ভূপতিত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান না করিয়াই ফিরিয়া যাইব কিনা, সেই নির্দ্দেশের জন্য অপেক্ষায় আছি জানাইলাম। বৈকালেই স্কোয়াড্রন লীডার স্মলের নির্দ্দেশ পাওয়া গেল। বিমান

উপস্থিত হওয়ার কারণ অনুসন্ধানের পর, দ্বিতীয় বিমানের জন্য অপেক্ষা না করিয়া যেন ট্রেনে বিশাখাপটনমে ফিরিয়া আসি।

পরদিন অনুসন্ধানের কাজ সুরু হইল। ওয়ারান্ট অফিসার ব্রাউন ও দুইজন গোরা ফ্লাইট লেফটেনান্ট অনুসন্ধান কমিটিতে নিযুক্ত হইলেন। সাথে আমিও ছিলাম, শুধু পর্যবেক্ষক হিসাবে। দেখা গেল এঞ্জিনের গতিবেগ বৃদ্ধি করার যন্ত্র ভাল করিয়া ঠিকভাবে লাগান হয় নাই। এঞ্জিন চলার ফলে যে কম্পন সৃষ্টি হয়, তাহাতে ভাল-করিয়া-না-লাগান যন্ত্রটি খুলিয়া আলাদা হইয়া গিয়াছে। কাজেই এঞ্জিনের গতিবেগ কমিয়া এত মন্থর হইয়া গিয়াছে যে তাহাতে বিমানের উড়ন্ত অবস্থায় থাকা অসম্ভব।

অনুসন্ধানের ফল জ্ঞাত হওয়ামাত্র আমার রাঁচীর কাজ ফুরাইল। রিপোর্টের এক-খানা কপি সংগ্রহ হইলে, আটাশ নম্বর গোরা স্কোয়াড্রনের নিকট হইতে আর কোন বিমান সংগ্রহের আশা ত্যাগ করিয়া, সেইদিন রাত্রের ট্রেনে বিশাখাপটনম অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

অনেকদিন পর্যন্ত একটা অন্যায় করিয়াছি বলিয়া মনে মনে ভাব ছিল। যদি কক্‌পিট্‌ খুলকে বিমান ভ্রমণের অনুমতি না দিতাম তাহা হইলে তাহার জীবনহানি হইত না। কিন্তু কে জানিত যে গোরা এঞ্জিনীয়ার বৈমানিকদের এমন সাংঘাতিক ভুল হইবে? সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ভুল হইল একটা ছোট দুই-ঠেঙ্গা সরু লোহার সলা একটা সরু ছিদ্রের মধ্যে ঢুকাইয়া আটকাইয়া না-দেওয়া। এই সরু দুই-ঠেঙ্গা সলা ছিদ্রে ঢুকান হয় নাই বলিয়া যে দুইটি অংশকে এই সলা একত্র সন্নিবদ্ধ রাখে, সেই দুইটি অংশ এঞ্জিন চলার কম্পনে আলগা ও ক্রমে আলাদা হইয়া গিয়াছিল। এইবার মনে পড়িল শিক্ষানবিশী সময়ে সার্জেণ্ট বোলের পুনঃপুনঃ উচ্চারিত সতর্কবাণী: "পরীক্ষা করিয়া দেখ, আবার দেখ, এবং পুনরায় অন্য কাহাকে দিয়া পরীক্ষা করাইয়া লও। যত সাবধান হও না কেন, আরও একটু সাবধান হইতে পারিতে।" (Check recheck and double check. No amount of care is enough. You could be little more careful.)

বিশাখাপটনমে সন্ধ্যার সময় পৌঁছিলাম। পৌঁছান মাত্র স্কোয়াড্রন নীডার স্বল আমাকে তাঁহার তাঁবুতে লইয়া গেলেন ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিমান বেরাবত হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্ঘটনা পর্যন্ত সমস্ত খুঁটিনাটি জানিয়া লইলেন। গোরারা যে আমাদের কিছুতেই বিমান দিতে ইচ্ছুক নয়, বা বিমান পাইলেও বিমান-চালনার কৌশলে পারদর্শী হইতে পারি তাহা চায় না—এই ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে-কথা স্কোয়াড্রন নীডার স্বলকে তখন জানাইলাম না।

এরপর পুনরায় পি, টি, প্যারেড। ড্রিল প্যারেড ইত্যাদি পূর্বোদ্যমে শুরু হইল।

বৈমানিকদের সংখ্যা দুই শতেরও অধিক, কিন্তু বিমান সর্বসাকুল্যে একটি, তাহাও হাস্যকর ওয়াপিটি। যথেষ্ট কাজ কেন, সারা দিনমানে কাহাকেও এক আধ ঘন্টার কাজও দেওয়া সম্ভব ছিল না। এমত অবস্থায় যাহা হওয়া স্বাভাবিক তাহাই হইতে লাগিল।

গোরা বৈমানিকদের সাথে ভারতীয়দের কিছু না কিছু বিষয় লইয়া প্রথমে মতান্তর ও পরে মুষ্টিযোগ প্রায় প্রাত্যহিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। গোরাদের নিজেদের মধ্যেও মতান্তর হইত, এবং তাহা শেষ পর্যন্ত মতান্তরেই নিবদ্ধ থাকিত না। বিশেষত শনিবার দিন, সারা সপ্তাহ না কাজ করার জন্য যে অবসাদ তাহা তাহারা স্পিরিটের সাহায্যে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিত। আমাদের মধ্যেও কয়েকজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন যাঁহারা গোরাদের মত শনিবার দিন রাত্রে স্পিরিটের ভক্ত হইতেন। ধার্মিক হওয়ায় দোষ নাই কিন্তু বিপদ হইত আমাদের মত কয়েকজন অধার্মিকদের। শনিবার রাত্রে কে কোথায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়া আছেন, তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া আনিয়া নিজনিজ তাঁবুতে খাটাঙ্গের উপর ফেলিয়া দিতে হইত। এই মানবহিতের কাজের সময় যে কখনও দুর্ঘটনা হই নাই, একথা হলপ করিয়া বলিতে পারিব না। শুধু তাই নয়, অনেক সময় খাটাঙ্গের উপর নিক্ষেপ করার পর সবুট পদচালনা করিবার লোভ বহু কষ্টে সংবরণ করিয়াছি। কিন্তু যাহাদের উপর এই অবিচার বা অত্যাচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, তাহারা কখনও এই অধার্মিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নাই। মহত্বের লক্ষণ ত' তাহাই।

এই সময়ের একটা ঘটনা, সামান্য কিন্তু কিছু রস আছে বলিয়া উল্লেখ করি। আমাদের সাথে এক ভদ্রলোক ছিলেন, বাড়ী আম্বালায়, নাম জাবিল হুসেন, পদে এল, এ, সি। এ অতি সদাশয় ব্যক্তি। কথায় বার্ত্তায় অর্থাৎ সব কাজেই খুব দড়, শুধু বিমানের কাজ মিলেই তিনি অন্তর্দ্ধান হইতেন। তাঁহাকে কেহই বাগে পাইতেছিল না। সবাই নজর রাখিয়াছিল, কেমন করিয়া তাঁহাকে দিয়া বিমানের কোনও কাজ করান যায়। গোরারা বলিত তিনি বান মৎস্যের ন্যায় পিচ্ছিল, সরাৎ করিয়া সরিয়া যান, ধরিবার উপায় নাই। একদিন কিন্তু তিনি সত্যই ধরা পড়িয়া গেলেন। এল, এ, সি ল্যাকার্টি ও তাঁহার উপর সেইদিন ওয়াপিটি বিমানে তৈল-পেট্রল ভরিবার ভার পড়িল। সকালে বিমানের কাজ ছিল না, কাজেই তৈল-পেট্রলের প্রয়োজন ছিল না। দুপ্রহরের পর হইতে তিনি অদৃশ্য হইলেন। বেলা প্রায় তিনটার সময় বিমানে তৈল-পেট্রল ভরিবার প্রয়োজন হইল। কিন্তু কে ভরিবে? জাবিল হুসেনের পাত্তা নাই। একা ল্যাকার্টি কোনও রকমে কাজ সম্পূর্ণ করিল। কাজ সমাধা হইলে পর ল্যাকার্টির অনুরোধে, সকলে মিলিয়া হুসেন সাহেবের খোঁজে বাহির হইল। পেট্রোল ভরার জন্য আমাদের নিকট দশটাকার বাউজার ছিল। বাউজারের পিছনের দিকে আটখানা চাকা, চাকাগুলির উপরে ও পেট্রল ট্যাঙ্কের নীচে, এই দুইয়ের মাঝখানে একটা কাঠের পাটাতন ছিল। হুসেন সাহেব সেই পাটাতনের উপর শুইয়া আরামে কপট নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। পেট্রল ভরা সমাধা হওয়ার পর ধীরে সুস্থে, সময় প্রশস্ত বুঝিয়া তিনি বাহির হইলেন। বাহির হওয়া মাত্র ল্যাকার্টি তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, বলিল, "এতক্ষণ তুমি কাজে ফাঁকি দিয়াছ। এবার আমি তোমাকে পিটাইয়া শিক্ষা দিব।" এই বলিয়া ল্যাকার্টি আস্তিন গুটাইয়া অগ্রসর হইতেই হুসেন সাহেব, ডান হাত তুলিয়া পরম

বিনয়ের ভঙ্গিতে বলিলেন, "থাম, থাম ; আমাকে পিটাইবার পূর্বে ক্লোয়াড্রনের কমাণ্ডিং অফিসারের অনুমতি লইয়াছ কি ?" তাঁহার কথাগুলি এবং বলার কায়দা এমন ছিল যে মনে হয় ন্যাকার্টি তাঁহাকে পিটাইলে যেন মহা অন্যায় কাজ করিবে। যাহারা এই ড্রামার উপস্থিত সকলেই চলেন সাহেবের ভঙ্গিতে না হাসিয়া পারে নাই। শেষ পর্যন্ত ন্যাকার্টিও হাসিতে যোগ দেয়। এবার হইতে কাহারও নিজের মান রক্ষার্থে যদি সে বাহুবলের পরিবর্তে কমাণ্ডিং অফিসার বা অন্য কাহারও বা নিজগুণের দোহাই পাড়িত, তবে আমরা তাহাকে জামিল হুসেন দ্বিতীয় নম্বর আখ্যা দিতাম। ভারত-বিভাগের সময় ভদ্রলোক পাকিস্তান বিমানবহরে চলিয়া গিয়াছেন।

জুন মাসের মাঝামাঝি বিমানবাহিনীর হেড্ কোয়ার্টার হইতে জরুরী হুকুম পাইয়া দমদমায় রওনা হইলাম। সেখানে ক্লোয়াড্রন লীডার চৌধুরী ও আরও অনেককে লইয়া নূতন ক্লোয়াড্রন পত্তন করা হইয়াছে। নাম তিনশত তিপ্পান্ন নম্বর কোর্টাল ডিফেন্স ক্লোয়াড্রন। অফিসার কমাণ্ডিং উইং কমাণ্ডার লিলি। 'এ'-ফ্লাইট কমাণ্ডার আমাদের তিন নম্বর ফ্লাইটের ছটন, এখন ক্লোয়াড্রন লীডার এবং 'বি'-ফ্লাইটের কমাণ্ডার ক্লোয়াড্রন লীডার চৌধুরী। 'এ'-ফ্লাইটে শুধু হাড্‌সন বম্বার, সংখ্যায় আটখানা। বৈমানিকরা সব ইংলণ্ড হইতে আগত গোরা। 'বি'-ফ্লাইটে আটখানা হাড্‌সন বম্বার ও চারখানা লম্বানাক ব্লেনহীম, মোট বারখানা বিমান। বৈমানিকরা অধিকাংশই ভারতীয়। আমি যে সময় পৌঁছিলাম, তখন সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত এই বিমানগুলি উড়াইবার মহড়ার মহা ব্যস্ততা। না-কাজের মধ্য হইতে হঠাৎ মহা ব্যস্ততার কাজের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। নিজেকে সেই স্রোতের মধ্যে ফেলিতে কয়েকদিন বহিয়া গেল।

দমদমায় পৌঁছিবার কয়েকদিনের মধ্যেই একদিন ক্লোয়াড্রন লীডার চৌধুরীর সাথে আমাদের 'এ'-ফ্লাইট সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হইল। তাহার ফলে বিশাখাপটনম হইতে আরও পাঁচসাতজন এঞ্জিনীয়ার বৈমানিক বিমানবাহিনীর হেড্ কোয়ার্টার হইতে জরুরী তলব পাইয়া আমাদের নূতন ক্লোয়াড্রনে পৌঁছিল।

একশত চার নম্বরের অবস্থা যথা পূর্বং রহিল। আরও প্রায় ছয় মাস পরে, কংক্রীটের নূতন উড়ন-পথ তৈয়ারী হওয়ার পর, তাহারাও কয়েকখানা হাড্‌সন বম্বার বিমান পাইয়াছিল। কিন্তু একশত চার নম্বরের বরাত খুব ভাল ছিল না। নূতন বিমান পাইবার কিছুদিনের মধ্যেই দুইবার দুই দুর্ঘটনায় তাহাদের উৎসাহ খুব কমিয়া যায়। একখানা হাড্‌সন বিমান একদিন ডেপ্ত চার্জ বর্ষণে অপারগ হইয়া ডেপ্ত চার্জ সহ যখন বিশাখাপটনমের নূতন উড়ন-পথে নামিতেছিল তখন, যেমন করিয়াই হউক, বিমানের পেটের খোলের মধ্য হইতে দরজা খুলিয়া ডেপ্ত চার্জ উড়ন-পথের উপর পড়ে এবং প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বিমান, বৈমানিক কয়েকজন, ও উড়ন-পথের একটা অংশ নিশ্চিহ্ন হইয়া উড়িয়া যায়। তাহার কয়েকদিন পরেই ক্লোয়াড্রন লীডার সেল হাড্‌সন্ বিমানে বর্মার উপকূলে জাপানী নৌবহরের

উপর বোমা ফেলিতে গিয়া আর ফেরেন নাই। বিমানবাহিনীর ভাষায় তাঁহারা নিখোঁজ হইয়া গিয়াছেন। বিশাল সমুদ্রে এই দুর্ঘটনার মানে সলিল-সমাধি হওয়া ছাড়া আর কি?

ফ্লেনহীম বিমানের পরিচয় পূর্বেই দিয়াছি। লম্বা নাক ফ্লেনহীমগুলি ছোটনাক ফ্লেনহীম হইতে বেশ কয়েক মাইল দ্রুততর ছিল। বোমাও বেশী লইতে পারিত। উপরন্তু পেটের তলায় ডাইবীন—গান টারেটও একটা ছিল। সেখানেও চারটি ব্রাউনিং মেশিন গান সন্নিবিষ্ট করা ছিল। সম্মুখের দিক বেশী লম্বা হওয়ার দরুন, বেতার-বার্তা অপারেটার ও নেভিগেটারের পক্ষে বিমানে তাহাদের স্থানে যাওয়ার অসুবিধা হইত এবং শীঘ্র বাহির হইয়া আসা একেবারে অসম্ভব ছিল। এ ছাড়া, আরও একটা অসুবিধার কারণ ছিল। বিমানের খোলের ব্যাস খুব কম হওয়ায়, বিমানের মধ্যে কোমর সোজা করিয়া দাঁড়ান যাইত না, কোমর বাঁকাইয়া দাঁড়াইতে হইত। ফ্লেনহীমের তুলনায় হাড্‌সন্ বিমান অনেক বড় ও দ্রুততর ছিল, আর বোমাও লইতে পারিত অনেক বেশী। বোমা ছাড়া, ডেপ্ত চার্জ লওয়ার ব্যবস্থাও এই বিমানে ছিল। ডেপ্ত চার্জ-গুলি দেখিতে অনেকটা বড় পিপার মত; এবং ডেপ্ত চার্জের সাধারণতঃ ব্যবহার হয় সাব-মেরিনকে ঘায়েল করার জন্য। অধিকতর বলবান প্রতিপক্ষ শক্তির সম্মুখীন হইলেই সাবমেরিন জলমগ্ন হইয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করে। তখন সাবমেরিন কোথায় জলমগ্ন হইয়াছে তাহা আন্দাজ করিয়া সেখানে ডেপ্ত চার্জ ফেলা হয়, ডেপ্ত চার্জ ফেলার পূর্বে কত ফুট গভীরে সাবমেরিন ডুবিয়া পলাইয়া আছে, তাহারও একটা আন্দাজ বৈমানিককে করিতে হয়, এবং সমুদ্রের মধ্যে সেই আন্দাজ মত গভীরে পৌঁছাইলে যাহাতে বিস্ফোরণ হয় তাহার হিসাব ডেপ্ত চার্জ নিক্ষেপ করার পূর্বেই করিতে হয়। অন্যান্য বোমারু বিমানের ন্যায় হাড্‌সনেও বোমা ও ডেপ্ত চার্জগুলি লওয়া হইত পেটের তলায় খোলের মধ্যে। খোলের সব দরজা সব সময় বন্ধ থাকিত, শুধু বোমা বা ডেপ্ত চার্জ বর্ষণের পূর্বে খোলা হইত।

নিশানামাফিক বোমা-বর্ষণের জন্য হাড্‌সনে নূতন ধরণের বম্ব-সাইট ছিল। যেখানে বোমা বর্ষণ করিতে হইবে, সেখানকার একটা কোটোর সাথে মিলাইয়া বম্ব-সাইট্ নিশানা করিতে হইত, এবং আকাশে হাওয়ার স্রোতে বা বিমানের গতির জন্য বর্ষিত বোমা যেন অন্যদিকে ভাসিয়া না যায়, তাহার জন্য বোমা বর্ষিত হওয়ার পূর্বেই প্রয়োজন অনুসারে বম্ব-সাইটের নিশানায় আপনা হইতেই ভুল সংশোধিত হইত। এতগুলি কাজ যাহাতে একটার পর একটা আপনা হইতেই সুশৃঙ্খলভাবে হয়, তাহার জন্য বম্ব-নিশানাকারী বৈমানিককে শুধু একটি বোতাম টিপিয়া করিতে হইত। তাহার পর ইলেক্‌ট্রিক মোটর, সলেনয়েড্ ইত্যাদি বিশ্বাসী অনুচরের মত সব কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিত।

গান টারেটও সংখ্যায় চারটি ছিল। বিমানের সম্মুখে নোজ টারেট, পশ্চাতে টেইল টারেট, পৃষ্ঠের উপরে টারেট ও পেটের তলায় ডাইবীন টারেট। গানটারেটেও যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল। সবগুলিই প্রশস্ত, ফ্লেনহীমের মত সঙ্কীর্ণ নয়। গোলন্দাজরা আরামপ্রদ কেদারায়

বসিয়া চারেট ভত উচ্চামত দিকে ঘুরাইতে পারিত। প্রত্যেক টারেটে চারটি মেশিন গান। আর এই বন্দুকের গুলিও ব্লেনহীমের তুলনায় অনেক বেশী মারাত্মক। গুলির ব্যাস আধ ইঞ্চি, ব্লেনহীমের গুলির প্রায় দ্বিগুণ আকার। বিমানের খোল খুব প্রশস্ত থাকায় বৈমানিকরা স্বচ্ছন্দে একস্থান হইতে অন্য স্থানে বিমান উড্ডীন থাকা কালেও যাতায়াত করিতে পারিত। গানটারেটের বৈমানিক আহত বা অসুস্থ হইয়া পড়িলে, উড়ন্ত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও তাহাকে বিমানের খোলের মধ্যস্থানে সহজেই আনা যাইত।

ব্লেনহীম ও অন্যান্য যে বিমানগুলির সহিত এ পর্যন্ত পরিচয় হইয়াছিল, সেসবগুলিই ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লাগিবার পূর্ব্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী। হাড্‌সনের পরিকল্পনা যুদ্ধোত্তর। প্রায় সব দেশের বিমান-যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এই বিমানের পরিকল্পনায় প্রয়োগ করা হইয়াছিল। সেইজন্য তখনকার দিনে তৈয়ারী বিমানগুলির মধ্যে হাড্‌সনই ছিল সেরা।

হাড্‌সন্ বহুগুণসম্পন্ন হইলেও, দুই কারণে অনেক সময় বিপদে পড়িত। বিমানের খোল বৃহৎ হওয়ার দরুণ, হাওয়ার ঠিক বিপরীত দিক হইতে অবতরণ বা আরোহণ না করিলে, প্রায়ই হাওয়ার স্রোতের চাপে বিমান হাওয়া চলার দিকে ঘুরিয়া যাইত। এই ঘুরিয়া যাওয়ার সময় বৈমানিকরা সতর্ক না থাকিলে, বিমান উল্‌টাইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। দ্বিতীয় কারণও বিমানের বৃহৎ খোল। বিমানের খোল বৃহৎ হওয়াতে আক্রমণকারী শত্রুবিমানের পক্ষে নিশানা করা সহজ ছিল। অনেকগুলি হাড্‌সন বিমান এই দ্বিতীয় কারণে গুলিবিদ্ধ হইয়া ভূপাতিত হইয়াছিল।

একবার পেট্রল ভর্ত্তি করার পর, এই বিমান অনায়াসে আটদশ ঘন্টা আকাশে বিচরণ করিতে সক্ষম ছিল এবং এই সময়ের মধ্যে ন্যূনাধিক তিন হাজার মাইল পাড়ি দিতে পারিত, উত্তর আমেরিকার সমুদ্রের পূর্ব্ব উপকূল হইতে এক ক্ষেপে আয়ারল্যাণ্ড পর্য্যন্ত উড়িয়া আসিতে পারিত। সেই জন্য আমেরিকার বিমান প্রস্তুতের কারখানা হইতে সরাসরি উড়াইয়া এই বিমান ইংলণ্ডে পৌঁছান হইত। এত শীঘ্র পৌঁছানর ফল মিত্রশক্তির পক্ষে অনুকূল হয়।

যখনকার কথা বলিতেছি তখন মিত্রপক্ষীয় কোন বিমান একক সাবমেরিন আক্রমণের শক্তি রাখিত না এবং একক সাবমেরিন আক্রমণের জন্য অনুমতিও ছিল না। হাড্‌সন বিমানের পরিকল্পনায় সাবমেরিনকে একক আক্রমণ করার শক্তি ও উপকরণ যোগান হয়। সেই কারণেই আমাদের নূতন ঘোয়াড্রনের নাম হইল কোষ্টাল ডিফেন্স ঘোয়াড্রন। যদিও বহুবার আমরা বন্দে পসাগর পার হইয়া বর্ম্মা দেশের গভীর অভ্যন্তরে গিয়া বোমা ফেলিয়া আসিয়াছি।

প্রত্যেক হাড্‌সন বিমানে সাত-আটজন বৈমানিকের প্রয়োজন হইত—দুইজন বিমান-চালক, একজন বেতার-বার্ত্তা-অপারেটর, একজন নেভিগেটর ও চারজন গানার। বিমান কার্য্যকরী হইতে হইলে এই সাত-আটজনের এক নির্দ্দেশে একমন হইয়া চলা প্রয়োজন।

একজন যখন কোন কার্য্যে ব্যাপৃত, তখন অন্য সকলের জ্ঞাত থাকা চাই যে, ঐ একজনের তখনকার কার্য্য সমাধা হওয়ার পর অন্য কোন্ কার্য্য করা প্রয়োজন হইতে পারে, কাহাকেও কিছু বলিয়া নির্দ্দেশ দিবার প্রয়োজন না থাকে, সকলেই কার্য্যের ধারা সম্পূর্ণ অবগত। শুধু তাই নয়, কাহারও কোন অসুবিধা বা বিপদ হইলে, অন্য সকলেই চেষ্টা করিবে বিপদ-গ্রস্তকে সাহায্য করিতে। সকলেই অন্য সকলের সাহায্যে প্রস্তুত। কেহই শুধু নিজের শুভের দিকে দৃষ্টি দিবে না। এই টিম-স্পিরিট হঠাৎ উদয় হয় না। টিম-স্পিরিট গঠন করতে হয়। শুধু পরস্পরকে ভালোবাসিয়াই তা হয় না। তাহার জন্য প্রত্যহ কয়েক ঘন্টা ধরিয়া একসঙ্গে থাকা প্রয়োজন, একসঙ্গে বিমানে উড়িয়া মহড়া দেওয়ার প্রয়োজন। বিমানে উড়িয়া মহড়া দেওয়া শুধু বিমানচালকদের জন্য নয়, সবারই প্রস্তুতির জন্য। প্রত্যহ অনুশীলনের প্রভাবে যখন প্রত্যেক বৈমানিক নিজ নিজ কার্য্য সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে কার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম, তখনই তাহারা বিমানযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত বলিয়া গণ্য। আর বৈমানিকদের এমন একটা দল যখন একবার তৈয়ারী হইল, তখন সেই দলকে ও যে বিমানে তাহারা মহড়ার শিক্ষানবিশী করিয়া দক্ষ হইয়াছে, সেই বিমান লইয়া একটা ইউনিট তৈয়ারী হইল। বিমান ও বৈমানিক দলকে আর আলাদা করা হইত না। ঐ দলের কেহ একদিন উড়িতে অসমর্থ হইলে, সেদিন সম্পূর্ণ দলকেই অব্যাহতি দেওয়া হইত। কোন দলের বিমান উড়িবার অনুপযোগী হইলে, বিশেষ জরুরী প্রয়োজন না থাকিলে, তাহাদিগকে অন্য বিমানে উড়িয়া যাইতে দেওয়া হইত না।

এইভাবে 'এ' ও 'বি' ফ্লাইট মিলিয়া আমাদের স্কোয়াড্রনে প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশটি দল প্রস্তুত হইল। এই প্রস্তুতির পথে দুই একটা বিমান সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল বটে, কিন্তু বৈমানিকদের কাহারও শারীরিক ক্ষতি হইল না বা কোন বিমানও সম্পূর্ণ ধ্বংস হইল না। তখনকার সময়ে আমরা ভগবৎ-কৃপায় **charmed circle**-এ ছিলাম তাহার একটা দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। একদিন সকালে প্রায় দশটার সময় ফ্লাইং অফিসার ভাটিয়া তাঁহার ক্রু ও বিমান লইয়া দমদম উড়ন-পথে উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে আসিয়া অবতরণ করিলেন। তখন হাওয়া পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমে বহিতেছিল। কন্ট্রোল টাওয়ারের সামনে পাচ-ছয়টা বিমান পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া রাখা ছিল। কন্ট্রোল টাওয়ার পর্য্যন্ত বিমান উড়ন-পথের উপর দিয়া সোজা আসিয়া, হাওয়ার চাপে হঠাৎ পশ্চিম দিকে ঘুরিয়া বেশ জোরে চলিতে লাগিল। ঐখানেই পাঁচ ছয়টা বিমান রাখা ছিল। ফ্লাইং অফিসার ভাটিয়া কোন মতেই বিমানকে বাগে আনিতে পারিতেছিলেন না। বিমান ঐ পাঁচ ছয়টা বিমানের নিকটে আসিয়াই পুনরায় দিক বদল করিল। এবং সম্পূর্ণ এক চক্কর ঘুরিয়া পুনরায় উড়ন-পথের উপর আসিয়া পড়িল। কেমন করিয়া ঐ পাঁচ ছয়টা বিমানের সাথে ধাক্কা না লাগিয়া ফ্লাইং অফিসার ভাটিয়ার বিমান নির্বিঘ্নে ফিরিয়া গেল, বুদ্ধিতে তাহার ব্যাখ্যা নাই।

(ক্রমশঃ)

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রশ্নোত্তর]

এপ্রিল ৮.

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী আধুনিক কালের "আর্ট"এর উচ্ছৃঙ্খলতা সম্বন্ধে উল্লেখ করে মা বললেন

...কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, এখন মনে হচ্ছে যে আবার আমরা নীচের থেকে উপরে ওঠার পথ ধরেছি। বস্তুত এর আগে আর্ট একেবারে নীচে নেবে গিয়েছিল, অসংকোচ অসঙ্গতি ও অর্থশূন্য নোংরামির চূড়ান্ত হচ্ছিল—যা কিছু কুৎসিত, ঘৃণ্য, বীভৎস তারই দিকে ঝোঁক। যেন আমরা পাঁকের তলায় তলিয়ে গেছি।

প্রশ্ন এখন যথার্থই কি আবার আর্টের গতি ফিরেছে?

উত্তর তাই মনে হয়। সম্প্রতি কয়েকটি ছবি দেখলাম যার মধ্যে তেমন নির্লজ্জ কদর্যতা নেই। এখনও তাকে ঠিক আর্ট বলবনা, সুন্দরের ধারে কাছেও যায়না, তবু তার মধ্যে উচ্চদিকে মোড় নেবার লক্ষণ রয়েছে। দেখো, হয়তো বছর পঞ্চাশের মধ্যে আবার সুন্দর কিছু দেখতে পাবে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভেবেছি যে একেবারে তলার দিকে ডুবে গেছি—এখনও নীচেই আছি, তবু মনে হচ্ছে আবার উপরে ওঠা শুরু হয়েছে। একটা ব্যাপার তাব দেখেছে, যদিও সুন্দরের সম্বন্ধে এখনও কোনো ধারণাই আসেনি, কিন্তু যা নিতান্ত স্থূল নয় এমন কিছুর দিকে একটা আকূতি ও আস্পৃহা দেখা যাচ্ছে। কিছুকাল ধরে আর্ট কেবল পাঁকই ঘাঁটছিল আর তাকে বলছিল 'রিয়ালিষ্টিক' আর্ট। জগতের মধ্যে যা সব চেয়ে নোংরা তাকেই ওরা বাস্তব বলে বেছে নিচ্ছিল—অর্থাৎ যা কিছু বিকৃত, বিরলা, অসুন্দর, শ্রীহীন, যার মধ্যে বর্ণ ও আকৃতির কোনো সঙ্গতি ও সুষমা নেই। যাই হোক সে অবস্থা এখন পার হয়ে এসেছি বলে মনে হয়। এমন ধারণা কয়েকদিন যাবৎ আমার মনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে (কেবল ছবি দেখে নয়, কারণ এখানে বেশি কিছু দেখতে পাইনা, তবে এটা অনুভব করছি বর্তমান 'আবহাওয়া' থেকে)। এমন কি যে সব ছবির নকল ছাপা হয়ে এখানে আসে, তার মধ্যেও দেখতে পাই উপরে ওঠার জন্য আস্পৃহার লক্ষণ।

প্রায় পঞ্চাশ বছর লাগবে...তারপরে হবে...যদি ইতিমধ্যে আবার নতুন কোনো

যুদ্ধ কিংবা বিপর্যয় না বাধে। কারণ কদর্যতার প্রতি এই যে রুচি, এর জন্য যুদ্ধ ও যুদ্ধের বিভীষিকাই অধিকাংশ ভাবে দায়ী। যুদ্ধের সময়কার যত কষ্টকঠোরতা সহ্য করে করে মানুষের যা-কিছু সূক্ষ্ম রুচি ও সৌন্দর্যবোধকে একেবারে বিসর্জন দিতে হয়েছে, নতুবা হয়তো তার বিভীষিকা সইতে না পেরে মানুষ মরেই যেতো। স্বাভাবিক মন নিয়ে সেই সব নগ্ন বর্বরতা বরদাস্ত করা যায় না তাই ওর ফলে সর্বত্রই মানুষের রুচি বিকৃত হয়ে গেল, তারপর যুদ্ধ যখন থামল (প্রকৃতই থেমেছে বলে ধরে নিলে), তখন সবাই চাইলে একটিমাত্র জিনিস, সব কিছু ভুলে যাওয়া, একেবারে সম্পূর্ণই ভুলে যেতে। নিজেকে ওর স্মৃতি থেকে সরিয়ে নেবো, যা কিছু সয়েছি সে কথা একবারও ভাববনা—তাতেই একেবারে নীচের দিকে ডুব দিতে হলো। তাই এখন প্রাণগত সমস্ত আবহাওয়া হয়েছে বিষাক্ত, পার্থিব আবহাওয়াও তমসাচ্ছন্ন।

অতএব আমরা যদি এবার নতুন বিশ্বযুদ্ধকে এড়াতে পারি—যেহেতু যুদ্ধ তো চলেইছে, একবারও থেমে যায়নি—বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকেই চলছে! চীন থেকে শুরু করে, তারপর তুরস্ক, ত্রিপোলিটেনিয়া, মরোক্কো—পরে পরে লক্ষ্য করে যাও,—বল্‌কান দেশগুলিতে,—যুদ্ধ একেবারে থামেনি; মাঝে মাঝে প্রবল হয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন আরো ভয়ানক হয়ে উঠেছে। তোমরা আমার ছেলেমেয়েরা সকলেই প্রায় জন্মেছ যুদ্ধের পরে (অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে), সুতরাং তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানোনা, আর যারা এদেশে জন্মেছ তারা তো জানোই না। কিন্তু যারা ইউরোপে জন্মেছ পরবর্তী যুদ্ধগুলির কালে, যাদের বলা যায় যুদ্ধকালের জাতক, তাদের মনে যে একটা বিভীষিকা ও আতঙ্ক রয়ে গেছে তা মুছে ফেলা কঠিন। বিভীষিকা যে কাকে বলে সে তারা না জেনে থাকতেই পারে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বোধ করি দ্বিতীয়টির চেয়ে আরো ভয়ংকর ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এমন নির্মম হয়েছিল যে তাতে সকলের সব কিছুই গেল,—কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যে কত ভয়াবহ ছিল তা বলা যায় না...তার শেষের কয়েকমাস আমি ছিলাম প্যারিসে, সে যে কত কল্পনাতীত রকমে নিদারুণ তা কথায় বলা দুঃসাধ্য। যেমন ট্রেঞ্চের মধ্যে বাস করা, তা যে কেমন ছিল সে জিনিস বর্ণনাতীত। নতুন যুগের মানুষরা তার সম্বন্ধে কিছু জানেইনা....যারা একালে জন্মেছে তারা সে বিভীষিকার কথা সত্য বলে বিশ্বাসই করতে পারে না। পরাজিত দেশগুলিতে যে কি অবস্থা হয়েছিল, চেকোস্লোভাকিয়াতে, পোল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে—যত কিছু অভাবনীয় ও অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছিল—তা যারা কাছে থেকে না দেখেছে তারা সত্য বলে ধারণাই করতে পারবে না। সেদিন আমি তোমাদের বলেছি প্রাণময় জগতের বিভীষিকার কথা, সে জিনিস পুরোপুরিভাবেই নেমে এসেছিল এই পৃথিবীতে, আর তা প্রাণময় জগতের চেয়েও ভয়ানক হয়ে উঠেছিল, কারণ সেই জগতের জিনিসের বেলাতে তোমার আভ্যন্তরীণ শক্তি ও জ্ঞানশক্তি থাকলে আরই ক্রিয়াতে অকে থামিয়ে দিয়ে তুমি দেখাতে পারো যে তার চেয়ে তুমি বেশি বলবান।

কিন্তু স্থূল জগতের বেলাতে তার যুদ্ধের বিভীষিকার উপরে ঐ সব শক্তি কোনো কাজেই লাগে না। পার্থিব আবহাওয়াতে ওর যা ক্রিয়া তাকে থামাতে পারা খুবই কঠিন, অত্যন্তই কঠিন।

মানুষ যে ও সব ভুলতে ব্যগ্র হয় তা খুবই স্বাভাবিক। এখনই অনেকে বলতে আরম্ভ করেছে, "এতটা কি সত্যই হয়েছিল?" কিন্তু যারা সে অবস্থার ভিতর দিয়ে এসেছে তারা সেগুলোকে মুছে ফেলতে চায় না (তাই যে সব স্থানে মানুষের উপর অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছে ও তাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে—সেই সব ভয়ানক হত্যাভূমিকে সংরক্ষিত ও চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে)। প্যারিসে গেলে দেখতে পাবে সেখানে জার্মানরা নৃশংসভাবে মানুষ মারার জন্য যে 'মরণকোঠা' তৈরি করেছিল তা রয়েছে, আশা করি সেগুলিকে কখনই নষ্ট করা হবেনা—কারণ যারা বলবে যে ও-সব অতিশয়োক্তি (যেহেতু বীভৎসতার কথা কেউ মেনে নিতে চায় না), তাদের হাতে ধরে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হবে, "দেখে যাও স্বচক্ষে, যদি ভয় না পাও"।

ঠিকভাবে নিতে পারলে ওর দ্বারা চরিত্র গড়ে ওঠে (কারো কারো তা হয়েছে বলেও মনে হয়)। ওতে সরাসরি যোগে গিয়ে পৌঁছান যায়। অর্থাৎ জগতের সব কিছুর উপরেই এমন একটা অনাসক্তি এসে পড়ে, আর সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে অন্য একটা বিশেষ কিছুর জন্যে এমন এক আকিঞ্চন জেগে ওঠে যা প্রকৃতই সুন্দর ও মধুর, প্রকৃতই নূতন, প্রকৃতই সর্বোত্তম...এর থেকেই এসে পড়ে আধ্যাত্মিক আস্পৃহা। যুদ্ধের বিভীষিকা মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল—অল্পসংখ্যক যারা তৈরি ছিল তারা খুব উপরের দিকে উঠে গেল, আর অধিকাংশ যারা তৈরি ছিল না তারা গেল একেবারে নীচের দিকে নেমে। এখনও তারা পাঁকের মধ্যে ডুবে আছে, তাই আপাতত উঠে আসতে পারছে না। জগতের এইভাবই যদি চলতে থাকে তাহলে এতে আমাদের টেনে নিয়ে যাবে এক নতুনতরো যুদ্ধের দিকে, যার ফলে এবার বর্তমান সভ্যতা প্রকৃতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে,—জগতের ধ্বংস বলছি না, কারণ জগতের ধ্বংস কোনোমতেই হতে পারে না, তবে এই সভ্যতা লোপ পেয়ে যাবে, অর্থাৎ এর থেকে আবার এক নতুন সভ্যতাকে গড়ে তুলতে হবে। তোমরা হয়তো বলবে যে তাতে খুব ভালোই হবে, কারণ এখানকার সভ্যতার অধোগতি হয়ে এতে পচন ধরে যাচ্ছে; কিন্তু তথাপি এর মধ্যে এমন কিছু ভালো ভালো জিনিস ছিল যাকে বাঁচিয়ে রাখা চাই, সব কিছুই যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেটা খুবই দুঃখের বিষয় হবে। কারণ মানুষরা হলো খুব ধারালো বুদ্ধিযুক্ত প্রাণী, তারা সবকিছুকেই ধ্বংস করবার উপায় জেনে গেছে, আর সে উপায়কে তারা কাজে লাগাবেই। এমন দুর্দান্ত রকমের বোমা তৈরি করতে তারা কোটি কোটি টাকা খরচ করছে কেন, যদি তা কোনো কাজেই না লাগবে? একটা গোটা শহরকে কয়েক মুহূর্তে উড়িয়ে দেবার উপায় তারা আবিষ্কার করল কেন, যদি তাকে কখনো কোনো ব্যবহারে না লাগায়? কোনো একটা জিনিসকে কষ্ট করে আবিষ্কার করাতে তোমার কি

লাভ আছে, যদি সে আবিষ্কারের কি ফল হলো তা দেখতেই না চাও? এবার একবার যুদ্ধ বেধে গেলেই তা হবে।

যা তোমাদের বল্‌লাম তা খুব আনন্দের কথা নয়, কিন্তু এগুলো ভেবে দেখবার জন্য তোমাদের মস্তিষ্ককে একটু নাড়াচাড়া দেওয়া দরকার।

এপ্রিল ১৪, ১৯৫১

প্রশ্ন : ('কথাবার্তা' হতে) সমর্পণ ও ত্যাগ কি একই কথা নয়?

উত্তর : কে এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারো? দুটির মধ্যে কি পার্থক্য?

জনৈক শ্রোতা : সমর্পণ আসবে আপনা হতেই।

উত্তর : যারা আপনা হতে সমর্পণ করতে পারবে তাদের আমি বাহবা দিতে রাজী আছি। সে অত সোজা কথা নয়। না, এ জবাব ঠিক হলো না।

অন্য জন : ত্যাগে সত্তা সেই জিনিস থেকে রিক্ত হয়ে যায়।

উত্তর : তা তো হবেই, কিন্তু কেন? এটা তো খুবই সোজা কথা হলো, ত্যাগ করা মানেই রিক্ত হওয়া। অর্থাৎ বেটা ধরে রেখেছিলে সেটাকে ছেড়ে দিলে। জীবনকে ত্যাগ করলে মানে জীবনের বন্ধন তোমার রইলনা, নতুবা সেখানে ত্যাগ হলোনা, দান বলতে পারো। যেখানে 'ত্যাগ' শব্দ প্রয়োগ করছ সেখানে সেই ত্যাগের জন্য তোমাকে কিছু কষ্টস্বীকার করতে হচ্ছে। 'ত্যাগ' শব্দটি তোমরা হাল্‌কাভাবে বলে থাকো তা জানি, কিন্তু আমি বলছি ওর প্রকৃত অর্থে। যে জিনিসে তোমার আসক্তি আছে এমন কিছুই তুমি ত্যাগ করতে পারো। আসক্তি না থাকলে সেখানে আর ত্যাগ নয়, তা হবে দান, শুধু দেবার আনন্দে। অপরপক্ষে সমর্পণের বেলাতে তার কোনো মূল্যই থাকেনা যদি কষ্টপূর্বক তা করতে হয়, জোর ক'রে কষ্টপূর্বক যা করা হবে সে হবে ত্যাগ। সমর্পণ মানে সাগ্রহে সানন্দে যথাথ নিবেদন। শুধু গঁপে দেওয়া, ত্যাগ করা নয়।

মা আরো পড়লেন তাঁর 'কথাবার্তা' হতে—"আমাদের যোগে ত্যাগের কোনো স্থান নেই...ত্যাগের সঙ্গে কিছু বিনষ্ট করার অর্থ নিশে আছে, অর্থাৎ ওতে একটা নেতির ভাব নিয়ে আসে। এরূপ ত্যাগে পূর্ণতা আসেনা, কেবল আত্মরিক্ততা আনে...যেখানে সত্তার মধ্যে জবরদস্তি আনতে হয়, সেখানে ভুল কাজ হচ্ছে এটা নিশ্চয় জেনো।"

প্রশ্ন তবে ধর্মগুলিতে ত্যাগকে এত মূল্য দেওয়া হয় কেন?

উত্তর অনেক ধর্মই ত্যাগের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। যেমন কালদীয় (Chaldean) ধর্মগুলি। সংশোধিত মুসলিম ধর্মেও ত্যাগের দিকে ঝোঁক ছিল। তার প্রথম অনুগামী ভক্তেরা সেই ধর্মপথের জন্য নিজেদের জীবনদান করেছিল। পারস্য দেশে তাদের অনেক অকথ্য নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। আর অনেক গ্রন্থাদিতে ত্যাগের আনন্দকে যথেষ্ট গৌরবান্বিত করা হয়েছে—এ হলো কালদীয় মনোভাব থেকে। কিন্তু খুবই সতর্কভাবে এর অর্থ বিচার করা চাই, যেহেতু সবই নির্ভর করছে কথাটি কেমন অর্থে নেওয়া হবে তারই উপর। অবশ্য যেখানে কেউ স্বেচ্ছায় সানন্দে ত্যাগ করছে, অর্থাৎ সানন্দে জীবনদান করছে, সেখানে তাকে পূর্বোক্তরূপে ত্যাগ বলা যায় না।

অনেকে বলেন ভগবানের 'ত্যাগ' বা আত্মোৎসর্গের কথা। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যে লোকে কষ্টস্বীকার ক'রে 'ত্যাগে' নিজেকে বাধ্য করে, (হেসে) যে ত্যাগ করা কঠিন তাই হলো ত্যাগ; কিন্তু ভগবানকে তো কষ্ট করে সেটা করতে হচ্ছে না, তিনি স্বেচ্ছায় আত্মদানের আনন্দে এইভাবে আত্মোৎসর্গ করছেন।

আবদুল বাহাকে আমি উত্তমরূপেই চিনি। তিনি বাহাউল্লার পুত্র ও উত্তরাধিকারী এবং বাহাই ধর্মের প্রবর্তক। আবদুল বাহা কারাগারে জন্মে চল্লিশ বছর পর্যন্ত কারাগারেই ছিলেন জানি। কারাগার থেকে যখন বেরোলেন তখন পিতা মৃত, তারপর থেকে তিনি পিতার ধর্ম প্রচার করতে থাকলেন। আমাকে তিনি তাঁর নিজের কাহিনী বলেছিলেন যে তাঁর ধর্মস্থাপনের গোড়ার দিকে পারস্যে কি কি ব্যাপার ঘটেছিল। মনে আছে তিনি বলেছিলেন যে ধর্মানুরাগীরা ভগবানকে সম্মুখে উপস্থিত জেনে ও ভগবৎ-শক্তিকে নিজের মধ্যে অনুভব করে কতই আনন্দে আত্মোৎসর্গ করেছিল—একে 'ত্যাগ' বলব না, সানন্দে জীবনদানই বলব...তিনি সর্বদাই বলতেন এক মস্ত কবির কথা, বাহাই ধর্ম গ্রহণ করাতে তাকে বিধর্মী বলে বন্দী করা হয়। তাকে ওরা পুড়িয়ে অথবা ফাঁসী দিয়ে অথবা ক্রুশে বিঁধে মারতে চেয়েছিল। ঠিক বলতে পারিনা ঐ সময়ে কোন রীতি প্রচলিত ছিল; তারপর যখন সে বললে যে ধর্মের জন্য ও ভগবানের জন্য সে সবরকম যন্ত্রণাই সইতে প্রস্তুত, তখন সকলে মতলব করলে যে ওর সারা দেহে ছোট ছোট মোমবাতি জেলে দেওয়া হোক। মোমবাতি-গুলি গলে গলে ফুটন্ত মোম সারা দেহে ছড়িয়ে পড়বে, শেষে বাতির পলিতাগুলি চামড়ার উপর জ্বলতে থাকবে। আবদুল বাহা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, লোকটিকে এইভাবে মারা হচ্ছে জেনে যখন তার কাছে গিয়ে তাঁর স্নেহসমবেদনা জ্ঞাপন করতে উদ্যত হলেন, তখন দেখলেন সে এমনিতেই এক পরমানন্দের ভাবে উল্লসিত। বাহা তাকে বললেন, তোমার খুবই কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়? সে বললে, "কষ্ট। এই হলো আমার জীবনের সব চেয়ে আনন্দের কয়েকটি ঘন্টা।" তাহলে একে তুমি কি 'ত্যাগ' বলবে?

যারাই আপন ধর্ম বিশ্বাসের জন্য অর্থাৎ তাদের মনের সর্বোচ্চ বিশ্বাস ও আদর্শের জন্য বহু পীড়ন সহ্য করেছে, তারা সকলেই ভিতরে ভিতরে নিজেদের মধ্যে কিছু ভগবৎ-কৃপা অনুভব করেছে এবং তারই জোরে তারা পীড়ন সত্ত্বেও তার কষ্টবোধ হতে অব্যাহতি পেয়েছে। বাইরের দিক থেকে লোকে তাকে 'ত্যাগ'ই বলবে (অর্থাৎ জীবনকে ত্যাগ), কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত দিক থেকে তা বলা চলে না, কারণ তাদের কাছে তা আনন্দ, ত্যাগ নয়। সবই নির্ভর করে তাদের ভিতরকার মনোভাবের উপর। যদি পীড়নের সময় তারা একবারও এ কথা ভাবতো, "এরা কেন আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছে?" তৎক্ষণাৎ নিজেরাও অসহ্য কষ্টবোধ করত। একবার মাত্র এমন কথা মনে হলেই হয়ে গেল।

প্রায় সকল জিনিসকেই—মানব-জীবনের প্রায় সকল বৃহৎ ব্যাপারকেই দুটি বিভিন্ন দিক থেকে দেখা যেতে পারে : নীচের দিক বা উপরের দিক। যদি সাধারণের মতো নীচের দিক থেকে দেখ, তাহলে যারা কোনো নতুন ধর্ম বা নতুন আদর্শ জগতে প্রচার করতে গিয়ে সকল নির্যাতনকে হজম করে নিয়েছে, তাদের সেই সব নির্যাতনকে উৎকট যন্ত্রণাদায়ক ভেবে তুমি আতঙ্কিত হয়ে উঠবে—অথচ তারা সকলেই সে যন্ত্রণাকে অর্থাৎ জনতার নির্যাতনকে সহ্য করে নিয়েছে। সেটা হয়েই থাকে, কারণ দৈবাৎ ব্যতিক্রম ছাড়া মানুষ সাধারণত নিজেদের চেয়ে বড়ো কাউকে সহ্য করতে পারেনা, তাদের চেয়ে অনেক বেশি উচ্চস্তরের কাউকে দেখলেই তারা খাপ্পা হয়ে ওঠে (দুই একজন ছাড়া)। নিজের চেয়ে অনেক বড়ো কিছুকে দেখলেই তারা তাদের বিরক্তি দমন করতে পারেনা, সুতরাং তাকে নষ্ট করে ফেলাই তাদের একমাত্র কাম্য হয়ে ওঠে ; আর তাইই তারা বরাবর করে এসেছে, মানব-ইতিহাসের গোড়া থেকেই। বিশিষ্ট রকমের গুণাবলী পেয়ে ও ভগবানের কৃপা নিয়ে যারাই এখানে এসেছে, আর জগতের মানুষকে তাদের গতানুগতিক খাতের ভিতর থেকে তুলতে চেষ্টা করেছে, তাদের সকলকেই বিস্তর নিগৃহীত হতে হয়েছে, আত্মবলি দিতে হয়েছে, তাদের হয় পুড়িয়ে মারা হয়েছে নয় ক্রুসে বিদ্ধ করা হয়েছে।...এখনকার দিনের অবস্থা তার চেয়ে কিছু ভাল, কারণ এখন কাউকে পুড়িয়ে মারতে হলে তার যুক্তিযুক্ত কারণ দেখাতে হয়—তা আর অত্যন্ত ব্যাপার নেই—কিন্তু মনোভাবটি বিশেষ বদলায়নি। কেউ যে আমাদের ছাড়িয়ে উঠেছে এটা দেখলেই সাধারণ মানুষের জিঘাংসা-প্রবৃত্তি জেগে ওঠে, কারণ নিজেদেরকে তখন তারা বড়ো হীন বোধ করতে থাকে, কেউই তা পছন্দ করেনা।

প্রশ্ন : কখনো কখনো আমি ঘুম ভেঙে উঠে সবই ভুলে যাই, কোথায় যে আছি সে কথাও ভুলে যাই। এর কারণ?

উত্তর এর কারণ ঘুমের সময় তুমি নিশ্চেতনের মধ্যে গিয়ে চেতনার সংস্পর্শ হারিয়েছিলে, তা ফিরে আসতে কিছু সময় লাগছে। অবশ্য নিশ্চেতনের বদলে তুমি

অতিমানসেও চলে যেতে পারো, কিন্তু তা প্রায় হয়না। আর সে ক্ষেত্রে তোমার অনুভবও অন্যতরো হয়না, সব ভুলে যাওয়ার বদলে এমন এক বাস্তব বোধ আসে যে সাধারণ জীবনের চেয়ে উপরে কোথাও উঠেছি, আমি সেই মানুষ আর নেই। আর চেতনার সংস্পর্শ কেটে যাবার অর্থ তুমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চেতনের মধ্যে ছিলে। সত্তা সেখানে ছড়িয়ে পড়ে নিশ্চেতনে ডুবে ছিল, তাকে অতঃপর গুছিয়ে গুটিয়ে আনা দরকার। অস্তিত্বের প্রথম দিকের চেয়ে তা অবশ্য তাড়াতাড়িই এসে যায়, তবু তোমাকে চেতনার সূত্রগুলি জড়ো করে আনতে হয়, তখন আবার জানতে পারো যে তুমি কে।

প্রশ্ন : কখনো বা স্বপ্নের মধ্যে এমন আশ্চর্যস্থানে কিংবা কোনো বাড়িতে বা রাস্তাতে গিয়ে পড়ি যা আমি জীবনে কখনো দেখিনি। কেমন করে তা হয়, এর অর্থ কি হতে পারে?

উত্তর এর অনেক কারণ থাকতে পারে। হয়তো তখন তুমি দেহ ছেড়ে বাইরে বেড়াতে বেরিয়েছিলে। কিংবা হয়তো ওগুলি গতজন্মের স্মৃতি থেকে এসেছে। কিংবা হয়তো অপর কারো চেতনার সঙ্গে মিশে গিয়ে তুমি তারই স্মৃতিগুলো দেখছিলে। কিংবা ওটা তোমার একরূপ পূর্ববোধও হতে পারে (ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা কিছু আগের থেকে স্বপ্নে দেখা),—যদিও এরূপ দৈবাৎ হয় তথাপি তাও হয়ে থাকে।

সেদিন তোমাদের বলেছি জাপানের দৃশ্যগুলির কথা। তার প্রায় সবগুলিই—বিশেষত যেগুলি খুব সুন্দর ও চমকপ্রদ—সেগুলি আমি ফ্রান্সে থাকতেই অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছিলাম; তখন আমি জাপানের সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না, কোনো ছবি পর্যন্ত দেখিনি। ঐ সব দৃশ্যের মধ্যে কোনো মানুষ ছিলনা, শুধুই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, দেখে মনে হতো এসব জড়জগতের নয়, এমন সুন্দর জিনিস এখানকার হতে পারেনা। বিশেষত প্রায়ই দেখতাম যে ওখান থেকে খুব লম্বা লম্বা সিঁড়ি আকাশ পর্যন্ত উঠে গেছে, সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে অনেক উচ্চে চলে যাওয়া যায়...অতপর যখন বাস্তবেই সেই দৃশ্য দেখলাম তখন মনে পড়ল যে জাপান দেখার অনেক আগে ফ্রান্সে থাকতেই এ দেখেছি।

এ রকম স্বপ্ন দেখার ব্যাপারের নানারূপ অর্থ থাকতে পারে, একজনের দেখার অর্থ অন্যের পক্ষে বলা খুব কঠিন। নিজেই তুমি যদি তোমার স্বপ্নের ও ঘুমের সময়কার জিনিসগুলিকে নিয়ে নিবিষ্টভাবে আলোচনা করতে থাকো তাহলে তার ভিতরকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ইতরবিশেষগুলিকে চিনে নিতে পারবে। যেমন আমার মনে হয়েছিল যে আমি অন্য কোনো জগতের দৃশ্য দেখছি—জানতাম যে এর অস্তিত্ব কোথাও আছে, কিন্তু তা যে এই বাস্তব জগতেই আছে সে কথা ভাবতে পারিনি; আবার তা অসম্ভব বলেই মনে হয়েছিল—এমনই চমৎকার সে দৃশ্য। আমার বুদ্ধিটা তখন সক্রিয় হয়ে ঐ কথাই বলেছিল। তবু তার যে প্রকৃত

অস্তিত্ব কোথাও আছে এটুকু জানলাম, অতঃপর যখন নিজের চোখে সেই সব দৃশ্য দেখলাম তখন বুঝলাম যে বাস্তবেই ওর অস্তিত্ব রয়েছে, যদিও আমি দেখেছিলাম অন্তর্দৃষ্টিতে (সূক্ষ্ম-দেহের দৃষ্টিতে), চোখে দেখার আগে। এইভাবে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ছোটোখাটো নিদর্শন পেয়ে যায়, কিন্তু তাকে খুব নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, সামান্য চিহ্নটিকেও অবহেলা করলে চলবেনা। আর বিশেষ করে সেখানে নিজের মনের ধারণা দিয়ে কোনো অর্থ করতে যাবেনা। কারণ যদি নিজের কাছেও নিজে তার অর্থ বোঝাতে যাও (অন্যের কাছে না হলেও) যাতে তোমার মন খুশী হয়ে সায় দিতে পারে, তাতে তোমার কিছুই বোঝা হবেনা। তখন নিজের অজ্ঞাতেই তার চিহ্নগুলিকে নিশিয়ে ফেলবে। যেমন মনে করো তুমি স্বপ্নে দেখলে কেউ একজন তোমার কাছে এসেছে (অচেনা কেউ নয়, চেনা লোক যে এসে থাকে তোমার কাছে), এরই অনেক রকম অর্থ হতে পারে। সে যদি অনেক দূরদেশে থাকে, তাহলে হয়তো সে তোমাকে চিঠি লিখেছে, এবং চিঠিটা আসছে তোমার কাছে, সেই লোকটি ঐ চিঠির মধ্যে নিজের একাগ্রতা প্রয়োগ করেছে, তাই তুমি তাকে আগেই স্বপ্নে দেখলে এবং পরের দিন সকালে চিঠিটা এসে হাজির হলো। এমন প্রায়ই হয়ে থাকে। আর সেই লোকটির চিন্তাশক্তি যদি খুব সতেজ হয়, আর সেই দূর দেশ থেকে একাগ্রতার সঙ্গে সে তোমাকে স্মরণ করতে থাকে, তখন তার সেই একাগ্রতা তোমার স্বপ্নচেতনার মধ্যে রূপায়িত হতে পারে। হয়তো সে তোমাকে ইচ্ছা করেই আকুলতার সঙ্গে ডাকছে ; কিংবা সে তোমাকে কিছু বলতে চায় বা জানাতে চায় যে সে বিপন্ন কিংবা অসুস্থ ; মনে করো কোনো জরুরী কথা তোমাকে জানাতে সে খুব একাগ্র হলো (সকলের সেরূপ ক্ষমতা না থাকলেও তার তা থাকতে পারে), ,তখন তোমার আবহাওয়ার মধ্যে এসে সেই বিশেষ কথাটি তোমাকে জানিয়ে দেবে, আর তুমি গ্রহিষ্ণু ও অচঞ্চল থাকলে সে খবর তুমি পেয়ে যাবে। আরো দুই রকম জিনিস হতে পারে কোনো ব্যক্তি তার ঘুমের মধ্যে দেহ থেকে বেরিয়ে অল্পবিস্তর বাস্তবভাবেই খুঁজে খুঁজে তোমার কাছে এসে পড়তে পারে। তুমি তখন তাই জ্ঞাত হয়ে (অনেকটা অঘটনের মতো) তারই চেতনার অবস্থায় গিয়ে পড়তে পারো। অবশেষে এমনও হয়, কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পরে তোমার কাছে এসে উপস্থিত হলো (আংশিক বা পুরোপুরিভাবে, তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অনুযায়ী), তাই তুমি তাকে দেখলে। অতএব খুবই মনোযোগী না হলে এ সব স্বপ্নের সঠিক অর্থ বোঝা কঠিন। আবার যারা কল্পনাপ্রবণ তারা প্রায়ই বলে থাকে, "অমুক জন আমাকে স্বপ্নে দেখা দিলে —তাহলে সে নিশ্চয় মারা গেছে।" এমন কথা যে কতবার শুনেছি তার ঠিক নেই। এদের কল্পনা খুব তৎপর ; হয়তো সে মারাও যেতে পারে, কিন্তু স্বপ্নে দেখা দিলে বলেই মারা গেছে তা নয়।...কোন জিনিস কি বাহ্য আকার নিচ্ছে তার বিচার খুবই সতর্কভাবে করবে। সূক্ষ্ম জিনিসের এমন ইতরবিশেষ থাকে যার জন্য গভীর মনোযোগের দরকার হয়। আর কেবল নিজের জিনিসের বেলাতেই সেই ইতরবিশেষকে ধরা যায়, কিন্তু অন্যের

অনুভূতির অর্থ করা খুবই কঠিন, যদি স্বপ্নবিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানা না যায়, স্বপ্নের আগে কিরূপ ধারণা ছিল, পরে কিরূপ ধারণা হলো, তার স্বাস্থ্য বর্তমানে কেমন, ঘুমোতে যাবার সময় তার মনের অবস্থা কেমন ছিল, আগের দিনে সে কি কি করেছিল—এত সব কথাও জানা দরকার। যারা বলে, "অমুক ধরনের স্বপ্ন দেখেছি, এর মানেটা কি বলতে পারো?" সেটা তাদের নিতান্ত ছেলেমানুষি করা হয়; তাকে যদি তুমি খুব ভালোরকম জানো, ঘনিষ্ঠভাবে তাকে লক্ষ্য করে থাকো, চেতনার বিভিন্ন স্তর চিনতে তাকে শিখিয়ে থাকো, তার ধরনধারণ অভ্যাস ও আচরণ সবই তোমার জানা থাকে, তখন হয়তো বলতে পারো। নতুবা তা অসম্ভব, কারণ একই জিনিসের অসংখ্য অর্থ থাকতে পারে।

দেহ ছেড়ে বাইরে বেরোবার সম্পর্কে কয়েকটি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত আছে। তার মধ্যে বেড়ালদের নিয়ে দুটি গল্প তোমাদের বলি, যে ঘটনা আমি ফ্রান্সে থাকতে ঘটেছিল অনেক কাল আগে। তার মধ্যে একটি যুদ্ধেরও আগেকার কথা। আমি তিন চার জন বন্ধুর সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে বুধবার সন্ধ্যায় এক বৈঠকে একত্রে মিলিত হতাম, সেখানে দার্শনিক তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হতো। আমাদের মধ্যে ছিল একজন যুবা কবি, সে প্যারিসের একজন ছাত্র, বেশ তীক্ষ্ণবুদ্ধি। সে প্রতি বৈঠকেই নিয়মিত আসত, কিন্তু একটি বৈঠকে এলোনা। আমরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করলাম, তারপর বৈঠক শুরু হলো। বৈঠকের শেষে যেমনি সকলের বেরিয়ে যাবার জন্য দরজাটি খুলেছি (বৈঠক বসতো আমারই ঘরে), অমনি সামনেই দেখি মস্ত এক ঘোর ধূসরবর্ণ বেড়াল; সে ঘরের মধ্যে পাগলের মতো লাফ দিয়ে এসে আমার গায়ের উপর পড়ে কাতরভাবে ডাকতে শুরু করলে। কিন্তু ওর চোখ দুটো দেখেই আমার মনে হলো, এ তো ঠিক সেই যুবকের মতো চাইছে (যার জন্য আমরা সেদিন অপেক্ষা করেছিলাম)। আমি তখন সবাইকে বললাম, "নিশ্চয় তার কিছু একটা হয়েছে।" পরের দিন জানলাম, গত রাত্রে কে তাকে তার বিছানাতে খুন করে গেছে। এই এক সত্য কাহিনী।

দ্বিতীয়টি অনেক পরের কথা; প্রথম যুদ্ধের সময়কার, যখন চলেছিল ট্রেঞ্চের লড়াই। একটি যুবককে আমি চিনতাম, সে ছিল একজন কবি ও শিল্পী, (এর কথা আগেও বলেছি)। বয়সে তরুণ, যুদ্ধে সে একজন অফিসার হয়েছিল। সে ভালোরকম সংস্কৃত জানতো, বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী ছিল; সাধারণ প্রকৃতির ছেলে নয়, আধ্যাত্মিকতার দিকে একটা টান ছিল। সে আমাকে তার একটি ফটোগ্রাফ দিয়েছিল, তাতে সুন্দর অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় একটি কথা লিখে দিয়েছিল। আমি সেটি বাঁধিয়ে রেখেছিলাম ড্রয়ারযুক্ত উঁচু এক সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপর। যুদ্ধের সময় খবরাখবর পাওয়া খুব কঠিন ছিল, কোথায় যে কি হচ্ছে জানা যেতনা। কখনো কখনো ঐ ছেলেটির চিঠি পেতাম, কিন্তু অনেকদিন কোনো চিঠি আসেনি। একদিন যেমনি আমি ঘরে ঢুকেছি, অমনি দেখি ওর ছবিটা নীচে পড়ে গেল,

ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে তার কাঁচ ভেঙে গেল। আমি চিন্তিত হয়ে উঠলাম, বললাম "নিশ্চয় ওর কিছু হয়েছে।" কিন্তু খবর কিছু পেলাম না। এর দুদিন পরে, আমি গেট খুলে যখন ভিতরে ঢুকছি (তখন ছিলাম এক বাড়িতে দোতলার ঘরে, নীচেও কয়েকটি ঘর ছিল, সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে বাগানে যেতে হতো), হঠাৎ দেখি নতুন বড়ো এক বেড়াল — এটি ছিল হাল্‌কা ধূসর রঙের—সে ঐ পূর্বোক্ত বেড়ালটারই মতো ছুটে এসে আমার গায়ের উপর লাফিয়ে পড়ল আর মিউ মিউ করতে লাগল, আর আমি তার চোখের দিকে চেয়ে দেখি ঠিক সেই ছেলেটির মতো চোখ। বেড়ালটি মিউ মিউ করে আমার চারিদিকে ঘুরতে থাকল আর কাপড় ধরে টানতে থাকল। আমি বাইরে তাকে তাড়াতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনোমতে সে নড়তে চায় না। এর পরের দিনই খবর পাওয়া গেল, ছেলেটিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে দুই দিকের ট্রেঞ্চের মাঝখানে, তিন দিন আগে সে মারা গিয়েছিল। অর্থাৎ যেদিন ফটোগ্রাফটি পড়ে ভেঙে গেল ঠিক সেইদিন। তখন তার চেতনা দেহ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, আর দেহটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, কারণ দুই পক্ষের ট্রেঞ্চের মাঝখানে কি হচ্ছে তা কেউ গিয়ে দেখতে পারে না। দুদিন বাদে তার সন্ধান মিলল। কিন্তু তখনই সে দেহবন্ধন থেকে ছাড়া পেয়ে আমাকে জানাতে চাইছিল তার মৃত্যুর কথা, তাই ঐ বেড়ালকে ধরে সে এসেছিল। বেড়ালরা প্রাণময় জগতের হওয়াতে ওদের প্রাণিক চেতনা থাকে, প্রাণিক শক্তি সহজে সেখানে এসে ভর করতে পারে।

তবে এ দুটি দৃষ্টান্ত খুবই অসাধারণ, আর দুটির বেলাতেই একই রকম ভাবে কাজ হয়েছিল—দুই বেড়ালেরই চোখের ভাব সম্পূর্ণ বদ্‌লে গিয়ে নির্দিষ্ট মানুষ দুটির মতো চোখ হয়েছিল।

এপ্রিল ১৭, ১৯৫১

(মায়ের 'কথাবার্তা' হতে) "আধ্যাত্মিক জীবন এই সত্যকে জানিয়ে দেয় যে সব কিছুর মধ্যে মূলবস্তু একটিই, আর সেই একই অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকটিত ; আধ্যাত্মিক জীবন এইভাবে কাজ করে যাতে সেই একই বহুর মধ্যে সম্যক অভিব্যক্ত হয় আর তা যেন সেই বহু বিচিত্রের মধ্যে পূর্ণ পরিণতি পায়।"

বিশ্বসৃষ্টির মূল তাৎপর্যই তাই ; অর্থাৎ সবই যদিও মূলে এক ও অভিন্ন, কিন্তু প্রত্যেক জিনিস, প্রত্যেক মৌলবস্তু, প্রত্যেকটি সত্তার কাজ হলো ওরই এক এক অংশকে নিজের দিক থেকে নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তুলবে আর আপন আপন বৈশিষ্ট্যের সর্বোত্তম বিকাশ করতে থাকবে—সেই সঙ্গে তার মূল ঐক্যবোধের মধ্যেও ক্রমশ জেগে উঠবে। এই হলো "বহুর

মধ্যে একজে অভিব্যক্ত করার কাজ।" আর তার পূর্ণ পরিণতি মানে প্রত্যেকেরই চরমভাবে যতদূর পর্যন্ত বিশিষ্ট বিকাশ হবার কথা ততটাই সে হয়ে উঠবে।

প্রশ্ন : আমাদের ঘিরে থাকা আবরণকোষও কি কামনার তরঙ্গকে ও অন্যদের থেকে আসা প্রভাবস্পন্দন প্রভৃতিকে রোধ করতে থাকে?

উত্তর : তুমি কি স্থূলদেহের আবরণের কথা বলছ, যার কথা আমি দেহ সম্পর্কে বলেছি, তা কি নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াগুলিও করবে? না, সেই এই স্থূল আবরণ নয়, কারণ তা হলো অন্য বিভাগের ব্যাপার। তোমার সূক্ষ্মদেহের ঢাকনি অটুট থাকলে তা সকল আধিব্যাধির হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবে, কিন্তু তখনও সর্বপ্রকার কামনা বাসনা তোমার ভিতরে পুরাপুরিভাবে কাজ করতে পারবে, কারণ এগুলি হলো অন্য রাজ্যের জিনিস। কামনা দেহের তরঙ্গের জিনিস নয়, প্রাণের তরঙ্গের জিনিস, আর এ আবরণ প্রাণের নয়, বাস্তব দেহের—সুতরাং প্রাণের জগতের কোনো প্রভাবকে সে নিবারণ করতে পারেনা। অবশ্য যদি নিজের উপর স্বাধিকার অর্জন করে থাকো, ভিতরের চৈত্যের সন্ধান পেয়ে থাকো ও তার সঙ্গে সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠ করে থাকো, ভিতরের ভগবৎ-উপস্থিতির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে থাকো, তাহলে তুমি সকল কামনাদির বিরুদ্ধে এমন জ্ঞান আলো ও সৌন্দর্যের পরিবেশ নিয়ে থাকবে, যে তাই-ই তোমার পক্ষে দুর্ভেদ্য বর্মস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। তবুও কিন্তু কামনার প্রবেশের সম্ভাবনা থেকে যাবে, সুতরাং তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে সব সময়েই; কারণ আমরা বলি যে কামনা আসে বাইরের দিক থেকে। কামনাকে হয়তো ভিতর থেকে তুমি দূর করতে পেরেছ, তবু তা সংক্রামকের মতো বাহির থেকে ঢুকে পড়তে পারে। তবে তোমার জ্ঞান আলো ও পবিত্রতার বর্ম ভেদ করে যেতে গিয়ে তার তেজ অনেক কমে যাবে, তখন তার অন্ধ আবেগের ক্রিয়াতে প্রভাবিত হয়ে পড়ার পরিবর্তে তুমি দেখতে পাবে যে ব্যাপারটা কি হচ্ছে, কিসের বেগ তোমার মধ্যে প্রবেশ করতে চাইছে, আর তা তোমার অনভিপ্রেত হলে নীরবে আপন ভিতরের ক্রিয়ার দ্বারা তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে। এই একমাত্র প্রকৃত প্রতিরোধ; সর্বদা সজাগ থাকো এক নির্মল চেতনা নিয়ে, সে চেতনা যেন কখনো ঘুমিয়ে না পড়ে, যেন সে আগে পর্যবেক্ষণ করা ব্যতীত কোনো কিছুকে ঢুকতে না দেয়। দুঃখের বিষয় এই যে লোকে থাকে অচেতন হয়ে, তার পর সংক্রমণ ঢুকে পড়লে তখন তারা চেতন হয়, কিন্তু ততক্ষণে তাকে প্রতিরোধ করতে বিলম্ব হয়ে গেছে, —কাজেই একেবারে অসম্ভব না হলেও তখন তাকে তাড়ানো কঠিন হয়। অপরপক্ষে যদি তুমি তাকে চোকার মুখেই দেখতে পাও যে ক্ষুদ্র একটি কালো জিনিস তোমার আবহাওয়ার মধ্যে আসছে, তখনই তাকে ত্যাজ্য জিনিসের মতো ঝেড়ে ফেলতে পারো। কিন্তু এ স্থলে

তোমার ঐ সূক্ষ্মদেহের আবরণকোষের দ্বারা কোনো কিছুই কাজ হবে না, ওর এতে কোনো ক্ষমতা নেই।

তবে এ কথাটি উল্লেখযোগ্য...বাস্তবের দিকটা এখন এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে বাস্তবের যন্ত্রকে তুমি সকল বিভাগেই সুপরিণত করে তুলতে পারো,—চৈত্য বা আভ্যন্তরীণ উন্নতির মাত্রা যাই কেন থাক। কালকের টকি সিনেমা দেখে আসার তাই মনে হচ্ছিল সিনেমা-শিল্পের উন্নতি খুবই হয়েছে, তাতে ভালো কি মন্দ হয়েছে তা বলতে পারিনা। আজ দেখলাম যা, তা একটা নিম্নজাতীয় নোংরা গল্পের ছবি—আজকাল এই সব হীনভাবের ছবি সাধারণকে দেখানো হচ্ছে এবং যন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হওয়াতে তার বর্বর স্থূল নগ্নতা খুবই প্রকট হচ্ছে। কিন্তু গতকাল যে সুন্দর প্রামাণ্য চলচ্চিত্রটি দেখানো হয়েছিল তাতে দেখতে পেলাম সুন্দর সুন্দর পাখিরা কেমন স্বাভাবিকভাবে গান করছে...যারা এ ছবি তুলেছে তাদের এর জন্য যে কতখানি মেহনত করতে হয়েছে তার কোনো ধারণা করা যায়না—কারণ পাখিরা যখন নির্বিঘ্নে তাদের বাসায় বসে স্বচ্ছন্দে কাকলি করছিল, তখন তাদের কিছুমাত্র না জানিয়ে খুব দক্ষতার সঙ্গে সেই ছবি নিতে হয়েছে আর তাদের স্বাভাবিক স্বরগুলিকেও নিখুঁতভাবে ধরতে হয়েছে, তবেই তাকে এমন যথোচিত বিবর্ধিত করে সকলকে শোনানো যাচ্ছে। খুব বাহাদুরির কাজ বলতে হবে। অথচ যে যন্ত্র দিয়ে আজকের এই জঘন্য ছবি তোলা হয়েছে সেই একই যন্ত্র দিয়েই কালকের অমন সুন্দর ছবিও তোলা হয়েছে।...বাস্তবের দিকের ভালোমন্দ এই থেকেই বোঝা যাবে।

বাস্তবের দিকে উন্নতি করলেই যে আধ্যাত্মিকের দিকে এগোনো যাবে এমন কথা আদৌ বলা যায় না। বাস্তবের দিকের উন্নতি মানে তার যন্ত্র এমন নিপুণ হয়েছে যে শক্তির ক্রিয়া—যে-কোনো শক্তির—তার মাধ্যমে সুপ্রকাশ হতে পারবে। কিন্তু এখানে সব চেয়ে বড়ো কথা এই যে কোনরকম শক্তির মাধ্যম তাকে করা হবে তাই আগে নির্বাচন করা চাই। দেহকে যদি তুমি নিপুণ যন্ত্র করে তুলতে পারো, তাতেই আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে সুরাহা হলো এমন কথা মনে কোরোনা। যন্ত্রকে তুমি আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে উপযুক্ত করে তুললে, এই পর্যন্ত। কিন্তু যা তার দ্বারা অভিব্যক্ত করবে সেটা তোমার নিজেকেই বেছে নিতে হবে। অনেকে দেহকে মজবুত সাবলীল সুগঠিত ও সুপটু করে তোলে কেবল তাদের গর্বকে অহংকে তোষণ করতে, আবার কেউ কেউ তা করে যাতে আধ্যাত্মিক আলো এসে পড়লে তাকে গ্রহণ করে তারই উদ্দিষ্ট কর্মগুলি সম্পন্ন করতে পারে। যাতে এই যন্ত্র দিয়ে যে কাজই করানো হোক তা সে অবলীলাক্রমে ও নিখুঁতভাবে সুসম্পন্ন করতে পারে।...এই কথাটাই বিশেষভাবে জানা দরকার যে কোন শক্তিকে তুমি তোমার দেহের মাধ্যমে অভিব্যক্ত করবে তা তুমি নিজে বেছে নেবে। দেহকে ভালভাবে গড়ে তোলো, তাকে সুযোগ্য যন্ত্র করে তোলো, কিন্তু একবারও ভুলোনা যে অভীপ্সিত শক্তিকে তোমায় বেছে নিতে হবে—

কেবল একবারের জন্য নয়, নিত্যই নতুন করে বার বার তাই করে যেতে হবে। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণবিলন ও তোমার পূর্ণ বিকাশ না ঘটছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাজ নষ্ট করে দিতে বাইরের সব আক্রমণ চলতেই থাকবে। সুতরাং নিত্যই সতর্ক থাকা অপরিহার্য। কেবল একবারের মতো সিদ্ধান্ত করে নিয়ে তার পর নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলে, "এবার সব ঠিক হয়ে যাবে, আর চিন্তা নেই", এই বলে যেন ঘুমিয়ে থেকোনা। যুক্তির দিক থেকে সবই ঠিক কথা ; তোমার উদ্দেশ্যের আন্তরিকতার স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও তুমি নিঃসন্দেহ। তবু তোমার সে আন্তরিকতা যাতে অটুট থাকে তার জন্য সর্বদাই সজাগ থাকা দরকার—তার মানে সত্যিই রাত্রে ঘুমোবেনা সে কথা বলছিনা, আমি বলতে চাইছি যে চেতনাকে জাগিয়ে রেখো। এ হলো কেবল প্রস্তাবনা, এর পর শ্রীঅরবিন্দের একটি চিঠি যেটি লেখা হয়েছিল অনেক আগে বোধ করি ১৯২৮ সালে। তাতে দেখবে যে জগতের অবস্থা খুব তাড়াতাড়ি বদ্‌লে যায়না।

প্রশ্ন : আপন সত্তার যা বৈশিষ্ট্য তার বিকাশ কেমন করে করতে হবে ?

উত্তর : তোমার জীবনযাপনই হবে তাই নিয়ে, অর্থাৎ তোমার সত্তার আভ্যন্তরীণ সত্য ও আভ্যন্তরীণ বিধানকে অনুসরণ করে। এ কথা আমি "জীবন বিজ্ঞান" এর (The Science of Living)-এর সূত্রে বিশদভাবে বলেছি। বলেছি যে সত্তার সত্য প্রত্যেকেরই নিজস্ব।

প্রশ্ন : আর তা প্রত্যেকেরই ভিন্ন, নয় কি ?

উত্তর : প্রত্যেকের বিধান তার পক্ষে স্বতন্ত্র হবেই, নতুবা পার্থক্য হয় কেমন করে ? নতুবা প্রকৃতির সব কিছুর চেহারা ও কাজগুলো যে একই রকম হয়ে যেতো। বিধান যদি একই হতো তাহলে সবাই তারই পুনরাবৃত্তি করতে থাকত। তাহলে বিশ্বে বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি হতোনা, সবই চলত একঘেয়ে এক নিয়মে। কিন্তু বিশ্বের স্বরূপই হলো অনন্ত রকম নিয়মের অনন্ত বৈচিত্র্য, আর তারই ভিতর দিয়ে সমগ্রভাবে অনন্যের অভিব্যক্তি। এইটাই হলো বাস্তব জগতের পরমাশ্চর্য (এবং মানুষের বেলাতেও তাই, কারণ পার্থিব সত্তা মাত্রেরই এই বৈশিষ্ট্য)—অসংখ্যের মধ্যে সেও একটি, সমগ্রের সঙ্গে মিশে সেও হতে পারে সেই অনন্য, অথচ নিজে সে স্বতন্ত্ররূপে তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অর্থাৎ তার মধ্যে সেই অনন্যের চেতনা রয়েছে বিধৃত, এবং সে তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, অথচ সমগ্রের দিক থেকে সেও তারই এক অংশ। কিন্তু তারই চেতনা পেয়ে তার সঙ্গে একান্ত হয়ে যদি তোমার বৈশিষ্ট্য লোপ পায়, তাহলে তোমার স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্ব আর রইলনা। বৌদ্ধ ও শংকরবাদীরা এই জিনিসই উপলব্ধি করতে চেয়েছে ; ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ বর্জন করে তারা সত্তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য

ও বিধানকে লুপ্ত করে দিতে চেয়েছে। একেই তারা বলেছে পরাৎপরের সাযুজ্য। কিন্তু এতে সৃষ্টিকে অস্বীকার করা হয়। তাই আমি বলছিলাম, সৃষ্টির মধ্যে থেকে পার্থিব ব্যক্তিত্বের এটাই পরমাশ্চর্য যে তুমি ঐ নিয়ে থেকেই ভগবানের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলে গিয়ে একের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারো, আবার সেই সঙ্গেই তোমার বৈশিষ্ট্য-চেতনাকেও বজায় রেখে আপন সত্তার বৈশিষ্ট্যে অভিব্যক্তির বিকাশ করতে পারো। এ পন্থা আরো কঠিন বটে, কিন্তু এর পূর্ণতা আরো অনেক বেশি, আর বিশ্বসৃষ্টির গূঢ় সত্যও তাই। বিশ্বের সৃষ্টি এইজন্যই হয়েছে, দুই প্রান্তকে এক করা, চেতনার দুই প্রান্তকে একত্রে মিলিয়ে দেওয়া, এ ছাড়া অন্য কিছু কারণ নেই। মিলে গেলে দুটি প্রান্ত একই জিনিস—আর এক হয়েও অসংখ্য বৈচিত্র্য নিয়ে তা সমগ্র।

প্রশ্ন : কিন্তু আমি যে নিজে বোধ করছি অন্যেদের থেকে আমি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

উত্তর : বাহ্যতঃ তাই বটে।

প্রশ্ন তাহলে এ তো অজ্ঞানতা।

উত্তর : না, অজ্ঞানতা সেইখানে যেখানে তুমি মূলের একত্বে, আদি অনন্তকে অস্বীকার করছ। আর অভিব্যক্তির বাহ্য স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করা, একে আমি নূঢ় অজ্ঞানতা বলে মনে করি। স্বাতন্ত্র্য না থাকলে অভিব্যক্তির অর্থ কি? তার ফল কি হবে? তাহলে তার অর্থ হবে এই যে সৃষ্টির গোড়াতেই ছিল নির্বুদ্ধিতা। এমন সৃষ্টির যদি উদ্দেশ্য কিছু না থাকে, তার মানে বিবেচনাপূর্বক কিছু করা হয়নি; বিধাতা হয়তো একটা ভুল কাজ করেছেন, অথবা তিনি যে কি করতে চান তা নিজেই বোঝেন নি। এক ভেবে আর করে ফেলেছেন। এ ছাড়া আরো বলব, বিশ্বের সব কিছু যদি একই রকমের করা হতো, তাহলে প্রশ্ন হতো যে এমনতরো অস্তিত্বের আদৌ কি প্রয়োজন ছিল? তোমরা যারা সামনে বসে আছো, সকলেই যদি একরকম হতে, একই কথা বলতে, একই রকম ভাবতে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সব একই রকম করতে, তাহলে আমি তো তখনই এখান থেকে সরে পড়তাম।

প্রশ্ন : আপনি বললেন, তৃতীয়বার বিশ্বযুদ্ধ বাধলে 'বর্তমান' সভ্যতা লোপ পেয়ে যাবে। পৃথিবীর অবস্থা তাতে ভালো হবে কি মন্দ হবে?

উত্তর : একটা কথা বলি, মারাত্মক রোগ যদি কিছু হয়, সেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো হয় না মন্দ হয়? এও ঠিক তেমনি। একটা সভ্যতা, সে যেমনই কেন হোক, বহুকালের চেষ্টাচরিত্রে গড়ে উঠেছে, আর নিজেকে জেনে ও প্রকৃতিকে জেনে তার উপর আধিপত্য

করে তার দ্বারা যথাসাধ্য নিজের কাজ হাসিল করছে। এইমাত্র আমরা বলছিলাম দেহকে এমনভাবে গড়ে নিতে হবে যাতে তাকে যন্ত্রস্বরূপ করে তার মাধ্যমে ভগবান নিজেকে অভিব্যক্ত করতে পারেন। তেমনি একটা সভ্যতাও যন্ত্ররূপে প্রস্তুত হয়ে উঠছে, যার মাধ্যমে তিনি অভিব্যক্ত হতে পারেন। যতই ধীরে ধীরে ও বহু যত্নে সে সভ্যতা তৈরি হয়ে ওঠে আর প্রকৃতির বিধানকে জয় করতে সক্ষম হয়, ততই তা ঐ অভিব্যক্তির পক্ষে অনুকূল হয়ে ওঠে। আরো ঠিক সেই কারণেই আমরা চাই দীর্ঘজীবন লাভ করতে, যাতে ক্রমশ যন্ত্ররূপে নিখুঁত হয়ে উঠে বিকাশোচ্ছু ভগবৎশক্তির সম্যক বিকাশের সহায়ক হতে পারি। নতুবা এ তো সহজ কথা, দেহটা যেমনি অসুস্থ হলো বা প্রাচীন হয়ে গেল বা যৌবনোচিত প্রতিক্রিয়া করতে অপারগ হলো, অমনি জীর্ণবাসের মতো তাকে ত্যাগ করে আবার নতুন দেহ নিলাম। দুঃখের বিষয় তাতে তেমন কাজ হয় না। তোমার প্রচেষ্টার যত কিছু ফল, চেতনালাভের যা কিছু প্রয়াস, সমস্তই নষ্ট হয়ে যায়। তেমনি দেখ, এই যে সভ্যতা এতদিনে গড়ে উঠেছে, প্রকৃতির বিধানের উপর অনেকটা অধিকার স্থাপন করতে পেরেছে, গুহ্য বিশ্বনিয়মগুলিকে অসামান্যরকমে আবিষ্কার করেছে, আর সকল দিক দিয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভের ফলে অনেক কিছু জেনে নিজেকে বিকাশ করে আনতে পেরেছে, এত কিছু যদি সবই ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে আবার সেই গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। নতুন জন্ম নিয়ে কোনো শিশুর পক্ষে শিক্ষাগ্রহণের পাল্লাতে পড়ে যখতে যখতে মস্তিষ্ক তৈরি হয়ে উঠলে তার পর একটা অতি সাধারণ ধারণাকেও ব্যক্ত করতে সক্ষম হবার জন্য তার কত বছর সময় লাগে, আর অচেতনের কাজগুলির পরিবর্তে চেতনার কাজ করবার মতো হতে তার কত বছরের চেষ্টার প্রয়োজন হয়? তেমনি একটা নতুন সভ্যতার পক্ষে আগেকার যতটা সফল সে হারিয়েছে, ততটা আবার ফিরিয়ে আনতে কত যুগ সময় লাগবে? পৃথিবীতে এর আগে অনেকবার অনেক সভ্যতাই গড়ে উঠেছিল, এখনকার পণ্ডিত জনেরা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছে সেই সব প্রাচীন তথ্য, কিন্তু কেউই সঠিক বলতে পারছেনা যে তখনকার ব্যাপার কেমন ছিল। সে সব সভ্যতার অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমি বলছি আমাদের কাছে ইতিহাসেরও অনধিগম্য আগেকার সভ্যতার কথা। অতএব এর পরে যদি আবার কয়েক সহস্র বছর লেগে যায় নতুন সভ্যতার গোড়াপত্তন হতে, তাহলে...অন্ততপক্ষে আমাদের বাহ্য মানবচেতনার দিক থেকে তাকে বৃথা সময়নষ্ট হওয়াই বলব। আমরা শুনে রেখেছি যে প্রতিশ্রুত ভগবৎ-কর্ম এখন বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। আর তা হবার পক্ষে সভ্যতার বর্তমান কাঠামোই সব চেয়ে অনুকূল, এর উপরে ভিত্তি করে সে জিনিস গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু এই সভ্যতাই যদি বিনষ্ট হয় তাহলে কিসের উপর তা গড়ে উঠবে? আগে চাই তার মেরুপীঠ, যার উপর তার স্থাপনা হতে পারে। সেই মেরুপীঠ খাড়া করতেই যদি আরো পাঁচ ছয় হাজার বছর সময় লেগে যায়, তার মানে এখন তা আর হবেই না—শেষ

পর্যন্ত হবেই নিশ্চয় তা আমাদের ভালো করেই জানা আছে, কোনো একদিন তা হবেই হবে কিন্তু...তোমরা এর আগে কত জন্ম পার হয়ে এসেছ সে কথা কেউ জানো কি? বলতে পারো, তোমাদের বিগত জন্মগুলির কথা কতখানি স্মরণ আছে? সেই সকল জন্মে ও জন্মান্তরে কত প্রচেষ্টা ও প্রয়াস করে নিজেকে পরিণত করে তুলেছিলে, কিছু আত্মজ্ঞান পেয়ে আত্মকর্তৃত্ব অর্জন করে নিজেদের যন্ত্রটিকে কাজের মতো করে তুলেছিলে, তা কোন কাজে লাগল? এখন তার কতখানি টিঁকে আছে? এ সব কথা কি বলতে পারো? তোমাদের মধ্যে কে বলতে পারবে যে গত গত জন্মের অভিজ্ঞতা হতে কতটা লাভবান হয়েছ—যচেতনে কিছু হয়ে থাকতে পারে, তাও বেশি নয়—কিন্তু চেতনে?—নিশ্চয় কেউই এ কথার জবাব দিতে পারবে না।

প্রশ্ন: না। বস্তুত এইটুকু মাত্রই ধারণা আছে যে এত বছর জীবনযাপন করে এখন মাত্র সামান্যই কিছু জানতে শুরু করেছি।

উত্তর: ঠিক বলেছ, হাঁ, এমনিই হয়। এর কারণ যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই দেখা যায় যে এখনও সব কিছুই বুঝতে বাকী আছে, শিখতে বাকী আছে। তাই, যদি তুমি ষাট বছর পিছনে ফেলে এসে থাকো, তাও মনে হবে সে কিছুই না। মনে হবে যে শত শত বছর যদি বেঁচে থাকতে পারি, তবেই কিছু কাজের মতো কাজ করতে পারি। এখনও তোমরা শিশু মাত্র, তাই নয়কি? তাই মনে হবে যে অনেক দীর্ঘ বছর পড়ে রয়েছে, বেশি বছরের সুযোগ পাওনি। যতই এগিয়ে যাবে ততই দেখবে যে আরো বিস্তর রাস্তা বাকী রয়েছে। সুতরাং আবার সেই গোড়া থেকে শুরু করতে কখনই তুমি চাইবে না, তাতে অনর্থক আরও বেশি সময় নষ্ট করা হবে।

প্রসঙ্গত

১১৫

জগৎ যেন পৌনঃপুনিক দশমিক যার পূর্ণসংখ্যা হলো ব্রহ্মন। কাল সম্বন্ধে মনে হয় যেন তার আরম্ভ ও শেষ আছে, কিন্তু মূল ভগ্নাংকটি হলো শাশ্বত; তার শেষ কখনই হবেনা, আর তার যথার্থ আরম্ভ বলতে কিছুই ছিল না।

১১৬

সব কিছুর আরম্ভের ও শেষের কথা আমরা যেমন বলে থাকি তা আমাদের অভিজ্ঞতারই প্রচলিত বাক্য মাত্র; প্রকৃত অস্তিত্বের দিক থেকে ওর বাস্তবতা কিছু নেই, কারণ শেষ বা আরম্ভ বলতে বাস্তবিক কিছু নেই।

গত সপ্তাহেই এ বিষয়ের অনুভূতি পুরোপুরি ভাবে ফুটে উঠেছিল। বস্তুত ব্যক্তির পক্ষে যা, জগতের পক্ষেও তাই, বিশ্বের পক্ষেও তাই। যা তারতম্য তা শুধু মাত্রার—ব্যক্তির বেলা খুবই ছোট, জগতের বেলা তার চেয়ে কিছু বড়ো, বিশ্বের বেলা আরো বড়ো। কিন্তু যেখানে আরম্ভ থাকবে সেখানে তার শেষও থাকবে।

প্রশ্ন: শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু বলেছেন যে "আরম্ভও নেই শেষও নেই।"

উত্তর আমরা আমাদের ভাষাতে কিছু একটা কথা বলতে বাধ্য হই, কিন্তু আসল কথা গলে বেরিয়ে যায়। আমাদের কাছে যে ভাবটিকে তর্জমা করে বলা হয় "শাশ্বত সদ্‌বস্তু", "পরাৎপর" "ভগবান," তার তো কোনো আরম্ভও নেই শেষও নেই (আমরা যদিও বলি "তা আছে, আছে"—কিন্তু তবুও কথাটা ঠিক হয় না, কারণ তার যা থাকা তা অনভিব্যক্ত ও অভিব্যক্ত দুইকেই ছাপিয়ে, সুতরাং অভিব্যক্তির মধ্যে থাকা দিয়ে তাকে পুরোপুরি জানা বা বোঝা যায় না), এবং সেই জিনিসেরই আরম্ভ বা শেষ নেই। অথচ নিত্যই তা শাশ্বতভাবে নিজেকে এমন কিছুর মধ্যে অভিব্যক্ত করছে যার আরম্ভ ও শেষ আছে। শেষ কেবল দুই প্রকারে হতে পারে—এক বিনষ্টি বা ধ্বংস হয়ে, আর এক রূপান্তর হয়ে,—যার অভিব্যক্তি যতই পূর্ণতা পায় ততই তার বিনাশের প্রয়োজন কমে আসে, শেষে এমন সময় আসে যখন নাশের বদলে রূপান্তরই ক্রমশ ঘটতে থাকে। কিন্তু এসব কথাই হলো মানুষের ধরনে বাধ্যভাবে বলা।

শব্দের দৈন্য সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন, অথচ শব্দের মাধ্যমেই সব জিনিস ধরতে হয়।...মানুষের চিন্তায় ও বিশেষত ভাব প্রকাশের ব্যাপারে বিড়ম্বনা এই যে মুখের কথায় তার কথা বললে কেবলই ধারণা আসে যে তবে ওর আরম্ভ বলতে কিছু একটা আছে।

(নীরব থেকে)

অভিব্যক্তিকে আমি প্রত্যক্ষবৎ বোধ করেছি—যেন হার্টের "ধুকধুক" করতে থাকার মতো একবার করে খুলছে আবার বুজে যাচ্ছে, আবার খুলছে আবার বুজছে...একটা সময় আছে যখন অভিব্যক্তি খুলে গিয়ে আর বুজবে না, তার এমন নমনীয়তা ও তারল্য ও শক্তিসম্পদ থাকবে যে আবার নতুন করে গড়বার জন্য তার বিলুপ্তির দরকার হবে না, সেই জিনিসই উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে। আমি একজন গুহ্য-বাদীকে জানি, যিনি বলতেন যে এটি হলো সপ্তমবারের বিশ্বসৃষ্টি, এর আগে ছয়বার প্রলয় হয়ে গেছে, এবারকার বেলাতে আর প্রলয় না হয়ে আপনা হতেই একটা রূপান্তর আসবে—তবে শাশ্বত চেতনাতে পৌঁছে গেলে এমনই হোক বা তেমনই হোক তাতে কিছু যায় আসেনা। কেবল সীমাবদ্ধ মানবচেতনাই এটা চায় যে কোনো কিছু লোপ না পাক, কারণ তার মধ্যে যে "শাশ্বতের স্মৃতি" জেগে আছে সে আশ্বস্ত করতে থাকে যাতে এই অভিব্যক্তিই শাশ্বতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু সেই শাশ্বতবোধটি যখন সক্রিয়ভাবে এসে পড়ে তখন আর কোনো কিছু ক্ষোভের থাকেনা—মলিন বস্ত্রটা ছেড়ে ফেললে কেউ কি তাতে ক্ষোভ করে (আসক্তি থাকতে পারে কিন্তু ক্ষোভ কেন হবে)? এও তেমনি, এ বিশ্বটা যদি লোপ পায় তার মানে এর কাজ পূর্ণ হয়ে গেছে, এর সর্ব সম্ভাবনাই সম্পূর্ণ হয়েছে, পরে আবার নতুন আসুক।

আমি এর সম্পূর্ণ বক্ররেখাটিকে অনুসরণ করে দেখেছি। চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের দিক দিয়ে তুমি যখন খুব শিশু, তখন বোধ করতে থাকো এই পৃথিবীটাই টিঁকে থাকা খুব দরকার, যেন চিরকাল এ বজায় থাকে (রূপান্তর যেমন হবার হোক, কিন্তু বর্তমান পৃথিবী যেন ঠিক থাকে)। তারপরে জ্ঞান যখন কিছু পেকে ওঠে তখন আর ঐ নিয়ে এতটা গুরুত্ব থাকে না। আর যখন শাশ্বতবোধের সঙ্গে নিত্য সংযোগ স্থাপিত হবে তখন আর এরূপ প্রয়োজনের ধারণাটি একেবারেই থাকবে না, তোমার সক্রিয় চেতনার কাছে ওতে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হবেনা, শুধুই পছন্দের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। দিন কয়েক পূর্বে (কোন দিন তা মনে নেই, কিন্তু খুবই সম্প্রতি) সেদিন সারা সকালটাই আমি ঐ চেতনাতে ছিলাম, আমি দেখলাম (সম্ভাবিকাশের বক্ররেখাকে অনুসরণ করে) যে—পৃথিবীর এ জীবনধারা যেন চিরকাল বজায় থাকে—এই ঐকান্তিক প্রয়োজনবোধ ক্রমশ বিষয়গত হয়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ তা আর অমন জরুরী থাকে না ; তখন এমন মনে হয় যেন এক অভিনয় দেখছি, আর মনে মনে বিচার করছি এ অভিনয় শেষকালে কি এমন পরিণতিতে না তেমন পরিণতিতে গিয়ে দাঁড়াবে। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই তা চিত্তাকর্ষক।

যেন কোনো শিল্পী নিজেকেই নিজে শিল্পে গঠন দিচ্ছে, আর একবার, দুবার, তিনবার করে নতুন নতুন গঠন দিয়ে পরীক্ষা করে যাচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত জিনিসটা মনোমতভাবে সম্পূর্ণ হয়ে নতুন অভিব্যক্তির সঙ্গে মানিয়ে যেতে না পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন অভিব্যক্তি এমন সন্তোষজনক হয়ে না ওঠে যাতে পুনঃপুনঃ নিজেকে সংবরণ করে মুছে ফেলা ও পুনঃপুনঃ বিশ্রুণকার্যের দরকার না হয়। কিন্তু তা ঐ পর্যন্তই, এ কেবল তার পছন্দের প্রশ্ন, যে কথা তখন বলছিলাম। একটা বস্তুরূপ দেবার আনন্দের জন্যই তো অভিব্যক্তি, তাই নয় কি (আনন্দই বলো আর কৌতূহলই বলো)? যখন এমন আকারে এসে দাঁড়াল যা আশানুরূপ নমনীয় ও সাবলীল ও গ্রন্থিক্ষু ও বিস্তারপ্রাপ্ত, যাতে অভিব্যক্তির শক্তিগুলি তাকে ইচ্ছামত নিত্য চালাই করে নিতে পারে, তখন আর তাকে ভেঙে গোড়া থেকে আবার নতুন করে গড়বার কোনো প্রয়োজনই থাকবে না।

ঐ বক্তব্যের সঙ্গে সেই প্রচলিত কথাটিও ছিল, "আরম্ভ থাকলেই তার শেষও থাকবে"—কিন্তু আমার মনে হয় ওটা মানুষের মনের তৈরি করা কথা, সে কথা যে সত্যই হতে হবে এর কোনো মানে নেই। কিন্তু ভাবের দিক থেকে, উপরের স্তর থেকে দেখলে এ প্রশ্নের ধারই অনেক কমে যায় (কিংবা বস্তুত কেন্দ্রস্থ হয়ে দেখলে)।

আর ব্যক্তির বলাতেও তাহলে সেই কথা..."আদি সূত্রের" কথা বলছি না কারণ এটা সূত্রের প্রশ্ন নয়—তবে জগতের পক্ষে ও বিশ্বের পক্ষে ও ব্যক্তির পক্ষে একই নিয়ম।

(বহুক্ষণ নীরব থেকে)

যেমনি কথাতে বলতে যাবো অমনি তা মিথ্যা হয়ে যাবে (মা হাত উল্টে দেখানোর ভঙ্গি করলেন)...এটা আমি লক্ষ্য করে দেখছিলাম, সর্বাত্মক মূল চেতনার সঙ্গে সম্পর্কের এই অনুভূতি: মানব-সত্তার সঙ্গে সর্বেসর্বার এই সম্বন্ধ; পৃথ্বীচেতনার সঙ্গে সেই সর্বেসর্বার, অভিব্যক্ত বিশ্বচেতনার সঙ্গে সর্বেসর্বার, বিশ্বনিয়ন্ত্রণকারী চেতনার সঙ্গে সর্বেসর্বার যা সম্বন্ধ এ এক অনির্বচনীয় ব্যাপার যে চেতনার প্রত্যেকটি অণুবিন্দু (যা কোনো স্থানই অধিকার করেনা), সেটুকুও সর্বপ্রকার অনুভূতিই পেতে পারে...এ সব কথা বুঝিয়ে বলা খুবই কঠিন।

এইটুকু বলা যায় যে সীমাই যত কিছু পার্থক্যের নিরূপণ করে—কালের, স্থানের, আয়তনের, শক্তির পার্থক্য। সীমাতেই সব করে। চেতনা যদি তার সীমাকে ছাড়িয়ে যে-কোনো আয়তনের অভিব্যক্তির যে-কোনো জায়গাতে গিয়ে পড়তে পারে (হাঁ, আয়তনে কিছুই যায় আসেনা), শুধু সীমা ছাড়িয়ে গেলেই সে আসল চেতনাতে এসে গেল।

আবার এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ কথাও বলা যায় যে সীমাকে মেনে নেওয়াতেই অসীমের অভিব্যক্তি ঘটতে পেরেছে। সীমার ভাবনা গ্রহণ করাতেই তার অভিব্যক্তির সম্ভাবনা এসে গেছে...কিন্তু এ বিষয়ে বলতে যাওয়া অসম্ভব। যেমনি বলতে যাবো অমনি তা বেঁকেচুরে পাল্টে যাবে (মা আবার হাত উল্টে দেখালেন)—বাস্ হয়ে গেল,

আসল কথা পালিয়ে গেল। অমনি দার্শনিক বুদ্ধি এসে বলবে : "এইভাবে বলো, ওই ভাবে বলো।" ভাষাতে বলতে গেলে : প্রত্যেক অণুবিন্দুর মধ্যে রয়েছে অনন্তের ও শাশ্বতের চেতনা (এটি কেবল কথাতেই বলা হলো, তা ছাড়া আর কিছু হলোনা)। তবে অনুভূতির সম্ভাবনা তো রয়েছেই। যেন স্নান কালকে উৎরে যাবার মতো। ক্রীড়াচ্ছলে এমনও বলতে পারো যে, এমন কি পাথরের মধ্যেও, এমন কি...হাঁ, জলের তো নিশ্চয়ই আছে, আগুনের তো নিশ্চয়ই আছে চেতনাশক্তি...এ সেই আদি চেতনা (যে বাক্যেই বলি সবই অর্থহীন।) মৌলিক চেতনা, আসল চেতনা (সবই অর্থহীন হচ্ছে।) যা নাকি অনন্ত, চিরন্তন...তবু কিছু অর্থ হচ্ছেনা, যেন স্বচ্ছ কাঁচের উপর ধুলো ছড়িয়ে তার স্বচ্ছতাকে ঝাপ্‌সা করে দেওয়া হচ্ছে।...শেষ পর্যন্ত, ঐ অনুভূতিতেই অবস্থান করে (এ কয়দিন যাবৎ তা পুন:পুন: ঘটেছে আর সকল কাজকর্ম করা সত্ত্বেও সবের উপর সেটাই সব চেয়ে প্রবল ও প্রধান হয়ে থেকেছে), সকল ব্যবস্থাগুলি যথাযথ পালন করতে থাকা সত্ত্বেও— আবহমান কালের সকল রীতিকেই মনে হয়েছে সব ছেলেমানুষি—তার পরে আর তাও নেই, কেবল হইল বেছে নেওয়া,—এমন হবো না তেমন হবো, এই বলব না ওই বলব— (তোমরা ছেলেবয়সে যেমনভাবে খেলা করো...যখন যেমন খেয়াল হয়)।

তবে এটি নিশ্চয় কথা (চলতি ভাষায় বলতে) যে কাজে লাগবার মতো প্রেরণা পেতে হলে মানুষের মনের পক্ষে দরকার একটি বাসস্থান ঠিক করে নেওয়া—যা হবে অল্পবিস্তর বড়ো এবং সম্পূর্ণ ধরনের এবং নমনীয় গোছের, তেমনি একটি তার ডেরা থাকা চাই। শুধু (হেসে) সেটি কিন্তু হয়না। তাতেই সব ভেস্তে যায়।

আর আশ্চর্যের কথা এই—এটাই খুব আশ্চর্য যে বাইরের দিক দিয়ে তুমি আপনা হতেই এক বিশিষ্ট ধারাতে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছ (তা প্রয়োজন মনে না হলেও), তাকে মেনে চলছ আপনা হতেই, এই বোধটুকু নিয়ে যে সীমাহীন ও অতিবৃহৎ কোনো কিছু তারই ইচ্ছাতে তোমাকে দিয়ে তাই করাচ্ছে (এটা ঠিক অনুভব করা নয়, কেবল খুব সূক্ষ্মরকমের একটা ধারণা)। তার "ইচ্ছাতেও" বলতে পারি, বা "খেয়ালেও" বলতে পারি, কিন্তু তা "ইচ্ছাতেই" হবে ; সে ইচ্ছা মানুষের ইচ্ছার মতো কাজ করেনা—সে ইচ্ছা মানে একেবারে তাই দেখা, তাই নিরূপণ করা। আর প্রত্যেক কিছুর মধ্যেই চলছে তার স্পন্দন, যা দীপ্ত, অবশ্যগ্রাহ্য...অতএব নিশ্চয়ই তা সর্বশক্তিমান। তার পিছনের দিকে রয়েছে অনস্বীকার্য নিশ্চয়তা, যা উপর থেকে নিচে নেমে এসে নিজেকে তোমার চেতনার মধ্যে রূপ দিচ্ছে ঈষৎ কৌতুক-হাস্যের সঙ্গে।

প্রশ্ন : ওর পরে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন সেই সব জগতের কথা যার কোনো আদি অন্ত নেই, আর তার সৃষ্টি ও ধ্বংস "আমাদের যাহা চেতনার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা।"

উত্তর : হাঁ, আমি যা বলছি তাইই অতি চমৎকার ভাবে বলা।

প্রশ্ন : আমার প্রশ্নটি এই যে ওই দিক থেকে বাস্তব জগৎকে বর্তমান থাকতেই স্পষ্ট দেখা যাবে, না সবস্তুই নয় হয়ে যাবে ?

উত্তর : সে অনুভূতিও পেয়েছি এ কয়দিনে। পুরো নিঃসন্দেহেই দেখলাম (যদিও ব্যক্ত করা কঠিন) যে বস্তুজগতের এই "ভ্রান্তি" যেটা রয়েছে তা ছিল অপরিহার্য ; অর্থাৎ এই বাস্তব ভাবে ও বাস্তব দৃষ্টিতে সব কিছুকে দেখা ও সেই ভাবেই তাকে জানা ও বোঝা, এটা হয়েছে ঐ "ভ্রান্তি" হতে, নতুবা হতে পারতনা, আর সত্যচেতনা এলে তখন আবার দেখবে যে অস্তিত্ব ঘুচে নয় হবার মতো কিছুই নয়, বরং দেখবে যে বিশেষ প্রকারে কিছু এসে যুক্ত হচ্ছে এবং সেই মূলগত চেতনাতে তাইই লক্ষিত হচ্ছে।

এই যে নির্দিষ্ট ধরনের বাস্তব ভাবে দেখা (যাকে বলো "যথার্থই" দেখেছি বা "ঠিকই" দেখেছি) এটাই যেন সৃষ্টিকে সমর্থন করে আছে, নতুবা থাকতনা। যার যখন সত্যচেতনা বা পূর্ণচেতনা বা মূলচেতনা আসবে আর সব কিছু ছেড়ে তারই মধ্যে অবস্থান করবে, তখন দেখবে যে একটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ধরনের স্পন্দন সর্বদা চলেছে, যে স্পন্দন ঐ বাস্তব সৃষ্টি ছাড়া থাকতনা।...এখন তোমাদের সেই চিরন্তনের প্রধান প্রশ্ন "কেন, কেন"—"কেন এমন হলো, কেন এই সব হচ্ছে ?"—যা মানব-চেতনাতে আকার নিচ্ছে দুঃখ, দুর্দশা, ব্যর্থতা, অপায়গতা প্রভৃতি হয়ে, সাধারণ চেতনার পক্ষে যত কিছু বিভীষিকার ব্যাপার—সেগুলো কেন ? কেন এত কিছু ? তার জবাব হচ্ছে এই : এগুলি ছাড়া মূল সত্যচেতনার যে সুনির্দিষ্ট স্পন্দন চলছে তার অভিব্যক্তির কোনো সুযোগ হতোনা। এটি খাঁটি কথা। "কেন" প্রশ্নের এই সর্বশক্তিমান ও সর্বাত্মক উত্তর।

এটা প্রত্যক্ষ—স্পষ্টই প্রত্যক্ষ—যে আমাদের কাছে যা উন্নতি ও তার অভিব্যক্তি, এগুলি শুধু আমাদেরই জানিত বাস্তবের রাজ্যের কার্যকারণ বিধান নয়, সবই মূল শাশ্বতের অভিব্যক্তির বিধান। পার্থিব স্তরের ভাবনাতে নেমে এসে তুমি বলতে পারো যে উন্নতি ছাড়া অভিব্যক্তি হয়না। কিন্তু আমাদের চেতনাতে যাকে উন্নতি বলছি, উপরের দিকের পক্ষে তা...অনেক কিছুই হতে পারে, হয়তো তাই তখন প্রয়োজন বা আর কিছু ; এক যে পূর্ণবস্তু রয়েছে, যাকে আমরা বুঝিনা, যা সত্তার পূর্ণ: অতএব আপাতত এটা এমন দরকার বলেই এমন হয়েছে, এই পর্যন্ত। কিন্তু আমাদের চেতনার কাছে তা উত্তরোত্তর ভালোর চেয়ে আরো ভালো, বেশির চেয়ে আরো বেশি—(বেকথার দাম নেই), আরো পূর্ণতর ও লক্ষণীয়। কিন্তু অভিব্যক্তির মূল কথাই তাই।

তার অনুভূতিটা চকিতের মতো এলেও খুবই সুনির্দিষ্ট, যাতে এমন কথা বলতে বলতে পারি যে—আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে, অনভিব্যক্তের একরকম "আস্বাদ বা আঘ্রাণ" আছে,—অভিব্যক্ত আছে বলেই তার সেই গন্ধটি আসে।

সবই হয়ে যাচ্ছে কথার কথা, কিন্তু তাইই যে আমাদের সম্বল। হয়তো কোনোদিন

আমরা এমন কিছু ভাষা ও বাক্য পেয়ে যাবো যার দ্বারা এ সব জিনিস ঠিকভাবে ব্যক্ত করতে পারব, কিন্তু তাও যদি সম্ভব হয় তবু সেও তর্জমাই হবে।

এখানে একটা স্তর আছে (বুকের উপরটা দেখিয়ে) যেখানে শব্দ নিয়ে, বাক্য যোজনা ও প্রতিরূপনিয়ে কিছু খেলা চলতে থাকে (হাত ঘুরিয়ে দেখালেন) তাতে সুন্দর চিত্র ও প্রতিমূর্তি তৈরি হয় ; তারই এমন শক্তি থাকে যাতে তোমাকে সে পরমতন সদ্‌বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়, যা এখানকার চেয়েও বৃহৎ (কপালের উপরদিকে হাত দিয়ে দেখালেন), যা দার্শনিক বিকাশ ('দার্শনিক' কথাটাও কেবল বাক্যই) : যা তার প্রতিরূপ। অর্থাৎ কাব্য। ওর দ্বারাই প্রায় সরাসরি সেই অব্যক্ত স্পন্দনের মধ্যে প্রবেশলাভ ঘটে। শ্রীঅরবিন্দের বিকাশ আমি দেখি ঐরূপ কাব্যরূপের মধ্যে, যাতে রয়েছে এক মোহনীয় সারল্য—সে সারল্য যেমন সুন্দর তেমনি মনোরম—মাথার ক্ষমতার সব কিছুর চেয়ে তাতে তোমাকে অনায়াসে এক ঘনিষ্ঠতর ও নিবিড় সম্পর্কের মধ্যে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন : সেই শাশ্বত চেতনাতে প্রবেশ করলে তখন দেহমধ্যে থাকি বা না থাকি তাতে বিশেষ তফাৎ হয়না, কিন্তু যাকে বলি "মরে যাওয়া", সেই মৃত্যুর পরেও কি বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে এমনি ধরনের স্পষ্টবোধ থাকে, অথবা তা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হয়ে যায়,—যেমন এপারের জগতে যখন রয়েছি তখন ওপারের সব জগৎ সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণামাত্র করি সেই রকম? শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন লুকোচুরি খেলার কথা। তা খুব উপভোগ্য হতে পারে যদি এক অবস্থার চেতনা অন্য অবস্থার চেতনাকে সরিয়ে না দেয়।

উত্তর : গতকাল কিংবা পরশু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদিন ধরেই কিছু যেন আমাকে বলছিল : "আমি আছি—আমি আছি, আমি হচ্ছি এ পৃথিবীর উপরে মৃতের চেতনা" এটা আমি ভাষাতে তর্জমা করলাম, কিন্তু সে যেন এইরকম বলছে : "মারা গেলে পৃথিবী ও পার্থিব জিনিসের সম্বন্ধে এমনি চেতনাই আসে...আমি মৃত হয়ে পৃথিবীতে অবস্থান করছি।" সেই অবস্থার চেতনা যেন বলছে (কারণ নিত্যই চেতনার অবস্থান্তর ঘটছে) "পৃথিবী সম্পর্কে মৃতের চেতনা এমনিই হয়ে থাকে"; আরো বলছে, "পৃথিবীর সম্পর্কেতে আমি মরা জিনিস," "আমি মরা মানুষ হয়ে পৃথিবীতে আছি" ইত্যাদি ধরনের সব কথা। অথচ এদিকে আমি যথারীতি আমার নিজের কাজ করে যাচ্ছি। অনেককাল যাবৎ এমনি চলেছিল। প্রায় দুই বছরেরও বেশি সময় আমি পৃথিবীকে এইভাবে দেখেছি (হাত নেড়ে দেখালেন নিচে এক ধাপ তার উপরে এক ধাপ), আর এখন দেখছি এমনি (হাতটা আরো নিচে নামিয়ে দেখালেন)। কেমন করে বোঝাবো, এর মধ্যে মনের জিনিস বলতে কিছুই নেই, মন ছাড়া অনুভূতি এমন ধোঁয়ার মতো যার বর্ণনা করাই কঠিন। কিন্তু এ সব ভাব ও চিন্তা

ছিল মাথার সীমানা থেকে অনেক দূরে (মাথার চারিদিকে হাত ঘোরালেন), যেন দূর থেকে কেউ কিছু একটা লক্ষ্য করছে ও বুঝছে—যার যা দেখছে তাই বলছে,—যা রয়েছে তার চারিদিকে। আজই দুই তিনবার এ ভাবটি খুব প্রবল হয়েছিল (সমগ্র চেতনাকে অধিকার করে), যেমন একরূপ ধারণার মতো (বা অনুভবের বা বোধের মতো, কিন্তু তাও ঠিক নয়) আমি যেন মৃত হয়ে পৃথিবীতে আছি।

এর কিইবা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ?

সেই দেখা, যাতে চোখে দেখার মতো বাস্তব যাথার্থ্য নেই (বা চোখে না-দেখার মতো ভঙ্গী করলেন), আমি দেখছি ভিতরের চেতনার ভিতর দিয়ে। শোনার বেলাতেও ঠিক তাই, আমি শুনি কানে শোনার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ; সে এক ধরনের "জানতে পারা" (কিন্তু "ইন্দ্রিয়বোধ" নয়), যা বোধশক্তির মধ্যে ধরা পড়ে, সেই শক্তি নিরূপণ করে নেয় (স্বতঃপ্রকাশে নয়) যে কোনটা সত্যই শুনলাম আর কোনটা শুনলাম না, কোনটা সত্যই দেখলাম আর কোনটা দেখলাম না। দেখতে পাওয়া তো যায়ই, কিন্তু শুনতে পাওয়া জিনিসটা হয় আরো স্পষ্টতর ; কোনোটা বা একরূপ বিরামবিহীন সুস্পষ্ট গুঞ্জন ; কোনোটা হয় অস্পষ্ট আধশোনার মতো ; কোনোটা বা স্বচ্ছ সুস্পষ্ট। দেখার বেলাতে দেখি একই রকমের জিনিস : সবগুলি রয়েছে একটা উজ্জ্বল কুহেলিকার অন্তরালে—প্রোজ্জ্বল দীপ্তি সত্ত্বেও তা কুহেলিকার মতো ছড়ানো, অর্থাৎ তার কোনো সীমান্বিত গণ্ডীরেখা নেই—তারই ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট এক দৃশ্য যা সর্বরকমে নিখুঁত। সাধারণত এ দেখা মানে সব কিছুর আভ্যন্তরীণ চেতনাকে দেখা, যা বিষয়গত না হয়ে উত্তরোত্তর ভাবগত।...আর এ দেখা দৃষ্টিশক্তিকে আদৌ স্পর্শ করে না, এ শোনা শ্রবণশক্তিকে স্পর্শ করেনা, শুধুই চেতনার ভিতরকার ক্রিয়া যার দ্বারা কোনো জিনিসকে দেখার সামনে সুস্পষ্টভাবে আর কোনো জিনিসকে দেখার অস্পষ্ট পশ্চাৎপটের মতো।

প্রশ্ন : অর্থাৎ চেতনা যা দেখতে চাইছে সেটাই সে বেছে নেয়।

উত্তর : এর মধ্যে কোনো কিছুই ব্যক্তিগত নয়,—একেবারেই না। বেছে নেওয়া ও সিদ্ধান্ত করে নেওয়ার ভাবটি থাকে বটে, কিন্তু তাও ব্যক্তিগতভাবে নয়—তা ছাড়া "ব্যক্তি" সেখানে নিজেকেই তফাতে রাখার দরকার বোধ করে (বা হাত ঠেকিয়ে আড়াল করে দেখালেন)। যেমন, খাবার সময়ে যা হয় তা এক অদ্ভুত ব্যাপার...যেন আমি দেখছি দেহটা খাচ্ছে, তাও খুব সুনির্দিষ্ট দেহ নয়, যেন কতকগুলো উপাদানকে জড়িয়ে একত্রে পিণ্ডবৎ তালপাকানো ; আমি দেখছি...কি একটা ব্যাপার হচ্ছে। বিচিত্র এক অবস্থা। আজই ঐ ভাব খুব প্রবল হয়ে সমগ্র চেতনাকে ছেয়েছিল। এমন কি সময় সময় মনে হচ্ছিল যে সামান্য একটু কিছু ঠেকে গেলেও এ সংস্পর্শ ছিঁড়ে যেতে পারে (বা ইঙ্গিত করে দেখালেন যেন দেহ থেকে কিছু ছিঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে),—কেবল

খুবই স্থির নিশ্চল অনড় ও উদাসীন হয়ে থাকলে—সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থায় থাকলে তবেই সংস্পর্শটুকু বজায় থাকতে পারে।

এই সকল অনুভূতি পাবার আগে আসে একটা নৈকট্যবোধ, গভীর অন্তরে পরাৎপরের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও তার সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গতা, যেন সে সংকেত করে আমাকে বলছে : "সব কিছুর জন্যেই তুমি প্রস্তুত তো ?" আর আমি অমনি বলি, "হাঁ, সব কিছুরই জন্যে।" তখন সেই উপস্থিতি আরো এমন ঘনীভূত হয়ে ওঠে যে সমগ্র সত্তা জুড়ে এই আকাঙ্ক্ষাই জাগতে থাকে যে এমনি অবস্থাই যেন বরাবর বজায় থাকে। তখন দেখা যায় যে কেবল সেই জিনিসই তন্মাত্র হয়ে রয়েছে, একমাত্র তারই অস্তিত্বের কোনো মানে হয়। আর ভিতরে সেই সংকেতই চলতে থাকে : "সব কিছুর জন্যেই প্রস্তুত আছো তো ?"

আমি অবশ্য দেহের কথাই বলছি, আভ্যন্তরীণ সত্তার নয়, দেহেরই তরফ থেকে।

আর দেহ সর্বদাই বলে, হাঁ হাঁ,—সর্বদাই তার এই দেবার ভাব (নিজেকে সঁপে দেবার ইঙ্গিত) : তার তরফের কোনো নির্বাচন নেই, কোনো পক্ষপাত নেই, এমন কি আশ্পৃহাও কিছু নেই, শুধুই তার সম্পূর্ণরূপে বিনাশর্তে আত্মদান। এর পরে এলো ঐ ধরনের জিনিস—গতকাল সারা দিনই চলেছিল : "মরে গিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে আছি।" এ বোধ যদিও খুব প্রবল নয় তবু সুস্পষ্টই, আর সকলে যেমনভাবে বেঁচে আছে তার চেয়ে অন্যভাবে বেঁচে থাকা। খুব জোরালো না হলেও বেশ টের পাওয়া যায়। এ হলো অন্য এক ধরনের বেঁচে থাকা।

প্রশ্ন : চেতনার দিক থেকে এতে যে কিছু লাভ আছে তা কিন্তু মনে হয় না, কারণ এ জিনিস তো থাকে না, মিলিয়ে যাবেই। জানিনা, কিন্তু এতে কোনো লাভ হয় কি ?

উত্তর : এতো কেবল এক মধ্যবর্তী অবস্থা। পৌঁছবার পথের এক মধ্যবর্তী স্তর। চেতনার দিক থেকে এতে মস্ত লাভ। কারণ যাহা ব্যাপারের সকল দাসত্ব, সকল বন্ধন তখন ঘুচে গেল, একেবারেই ছেড়ে গেল, তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত। রইলেন শুধু তিনি, পরম প্রভু, যিনি আসল মালিক। সেদিক থেকে একে লাভই বলতে হবে। এ একরূপ বাস্তব উপলব্ধি।...মুক্তির চরম, যা সাধারণ জীবনেতে থেকে মেলা অসম্ভব।

এ হলো সেই পূর্ণ মুক্তির অনুভূতি যা সত্তার উচ্চাংশে অনুভূত হয় যখন তুমি আর দেহাশ্রয়কে নির্ভর করে থাকোনা। কিন্তু এর মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে (যারই উপরে আমি খুব জোর দিয়ে থাকি) এ অনুভতি দেহেরই চেতনার, যে দেহ এখনও বাস্তবে দৃশ্যমান।

বস্তুত এর চেয়ে বেশি "জীবনে বিশ্বাস" মানুষকে আর কিছুতে দিতে পারেনা।

বাহা ভগতে এর চেয়ে বেশি অবলম্বন আর কিছু নেই...পরমতত্ত্বের ইচ্ছা। সহজ ভাষাতে, দেহ এই বোধ করতে থাকে যে পরমপ্রভু তাকে টিঁকিয়ে রাখছেন বলেই টিঁকে আছে, নতুবা বাঁচত না।

প্রশ্ন আপনার কথা বুঝলাম, কিন্তু আমার মনে হয় যে পূর্ণতার অবস্থা পেলে তখন সব কিছুই তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, বর্তমান স্থূল অবস্থাকেও বাদ দিতে হবেনা।

উত্তর : বাদ দিতে তো হবেই না।

প্রশ্ন কিন্তু আপনি বলেন তা "তফাতে সরে যাবে," "পর্দার অন্তরালে" থাকবে, তেমন বাস্তবতা তার আর থাকবে না।

উত্তর : ও সেই কথা, তা হবে ভাসাভাসা রকমের মানবীয় বোধ মাত্র। নতুবা আমি নিজে তো একটুও বোধ করিনা যে আমার কোনো কিছু বাদ হয়ে গেছে, বরঞ্চ তার উল্টো। শুধু এটা বোধ করি যে আগের অবস্থার চেয়ে এখন অনেক উচ্চ অবস্থাতে আছি।

প্রশ্ন : পার্থিবের দিক থেকেও কি তাই?

উত্তর : প্রভুর যেমন ইচ্ছা তাই হচ্ছে—এই পর্যন্তই বলতে পারি। সেইখানেই আরম্ভ আর সেইখানেই শেষ। তিনি যদি বলেন...দেহটাকে দিয়ে তিনি যাই কেন করাতে চাইবেন, দেহ তাই করতে পারবে, কোনো পার্থিব নিয়মের উপর তা নির্ভর করবে না।

প্রশ্ন : তিনি যা দেখতে চান তাই দেখেন, যা শুনতে চান তাই শোনেন।

উত্তর : নিশ্চয়।

প্রশ্ন : আর বাস্তবেও তিনি যা দেখতে ও শুনতে চান, তাও হয় নিখুঁত।

উত্তর : হাঁ, একেবারেই নিখুঁত। এক একটা সময় আসে যখন এমন পরিষ্কার ভাবে দেখি যেমন আগে কখনো দেখিনি। কিন্তু তা অস্থায়ী দেখা, আসে আর চলে যায়; তার কারণ বোধ হয় এই যে আগামী জিনিসের নিশ্চয়তার একটা ইঙ্গিত ওতে দিয়ে যায়। কিন্তু মানুষের ভিতরকার যা অন্তরতম সত্যবস্তু (তারা যেটা ভাবে তাও নয় কিংবা নিজের সম্বন্ধে যা বলে তাও নয় কিংবা যা দেখায় তাও নয়—এগুলো সবই মুছে যাবে), সেই জিনিসের সম্বন্ধে আমার বোধ আগের চেয়ে অনেক বেশি সুস্পষ্ট হয়েছে। যথা, একটা কারো ফোটো

যখন দেখি, তখন আমার আর কিছু দেখতে হয়না, তার ভিতর থেকেই দেখতে পাই যে মানুষটি কেমন। সে দেখার "মাধ্যম"টি তখন এমন মিলিয়ে যায় যে একেবারেই থাকেনা।

বাস্তবিক, যদি কোনো মানবীয় ইচ্ছা এই দেহের উপর ক্রিয়া করত এবং বলত: "যাকে অমুক করতে হবে তা তমুক করতে হবে বা এটা ওটা করা দরকার...", তাহলে তাকে ব্যর্থই হতে হতো, এবং সে বলত "না আর কোনো কাজের নেই", যেহেতু এ দেহ সেই ইচ্ছাকে পালন করছেনা...মানব সত্তারা এইভাবেই পরস্পরের উপর নিজেদের ইচ্ছাকে আরোপ করছে, অথবা বাহির থেকে আসা ইচ্ছাকে গ্রহণ করে বলছে সে তাদের নিজেরই ইচ্ছা, বুঝতেও পারেনা—যে সেগুলো সবই বাহ্য ও মিথ্যা।

এই দেহে এমন এক নিশ্চয়তা আছে যে আমি যদি কয়েক মুহূর্তের জন্যও পরাৎপরের সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই ('আমি' মানে এই দেহটা) তাহলে এ দেহ তখনই গতায়ু হয়ে যাবে। তিনিই রেখেছেন একে বাঁচিয়ে। এই হলো কথা। সুতরাং অজ্ঞান ও মূঢ় মানব সত্তাদের পক্ষে যে অবস্থা তা শোচনীয়—আমার পক্ষে এই অবস্থাটাই সঠিক অবস্থা। কারণ তাদের পক্ষে স্বতঃই পূর্ণতার লক্ষণ তাদের জীবনীশক্তি, সাধারণ জীবনের জিনিস।—কিন্তু তার স্থায়ী অস্তিত্ব নেই, সে শক্তি পুরোপুরিই চলে যায়।

হাঁ, অনেকবারই এ দেহ প্রশ্ন করেছে, "কেন আমি তোমার নিজের শক্তি নিজের তেজ নিজের মধ্যে অনুভব করিনা?" আমি হেসে তার জবাব দিই (কথায় বলিনা, এখন কথায় তর্জমা করে বলছি) : "সবুর সবুর, আগে সেজন্য প্রস্তুত হও।"

৪ঠা ও ৯ই মার্চ, ১৯৬৬ শ্রীমা

পথের কথা

জানুয়ারি ২২, ১৯৬৬

আজ সকালে প্রায় দুটি ঘন্টা আমি ছিলাম এক পরমানন্দের অবস্থায়, তখন স্পষ্ট চেতনাতে দেখলাম যে সর্ব জগতে সর্ব মুহূর্তে সর্বপ্রকার জীবনই সম্ভব হয়েছে নির্বাচনের ফলে—তাই হতে চেয়েছে বলেই তাই হয়েছে।

এ কথা বাক্যে বলতে যাওয়া খুব মুশকিল...যেরূপ বাধ্য হয়ে জীবনযাপনে নিযুক্ত আছি বলে মনে হতো সে ধারণা সম্পূর্ণ ঘুচে গেছে, এই বোধ এখন স্বতঃই স্বভাবিকরূপে এসেছে যে এই পৃথিবীর ও অন্যান্য সকল জগতের সর্বপ্রকার জীবনই হয়েছে ইচ্ছাকৃত; তুমি এমনই হতে চেয়েছ, নিত্যই চাও যে এমন হই বা তেমন হই কিংবা এমনি হোক বা তেমনি হোক; আর এই বিশ্বাসটিও করতে চাও যে এইই তোমার ভবিতব্য। নিয়তির কারণে বা অদৃষ্টের বিধানে তুমি এই হতে বাধ্য হয়েছ,—কিন্তু সবই ইচ্ছার ব্যাপার। এ কথা জানার সঙ্গে এলো একটা লঘুত্ব ও মুক্তিবোধ ও সকল জিনিসেই মৃদু হাস্য। তারই সঙ্গে এলো বিপুল শক্তিবোধ। বাধ্য হওয়ার প্রশ্ন, অপরিহার্যতার প্রশ্ন, অদৃষ্টের প্রশ্ন একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। সকল রকমের অসুস্থতা, সর্বপ্রকার সংঘটন ও নাটকীয়তা, সবই গেল ঘুচে। স্থূল জীবনের এই নিরেট ও বর্বর বাস্তবতা, কিছুই আর রইলনা।

সকালে দেড় ঘন্টারও বেশি সময় আমি এমনি অবস্থাতে ছিলাম। পরে অবশ্য ফিরে আসতে বাধ্য হলাম...এখনকার অবস্থা আমার কাছে কৃত্রিম মনে হলেও অন্য সকলের সংস্পর্শে আসার জন্য আর অসংখ্য রকমের সব কাজের জন্য এতেই ফিরে আসা দরকার। তথাপি সব কিছুর অন্তরালপটে সেই অনুভূতি থাকে জেগে। জীবনের সব কিছু জটিলতার ব্যাপারেই লেগে থাকে একটা কৌতুকহাস্য—যে যেমন সে তেমন ইচ্ছা করেই আছে, কিন্তু লোকের ইচ্ছার যে স্বাধীনতা আছে তা গেছে ভুলে। এটাই মজার কথা।

সেই সঙ্গে আমি দেখছি মানুষের জ্ঞানের সমস্ত মূক অভিনয়গুলো (কারণ এ অবস্থায় যা কিছু মানবীয় উপলব্ধি ও জ্ঞান সবই সারে সারে চোখের সামনে ভাসে তার নিজ নিজ স্থানে—অনুভূতি এলে এমন হবেই হবে, যেন ভূতাপেক্ষের মতো) আর তাদের যতরকম বিশ্বাস ও থিওরি ও দার্শনিক তত্ত্ব এই নতুনভাবে দেখা যায় যাতে আমোদ হয়। আর এতে বিরক্তির কোনো দরকার হয়না। এসব অনুভূতি স্বতঃই এমন জমাট রকমে বাস্তব (যেহেতু চেষ্টাকৃত ও ইচ্ছাকৃত জিনিস নয়) যে তা অবিরাম চলতে থাকে।

কিন্তু যাদের এমন অনুভূতি দার্শনিক বা মনস্তাত্ত্বিক পূর্বপ্রস্তুতি না থাকা সত্ত্বেও এসে গেছে (সাধুসন্ত ও আধ্যাত্মিক মানুষদের বেলাতে), তারা তখন খুবই তীব্রভাবে এটা বোধ করতে থাকে যে এই জীবন একেবারে অবাস্তব মায়া মাত্র। কিন্তু সেটা হলো সংকীর্ণ

দৃষ্টিভঙ্গী। তা নয়, তা নয়, সব কিছুই হয়েছে ইচ্ছার ফলে, সমস্তই তাই, প্রভুর ইচ্ছা —কিন্তু তা আমাদেরই মধ্যে, উপরে নয় (উপরদিকে ইঙ্গিত করলেন) এইখানে। যারা জানিনা, কিন্তু আছে তা আমাদেরই হৃদয়ে। আর তা যখন জানতে পারি— সজ্ঞান ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা করতে পারি, তখন সে হয় অতি আশ্চর্য।

অতএব ঐ ধরনের নিয়তির বন্ধন ও অস্তিত্বের অবশ্যকঠোরতা সবই চুকে গেল। সমস্তই ঘুচে গেল। কেবল রইল স্বচ্ছনীল ও গোলাপী আভা, যা স্বচ্ছ আলোকে জ্যোতির্ময়।

আমি ভালো করেই জানি যে এটাই পূর্ণাবস্থা নয়, একটা অনুপম রকমের অবস্থাধারা মাত্র...যাদের মনোবুদ্ধির যথেষ্ট পূর্বপ্রস্তুতি হয়নি তারা এমন অনুভূতিকে পূর্ণ-সত্তা-প্রাপ্তি বলেই ধরে নেবে। এবং তাই নিয়েই গোড়ামি শুরু করে দেবে। কিন্তু আমি স্পষ্ট জানলাম যে সে জিনিস নয়, এ কেবল সত্তার একটি ধারাপ্রাপ্তি, যদিও খুবই মনোরম অবস্থা, তাই না? পৃথিবীতে আমরা যে অবস্থাতে থাকি এ তার চেয়ে অনেক গুণে উঁচু। এখানে থেকেই আমরা ও অবস্থা পেতে পারি; আমিই তো পেলাম। খুব জমাট ভাবেই মিলেছে। এখানে যখন দেখি যে একটা কিছু ঠিক হচ্ছে না, ভুল জিনিস হচ্ছে, এখানে ওখানে বেঠিক আর ঘটনাচক্রও বেঠিক, মুশকিল বাধছে—তখন ঐ অবস্থার জোরে সব কিছুর রং বদলে যায়। সবই হয়ে দাঁড়ায় আলো, আলো—নরম জ্যোতির আলো। সব কর্কশতা, কাঠিন্য, বিকৃতি একদম চলে গেছে।

আর এই বোধ করি যে ইচ্ছা করলে তুমি ঐরূপ হতে পারো, ঐরূপ হয়ে থাকতে পারো। এবং এ সত্য কথাই। কেবল যত কিছু বদ অভ্যাস—সহস্র সহস্র বছরের জমা করা সব পার্থিব অভ্যাস—তাতেই তোমাকে আটকে রাখছে, কিন্তু তা যে চিরকালই থেকে যাবে এমন কোনো মানে নেই। কারণ ও জিনিস সব কিছুই পাল্টে দিতে পারে। সবই যায় বদলে। এমন কি তোমার যদি ঐ অবস্থা আয়ত্তে আসে, তাহলে তখন তোমার পারিপার্শ্বিক ঘটনাচক্রও যাবে বদলে।

সম্প্রতি (কিছুদিন যাবৎ) দেহকে নিয়ে ঐরূপ মুশকিলই হয়েছিল, কারণ এ দেহ সাধারণের মতো খোলসের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে স্বতঃই গ্রহিষ্ণু হয়ে পারিপার্শ্বিক স্পন্দন-গুলিকে 'গ্রহণ' করছিল। কিন্তু সেই সব স্পন্দন মন ও নীতির দিক থেকে যদি হয় সীমা-য়িত ও আড়ষ্ট, তখন হয় বিড়ম্বনা, তখন সেগুলিকে শোধন করে রূপান্তরিত করে নেবার দরকার হয়। বহুবিচিত্র ও অব্যবস্থিত চেতনাতে ও তার ক্রিয়াতে যতটা সম্ভব মানসিক ভাবে সঙ্গতি আনা দরকার; আর যখন তোমার পারিপার্শ্বিক যাকে বলে 'বিগড়ে' যায়, তখন সেখানে কিছু কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে, যদিও তা খুব সামান্য হয় তবু হয় নাছোড়বান্দা। মনে আছে, ঐ অনুভূতি আসার ঠিক আগেই দেহে আস্পৃহা জেগেছিল একটা সঙ্গতি স্থাপনের জন্য, যাতে কোনো জিনিসের মধ্যে ঘষাঘষি বা খোচাখুঁচি না থাকে। সম্ভবত সেই আস্পৃহা হতেই এলো অনুভূতি।

এটা আমি লক্ষ্য করেছি যে এই দেহের জীবনকালে একরকমের অনুভূতি কখনো দুবার আসেনি—এক ধরনের হলেও তা কখনো এক জিনিস হয়নি, আগের চেয়ে অনেক উচ্চ ও ব্যাপক জিনিস হয়েছে। আর কোনো অনুভূতিকেই আমি ধরে রাখিনা, আমি বরাবর এগিয়েই চলি আর এগিয়েই চলি (অগ্রগতির ইঙ্গিত করলেন)। যা, চেতনার রূপান্তরের কাজ এমন ত্বরিত হওয়া দরকার যাতে একটা অনুভূতিকে ধরে রেখে উপভোগ করবার মতো সময়ই না থাকে। এমন জোরে আসবে যে আগেরটি ধরে রাখা অসম্ভব হবে, বর্তমানকে সম্পূর্ণ বদ্‌লে দিয়ে আবার নতুন কিছু হবে। দেহকোষের রূপান্তরের বেলাতেও তাই ; নানারকম ছোটোখাটো গণ্ডগোল বেরিয়ে পড়ে যা প্রত্যক্ষ চেতনার দ্বারা রূপান্তরিত হওয়া দরকার, তখন তাই নিয়েই ব্যস্ত হতে হয় শৃঙ্খলা ও সঙ্গতি আনতে ; অথচ তখন তোমার ভিতরের কোনো অংশ জানছে যে গণ্ডগোল কিছু বেধেছে যাতে স্বাভাবিক ক্রিয়ার বদলে তোমার চেতনা সরাসরি প্রভুর নির্দেশ ও ভগবৎশক্তির প্রভাবে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে গেছে। আর তোমার দেহও সে কথা জানে। (যদিও এখানে ব্যথা, ওখানে ব্যথা, কিংবা এটা বিগড়েছে ওটা বিগড়েছে, এ অবস্থা সুখের নয়, তথাপি সে জানে ব্যাপারটা)। তার পর যখন রূপান্তর আসতে শুরু হয়, তখন একটার পরে একটা তার পরে অন্যটা বদলাতে থাকে ; কিন্তু কোনো কাজই নির্খুঁতভাবে করা যায়না...পুরোপুরি প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত। অতঃপর ঐ কাজই ব্যক্তি অনুযায়ী উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে বা আরো জোরালো ও ব্যাপকভাবে শুরু হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সমগ্রটাই সমান্তরাল ও সমভাবে তৈরি হয়ে না ওঠে।

আমি দেখি যে এ কাজ যথাসম্ভব দ্রুতভাবে হতে থাকলেও এতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। মোট ব্যাপারটাই হলো অভ্যাসের পরিবর্তন। হাজার হাজার বছরের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যাসকে সরাসরি বদলাতে হবে ভগবৎ-চেতনার আনুকূল্যে যথাযথ সচেতন ও সক্রিয় উপায়ে।

যদি বলো যে বহুজনের মধ্যে বহু জাগতিক কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকাতেই রূপান্তর আসা এত বিলম্বিত ও কঠিন হয়ে পড়ে, কিন্তু আবার তেমনি ঐরূপ অবস্থার মধ্যে না থাকলে অনেক জিনিসই ভুল হয়ে যাবে, অনেক দিকে ফাঁক পড়ে যাবে। তাতে অনেক কিছুই করা হবে না। এমন অনেক ধরনের স্পন্দন আছে যার এই কোষসমষ্টির দিকে (মায়ের আপন দেহ দেখিয়ে) কোনো টান নেই, আমি যদি সবারই মাঝে না থাকতাম তাহলে কোষগুলি রূপান্তরকারী শক্তির স্পর্শলাভের সুযোগই পেতোনা।

এটা নিঃসন্দেহ, খুবই নিঃসন্দেহ যে তুমি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত অবস্থার মধ্যে আর সর্বাপেক্ষা ভালোভাবে তোমার কাজ করবার সম্ভাব্যতার মধ্যেই রয়েছ...যদি তুমি ঐকান্তিক ভাবে তা করতে চাও। * শ্রীমা

* S. A. I. C. E. Bulletin থেকে। অনুবাদক—পতিতপাবন ভট্টাচার্য

শ্রীঅরবিন্দের যোগ*

সুধা বসু

ঐতিহাসিক ধারায় নয়, চেতনার অভিব্যক্তির দিক থেকে দেখলে যোগের ওই যে প্রথম আদর্শ ছিল জীবনকে গ্রহণ করে ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলি খুলে মেলে দিয়ে সৌরালোকে উদ্ভাসিত করে নেওয়া—একে পূর্ণযোগেরও মূলসূত্র বলে ধরা যেতে পারে। ছান্দোগ্যোপনিষদের শান্তিপাঠে আছে—"আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি" ইত্যাদি। এ হল সর্ব অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়নে সেই পরম সত্যকে অধিগত করা, জাগ্রৎ চেতনায় লোকোত্তরের সামনে দাঁড়ানো। এই আদিম দর্শন থেকে ক্রমে এল সমগ্রের বদলে একেকটি অংশকলার অনুশীলনের যুগ। প্রথমে ধরা যাক হঠযোগ। তার আলম্বন হল দেহ এবং নাড়ীতন্ত্র। তারও লক্ষ্য কিন্তু নিরোধ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারগুলি নিরুদ্ধ করে মানসোত্তরকে উপলব্ধি করা। ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতই পরাক্ প্রবণ এবং তাতে আপ্যায়নের চাইতে বিশ্রুণের সম্ভাবনাই বেশি। কেননা আমাদের দেহ প্রাণ মন শুদ্ধ নয়, তারা অপরা প্রকৃতির অধীন। এই বিশ্রুণ শুদ্ধ করা যায় দুভাবে। এক, উচ্চতর শক্তি তাতে প্রবাহিত করে, আর দুই প্রকৃতিকে দমন করে তার কণ্ঠরোধ করে। কিন্তু কণ্ঠরোধ করতে গিয়ে আমরা তার শ্বাসপ্রশ্বাস পর্যন্ত রুদ্ধ করে দিয়েছিলাম।

হঠযোগের সাধনায় শ্বাসরোধের ব্যবস্থা আছে। প্রাণ রুদ্ধ করে চিত্ত শান্ত করা। চিত্ত চিরচঞ্চল, এ চঞ্চলতা প্রাণের, প্রাণ সক্রিয় শ্বাসে প্রশ্বাসে। চঞ্চল চিত্ত স্থির করতে উল্টা পথ বেয়ে শ্বাসরোধে প্রাণকে নিরুদ্ধ করা, তাতে চিত্তের প্রশম। তার জন্য প্রথমে দেহ শুদ্ধ করতে নাড়ীশুদ্ধির ব্যবস্থা। ষট্‌কর্মের দ্বারা নাড়ীশুদ্ধি ছিল হঠযোগের একটা প্রধান সাধন। নাড়ী বলতে সমস্ত nervous systemটাকে বোঝায়। অন্তর্মুখ হলে নাড়ীস্রোতের ভিতর দিয়ে চৈতন্যের তরঙ্গ অনুভূত হয়। প্রাণস্রোতের ধারাও স্বচ্ছন্দ হয়, তার সুস্পষ্ট গতিবিধিও লক্ষ্য করা যায়। বেদে ও উপনিষদে এর প্রাচীন সাধনরূপটি পাওয়া যায়। এই নাড়ীর ভিতর দিয়েই প্রাণবহ বায়ুর গতি, তাই নাড়ীর শোধন একটি প্রয়োজনীয় সাধনকর্ম। হঠযোগীরা স্থূল উপায়ে এগুলি করতেন। দেহকে দৃঢ় করতে আসন ও হাল্‌কা করতে ষট্‌কর্ম এবং প্রাণায়াম। স্থূল দেহের বিবর্তন মানুষের মধ্যে আপাত-দৃষ্টিতে একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ নিলেও নাড়ীশুদ্ধি দ্বারা প্রাণমনের শক্তি অনেক বাড়িয়ে নেওয়া যায়। হঠযোগে কুম্ভকের উপরেই জোর দেওয়া হল, যার ফলে চিত্তের প্রশম ও পরিণামে

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

জড় সমাধি আসে। জড় সমাধিতে তত্ত্বজ্ঞান আসতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য স্পষ্ট ও ধারণা উজ্জ্বল না হলে নাও আসতে পারে। যোগভাষ্যকার সাবধান করে দিয়েছেন, বিশুদ্ধ জড় সমাধি প্রায়ই হয় না। সেজন্য সমাধিটা বড় কথা নয়। রামকৃষ্ণদেবের কথামৃতে এর এক সুন্দর উদাহরণ আছে। এক বাঈজীকরের জড় সমাধি হয়েছিল ; সেটা ভেঙে গেলেই সে আবার চীৎকার করে লোক জড় করতে চাইল খেলা দেখাবার জন্য। এরকম অচেতন ভাবের সমাধি বা মূর্চ্ছার কোনও কাজ হয় না। আগেই বলা হয়েছে যে মূঢ় ক্ষিপ্ত এমন কি বিক্ষিপ্ত ভূমির সমাধিতে ঠিক ঠিক যোগ হয় না। আবার হঠযোগের উৎকট সাধনায় জীবন থেকে সরেও আসতে হয় অনেক সময়। প্রাচীন যোগীরা বলতেন রাজযোগে যাদের অধিকার নেই, তাদের জন্যই হঠযোগ! রামকৃষ্ণদেব বলেছেন 'এটা কোরো না, তাতে দেহের উপর মন পড়ে'। কিন্তু নাড়ীতন্ত্র সম্বন্ধে সচেতন হতে একেও আমাদের প্রয়োজন মত গ্রহণ করতে হবে। কুণ্ডলিনী যোগ হঠযোগীদেরই দান। তাতে সুষুম্নার পথ স্বচ্ছন্দ হয়। মেরুদণ্ডের ভিতর সুষুম্নাকাণ্ডে নাড়ীতন্ত্রের মূল। তার মধ্য দিয়ে প্রাণস্রোত চলে গেছে মস্তিষ্কে ; তা থেকে শাখা প্রশাখা হয়ে সর্বদেহে ছড়িয়ে পড়েছে। যোগের দ্বারা এই নাড়ী-তন্ত্র পুষ্ট ও দৃঢ় করতে হবে। সুষুম্নাকে উদ্বুদ্ধ করে মেরুদণ্ডে তার সূক্ষ্ম প্রবাহ সম্বন্ধে সচেতন থাকা,—হঠযোগের এই সিদ্ধি পূর্ণযোগে গ্রহণীয়।

হঠযোগে দেহ ও প্রাণের প্রতি পিছুটান আমার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেটা বুদ্ধি সহকারে করলে হয় রাজযোগ। তাতে প্রাণ ও মনের ক্রিয়া। রাজযোগের আটটি অঙ্গকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম যম ও নিয়ম চরিত্রের বিশুদ্ধির লক্ষণ। চারিত্রিক ভিত্তি দৃঢ় না হলে যোগ হয় না। এটি যোগের প্রয়োজনীয় প্রথম অংশ। এর পর আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার। হঠযোগের এই অংশটি গ্রহণ করেও রাজযোগ একে সহজ করে নিয়েছে। প্রত্যাহার থেকেই রাজযোগের অন্তরঙ্গ সাধন শুরু হয়। মনের গতিকে অন্তর্মুখ করা হল প্রত্যাহার। বাহিরের অনুভব ভিতরে এসে ভাবে রূপান্তরিত হয়, ভাব থেকে সুখ আসে। বস্তুকে ছেড়ে সেই অনুকূল সংবেদনে চিত্ত নিবিষ্ট হলে প্রসন্নতা লাভ হয়। তা থেকে চেতনার ব্যাপ্তি, এরই নাম প্রত্যাহার। এরকম চেতনার ব্যাপ্তি ও প্রসাদ এলে চিত্ত তাতে নিবদ্ধ হয় ও তন্ময়তা আসে। তারপর থেকে আরও অন্তরঙ্গ সাধন হচ্ছে ধারণা, ধ্যান, সমাধি। চিত্ত প্রসন্ন হলে ধ্যান হবে। যাতে আমাদের ঔৎসুক্য (interest) তাতেই আমাদের একাগ্রতা (attention) আসে। প্রত্যাহারে ধ্যানচিত্ত প্রবাহিত করতে গেলে, আধারকে হাল্‌কা করতে হয়, তাই ধারণা 'দেশবন্ধ চিত্তস্য ধারণা'। দেশ এখানে দেহ। ব্যাপ্ত দেহচেতনার তন্ময়তা, একতানতা, পরিব্যাপ্ত প্রসন্নতা, এগুলির পর্যবসান সমাধিতে। তখন লোকোত্তর বিজ্ঞানের দ্বার খুলে যায়, এটি প্রসাদগুণ।

রাজযোগের সাধনা সুন্দর, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করাই মূল

সূত্র হওয়ায় অনেক সময় সমাধি প্রবর্তিত করতে জোর করে মনের চাঞ্চল্যকে নিরুদ্ধ করার দিকে রাজযোগী ঝোঁক দেন, তাতে আবার ন্যূনতা (**defect**) এসে পড়ে। মানসোত্তর বিজ্ঞান ও আনন্দের জ্যোতির্ময় ভাবলোকের দর্শন ও তাতে অনুপ্রবেশ আর হল না এমনও হয়। মন অনিরুদ্ধ, তাতে ঐ ঊর্ধ্বলোকের তত্ত্ব স্ফুরিত হলে সে সহজে ধ্যাননগ্ন হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সহায়ে তার লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতনতা ক্রমে-ক্রমে বৃদ্ধি পেলে সে আর নীচের টানে নিগৃহীত হবে না, চঞ্চলতা আপনিই শান্ত হয়ে আসবে। তার ওপরে তখন পরমের প্রসাদ গুণে প্রসন্নতা ঝরে ঝরে পড়বে। তাতে নিবিষ্ট হতে পারলে জোর করে নিরুদ্ধ করার প্রশ্ন ওঠে না। এ অনুভবের ছবি পাই রবীন্দ্রনাথের ভোরবেলার গানে। উষার আবির্ভাবে চিত্ত আপনিই প্রাত্যহিক তুচ্ছতার জগৎ থেকে পরাবৃত্ত হয়ে পরমের অনুগত হয়ে গেল। এই ভূমিই দেখা দিল জ্যোতির্ময় হয়ে, আকাশ আলো করে সূর্যের উদয় হচ্ছে সহস্র কিরণ মেলে ; চিত্ত প্রসন্ন উদার। একে যদি যোগের ভিত্তি করে নিতে পারি তখন সবই মধুর হয়ে যায়। যাই দেখি, শুনি, ভাবনা করি, কর্ম করি সবস্তুতেই এই পরম মিলনের মাধুর্য স্ফুরিত হতে থাকে। কবিচিত্তে এ ভাবটি সহজে ধরা পড়ে। এই সহজ সুন্দর সরল ভাবটি হৃদয়ের নিজস্ব সম্পদ, তাকে উদ্ধার করে সেখানে পূর্ণযোগের বেদী প্রতিষ্ঠা করতে পারি। বেদের সাধনায় যাকে পেয়েছিলাম, গীতা ও ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ যার নির্দেশ দিয়েছেন, সেই সোনার আলোর রাজপথ আমাদের সামনে খুলে যাবে। মন বলবে—এ তো পৃথিবী মায়েরই আলো, তাঁরই শিশু আমি, তিনি আমার সম্মুখে—"আবিরাবীর্ম এধি"।

★

ভাবনা, বেদনা, সংকল্প এ তিনটি মনের ধর্ম। যোগশক্তিতে অবরুদ্ধ মনঃশক্তি সমৃদ্ধ হবে। ভাবনার শুদ্ধি ও মুক্তি হয় জ্ঞানযোগে, বেদনা হিল্লোলিত ও রূপান্তরিত হয় ভক্তিযোগে আর সঙ্কল্প শুদ্ধ ও সিদ্ধ হয় কর্মযোগে। জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম এই তিনকে যোগত্রয়ী বলে একসঙ্গে লক্ষিত করা যায়। এ তিনের সমষ্টিতে জাগ্রতের ব্যবহার ; তিনটি ওতপ্রোত, আলাদা করা যায় না। জানা ও ভাবা জ্ঞানের দিক, আস্বাদন বা রস ভাবের দিক আর কর্ম ইচ্ছার দিক। যথাক্রমে **thinking feeling willing**, এদের না হলে মানুষের কারবার চলে না। জানা বিশুদ্ধ হলে ব্রহ্মের চিৎসত্তার সঙ্গে যোগে জ্ঞান। রস আস্বাদনে ব্রহ্মের আনন্দময়ভাবের স্ফুরণ আর কর্মে ব্রহ্মের শক্তির বিচিত্র উল্লাস। তন্ত্রে এই শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। শক্তি ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াময়ী। চিৎশক্তিকে লীলায়িত করে রূপ ধরছে তাঁর সংকল্প—যিনি জ্ঞানস্বরূপ। তন্ত্রমতে শক্তি শুধু মায়া নয়, জগৎ মিথ্যা নয়।

বৈদিক সাধনায় যোগ ছিল সমগ্রকে নিয়ে, পুরুষ বলতে ঋষিরা গোটা সচেতন মানুষকেই গ্রহণ করেছিলেন। পরে আংশিক অনুশীলনের ফলে বিশুদ্ধ চৈতন্যকেই পুরুষ

আর সব কিছু প্রকৃতি, পুরুষ থেকে অবর একটা কিছু এবং সেই ভেদাত্মক মায়া থেকে মুক্তি পাবার সাধনায় ঝোঁক পড়ায় যোগপথগুলি যেন ইহবিমুখ হয়ে পড়েছিল। তখনই তন্ত্রসাধনায় যোগের মহাসমন্বয়ী এক আবির্ভাব। তন্ত্র সমস্ত সাধনপথগুলি হঠ, রাজ, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি আত্মসাৎ করেও পূর্ণযোগের অনুকূলে এক বিশিষ্ট যোগের সাধন-সঙ্কেতও দিয়েছেন। সেখানে জীবন ও জগৎকে প্রত্যাখ্যানের ভাব নেই। চৈতন্যকে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করছে যে বাধাগুলি, তাদের জীবন থেকে কেটে ফেলার আগে যতদূর সম্ভব শোধিত ও মার্জিত করে চেতনাকে ঊর্ধ্বগামী করার প্রয়াস তন্ত্রের সাধনায় আছে। যেগুলি প্রাকৃত হেয় ও সাধনের বাধারূপে উপস্থিত হয়, সেগুলির মধ্যেও শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার ব্যাহিত হয়ে আছে। বাঁধনমুক্ত হলে সেই শক্তিসমূহ সাধনের অনুকূল হবে, পরিশেষে রূপান্তরিত হবে চৈতন্যের নিজস্ব ঐ একশক্তিতেই—এটি সাধকের অনুভবে আসে।

বর্তমানে তন্ত্রকেই ভারতবর্ষের লোকায়ত ধর্ম বলা যেতে পারে। মুষ্টিমেয় বৈদান্তিক ছাড়া সাধনা এখনও যেটা আছে, তন্ত্র ছাড়া তার অস্তিত্ব নেই। বেদের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের মত তন্ত্রেও জ্ঞান ও কর্মের দুটি দিকই নিপুণভাবে অনুশীলিত হয়েছিল বৈদিক ধারারই সার দোহন করে। কিন্তু তন্ত্রের সে বিশাল জ্ঞানকাণ্ডের কথাও আমরা লোকজীবনে বিস্মৃত হয়ে শুধু পদ্ধতি গ্রন্থ দিয়ে কাজ চালিয়ে যাই। শক্তিসাধনায় বামাচার ইত্যাদির বিকৃতি দেখে ও রহস্য না বুঝে তন্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষিত মনে এক প্রবল বিতৃষ্ণা দেখা দিয়েছিল। অধুনা এই বিশশতকের প্রথমার্ধেই তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলনের ফলে ও পুনরুদ্ভাবনে এক নতুন আলোর দিগন্ত খুলে গেছে। দেখা যায় সে বিশাল গম্ভীর জ্ঞানরাশি—আগম-নিগমের থৈ পাওয়া কঠিন। জ্ঞানের এত গভীর অনুশীলন বেদান্তেও হয়নি।

তন্ত্রে পঞ্চদেবতার উপাসনার বিধি এখনও প্রচলিত। পাঁচটি দেবতা হলেন শিব, বিষ্ণু, শক্তি, গণপতি এবং সূর্য। তার মধ্যে সূর্যোপাসনা মূলত বৈদিক এবং তার নিকর্ষ রূপ বিশ্বামিত্রের সাবিত্রমন্ত্র আজ পর্যন্ত এদেশের দ্বিজাতি মাত্রের নিত্যজপ্য স্বাধ্যায় হয়ে আছে। মনে পড়ে সুদাসের যজ্ঞসভায় বিশ্বামিত্রের ঘোষণা, "বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মশক্তিই ভারতজনকে রক্ষা করছে।" তাঁর সে উদাত্ত ঘোষণা সত্য হয়েছে। গণপতির উপাসনা দক্ষিণদেশেই বিশেষ করে প্রচলিত। তাঁর নামে একখানি উপনিষদও পাওয়া যায়। তন্ত্রসম্মত যে কোন বাহ্যপূজার অনুষ্ঠানেও গণেশকে বুদ্ধি ও সিদ্ধিদাতা বলে সর্বাগ্রে স্মরণ করা হয়। তিনি প্রসন্ন না হলে সাধকের অভীষ্ট ফল লাভ হয় না। বস্তুত শিব, বিষ্ণু আর শক্তির উপাসনাই সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে। এদের অবলম্বন করে এক বিরাট অধ্যাত্মশাস্ত্রেরও সৃষ্টি হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে তাঁদের স্থান খানিকটা সঙ্কুচিত হলেও ইতিহাস পুরাণের একটা বড় অংশ তাঁরা জুড়ে আছেন। তাঁদের নিয়ে দার্শনিক ভাবনাও হয়েছে সুপ্রচুর। তন্ত্রের শৈবদর্শন কাশ্মীরে ও দাক্ষিণাত্যে কিছু পাওয়া যায়, না হলে তা প্রায় লুপ্ত। বৈষ্ণব ও শাক্তধারার প্রচলন আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি। এখন দেখে মনে

হয়, বৈষ্ণব সাধনার ধারা পথে যেন আলাদা হয়ে গেছে। সাধনার ক্ষেত্রে ভক্তি ও শক্তিকে যেন প্রকৃতি ও পুরুষের মত দুধারায় বইয়ে দেয়া হয়েছে পৃথক ভাবে। কিন্তু প্রকৃতিপুরুষের মিথুনকে তো ভাঙা যায় না। যদি তন্ত্রের সার শক্তিউপাসনাকে ধরা যায় আর বেদের জ্ঞানকাণ্ড বেদান্তের সাধনায় পুরুষপ্রধান দেখা যায়, তাহলে বৈদিক ও তান্ত্রিক দর্শনপ্রস্থান মিলিয়ে পুরুষ ও প্রকৃতির উপাসনা এক অখণ্ডদর্শনে জুড়ে নেওয়া যায়। একটি সিদ্ধান্ত শাস্ত্র ও অপরটি সাধন শাস্ত্র। বেদান্তে পুরুষ প্রধান এবং তন্ত্রে শক্তি প্রধান স্থান নিয়েছে। আধুনিক যুগে বেদান্ত সাংখ্যপ্রভাবিত হয়ে শক্তিকে ছেঁটে দিয়েছে। তাই আধুনিক যুগে পূর্ণযোগসমন্বয়ে বেদান্তদর্শন সমাহারের অনুকূলে আসেনা। অপর পক্ষে মহাশক্তিকে তন্ত্র জগতের মূলে গ্রহণ করেছে, তাই তন্ত্রের সমন্বয়ী দর্শন যোগসমন্বয়ে অধিক কার্যকরী। শক্তিকে পরমতত্ত্বের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তাই সেটা পূর্ণযোগসাধনের সবিশেষ অনুকূল ও প্রস্তুতির পথে এক অপরিহার্য আশ্রয় এবং ভিত্তি। অন্য যোগপন্থাগুলিতে শেষ পর্যন্ত জীবন্মুক্তিই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। যোগেশ্বর পুরুষকে চাওয়ার পথে ভুক্তি ও মুক্তি দুইকেই তন্ত্র সমানভাবে গ্রহণ করেছে শক্তির প্রাধান্য দিয়ে, এটাই তার বৈশিষ্ট্য।

যোগসমন্বয়ের আর একটি প্রধান ভিত্তি ও আশ্রয় ভগবদ্গীতা। তন্ত্রদর্শনকে ভিত্তি করে গীতার দর্শন গ্রহণ করলে এক প্রাচীন যোগসমন্বয়ের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এটাও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে শ্রীঅরবিন্দ দর্শন গীতা থেকেই শুরু। তাঁর দর্শন বুঝতে হলে **Essays on the Gita** গোড়ায় ভাল করে বুঝে নিতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন যে তিনি শ্রীকৃষ্ণচেতনাকে জগতে নামিয়ে আনার প্রয়াস করছেন ; সেই দৃষ্টিতে গীতার দর্শন অধিগত করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দের গীতোক্ত কর্মযোগের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব। আমাদের দেশে বহুযুগ ধরে কর্ম উপেক্ষিত হয়ে ছিল। গীতাব্যাখ্যায় এক সম্প্রদায় জ্ঞানে ঝোঁক দেন, অন্য সম্প্রদায় ভক্তিতে। গীতার রহস্য কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়। জ্ঞানযোগের সাধ্য ব্রহ্ম বা আত্মা ; তিনি বিশ্বোত্তীর্ণ। ভক্তের ভগবান বিশ্বাত্মক হয়েও বিশ্বোত্তীর্ণ ; তাই কর্মযোগী কর্ম করেন কর্মক্ষয়ের জন্য, সৃষ্টির উল্লাসে নয়। এতে সাধন জীবনে কর্মের স্থান গৌণ হয়ে পড়ে। শ্রীঅরবিন্দের **Essays on the Gita**তে চোখে আঙুল দিয়ে প্রথম দেখিয়ে দিলেন যে সব কর্মই ভগবানের। তাঁকে ভিত্তি না করে কর্ম করলে কর্ম দিব্য হবে না। এমন কথা আগে শোনা যায়নি। গীতার কর্ম ভাগবত কর্ম ; ভক্তি আর জ্ঞান যদি তার আশ্রয় না হয় তাহলে দিব্যকর্ম সম্ভাবিত হতে পারেনা—এ কথা শ্রীঅরবিন্দের আগে এভাবে কেউ বোঝাননি। গীতার প্রবচনের স্থান কুরুক্ষেত্রে ; তার প্রত্যেক অধ্যায়ে যুদ্ধের প্রেরণা। এটা ধরতে পারলে জীবনযুদ্ধের প্রেরণায় কর্মের মর্যাদা বাড়ে, শক্তি লাভ হয়। কর্ম ছাড়া জীবনে পূর্ণতা আসতে পারে না। প্রাচীন কালে গীতার ভাষ্যে কুরুক্ষেত্র যে ধর্মক্ষেত্র, এই আধারতত্ত্বটি প্রায় বাদই পড়ে গেছে। অর্জুনের চেতনা প্রাকৃত বলেই ঘোরকর্মের উপদেশ—এটুকু মাত্র বুঝলে গীতার

উপদেশ নিরালম্ব হয়ে পড়ে। জীবনে আর যোগে বিচ্ছেদ ঘটে, যোগেশ্বরের প্রসাদবঞ্চিত সংসার দুঃখময় মাত্র হয়েই দেখা দেয়। ধর্মযুদ্ধ এবং পুণ্যভূমি এই কুরুক্ষেত্র, এটা যেন শুধু কথার কথাই হয়ে দাঁড়ায়। শাঙ্করমতে গীতা মোক্ষশাস্ত্র, ভক্তি ও কর্ম সেখানে গৌণ। অপরপক্ষে শ্রীধরের মতে ভক্তির স্থানই মুখ্য। আবার আধুনিক যুগে বঙ্কিমচন্দ্র ও লোকমান্য তিলক যুগপ্রভাবিত হয়ে কর্মে এত জোর দিয়েছেন যে সেখানে জ্ঞান ও ভক্তির স্থান গৌণ হয়ে পড়েছে। আমরা যে মন দিয়ে বুঝি তার স্বভাবই হল খণ্ড করে দেখা বোঝা। তাতে একটা দিকে বেশি জোর পড়ে; অন্য দিকটা না দেখতে পেলেই গোঁড়ামি এসে যায়। মন জাগলে টর্চের মত কাজ করে এবং দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি সৃষ্টি করে, কারবারী বুদ্ধির সহায়ে তা বোঝাও যায়। কিন্তু এ মন দিয়ে অন্তরকে বোঝা যাবে না আর তা না হলে যোগও হবে না। এর জন্য চাই আত্মসমর্পণে এক সমগ্রের বোধ বা বোধিকে জাগানো। আত্মসমর্পণ এলে বুদ্ধি তিনিই দেবেন—'দদামি বুদ্ধিযোগং'। তখনই সমন্বয়ের দৃষ্টি খুলে যাবে, জ্ঞানের দীপ জ্বলে উঠবে। ব্যক্তিগত ভাবে, সিদ্ধজীবনে পুরুষের স্বভাবতই এক উদার সমন্বয়ী দৃষ্টি দীপ উন্মীলিত হয়। তিনি কারও নিন্দা বা স্তুতি করেন না। মধ্যযুগের অনেক সন্তদের মধ্যে এমন এক সমন্বয়ী দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলি সংগ্রহ করে কোনও শাস্ত্র রচিত হয়নি বলে সেটা সমাজজীবনে সমষ্টির বোধে সমন্বয়ী দৃষ্টি খুলে দিতে সমর্থ হয়নি। এরই জন্য প্রয়োজন আচার্যের, তাঁরা তত্ত্বকে সমাজগত করেন। সেই শক্তিপাতের প্রসাদে ও প্রভাবে সমাজের প্রতি স্তরেই চাওয়া পাওয়া দেওয়া এবং পরিশেষে হওয়া—এই সব ভাবেই যোগ এবং ক্রমে এক মহাসমন্বয়ে গ্রথিত হয়। বহু পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ তাও করেছেন, গীতা ও ভাগবত সেই পরিচয় বহন করে। তারপর সেই সমন্বয়ী দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় 'মহতা কালেন নষ্টঃ' হয়ে যায়। তাকে আবার শ্রীঅরবিন্দ এসে তাঁর যোগে সবভাবেই নতুন করে সমন্বিত করে গেঁথে তুলেছেন। প্রাচীনের সমাহার এবং এগিয়ে চলার নবীনের সংযোজন—এতে নূতন দিগন্ত খুলে উষার পুনরাবির্ভাব হয়েছে। তার মধ্যে প্রত্যেকের দর্শনের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাবে।

যোগের লক্ষ্য কি? ক্ষুদ্রজীবনকে বৃহৎ করা—ব্রহ্মস্বভাবে যুক্ত হওয়া। ব্রহ্ম বৃহৎ চেতনা কিন্তু জীবন অল্প, তাকে ভূমা করতে হবে। তাতেই জীবের স্বাতন্ত্র্য। 'আমি' ক্ষুদ্র সাধক আর আমার সাধ্য হলেন ব্রহ্ম। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ শ্রীঅরবিন্দ যোগসমন্বয়ের জ্ঞানযোগের পর্বে দিয়েছেন পাঁচটি। ব্রহ্মের সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপের কথা আমরা জানি। কিন্তু তাতেই তিনি নিঃশেষিত হয়ে যান না। আরও দুটি তত্ত্ব তাঁর স্বরূপস্বভাবেই, তিনি অসৎস্বরূপ ও শক্তিস্বরূপ। এ দুটিকে যথাক্রমে ওপরে ও নীচে কল্পনা করে নিতে পারি। বিশ্বাতীত ব্রহ্ম মন বুদ্ধির অগোচর, তখন তিনি সত্তেরও উর্ধ্বে অসৎ—**utter transcendence**; এটিও প্রাচীন ভাবনা। আবার

ব্রহ্ম নিঃশক্তিক হতে পারেন না, জগতের দিক থেকে দেখলে তিনিই শক্তিস্বরূপ, তাঁরই প্রকাশ এই জগৎ। তখন তাঁকে সগুণও বলতে পারি, নির্গুণও বলতে পারি। কাজেই তিনি সগুণ হয়েও নির্গুণ আবার নির্গুণ থেকেও সগুণ। ব্রহ্মচৈতন্যকে আমরা দ্বিধাবিভক্ত ভাবে দেখি, পুরুষের বা চৈতন্যের দিক থেকে এবং প্রকৃতি বা শক্তির দিক থেকে। দেখার জন্য দুটি মেরু স্বীকার করে নিতেই হবে। না হলে বস্তুত পুরুষপ্রকৃতি এক অবিভাজ্য তত্ত্ব। একদিকে যদি দেখি অসৎ সৎ ও চিৎ, তবে এ তিনের প্রতিষ্ঠায় পুরুষের ভাব। আবার তারই মধ্যে আনন্দের উল্লাসে শক্তির বিচিত্র প্রকাশ হচ্ছে প্রকৃতির ভাবরূপ। এগুলি আমাদের বোধে কি ভাবে প্রতিভাত হয়। অসৎএ সব হারিয়ে যায়, খৈ পাওয়া যায় না। তাকে আমরা জীবনের কোন কাজে লাগাইনা। শুধু এক অস্পষ্ট বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়ার সময় যদি সচেতন থাকি। যোগসাধনায় সমাধি আসার পূর্বেও এক অসৎ বা প্রবল নাস্তির বোধ আসে। জীবনের আর একটি ভিত্তি ব্রহ্মের সদ্‌ভাব। তাকেও আমরা জীবনের কাজে লাগাই না, এর প্রকাশ শান্তিতে ও বিশ্রামে। প্রশান্তি ও বিশ্রান্তি জীবনের সঙ্গে গ্রথিত, অঙ্গীভূত। কর্ম বা গতি একটা আছে আর ধ্রুবাস্থিতি বা স্থিরতা একটা নেই, তা তো হতে পারে না। এই ভাবে সৎ ও অসৎ জীবনের পশ্চাতে বা অধিষ্ঠানে আছেই। চৈতন্যের প্রকাশ হয় তাতে সৃষ্টিসুখের উল্লাসে ও বিলাসে, সেটাই জীবন—প্রাণ। তখন যে সচেতন অবস্থা সেটাকেই জাগ্রত বলে ধরা হয়। সেই অবস্থায় থেকে চিন্তা, সংবেদন, কর্ম সবই আস্বাদিত হয় জীবের মাধ্যমে। এসবই শক্তির প্রকাশ—লীলাবৈচিত্র্য ও প্রেমবৈচিত্র্য।

তাহলে ব্রহ্মকে যখন চাই, দুভাবেই চাওয়া যেতে পারে। তার প্রতিষ্ঠার দিক—ঐ সৎভাবকে আশ্রয় করে সৎসমাপত্তি বা বিশুদ্ধস্থিতি, এই হল একভাব। অন্য দিকে আর সমস্ত থাকল উপাধি রূপে। এতে সাধনার ধারায় জীবনবিমুখীনতা এসে পড়ে এবং জগৎ-ব্যাপার বা নামরূপ বর্জনই লক্ষ্য হয়ে পড়ার দিকে ঝোঁক আসে। কিন্তু ব্রহ্মচৈতন্যই একমাত্র, তদতিরিক্ত বস্তু কিছু থাকতে পারে না, এই অদ্বৈতবোধে যদি ঠিক ঠিক প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে কিছুই বাদ পড়তে পারে না। চৈতন্য জ্ঞান কর্ম আস্বাদন, এ সবই আনন্দ ও শক্তিরই চিদ্‌বিলাস। রসো বৈ সঃ—তিনি রস স্বরূপ। আপন আনন্দলীলায় আপনি বিভোর, সেই ভূমার বোধে যদি প্রতিষ্ঠা পাই সৎ ও অসৎকে রেখে, তাহলেই যথার্থ বৃহৎ হতে পারি। তাঁর লীলায় যোগ দিয়ে ব্রহ্মস্বভাবই লাভ করতে পারি। এই ভাবই যোগসমন্বয়ের মূলে। ব্রহ্মের সৎ ও অসৎ বাদ দিতে নেই, দেওয়া যায়না। তাতেই আশ্রয় ও স্থিতি লাভ এটা চাই। কিন্তু ব্রহ্মের ইতি করতে নেই, কোন ক্রমেই তা করা সম্ভব নয়। ঐ পশ্চাৎপট থেকেই শক্তির নির্ঝর আর তাতেই আনন্দের উল্লাস। মূল শক্তির যোগান ঐ কৈবল্য বা নৈঃশব্দ্য থেকেই। এই অসৎ ও সৎকে পুরোপুরি জীবনে অধিগত করা বা তাতে সমাপত্তিতেই বৌদ্ধ নির্বাণ বলা যায়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যেখানে বৌদ্ধ সাধনা শেষ, সেখানে

তাঁর সাধনা শুরু। এর অর্থ অসৎ বা নির্বাণকে অস্বীকার করা নয়। অসীমে অনন্তপ্রসারিত সত্তার অনির্বাণ অধিষ্ঠানেই আধাররূপে থাকবে চৈতন্য ও আনন্দের শক্তির নির্ঝর। জীবনে এটি ঘটিয়ে তোলাই পূর্ণযোগ বা যোগসমন্বয়ের ভিত্তি স্থাপন—অতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠা।

এই দৃষ্টিতে পূর্ণযোগ যথার্থ ব্রহ্মযোগ, ব্রহ্মকে জীবনে মূর্ত করে তোলা। এর সার্থকতা শুধু তত্ত্বদৃষ্টিতে পেলেই হবে না ; জীবনের জাগ্রতে তাকে মুখ্যস্থান দিতে হবে। সুষুপ্তিস্থান ও স্বপ্নস্থান জাগ্রতের শক্তির উৎস ; তাকে জাগ্রতে প্রতিফলিত করাই যোগকর্ম। ব্রহ্ম-সংকল্পকে রূপ দিতে হবে, তাকে সম্পদ্যমান করতে হবে জীবনকাব্যে, তা না করতে পারলে যোগ পূর্ণাঙ্গ হয়না। সেজন্য পূর্ণযোগে আত্মসচেতনতার সঙ্গে আর একটি মূলসূত্র ধরতে হবে, সেটি হল ব্রহ্মের এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপজ্ঞান ও স্বভাব সম্বন্ধে এক সমগ্র প্রত্যয়। কর্ম জ্ঞান ভক্তি, এই যোগত্রয়ীর সাধনে বিশেষ জোর দিতে হবে এবং আধার প্রস্তুত করতে হবে হঠযোগ ও রাজযোগের সহায়ে। কিন্তু প্রাকৃত স্বভাবে যোগত্রয়ীর সম্যক সাধনের দ্বারা ব্রহ্মস্বভাবের প্রকাশ ঘটাতে শুধু মনের শক্তি ও সহায়ে চললে হবেনা। কেননা মন ও বোধির সঙ্গে বুদ্ধির নিহিত আনুগত্য। বুদ্ধি পাশাপাশি সাজিয়ে সমস্ত খণ্ডকে দর্শন করে। সবগুলিকে পৃথকভাবে স্বীকার করেও স্বভাবানুযায়ী একটার পরে তাকে জোর দিতে হয় এবং তাতেই সে রস পায়, অন্যগুলিতে পায় না। এ হল **overmind** বা অধিমানসের মায়া। সেখানে মনের সব ধারাগুলি পৃথকভাবে গিয়ে মিলেছে কিন্তু সাধকের প্রাকৃত স্বভাব যত ঝোঁক পড়ছে বিশেষ একটির পরে। কিন্তু সবকিছুকে মিলিয়ে নিয়েও সমগ্রকে একসঙ্গে দর্শন সম্ভব হয় বোধিবৃত্তিতে (**Intuition**)। উপনিষদে যিনি প্রাণ, ব্রহ্মের প্রতিরূপ তিনিই বোধির আশ্রয়। হৃদয় দিয়ে জানা বা পাওয়া সেখানকার ধর্ম। চিন্তা, কর্ম আনন্দ সবই বোধিবৃত্তিতে একরসপ্রত্যয়ে বিজ্ঞাত। মন বিষয়কে জানে বিষয়রূপে আলাদা করে যেন কেটে নিয়ে। এই প্রাণের ধর্ম দিয়ে বোধি বিষয়কে জানে একাকার হয়ে, তাদাত্ম্যজ্ঞানে। এটাই সমগ্রের দর্শন (**Total vision**)। তাই হৃদয় দিয়ে জানা হলে পরে আর বিরোধ থাকে না। এই বোধি (**Intuition**) যোগসমন্বয়ের সাধনার এক অপরিহার্য সহায় সাধনার শুরু থেকেই। তাই যোগসাধনার গোড়া থেকেই বোধির প্রয়োগকৌশল শিখতে হবে সবরকম কর্মে বা ব্যবহারে। তাহলেই যোগ সহজ হবে।

বলা হয়েছে প্রাণ বোধির অবলম্বন। এই মুখ্য প্রাণ জাগলে জ্ঞানের দ্বারগুলি খুলে যায়। বোধি তখন জাগে যার মূলে আছে আত্মসমর্পণ। ভগবানকে সব দিতে হবে। যখন দেবার সময় আসে শুধু মন দিলেই তো আর চলে না। ভক্ত বলেন তাতে ফাঁপ দিয়ে পড়ি। তাঁকে আমার মাঝে আহ্বান করি 'সর্বভাবেন'—সব ভাব দিয়ে করে আমার মধ্যে আবির্ভূত হও। তোমার আলোয় আমার সব কিছু আলোময় করে তোলো। আমি শুধু হৃদয় মেলে নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দেব। আমার জ্ঞান, কর্ম, ভোগ, তপস্যা সবই

তুমি। এইই দেবাবিষ্ট জীবন। আমার সব দিয়ে তাঁকে চাই, তাঁরই আলোয় প্রতিনিয়ত স্নান করে করে নিত্যনবীন হয়ে উঠছি. এই ভাবের আত্মসমর্পণে জোর ধরলে প্রাণভূমিতে বোধির আবির্ভাব সক্রিয় হয়। তখন বুদ্ধি বোধির অনুগত হলে মন প্রোজ্জ্বল হয় এবং দেহবোধ পর্যন্ত সজাগ হয়ে সাড়া দেয়। যোগের পরবর্তী সব নিগূঢ় ভূমিতেও বোধির কাজ চলে সন্ধানী এক আলো ফেলে ফেলে শিকারী সারমেয়ের ক্ষিপ্র গতিতে অনুসন্ধানের মত। তাতে ভাবসমাধি, নির্বীজ সমাধি ইত্যাদি অপ্রাকৃত আবরণগুলিও নিরাকৃত হয় এবং যোগ-সাধনার মূলতত্ত্বে যোগী সহজে পৌঁছে যেতে পারেন।

সব চেয়ে বড় কথা যোগেশ্বরের কাছে নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দেওয়া। সে দেওয়াও তো তিলে তিলে বেড়ে চলে। বৈদিক ঋষিরা যেমন সৌরালোকে অভিষিক্ত হয়ে ওঠার এক চিন্ময় প্রত্যক্ষ সাধনা দেখিয়ে গেছেন, সেই বৃহতের ও সবগ্রের সহজবোধও সমর্পিত হয়ে চলার ফল। এই বোধ বা বোধিকে সম্যক লাভ করতে পারলে আত্মসচেতনতাও স্বস্থ থাকে। শুধু বুদ্ধির কারবারে মন পঙ্গু হয়ে পড়ে যদি না তাতে বোধির আলো এসে পড়ে। পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করতে এগিয়ে যায়, মূক হতে চায় বাচাল আর অন্ধের দৃষ্টিশক্তি লাভের আশ্বাস সবই এই বোধির জাগরণে সম্ভব হয়। দেবতার এই সাক্ষাৎ বোধকে আশ্রয় করে চলা পূর্ণযোগের আদর্শ।

The value of our actions lies not so much in their apparent nature and outward result as in their help towards the growth of the Divine within us.

—Sri Aurobindo

Bholanath Paper House (Pvt.) Ltd.

32-A, BRABOURNE ROAD

CALCUTTA—1

Phone 22-1532-33 **Gram-BIDYASEVA**

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,

HOWRAH.

Phone : 66-2434

Very often it so happens that the things a man does not really need are just the things that cause him most harm.

—The Mother

BENGAL IMMUNITY

Troubled by insects ? ?

If so, please do not hesitate to make use of our
up-to-date scientific and efficient servicing arrangements
by specially trained staff for completely
disinfecting your premises with :

I.C.I.'s " GAMMEXANE " FORMULATIONS

Eastern Insecticide & Co.

(Servicing Agent of Messrs I.C.I. (India) Private Ltd.)

4, Lyons Range
CALCUTTA-1

পূজার উপহার

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের
কবির্মনীষী
রবীন্দ্রনাথ
বেদমন্ত্র

সমীরকান্ত গুপ্তের
মনের মন মুকুর
দাম তিন টাকা

[দার্শনিক, কবি, চিত্রকর, সুরশিল্পী, বৈজ্ঞানিক, কর্মবীরের
জীবন থেকে অসামান্য কাহিনীমালা]

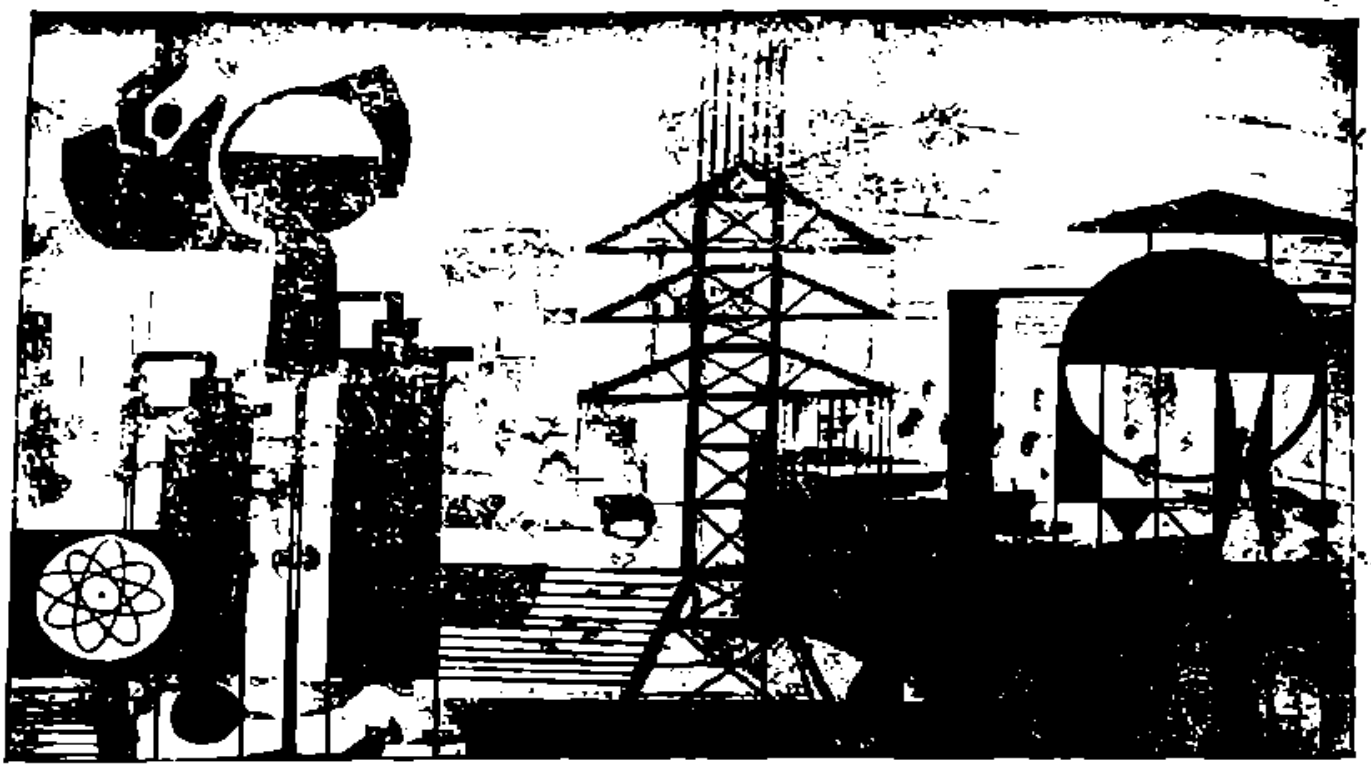

FROM BLUE PRINT TO INITIAL OPERATION

Kuljian's world-wide services in the field of consulting engineering range from preliminary surveys, site selection, feasibility reports, engineering studies, preliminary design to detailed plants and specifications, estimating and purchasing, management of construction and initial operation. ■ The Kuljian system of integrated engineering provides efficient and economical solution to all problems of an entrepreneur. Under one corporate roof Kuljian (India) maintains not only an able team of designers and experts in civil, mechanical, nuclear, electrical, architectural and chemical engineering, but also technicians, economists and management specialists who are equal to any exacting assignment anywhere in India. ■ Whatever be your project—a steel plant or an apartment house, a fertilizer plant or a thermal station, subway systems or transmission lines, let Kuljian do the job for you. It has the experience and the resources.

YOUR PARTNER IN PROGRESS

AN INDO-AMERICAN JOINT ENTERPRISE

The Kuljian Corporation (India) Private Ltd.

SURVEYS ■ REPORTS ■ DESIGN ■ ENGINEERING
■ PROCUREMENT ■ CONSTRUCTION ■ INSPECTION ■ INITIAL OPERATION

ENGINEERS • CONSTRUCTORS
24-B PARK STREET, CALCUTTA-16

God is infinite possibility. Therefore Truth is never at rest ; therefore, also, Error is justified of her children.

—Sri Aurobindo

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

PHONE : Boxboard

With Compliments of : —

INTER PROVINCIAL TRANSPORT Co.,

57, Radhabazar Street,
CALCUTTA—1.

(GARAGE 41 9, Russa Road, CALCUTTA-33).

GARAGE PHONE :
46-1512.

Eliminate egoism in all its form; eliminate it from every movement of your consciousness.

—Sri Aurobindo

RODUK & COMPANY

5, CLIVE GHAT STREET

CALCUTTA-1

TELE: 'Kenabecha'

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

২৪শে নভেম্বর, ১৯৬৬

বর্ষ—২৬ সংখ্যা—৪

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে নভেম্বর, ১৯৬৬)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

মাতৃবাণী	
শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী	
চর্য্যাপদাবলী	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা
প্রসঙ্গত	শ্রীমা
পত্রের কথা	শ্রীমা
বিদেশের ডায়েরীর কয়েক পাতা	এ. সি. পুরাণী
কঠিন ডানার ওড়া	নীরদবরণ

বর্ত্তিকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৩শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা-শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

শাখা :

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

দাম—দেড় টাকা

Published by : Sri Aurobindo Pathamandir,
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12

Edited by : NOLINI KANTA GUPTA

Printed by : AMIYO RANJAN GANGULI
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

PRINTED IN INDIA

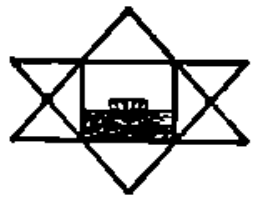

২৪শে নভেম্বর, ১৯৬৬

রয়েছে এই তিনটি শক্তি

(১) বিশ্ব-বিধি অর্থাৎ কর্ম্মফল-বিধি এবং অন্যান্য যা-কিছু।

(২) ভাগবত-করুণা—যার কাজ হ'ল যত জনার কাছে তা পৌঁছতে পারে বিশ্ব-বিধির জাল ভেদ করে, তাদের উপর।

(৩) ভাগবত-প্রসাদ—যার কাজ আরও দুরধিগম্য কিন্তু আরও অপ্রতিহত অন্য দুটি শক্তির অপেক্ষা।

—শ্রীঅরবিন্দ

মাতৃবাণী

সুকর্ম করতে হ'লে থাকা দরকার সুরুচি।

সুরুচি অনুশীলন করা যায় শিক্ষার দ্বারা আর যাদের সুরুচি আছে তাদের সাহায্যে।

শিক্ষা করতে হ'লে প্রথম প্রয়োজন হ'ল এই বোধ যে তুমি কিছুই জান না।

*

সত্যকে কথায় ব্যক্ত করা যায় না, কিন্তু তাকে জীবনে ফলিয়ে ধরা যায়। তবে সেজন্য প্রয়োজন অনেকখানি শুদ্ধ ও সুনম্য হওয়া।

*

জীবনে যা কিছু কর, তা করা উচিত একমাত্র ভগবানের সেবা হিসাবে আর কারো নয়।

তুমি যা কিছু চিন্তা কর, যা কিছু অনুভব কর তার জন্য তুমি দায়ী ভগবানের কাছে আর কারও কাছে নয়।

তোমার সত্তার, তোমার জীবনের একমাত্র অধিকর্ত্তা হলেন তিনি। তাঁর কাছে তুমি যদি একান্ত আন্তরিকভাবে পূর্ণ আত্মসমর্পণ কর, তাহ'লে তিনিই তোমার ভার গ্রহণ করবেন, অন্তরে তুমি পাবে শান্তি।

বাকী আর সব কিছু হ'ল অজ্ঞানের জগৎ নিয়ে এবং তা চালিত হয় অজ্ঞান দিয়ে, তার অর্থ বিশৃঙ্খলা ও দুঃখ-কষ্ট।

*

তোমার আশ্পৃহাকে সর্ব্বদা রাখবে প্রজ্বলন্ত এবং অকপট; কখনও ভুলবে না যে তুমি হলে জগজ্জননীর সন্তান। তা হলেই জগজ্জননীর সন্তানের পক্ষে অশোভন যা কিছু তা হ'তে তুমি বিরত থাকবে।

*

ভগবানের কাছে থেকে সাধক লাভ করে শান্তি। এ শান্তি বাহ্য অবস্থার উপর আদৌ নির্ভর করে না।

ভগবানের দিকে ফিরে তাকাও, অন্তরে সত্যকার শান্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা রাখ, তা হ'লেই নির্বিঘ্নে কাজ করে চলবার মত শান্তি তুমি পাবেই।

*

যাহা ঘটনাবলির উপর স্বাধীনতা নির্ভর করে না। স্বাধীনতা আসে আন্তর মুক্তি হতে। অন্তঃপুরুষের সাক্ষাৎ কর, তার সঙ্গে এক হও, তাই যেন তোমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, তবেই তুমি হবে স্বাধীন।

আন্তরিকভাবে যোগসাধনা করে যে, সকল রকম অবস্থার সম্মুখীন হবার শক্তি ও সামর্থ্য সে পাবেই ; কিন্তু যারা আত্ম-প্রতারণা করে, যাদের বিশ্বাস যোগসাধনা করে কিন্তু করে শুধু আংশিকভাবে, যারা এখনও অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ তাদের সংখ্যাই অগণিত।

*

অপরকে সাহায্য করবার ধারণা অহমিকার সূক্ষ্মরূপ। একমাত্র ভাগবতী শক্তিই সাহায্য করে, তার যন্ত্র তুমি হতে পার, কিন্তু প্রথমে হতে হবে তোমাকে উপযুক্ত অহংশূন্য যন্ত্র।

যারা ভগবানের কাছে নিজেকে দিয়ে দিয়েছে তাদের পক্ষে প্রত্যেক বিঘ্ন হ'ল নূতন একটা উন্নতির সূচনা এবং তাকে গ্রহণ করা উচিত ভগবৎ-করুণার দান বলে।

ছোটদের উদ্দেশ্যে

ভগবান, আমি তোমারই হয়ে উঠতে চাই, তোমার উপযুক্ত হতে চাই, আমাকে তোমার আদর্শ সন্তান করে তোল।

*

প্রশ্ন : "ভগবানকে কে গড়েছে ?"

মা ভগবান স্বয়ং।

*

প্রশ্ন : "অন্তরাত্মা কি ? আমাদের মধ্যে কোন রূপ নিয়ে তা আছে ?"

মা অন্তরাত্মার প্রথম রূপ হ'ল ভগবান থেকে একটা আলোর স্ফুলিঙ্গ ; ক্রমবিকাশের ফলে সে হয়ে ওঠে ব্যষ্টিগত সত্তা ; তার পরে সে রূপ গ্রহণ করতে পারে যেমনটি সে চায়।

প্রশ্ন : "তুমি কি ভগবান ?"

মা প্রশ্নটি যে কোন মানবসত্তাকে করা যেতে পারে। উত্তর হল : হাঁ, তবে বীজরূপে। আর প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য হ'ল কার্য্যতঃ, বাস্তবে তাকে প্রকট করা। *

---

* অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী

একাদশ পর্ব্ব

অগীনের মধ্যে তার সম্মুখভাগে সর্ব্বপ্রথম যে রাজ্য সেখানে এসে উপস্থিত হল সাবিত্রী। নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করল—সে দৃষ্টি তার চিরন্তন কালে অসংখ্য দৃষ্টিতে পরিণত হয়ে গেল—অজস্র জ্যোতির্ম্ময় জীব, বহু সূর্য্য; অগণ্য আত্মহারা আনন্দরাশির মাঝে। দৃষ্টি তার ঊর্দ্ধে প্রসারিত হল—যে মহান দেববৃন্দ রাজত্ব করে তাদের অতিক্রম করে সে দৃষ্টি গিয়ে স্পর্শ করল সব কিছুর উৎস এক জীবন্ত গ্রন্থিতে। নিখিল বস্তুর স্পন্দিত হৃদয়ে বিকশিত হয়ে উঠল অবিমিশ্র আনন্দের শতদল, অভিব্যক্ত হল ত্রিমূর্ত্তি এক বিরাট বিশ্বের স্রষ্টা যে; হিরণ্য-গর্ভ; সকল চিন্তা সকল স্বপ্নের নির্ম্মাতা; আর পশ্চাতে এক পরাচেতনা, সব কিছু যে গড়ে তোলে তার যোগনিদ্রা সর্ব্বজ্ঞানের মধ্যে।

অভিনব এক কণ্ঠ সাবিত্রীকে সম্বোধন করল: সত্যবানের সঙ্গে এখন সে মিলিতা, এখন সে দুর্গত পৃথিবী ত্যাগ করে যেতে পারে, শাশ্বত আনন্দের অধিকার অর্জন করেছে সে। কিন্তু সুদূর স্বর্গের এ প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করল সাবিত্রী—

"আমি উঠে যাব না তোমার চিরন্তন দিনের মধ্যে, আমি ত' চিরন্তন রাত্রিকেও পরিহার করেছি....বীরব্রতন হৃদয়রা বরণ করেছে এই পৃথিবীকে...পৃথিবীর উপর তোমার দাসত্ব করা, হে রাজন্, স্বর্গের পূণপ্রভ মুক্তি লাভ অপেক্ষাও মহত্তর। হে বিশ্বকর্ম্মা, তোমার হাতুড়ীর আঘাত ধ্বনিত হয়ে চলুক জীবনে, দীপ্ত অগ্নিকুণ্ডে তোমার, আমাদের সকলকে গালিয়ে মিশিয়ে এক করে দাও...আমি জানি মানুষের অন্তরাত্মাকে আমি ভগবানের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, আমি জানি ভগবান নীচে নামিয়ে নিয়ে আসতে পারেন এই এখানে অবরত্বকে।"

প্রত্যুত্তরে আবির্ভূত কণ্ঠ সাবিত্রীকে সাবধান করে দিল, অত্যধিক ত্বরা না করে চলে যেন সে; কারণ, অজ্ঞান এই জগৎ, ক্রমপর্য্যায়ের পথে ছাড়া জ্ঞানের অভিযানে সে চলতে পারে না। সাবিত্রী তবে প্রস্তুত; রাত্রির ভার যেমন সে বহন করে এসেছে তেমনি উদীয়মান দিনের প্রাখর্য্যও সে ধারণ করবে। দিন-রাত্রি, এ সব প্রতীক-সত্যের ঊর্দ্ধে কালাতীত পরমের মধ্যে, সাবিত্রী সজ্ঞানে তার নিজের জন্যে, পৃথিবীর জন্যে করবে শেষ নির্ব্বাচন।

এক মহাশক্তির আবির্ভাব হ'ল, কেঁপে উঠল লোকরাজি, শিথিল হয়ে গেল রূপ-বদ্ধ সব, দৃষ্টির ও চিন্তার সংহতি খুলে গেল, গলে গেল। কৈবল্য-আত্মার আলোকে মুছে গেল

স্বর্গলোকসমূহ। অস্পষ্ট এক স্পন্দনের লোলে সাবিত্রী হয়ে উঠল মহান অনির্বচনীয় ছন্দ এক। তারপর সবই আবার লীন হয়ে গেল নীরবতার মধ্যে। অপরিমেয় এক ঐশী সান্নিধ্য তাকে ঘিরে রইল যেন দ্রবমান মুক্তাকে ঘিরে রয় অজানিত শিখা। তাকে আচ্ছন্ন করল অশ্রুত শেষ কণ্ঠ এক

"আমার উর্দ্ধতর স্থিতি হতে তোমার দিকে চেয়ে রয়েছে নামহীন রূপহীন শান্তি... হে সঙ্গীত, তোমার সুরে যে ক্লান্তি নেমেছে তাকে স্বীকার করে নাও"

সেই পরাশান্তিকেই বরণ করে নিল সাবিত্রী, মাটির মানুষের আত্মার জন্যে যাতে এখানেই মানুষ প্রতিষ্ঠা করতে পারে তার আনন্দ।

আর সে বরণ করে নিল একত্ব, অসংখ্য জনহৃদয় যাতে সে নিজের মধ্যে বরণ করতে পারে। অজানা কণ্ঠ তখন সাবিত্রীকে দেখিয়ে দিল তার ক্ষমতার গরিমা, পরাৎপর স্থিতির মাঝে নিস্পন্দ যা, বিশ্বের সমস্ত আবর্ত্ত থেকে উর্দ্ধে উর্দ্ধ-স্থিত, এই শক্তিকেও সাবিত্রী গ্রহণ করল যাতে সে আপনার করে নিতে সকল নর আর সকল নারীকে, তাদের এক করে ধরতে পারে পরমা-জননীর স্নেহ-অঙ্কে।

আরও সে বরণ করে নিল এক অবিভক্ত আনন্দকে, বেদনার গ্রন্থি খুলে ফেলে অবারিত করে ধরল প্রেমের অতল পাথার অভিমুখে এক সরণী।

নিস্পন্দ ধ্বনি এক জেগে উঠল, আনন্দের সুতীক্ষ্ণ ধ্বনি; অসীমের মধ্যে একদিন যেমন জেগেছিল হর্ষের প্রথম কলস্বন যখন সচেতন হয়ে উঠল প্রথম জিজ্ঞাসা প্রথম অনুসন্ধিৎসা প্রথম স্পর্শলিপ্সা

"নশ্বর মর্ত্যের হে সুন্দর তনু। তোমার চিন্তা আমারই চিন্তা, তোমার কণ্ঠে আমিই কথা, আমার ইচ্ছা তোমারই ইচ্ছা, তুমি যা বরণ করেছ আমিও তাই বরণ করি। যা কিছু তুমি চেয়েছ তা সব আমি দিয়েছি পৃথিবীকে মানুষকে।"

সাবিত্রী তুচ্ছ করে এসেছে শাশ্বতের বিশ্রাম-ভোগ, তাই এখন কালের চক্রে ভাগবত-কর্ম্মে তাকে আবদ্ধ হতে হবে। কণ্ঠ বলে চলল:

"আমার কালাতীত শক্তির আধার করে তুলব তোমায়...হৃদয় তোমার যাকে কামনা করে তার সঙ্গে জীবনের মধ্যে গিয়ে অবতরণ কর। হে সত্যবান, হে জ্যোতির্ম্ময়ী সাবিত্রী, তোমাদের আমি পাঠিয়ে দিয়েছি আদিকাল হতে তারকামণ্ডলীর দৃষ্টিতলে, ভগবানের দ্বৈত-শক্তি তোমরা অজ্ঞানের জগতে। ভগবানের আরো উর্দ্ধতর ক্ষেত্রে আরো কত বস্তু আবৃত রয়েছে...মানস সত্তার ওপারে রয়েছে আর এক সত্তা।...রয়েছে এক চেতনা মন যাকে স্পর্শ করে না...তার আবাস নেই পৃথিবীর উপর...তার প্রতিষ্ঠান নাই মানুষের মধ্যে; তবুও তাই হ'ল সকল চিন্তার সকল ক্রিয়ার উৎস, সৃষ্টির এবং তার কর্ম্মাবলীর উৎপত্তিস্থান। এখানকার যা কিছু সত্য তার হেতু সে...তার মহিমার আধার করে গড়ে

তোলা হবে কতিপয়কে...তারাই হবে বীর অগ্রণী, কালের পুরোধা...একটা অভিনব সমুন্নত জাতির প্রথম জাত সন্তান।...শাশ্বত অতিমানস পার্থিব কালকে স্পর্শ করবে। কিন্তু মহাসত্যকে প্রথমে পৃথিবীর উপর স্থির হয়ে তার পদতার স্থাপন করতে হবে, মানুষকে শাশ্বতের জ্যোতির আবাহন করতে হবে, তার সমগ্র জীবনকে হতে হবে আন্তর মহাশক্তির অনুগত সেবক...একদিন তাহ'লে অন্তর্জ্ঞানের প্রভা প্রকৃতির শিখর সব স্পর্শ করবে, প্রকৃতির অন্তস্তল এক দিব্য আবির্ভাবে স্পন্দিত হবে...আলো, আধার সব বন্ধিত সংখ্যার জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করবে, দিব্যশক্তি এক তাদের শিরাসমূহ কোষসমূহ পরিপ্লুত করে দেবে, সকল চিন্তা হবে শত সূর্য্যের প্রভা....পৃথিবী এই রকমে আপনাকে খুলে ধরবে ভগবানের কাছে...এই পার্থিব জীবন হয়ে উঠবে ভাগবত জীবন।"

কণ্ঠ স্তব্ধ হ'ল, লোক থেকে লোকান্তরে ভাসতে ভাসতে অবরোহী সাবিত্রীর আত্মা একটি তারার মত নেবে যায়। তার সঙ্গে চলে এক মূর্ত্তি, এক ছন্দিত ঘূর্ণির মধ্যে, কি তার ব্রত দেখিয়ে দেয়। সত্যবানের অন্তরাত্মাকে গূঢ়ভাবে সে ধরে থাকে। আকাশের পর আকাশ অতিক্রম হল। পৃথিবী যতই নিকট হতে নিকটতর হয়ে এল ততই সাবিত্রীর আকর্ষণ পড়ল গিয়ে যে সব প্রবেগ আসছে নীচে থেকে তাদের উপর। উর্দ্ধে তার, বিপুল পক্ষছায়া কার প্রসারিত হয়ে টেনে দিল যবনিকা।

সাবিত্রীর চেতনায় আবার জেগে উঠল শ্যামল শাখা-পল্লব, জেগে উঠল সান্ধ্য বনভূমির অলৌকিকতা। নতুন করে হল সে মাটির নেয়ে সাবিত্রী। কোলে তার সত্যবানের জীবন্ত দেহ। সত্যবানের প্রশ্নে সাবিত্রী উত্তর দিল

"সবই এখন অন্যরকম হয়েছে, সবই তবু রয়েছে সেই একই। ভগবানকে আমরা মুখোমুখি দেখেছি, আমাদের জীবন মুক্ত হল ভগবানের সঙ্গে মিলে গিয়ে। তবুও ত' নশ্বর ভালবাসার আনন্দ বিন্দুমাত্র হ্রাস হয়নি। স্বর্গের স্পর্শ পৃথিবীকে পূর্ণ করে ধরে। তাকে লুপ্ত করে না...চেয়ে দেখ, আমি সেই একই নারী, যে এসেছিল একদিন তোমার কাছে এই বনভূমির প্রান্তে রৌদ্রকরোজ্জ্বল লতা-পত্রের মৃদু মর্ম্মরের মাঝে...তোমার চিন্তার তোমার আশার তোমার প্রয়াসের অন্তরঙ্গ সহচরে...এই জগৎকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে তবে এ হ'ল এখন ভগবানের ক্রীড়াক্ষেত্র, তাঁর আবাসগৃহ। ভগবান লুকিয়ে রয়েছেন পাখীর মধ্যে পশুর মধ্যে মানুষের মধ্যে যাতে তিনি আবার মধুরভাবে নিজের সঙ্গে মিলিত হন প্রেমের আশ্রয়ে ঐক্যের আশ্রয়ে।"

হারান গৌরব-শ্রী ফিরে পেয়েছেন দ্যুমৎসেন, পাঠিয়ে দিয়েছেন সুখ লোক-জন—পুত্র আর পুত্রবধূকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। সাবিত্রী দিল তার প্রেম যার একতার বাণী।

অজস্র কণ্ঠে মুখরিত এই জগতে সবাই যখন ফিরে এল তারার আলোর দীপনে রাতও লাভ করল তার রাজত্বে এক উদ্ভাসন-দীপালি। বুকে তার মহত্তর প্রত্যুষের প্রস্তুতি।

[সমাপ্ত]

চর্য্যাপদাবলী

শ্রীমলিনীকান্ত গুপ্ত

তোমরা "নাথ"-যোগী ও সিদ্ধাচার্য্যদের নাম অন্ততঃ শুনেছ হয় ত; তাঁদের লিখিত পদাবলী, যাকে বলা হয় চর্য্যাপদাবলী, তারও কথা শুনে থাকবে। আজ এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই। এ বস্তু একটা বিশেষ যুগের, বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষার পরিচয় দিয়েছে; মানব-চেতনা একটা বিশেষ প্রকাশ দেখিয়েছে এবং তার তুলনা মেলে না। একে বলা হয় তান্ত্রিক বৌদ্ধ যুগ। অর্থাৎ বৌদ্ধ প্রভাবের পরিণামে যে একটা সাধনা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, যার প্রসার ছিল প্রধানতঃ পূর্ব্বোত্তর ভারতে, কিন্তু সমগ্র উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারতও কথঞ্চিৎ যার অধিকারে এসেছিল, এ ছিল সেই আন্তর সাম্রাজ্যের ইতিকথা। খৃষ্টাব্দ ৮ম শতাব্দী থেকে একাদশ কি দ্বাদশ অবধি এই সাম্রাজ্যের স্থিতিকাল ছিল বলা হয়।

এই পদাবলীর আবিষ্কার-কাহিনী বড় চিত্তাকর্ষক। অর্দ্ধ শতাব্দী বা তারও বেশি কিছু পূর্ব্বে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন সত্যকার অনুরাগী, জ্ঞানীগুণী—খুঁজছিলেন বাংলার প্রাচীন ইতিকথা, গ্রামে গ্রন্থাগারে হস্তলিখিত পুঁথিপত্র সংগ্রহ করবার ঐকান্তিক চেষ্টায় ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি নেপালরাজ্যে উপস্থিত হ'ন একবার; সেখানে তাঁর হাতে প্রাচীন পুঁথিপত্র কিছু এসে পড়ে। একটি বিশেষ পুঁথি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, প্রথমে মনে করেছিলেন প্রাচীনতর হিন্দী কিছু গ্রন্থ হবে, তাই তেমন মনোযোগ তখন দেন নাই। কিন্তু পরে কৌতূহল হওয়ায় পুঁথিখানি বিশ্লেষণ করে পাঠ করবার ফলে এই অভিনব অভাবনীয় তথ্য আবিষ্কার করলেন যে এই হল বাংলার প্রাচীনতম রূপ এবং অতিসুন্দর কবিত্বময় রূপ। পুঁথিখানিতে ছিল পঞ্চাশটি কবিতা বা গান। এই সব পদাবলী সিদ্ধাচার্য্য নামে এক বৌদ্ধ তান্ত্রিকগোষ্ঠির কীর্ত্তি। পরে তিনি আরও আবিষ্কার করলেন যে এই পদগুলির সংস্কৃত ব্যাখ্যা রয়েছে; কারণ ব্যাখ্যা ব্যতীত এদের মর্ম্ম সহজে গ্রহণ করা যায় না। পদগুলি অধ্যাত্ম-সাধনার ইঙ্গিতময় প্রতীকে আলেখ্যে পরিপূর্ণ। আরো কৌতূহলের বিষয়, এই গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ তিব্বতী অনুবাদও পাওয়া গেল। এ থেকেই প্রমাণ হয় এই চর্য্যাপদাবলীর প্রাধান্য ও প্রভাব কতখানি ছিল। ফলতঃ এইগুলি কেবলমাত্র কবিতা নয়, এ হ'ল মন্ত্র, আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রকাশ এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির সহায়। আরও একটি কথা, প্রাপ্ত পুঁথিখানিতে দেখা যায় কয়েকখানি পাতা হারিয়ে গিয়েছে, ফলে গোটা একটি কি দুটি কবিতা আর দু-একটির

কিন্তু অংশ পাওয়া যায় না। সৌভাগ্যক্রমে সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও তিব্বতী অনুবাদ ছিল, তাদেরই সহায়ে লুপ্ত অংশগুলি পুনর্গঠিত করা হয়েছে।

সিদ্ধাচার্য্যদের এই সাধনা যা সংস্কৃতি ছিল, বলেছি আমি, একটা বিশেষ ধরণের—সাধারণ প্রচলিত সর্ব্বজননান্য বিধি-ব্যবস্থা নয়, আভিজাত্যমণ্ডিত নয়, জ্ঞানীগুণীজনের কিংবা সমাজের উচ্চশ্রেণীর, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা নয়,—বলা যেতে পারে বৈদান্তিক বিদ্যা ছিল ঐ ধরণের সত্ত্বাস্থবিদ্যা। কিন্তু আমরা যার কথা বলছি তা হ'ল একটা গুহ্যবিদ্যা। সাধনার, আন্তর অনুশীলনের জন্য তার হ'ল দক্ষিণ নয়, বামমার্গ। বৈদান্তিকের, বৈদান্তিক সাধক ত' স্পষ্টই বলে গিয়েছেন—

"যত্তে দক্ষিণমুখম্ তাহি তেন মাম্"।

বেদান্ত জ্ঞানের ও জ্ঞানীর পথ অর্থাৎ মার্জিত প্রবুদ্ধ বুদ্ধির পথ। তন্ত্র, বিশেষ বামতন্ত্র মানুষকে চালিত অনুশীলিত করতে চেয়েছে আর একটি পথে—তার প্রাণবৃত্তির, এমন কি শারীর প্রাণবৃত্তির পথ ধরে অর্থাৎ যা হল সর্ব্বমানুষের সাধারণ বৃত্তি, সহজ মানুষের সহজ ধারা। বুদ্ধ তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন প্রাকৃত ভাষায়, প্রাকৃতজনের কাছে, সংস্কৃতভাষায় সংস্কৃতিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতসমাজের জন্য নয়। তন্ত্র হ'ল এই প্রাকৃত সাধনার ধারা, তাই দেখি তার প্রচলন হয়েছে বিশেষভাবে সমাজের নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে। প্রাকৃত তন্ত্রশাস্ত্রে ও চর্য্যাপদাবলিতে অন্ত্যজশ্রেণীর গুণকীর্ত্তন হয়েছে—হাড়ি, ডোম, বেদে এরাই প্রধান পদ পেয়েছে। অবশ্য পরে পণ্ডিতেরা এই সাধনার ধারার প্রাধান্য ও সার্থকতা দেখে একে অধিকার করতে চেয়েছিলেন, একে ঘুরিয়ে দক্ষিণাবর্ত্ত করে ধরতে চেয়েছিলেন।

এইভাবে বেদান্ত যদি হয়, আমরা এখন যাকে বলি উচ্চশিক্ষিতের সাধনা, তন্ত্র ছিল লৌকিক বা সর্ব্বসাধারণের জন্য সাধনা।

এ দুটি ধারার পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আমরা একটু গভীরতর দৃষ্টি দিয়ে দেখব ও আবিষ্কার করতে চেষ্টা করব। বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধপ্রভাবিত মূল চেতনা হ'ল যাকে বলা হয়েছে নৈরাত্ম্য; আর বেদান্তের প্রতিষ্ঠা হ'ল আত্মা—বিশ্বাতীত সৃষ্টি-বহির্ভূত যে চিন্ময়সত্তা; এ আত্মাকে বুদ্ধ গণনার মধ্যে আনেননি, বৌদ্ধেরা তা অস্বীকারই করেছেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা এবং সাধারণ তান্ত্রিকেরা জগৎ ছেড়ে উঠে যান নি জগদতীত কৈবল্যের মধ্যে; তাঁরা জগতের মধ্যেই নামিয়ে এনেছেন স্থাপন করেছেন আর এক আত্মাকে, এক আন্তর চিন্ময় সত্তাকে। তাঁদের অভিজ্ঞতায় শিব জীবাকারে অন্তর্যামীরূপে প্রতিষ্ঠিত মানুষের আধারে, পৃথিবীর মধ্যে। সৃষ্টি বা জগৎ হ'ল পৃথিবী নিয়ে, পৃথিবী হ'ল মানুষকে নিয়ে, আর মানুষ প্রধানতঃ মানুষ দেহ-প্রাণ নিয়ে; মন এই দুয়ের অনুগত ভৃত্য; তান্ত্রিকেরা চেয়েছেন এই দেহ-প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী শক্তিকে।

বেদান্ত ব্রহ্মকে সযত্নকে রেখেছে জগৎ থেকে সৃষ্টি থেকে আলাদা করে, তার উর্দ্ধে একান্ত অতিক্রম করে ; ফলে জগৎ হয়েছে মায়া, মিথ্যা। পুরুষ প্রকৃতি হতে পৃথক, প্রকৃতির বাহিরে বা উর্দ্ধে, পুরুষ চিন্ময়, প্রকৃতি অচিৎ, এই সাংখ্য সিদ্ধান্তও বৈদান্তিক ধারার অনুগত। তন্ত্র পুরুষকে প্রকৃতির বাইরে বা উর্দ্ধে নয়, প্রকৃতির অন্তরে নামিয়ে স্থাপিত করেছে, শক্তির উর্দ্ধে শিব নয়, শক্তির অন্তরেই শিব। শুধু তাই নয় তন্ত্র দিয়েছে এক বিপরীত চিত্র, শক্তির পদতলে শিব।

বৈদান্তিক সাধনা এক হিসাবে অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল। কারণ তা 'নেতি' 'নেতি' করে সব বাদ দিয়ে এড়িয়ে গিয়ে সোজা চলে গিয়েছে উর্দ্ধে ; মস্তকে বুদ্ধির মধ্যে চেতনাকে স্থির করে তাকে চালিয়েছে, চলেছে উর্দ্ধতর ক্ষেত্রে—পুরুষ-চেতনা আশ্রয় করে। তন্ত্র 'প্রকৃতি-মা'কে আঁকড়ে ধরেছে অর্থাৎ মানুষের প্রাণবৃত্তিকে শারীরবৃত্তিকে 'নেতি' করতে, নাকচ করতে চায়নি, চেয়েছে এই তথাকথিত নিম্নতর অথচ প্রবলতর বৃত্তিকে আয়ত্ত করতে, পরিশুদ্ধ পরিপ্লুত করে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। সাধারণ মানুষ, মানুষ মাত্রই রয়েছে তার-দেহ প্রাণ নিয়ে ; তার জীবনধারা ও জীবনীশক্তিকে আশ্রয় করে। এ বস্তুটি রয়েছে যখন, তার সার্থকতাও আছে তবে। লোকায়ত জীবনের রহস্য তাই তাঁরাই খুঁজেছেন যাঁরা লোকায়ত জীবন যাপন করে থাকেন। তাই বলা হয় এইটিই হল সহজ মানুষের ধারা—এইটিই সহজিয়া পথ। শিক্ষা-দীক্ষায় বুদ্ধিশীল সুপণ্ডিতের চেয়ে এ পথে আকৃষ্ট হয়েছে লোকসাধারণ। এর প্রভাব প্রসার পরিচয় বেশি হয়েছে নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে। মানুষ, মানুষের আধার এবং তার কর্ম্মধারা দুটি ভাগে বিভক্ত। এখানেও রয়েছে পরার্দ্ধ ও অপরার্দ্ধ—উর্দ্ধের অর্দ্ধ এবং নিম্নের অর্দ্ধ, উর্দ্ধের ভাগ মাথা থেকে বুক অবধি, আর নিম্নের ভাগ নাভি হতে পা অবধি। অর্থাৎ উপরের ভাগ হ'ল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং নিচের ভাগ বৈশ্য শূদ্র এমন কি অন্ত্যজ—তাই বলা হয়েছে "পদ্ভ্যাম্ শূদ্র অজায়ত"। বেদে উপনিষদে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত ; তন্ত্রে, লৌকিক তন্ত্রে, সিদ্ধ তন্ত্রে সমাজের আর এক বর্ণের মাহাত্ম্য প্রদর্শিত।

তবে আরও কথা আছে। মানুষের আধারের চেতনার গঠনের দিক দিয়ে শুধু নয়, তা যদি ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন বা ক্রমপরিণতির দিক দিয়ে দেখি, তবে এ সিদ্ধান্ত সত্য হতে পারে যে তন্ত্র-সাধনা একটা প্রাচীনতর অনুশীলনের অনুবর্ত্তন বা অবশেষ। মানুষ গোড়া থেকেই বুদ্ধিজীবী হয়ে ওঠেনি, সে প্রথমে ছিল প্রাণজীবী, "অর্জিত বিদ্যা" "মার্জিত বুদ্ধি" নিয়ে সে তার পার্থিব যাত্রা সুরু করেনি, সে যাত্রা সুরু হয়েছে প্রাণ ও দেহকে আশ্রয় করে। সুতরাং তার প্রথম সমস্যা হয়েছিল দেহ-প্রাণের কূট-প্রশ্ন-মীমাংসা। আত্মাকে, পরমাত্মাকে সে অন্বেষণ করেনি, প্রথমে সে খোঁজ পেয়েছে দেহ-প্রাণের অধিপতি এক অন্তর্যামীর, অন্তরাত্মার। আমি বলেছি আধারের

মধ্যে জীবভূত শিবের কথা, তার চেয়ে সত্যতর হবে যদি বলি জীবভূত প্রকৃতির কথা। ফলতঃ পার্থিব প্রকৃতি, যার প্রতিষ্ঠা যার প্রধান উপকরণই হ'ল প্রাণ ও দেহ, মানুষের মধ্যে তা যখন সচেতন রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে তাই হল মানুষী অন্তরাত্মা। এই অন্তরাত্মার উন্মেষই মানুষকে ক্রমোন্নতি ও ক্রমপ্রকাশের পথে—জাগতিক বিবর্তনে বা আন্তরিক স্ফুরণে প্রচালিত করেছে। মানুষের মধ্যে এই যে নিভৃত মানুষ, জীবের স্বরূপ এই যে পুরুষ তাকেই সহজ সাধকেরা বলেছেন স্বপুরুষ, মনের মানুষ, সহজ মানুষ; সিদ্ধাচার্য্যেরা সহজিয়া সাধকেরা কতভাবে—কত আদরে ও সমাদরে—প্রকাশ করেছেন এই রহস্যময় বস্তুটিকে; তাঁদের সাধনার জীবনধারার মূল-সূত্র বীজ-মন্ত্র এখানে।

বলা হয়ে থাকে কর্ম্ম-কাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ড, বেদের পর বেদান্ত বা উপনিষদ, ঐতিহাসিক হিসাবে সত্য একথা, আন্তঃকরণিক ধারা বা ক্রম হিসাবেও তা সত্য। বলেছি মানুষ প্রথমে প্রাণময় পুরুষ, তারপরে জ্ঞানময় পুরুষ। তবে বিপদ এই যখন প্রাণকে ছেড়ে সে জ্ঞানে ওঠে তখন জ্ঞানকে ছেড়ে বিজ্ঞানে বা অতিজ্ঞানে উঠে যায় অর্থাৎ প্রাণকে দেহকে যায় ভুলে। এরই নাম বেদান্তের কৈবল্যপাদ বা নির্ব্বাণবাদ। কিন্তু মানুষ সামাজিকভাবে মানুষ অর্থাৎ প্রাণময় (অন্নময়) পুরুষই রয়ে গিয়েছে, এবং তাকে ভোলা চলে না বা উচিতও নয়। এই হল তন্ত্রের অবদান। এইজন্যই বলেছি তান্ত্রিকতা স্থান পেয়েছে প্রিয় হয়েছে তাদের কাছে যারা বিশেষভাবে দেহ-প্রাণের ব্যাপারী, সাধারণ সহজ মানুষ যারা। গোঁড়া বৈদান্তিকেরা, সমাজের শীর্ষপদস্থেরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন এদের, তাই এদের 'কৌল' (esoteric) হয়ে অনেক সময় অনেক যুগে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে ফল্গুপ্রবাহের মত, সমাজের নীচের তলায় ডুবে যেতে হয়েছে। এঁদের ইষ্টদেবী হয়েছেন কালী করালী চণ্ডী বাশুলী—দুর্গা লক্ষ্মী নয়, ব্রহ্মা বিষ্ণুও নয়। এক পদকর্ত্তা বলছেন স্পষ্টই হরি হর ব্রহ্মা সব পুড়ে গেল—উপবীত শাসন যেন ছাই হয়ে গেল। একটা সমস্ত যুগে এ সাধনার চর্চ্চা একরকম সমাজ-বহির্ভূত বা সমাজের প্রান্তবাসীদের মধ্যেই চলিত হয়েছে। কি রকমে শোন তবে তাঁদের কবি আচার্য্য কাহ্নুপাদ কি বলছেন—

নগরের বাইরে, ডোম্বী, তোমার কুঁড়েঘর,
তার আশে পাশে চলে বেড়ায় নেড়ে বামুন,
ওগো ডোম্বী, তোমার সঙ্গ করব আমি—
কাপালিক আমি, যোগী, উলঙ্গ, ঘৃণাহীন।
একটি মাত্র পথ রয়েছে তাতে চৌষট্টি পাঁপড়ি,
তার উপর চড়ে নাচছে ডোমনী আর এই আমি জীবটি—
ওগো ডোম্বী, তোমাকে আমি সোজা জিজ্ঞাসা করি

তুমি আসছ, যাচ্ছ, কার নৌকোয় ?
তাঁত আর এ বেচারী বিক্রী করে না, কাপিও বিক্রী করে না—
তোমারই জন্যে ছেড়েছে সে নটবেশ।
তুমি ত হ'লে ডোম্বনী, আমি হলেম কাপালিক,
তোমারই জন্যে ছাড়লেম হাড়ের মালা অবধি।
সরোবর ভেঙে লুটপাট করে, ডোম্বনী, মৃণাল আমি খেয়েছি
তোমাকে মায়ধর করেছি, প্রাণ নিয়েছি তোমার—

নগর বাহিরিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ
ছইছোই যাই সো ব্রাহ্ম নাড়িআ ॥
আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাগ ॥
একসো পদমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥
হালো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে
অইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ ॥
তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবর ন চঙ্গতা
তোহোর অন্তরে ছাড়িনড় এহা ॥
তু সো ডোম্বী হাউঁ কপালী
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী ॥
সরবর ভাঙীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ
মারমি তোম্বী লেমি পরাণ ॥

কাহ্নপাদ দিলেন তখনকার গ্রাম্যজীবনের, গ্রাম্যজনের সামাজিক পরিস্থিতির এক জীবন্ত চিত্র, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন এবং চিত্তাকর্ষক ; এবং তাকে আশ্রয় করে দিলেন তাঁর আন্তর সাধনার একটা গভীর, তেমনি পরিস্ফুট আলেখ্য। আগেই বলেছি এ সাধনা হ'ল উচ্চ-সমাজবহির্ভূত, জ্ঞানী-গুণী-জন-তিরস্কৃত, অপাঙ্‌ক্তেয় জনের গুপ্ত সাধনা ; তাই ডোম্বী অর্থাৎ ডোম্বনী হয়েছে সাধনার শক্তি বা ইষ্টদেবীর প্রতীক। এই কালো মেয়ে, এই অচ্ছুৎ-সুন্দরীর উপর জ্ঞানী-গুণীজনের পাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণের লোভ থাকতে পারে হয় ত, কিন্তু তার বিপুল তন্ত্র সাজসজ্জা, তার পাণ্ডিত্য, তার শাস্ত্রজ্ঞান, তার আচার-অনুষ্ঠান, তার বিধি-বিধান তাকে যেন সেই

নিরাভরণ নিরাবরণ নিভৃত নাড়ুক শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তাই কাহ্নুপাদ বলছে সে নিজে কিন্তু সব পোষাকপরিচ্ছদ, পদ-পদবি ছেড়েছে, হয়েছে ন্যাংটা কপালী, দেহে প্রাণে মনে হয়েছে উলঙ্গ অবধূত, পরম-সঙ্গিনীকে লাভ করবার জন্যই এই রকমে হয়েছে সে উত্তম অধিকারী। কোথায় মিলন-বিহার তাদের? আন্তর-হৃদয়ের গহনে যেখানে অপরূপ পদ্ম এক ফুটেছে তার চৌষট্টি দল মেলে দিয়ে। চৌষট্টি হবে চেতনার পূর্ণতাজ্ঞাপক, চার হল আধারের চারটি মূল স্তর বা কোষ—দেহ-প্রাণ-মন এবং তদতিরিক্ত চেতনা আর ষাট এদেরই বিভিন্ন বিবিধ বিভাগ বা প্রকাশধারা।

সাধারণ অজ্ঞানী মানুষ তার সাধারণ অজ্ঞান চেতনার নৌকোয় করে এই সংসারের বেসাতী নিয়ে তার জীবন কাটায়। কিন্তু মুক্ত অন্তরাত্মিনী চিন্ময়ী চলে আর এক ধারায়, কাহ্নু চলবে সেই আন্তর চেতনার নৌকোয় চড়ে আর এক পারে।

সংসার আবার যেন এক সরোবর, তাতে নিমজ্জিত পদ্মের মৃণাল এক, সে ত' কাহ্নুরই ইষ্টদেবী, তাই সে বলছে "সংসার-সরোবর মন্থন করব আমি তোমার খোঁজে, সে-সরোবর কারাগার যেন, তাকে ভেঙ্গে সেখান থেকে তোমাকে উদ্ধার করব।" এ যেন সঙ্কুল যুদ্ধ করে শত্রুর কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা প্রিয়া নায়িকাকে। বীর সাধকের বীরধারা এই—স্বর্গকে, স্বর্গের দেবীকে জোর করে জবরদস্তি করে অধিকার করা।

আর এক কবির আর এক চিত্র দেখ তবে—এও গ্রামীণ জীবনের সাধারণ লোকের দৈনন্দিন ধারা—

ভবনদী গহন গভীর বেগে বয়ে চলেছে
দুটি ধারে রয়েছে পাঁক, মাঝে জল থই থই।
ধর্ম্মসেবার উদ্দেশ্যে চাটিলপাদ সাঁকো গড়ে দিলেন।
পারগামী লোকেরা নির্ভয়ে এখন পার হতে পারে।
মোহ-তরুকে কেটে ফেলা হ'ল, পাটাতন জুড়ে দেওয়া হ'ল;
চাঙ্গী হ'ল তোমার নির্ব্বাণ-সত্তা, তাকে ধরে অদয় বোধ দৃঢ় কর।
সাঁকোর উপরে ওঠো, দক্ষিণে কি বামে ফিরবে না।
জ্ঞান ত' নিকটেই, দূরে যাবে না।
তোমরা মানুষেরা পার-গমনেচ্ছু যারা জিজ্ঞাসা কর তোমরা
অনুত্তর-স্বামীকে, অতুলন সিদ্ধ-পুরুষকে।

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই

পারগামী লোক নিতর তরই ।।
ফাড়ঙিঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ
সাঙ্কনত চড়িলে দাহিণ বাম না হোহী ।।
নিয়ড়ঙী বোহি দূরন জাহী ।।
জই তুমহে লোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছহু চাটিল অনুত্তরসামী ।।

জীবন-সাধনা জীবনের সার্থকতা একটা সম্মুখে যাত্রা, ক্রমগতি, কিন্তু যোগীর অধ্যাত্ম-সাধকের লক্ষ্য কেবল গতি বা প্রগতি নয়, সে চায় একটা পারান্তর, এ পার থেকে, এই সাধারণ চেতনা থেকে অন্য পারে আর এক চেতনায় উত্তীর্ণ হওয়া—এর চলিত ছবি হ'ল নৌকোয় পার হওয়া, তবে সাঁকো বেঁধেও পার হওয়া যেতে পারে। বর্ত্তমান কবি বলছেন এই সাঁকোর কথা। বলছেন তিনি এই সংসার, এই সাংসারিক জীবন হ'ল কাদায় ঘেরা অথৈ জলধারা—পঙ্কিল অতল বৃত্তিসবের লীলা। তার উপর দিয়ে বাঁধো সাঁকো—তক্তা চাই? মানুষের মোহ এই সংসারে গাছের মত শক্ত হয়ে তার ছায়া বিছিয়ে দিয়েছে, মানুষ তার মধ্যে আসক্ত। কেটে ফেল, চিরে ফেল তাকে; সেই মৃত আসক্তির—অর্থাৎ তার যত সামর্থ্য ছিল—তার খণ্ড সব জুড়ে ধর, তাদের একজোট কর, এক মুখ কর, জমাট কর। গাছ কেটে ফেলা হ'ল অর্থাৎ নির্ব্বাপিত হ'ল, নির্ব্বাণ লাভ করল বাসনাময় চিত্ত, নির্ব্বাণ চেতনায় ধরা দেবে জমাট অক্ষর বোধ; চাঙ্গী বা কুড়াল যেমন অপরিহার্য্য অস্ত্র সাঁকো বাঁধবার জন্য, তেমনি অন্তরের সেতুর জন্যও প্রয়োজন এই নির্ব্বাণৈষণা। এই একাগ্র বোধ বা চেতনা নিয়ে সোজা এগিয়ে যাবে, তাকে বিক্ষিপ্ত করবে না, তোমার পা দ্বিধায় টলবে না, তাহ'লে দেখবে যে জ্ঞান, যে উপলব্ধির খোঁজে তুমি চলেছ, তার জন্য দূরে চলে যাবার প্রয়োজন নেই, তা আছে তোমার কাছেই, তোমার বুকের মধ্যে। এই যে অপূর্ব্ব শিক্ষা, দিগ্‌দর্শন, তা দিয়েছেন অনুপম অতুলন এই সিদ্ধাচার্য্য।

তখনকার গ্রাম্যজীবনের, প্রাকৃতিক পরিবেশের দৃশ্যাবলি থেকে সাধনার জীবনের রূপক যা গ্রহণ করা হয়েছে তার কিছু দেখলাম। এখন সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা কি রকমে রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে তার উদাহরণ দেই একটু—কৌতুককর ও শিক্ষাপ্রদ।

পরিবারের মধ্যে "বধূনাতার" স্থান আমরা জানি—শুধু এ দেশে নয়, ও দেশেও, যদিও আমাদের দেশে এ ব্যবস্থায় বিশেষ বিশেষত্ব আছে। কবির উপমায় শ্বশুরগৃহ হ'ল সাধারণ অজ্ঞ চেতনার আবেষ্টন; তার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে, আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে

অন্তরদেবীকে, দিব্যসত্তা বা ইষ্টকে। কবি তাই বস্তুনির্ঘোষে বলছেন—শ্বশুরের ঘর থেকে মেরে কেটে ঝেঁটিয়ে বের করে দাও শ্বশুর শাশুড়ী ননদ শালা সবকটাকে। মারিঅ শাসু ননন্দ ঘরে শালা (১১)—সেখানে একচ্ছত্র অধিকারিণী হবে বধূরাণী। শ্বশুরের ঘর এই দেহ, এই আধার—তার পুরাতন কর্ত্তা ও কর্ত্রীকে স্থানচ্যুত করে তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সেখানে স্থাপিত করতে হবে তোমার ইষ্টদেবীকে, তোমার অন্তরাত্মাকে, ভাগবত-সত্তাকে—বৌদ্ধেরা অবশ্য এর নাম দেন শূন্যাদেবী বা নৈরাত্ম্যদেবী।

আরও একটা বিষয় আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করবে। সে যুগেও বাঙ্গালীর, সাধারণ বাঙ্গালীর অবস্থা বোধ হয় আজকালকার মত একই রকম দুর্গতিময় ছিল। সিদ্ধাচার্য্য নিজেকে বাঙ্গালী নামেই পরিচয় দিয়েছেন. তিনি বলছেন, ভুসুকু, তুমি সত্য সত্যই বাঙ্গালী বনে গিয়েছ, ডাকাতের দল এসে তোমার নৌকা লুট করেছে, তোমার ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দিয়েছে, তোমার গৃহিণীকে পর্য্যন্ত ধরে নিয়ে গিয়েছে। ভুসুকু, তুমি আজ সত্য সত্যই বাঙ্গালী হয়ে গেলে।

"আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী॥"

তবে এর বাহ্য। এর নিহিতার্থ হ'ল এই :

সাধক, এই যে তোমার সব চুরি গেল হারিয়ে গেল, তা হ'ল তোমার ঐহিকের অজ্ঞানের সম্পদ ও শৃঙ্খল। যে ডাকাতেরা এসে পড়ে তোমার সর্ব্বনাশ ঘটাল তা বাস্তবিক দিব্য করুণার প্রকাশ, তোমার 'ঘরিণী'টি হ'ল তোমার অজ্ঞানময়ী অহন্তার। তোমার সত্যকার পরিবার ও পরিজন হবে তোমার অন্তরাত্মার আন্তর ইষ্টের সঙ্গ।

সকল সাধনারই আন্তর রহস্য দুরধিগম্য, বাক্যমনের অতীত। কথা তাকে প্রকাশ করে না, চিন্তা তাকে গ্রহণ করে না। সিদ্ধাচার্য্যদের সাধন-রহস্য আরও রহস্যপূর্ণ, নিজেও তা বোঝা যায় না, অপরকেও বোঝান যায় না, তাই কাহ্নুপাদ বলছেন—এ পথে গুরু হ'লেন বোবা আর শিষ্য হ'লেন কালা—

"গুরু বোব সে সীসা কাল" (৪০)

এবার একটু অন্যরকম ভাবে ও সুরে যাওয়া যাক—একটা কোমলতর ভাব, মধুরতর সুর—নিবিড় হৃদয়বত্তার ছন্দ—নয় কি?

করুণার মেঘ নিরন্তর বর্ষণরত, ভাব-অভাবের দ্বন্দ্ব বিদূরিত,
মাঝগগনে উদিত অদ্ভুত এক বস্তু—
ভুসুকু, চেয়ে দেখ সহজ স্বরূপ,
যাকে নজরে আনলে সকল ইন্দ্রিয়পাশ টুটে যায়,
নিভৃতে মন আপনা হতেই হয় উল্লসিত,

বিষয়ের বিশুদ্ধি হেতু বুঝলাম আমি আনন্দ কি :
গগন যেন চন্দ্রালোকে সমুজ্জ্বল,
এই যে ত্রিলোক, এই হ'ল সারবস্তু,
যোগী ভুসুকু অন্ধকার বিদীর্ণ করলেন।

করুণ মেহ নিরন্তর ফরিআ
ভাবাভাব মলল দলিআ ॥
উইআ গঅণ সাবেঁ সমতুআ
পেখএ ভুসুকু সহজ সরূআ ॥
জাম্ব সুনন্তে তুটই ইন্দিআল
নিহএ পিঅ মন প সে উলাস ॥
বিসঅ বিশুদ্ধি মই বুঝিঅ আনন্দে।
গঅণহ জিব উজোলি চান্দে ॥
এ তৈলোএ এত বিআরা
জোই ভুসুকু হেবভই অন্ধকারা ॥ ৩০ ॥

উপর থেকে করুণার ধারা নিরন্তর নেমে আসছে, তখনই ঘুচে গেল অস্তি-নাস্তি, আছে কি আছে না তার দ্বন্দ্ব সংশয়, চেতনার পটে উদয় হ'ল অদ্ভুত রূপ এক—উপনিষদের উমা-হৈমবতীর মত। ভুসুকু, এই ত তোমার সহজ স্বরূপ, এই স্বরূপকে চিনলে জানলে ইন্দ্রিয়ের সকল বাঁধন টুটে যায়, মন আপনা হতেই পরম উল্লাসে ভরে ওঠে, এই ত হ'ল সত্তাকার বিষয়-বিশুদ্ধি অর্থাৎ বিষয়ের সঙ্গে, সকল বস্তুর সঙ্গে তোমার স্থাপন হয় বিশুদ্ধ সম্বন্ধ যার ফলে উথলে ওঠে পরম আনন্দ। এই ত গগনের চাঁদ, দেহ-প্রাণ-মনের আনন্দ-সারই চেতনায় তার জোছনা ছড়িয়েছে, দেখ, ভুসুকুর যোগিচিত্তে অন্ধকার কোথায় দূর হয়ে গিয়েছে।

আরো একটু এগিয়ে চলা যাক, আরো একটু ঘোরালো তত্ত্বের রাজ্যে, জটিলতর প্রতীকের ধাঁধালোকে। শোন সিদ্ধ লুইপাদের ধাঁধাবলী—

অস্তিও হয়ে ওঠে না, নাস্তিও হয়ে পড়ে না—
এমন যে সমুক্তি তাতে কার প্রত্যয় হয় ?
লুইপাদ বলছে, এ বড় দুর্দর্শ বিজ্ঞান
ত্রি ধাতু নিয়ে উদ্ভাসিত সে, তাকে ত জানা যায় না,
তার বর্ণ চিহ্ন রূপ কিছু জানি না,
শাস্ত্র দিয়ে তাকে কি রকমে ব্যাখ্যা করব ?

কাকে কি বলে প্রশ্ন করব—জলের চাঁদ যেন, সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়।
লুই বলছে কি ভাবনা ভাবব আমি?
যা নিয়ে আমি, তার ত কোন হদিশ নাই।

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই
আইস সংবোহেঁ কো পতিআই॥
লুই ভণই বট দুলক্খ বিণাণা
তিঅ ধাএ বিলসই উহ লাগে ণা॥
জাহের বানচিহ্ন রূব ণ জানী
সো কইসে আগম বেএ বখাণী॥
কাহেরে কিঘভনি মই দিবি পিরিচ্ছা
উদক চান্দ জিব সাচ ন মিচ্ছা॥
লুই ভণই ভাইব কীষ্
জালই অচ্ছমতা হেব উহ ণ দিস্॥ ২৯॥

বলা যায় না তা আছে, বলা যায় না তা নাই, কোন গুপ্ত বোধ দিয়ে এমন জিনিষ ধরা যায়? সে জিনিষ তিনটি ধাতু, তিনটি মূল উপাদান দিয়ে গড়া একটি আলো অথচ তার কোন রং নেই, আকার নেই, লক্ষণ নেই। কারণ যাহা ইন্দ্রিয় দিয়ে তার প্রকাশ হয়না, মন দিয়েও তাকে গ্রহণ করা যায় না, যত শাস্ত্রবিৎ তা হোক না। জলে চাঁদ ভাসে, সুন্দর শীতল মধুর, তা আছে আবার নাই। তেমনি চেতনার আকাশে এও এক সৌম্য আনন্দময়ী, কিন্তু ভাব-ভাবনার অতীত তা, কে ব্যক্ত করবে তার রহস্য।

ত্রিধাতু হতে পারে দেহ, প্রাণ, মনের অধিষ্ঠাত্রী অন্তর্যামিনী। বৈদান্তিক বলতে পারে এ হ'ল সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম। লক্ষ্য করবার বিষয় উপনিষদের ঋষিও অনুরূপ ভাষায় ও ভঙ্গিতে বলছেন এক অনির্দ্দেশ্যের কথা যা হ'ল "দুর্দ্দর্শম্ গূঢ়ম্ অনুপ্রবিষ্টম্ গুহাহিতম্ গহ্বরেষ্ঠম্"।

উপনিষদের অনেক পূর্ব্বে ঋগ্বেদের ঋষিও অনুরূপ উপলব্ধির কথা বলেছেন "নাস্তি তখন ছিল না, অস্তিও ছিল না, কে ছিল, কি ছিল, কে বলতে পারে? একমাত্র তিনি বলতে পারেন যিনি এ সমস্তের অধিকর্ত্তা, কিন্তু হয় ত' তিনিও পারেন না।"

"যে অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ৎসো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥"

তাহলে দেখছি আমাদের সিদ্ধদের থেকে প্রাচীন ঋষিরা খুব বেশি দূরে যাননি। ঘোর তান্ত্রিকের ধাতুতে বেদান্তসারও রয়েছে অনেকখানি। বাহ্যদৃষ্টিতে যাদের মনে হয়

অপাঙ্‌ক্তেয়, ভাবে ভঙ্গিতে উপলব্ধিতেও পাঙ্‌ক্তেয়দের সমানে উঠে গিয়েছে। ব্রাহ্মণের মতই নমস্য হয়েছে পঞ্চমবর্ণ। এঁদের উপলব্ধি দেখে এঁদের বাণী শুনে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের কথা—

"অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত,
তুমি দ্বিজোত্তম তুমি সত্যকুলজাত।"

তবে—গোড়াতেই আমি বলেছি—একদিকে উপনিষদ-সিদ্ধিকে ছাড়িয়ে চলে গেছে সিদ্ধদের সিদ্ধি। এঁরা দুই তিন পদ আরো এগিয়ে গিয়েছেন। উপনিষদ বৈদান্তিক খেমে গিয়েছে আনন্দ পর্যন্ত এসে, সৎ-চিৎ-আনন্দ, কিন্তু সিদ্ধেরা—কৌল সিদ্ধেরা—আনন্দ অতিক্রম করে দেখেছেন প্রেম, প্রেমও কেবল আন্তর চিন্ময় প্রেম নয়, তা হয়ে উঠেছে এক দিব্য শারীর প্রীতি-প্রমোদ। অর্থাৎ এসে গিয়েছেন পরমাত্মা-চেতনার সঙ্গে পার্থিব রসানুভূতিতে—চিন্ময়ের সঙ্গে মৃন্ময়ের অপরূপ উদ্বাহ ঘটিয়েছেন। এ যেন নন্দনের বৃন্তহীন কমল নয়, পৃথিবীর পঙ্কে প্রস্ফুটিত মৃণালের উপর মৃণালিনী। পদ্মপলাশের সুষমা সৌরভের মধ্যে এসে মিশেছে মাটির রস-গন্ধ।

চর্য্যাপদের মধ্যে বৌদ্ধ শূন্যবাদ এবং শাঙ্কর মায়াবাদ তাদের প্রভাব অনেকখানি ছড়িয়ে দিয়েছে। শূন্য এবং সহজকে যদিও অনেক সময় মিলিয়ে এক করে ধরা হয়, তবুও দুটি ধারাই চলেছে পৃথকভাবে তেলে জলের মত। শূন্য হ'ল পুরোপুরি বৈদান্তিকের মায়া কিন্তু সহজে রূপ নিয়েছে তান্ত্রিকের নিগূঢ় দেহতত্ত্ব। তাই সিদ্ধাচার্য্যেরা বলছেন শূন্য একান্ত শূন্য নয়, তা হ'ল পূর্ণসংখ্যা। মায়া বিভ্রম নয়, একটা অখণ্ড সমগ্রতা। এক সিদ্ধাচার্য্য স্পষ্টই বলছেন, আসল শূন্য হ'ল সেই বস্তু যা থেকে ভগ্নাংশ সব, অবান্তর অঙ্গ সব খসে পড়েছে। তা বস্তুর একান্ত অভাব নয়। কাহ্নু বলছেন

চিত্ত সহজের মধ্যে শূন্যকে সম্পূর্ণ করেছে।
কে বলবে কাহ্নু নাই?
বিশ্বের মধ্যে নিরন্তর সে অনুস্যূত যেমন রয়েছে দুধের মধ্যে সর।
জিনিষ ভাঙ্গলে তার রূপ কি নষ্ট হয়?
তরঙ্গ ভেঙ্গে পড়ছে নিরন্তর, সমুদ্র কি শুকিয়ে গিয়েছে?—
ভাগতরঙ্গ কি সোঘই সাঅর।

শ্রীঅরবিন্দের যোগ*

সুধা বসু

(৫)

পূর্ণযোগের সাধন ও সিদ্ধির পথে চলতে পারা যায় কেমন করে, এই প্রশ্ন আমাদের এখন তুলতে হবে। অধ্যাত্মপথের সহায় ও সম্বল কি আছে, যাতে যোগেশ্বরের কাছে ঐকান্তিক আত্মসমর্পণ সম্যক সমুদ্ধ হওয়া আমাদের জীবনে সহজ হবে? এখানে শ্রীঅরবিন্দ যোগের চারটি সহায়ের কথা বলেছেন—পাত্র, উৎসাহ, গুরু ও কাল। এগুলিই হবে পথের অবলম্বন ও সাধকের সাধনসম্পদ। কিন্তু বোধির জাগরণ বা শ্রদ্ধার আবির্ভাব না হলে এ সাধনচতুষ্টয়ের আলম্বনও কার্যকরী হয় না বা সাফল্য এনে দেয় না। মন দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে সমন্বয়ের দৃষ্টির সাহায্যে পথ চলতে হবে। কিন্তু বোধির আলোয় তাদের যাচাই হয়ে যাবে, এটা বুঝে চলা দরকার।

উৎসাহ হল যোগের মূল কথা। গীতার ভাষায় ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত না হলে যোগ হওয়া অসম্ভব। কোন কিছুতেই হার না মেনে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকার যে-নিষ্ঠা তাকে বলে ধৃতি, তার সঙ্গে থাকবে উৎসাহ। শ্রীঅরবিন্দ উৎসাহ বলতে গীতার এই লক্ষণই দিয়েছেন, "নিশ্চয়েন হি যোক্তব্য অনির্বিণ্ণেন চেতসা"। যোগ করতে হবে দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে, নির্বিণ্ণ হওয়া চলবে না। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন—এই হল দৃঢ়সঙ্কল্পের গোড়ার কথা। রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—সাধনা ভ্যাতভ্যাতে চিঁড়ের ফলার যেন না হয়, ভক্তি হবে ডাকাত পড়ার মত। উৎসাহ হল ওই রকমের এক জোরালো ধৃতিযুক্ত শক্তি। এরই অপর নাম অভীপ্সা (aspiration), যা মানুষকে ঊর্ধ্বলোকের অভিসারী করে, নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার এক প্রবল তাগিদ আনে তার মধ্যে। বেদে তার বাহনকে বলা হয়েছে অগ্নি 'অগ্নে দ্যুম্নেন জাগৃবে সহসঃ সূনো'—উৎসাহসের পুত্র তিনি, জেগে আছেন মনোদ্যুতি নিয়ে। শ্রদ্ধার আবেশে মানুষের হৃদয়ে যে আকূতি জাগে, সেটিই তার চিদগ্নির স্ফুরণ বা উৎসাহ। আধারে অগ্নির এই নিত্যজাগৃতি অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে সমনস্কতা ও সদাশুচিত্ব। কিন্তু এই উৎসাহ আসবে কখন, এ এক মরমী প্রশ্ন। আধারে গুহাহিত এই জাতবেদা

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

অগ্নির জাগৃতি তো সবার হয় না। অথচ এ অগ্নি বৈশ্বানর, বিশ্বের প্রতিটি নরই তার অধিষ্ঠান। এখানে কালের এক অপেক্ষা আছে। মূল লক্ষ্যের দিকে সকলেই চলেছে মন্থর গতিতে কিন্তু সবাই সে বিষয়ে সমনস্ক নয়। লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতনতা এলে গতি তীব্র হয়, মনোযোগে উৎসাহ জাগে। এ ভাবে এক তীব্র সংবেগ না এলে যোগ করা আদৌ চলে না—ধর্মকর্ম করা চলে, কিন্তু যোগ হয় না। মনে উৎসাহ নিয়ে যোগে প্রবৃত্ত হলাম, ধৃতিও এল। তারপর দীর্ঘকাল ধরে চলে সোটানা, চিত্তে এক ওঠা-নামার দ্বন্দ্ব। এক অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে পথ করে যেতে হয়। বারবার অন্তরে আলো জ্বালাতে যাই, আর বারবার তা নিভে যায়। আবার মাঝেমাঝে জ্বলেও ওঠে কিন্তু তবুও ধোঁয়া আর গাঁজলার যেন শেষ নেই। মনে হয় সুদীর্ঘ, অন্তহীন এই পথ পেরিয়ে যাব কি করে? এ থেকে প্রথম দিকে একটা আচ্ছন্ন ভাব আসে, তাতে সাবধান হতে হয়।

উৎসাহের আর এক নাম ব্যাকুলতা। রামকৃষ্ণদেব বলতেন "ব্যাকুলতা না এলে ঈশ্বরদর্শন হয় না"। এ কথাটাও কিন্তু এই প্রসঙ্গে ভাল করে বুঝে নেওয়া দরকার। এই ব্যাকুলতার ভিত্তি হবে প্রশান্তি। ব্যাকুলতা আসে কিন্তু অস্থিরতায় ও ছটফটানিতে সাধারণত সাধনশক্তি অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। প্রশান্তি ব্রহ্মের সদ্‌ভাব, তাকে ভিত্তি করে নিতেই হবে। এ প্রশান্তিকে ধরতে পারি কখন? প্রাচীন আচার্যেরা অতি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে অধ্যাত্মসাধনার মূলে আছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যাকুলতা এলে অন্তঃকরণের গভীরে প্রশান্তি ধরা পড়ে, মন ধীর হয়। চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না, একাগ্র হয়ে আসে। শ্রদ্ধা হল গোত্রান্তর। বৈষ্ণব-শাস্ত্রও বলেন "আদৌ শ্রদ্ধা ততো রতিঃ"। আভাসে যতক্ষণ তাঁকে অনুভব করেছি, রতি আসেনি। কিন্তু যখন ব্যাকুল হই, তাঁরই জন্য সব কিছু ত্যাগ করে অজানার বুকে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হই সেই সমাক ব্যাকুলতাই শ্রদ্ধা। এটি বিচারে বা হিসাবে আসে না। শ্রদ্ধা প্রসাদ গুণ বা কালের দান। সত্যি সত্যি তাঁকে পাবার জন্য যোগ হলে তিনিই মনকে ঘুরিয়ে দেন। তখন দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না এও যেমন সত্য, তিনি স্বয়ং ছাড়া দরদীও সে সময় কেউ হতে পারে না, এও তেমন সত্য। শ্রদ্ধাই বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা। যা চাই, তা পাবই এটা আমার হক্—এই ভাব থাকা চাই। এই জোর শ্রদ্ধার অঙ্গ। এটা না থাকলে শ্রদ্ধা ভাবস হয়, এলিয়ে যায়। হাল ছেড়ে দেবার মত হতাশা ও নিরুদ্যম থেকে এক নির্বেদ উপস্থিত হয়। তা থেকে আর এক বিপদ এসে পড়ে। না যায় আগেকার জীবনে ফেরা, অথচ এক ছটফটানির রাজস ভাব নিয়ে ব্যাকুলতার আধপ্রসাদে এই অস্থিরতার মধ্যেই তাঁকে পাবার জন্য টেনে নাবাতে গিয়ে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরী করা হয়। সে লোভ সামলাতে হবে। শ্রদ্ধার উন্মেষে ব্যাকুলতা প্রবল হয় অথচ ধৃতিশক্তিতে সেটা যুক্ত থাকে। তাতে জাগে সমনস্কতার শুচি দহন;

এক মুহূর্তও তাঁকে ভুলতে পারি না। ঐ সঙ্গে বিচ্ছেদের ব্যাকুলতায় এক ঊর্ধ্বমুখী হোম-বহ্নিশিখা হৃদয়ের আকাশে আগুন ধরিয়ে দেয়। শ্রদ্ধার আবেগে পথে নেমেছি, তীরের মত ধনুকের ছিলা থেকে বেরিয়ে পড়েছি, কোন বাধাই আর কুলে ফেরাতে পারবে না। পথের হদিশ পাওয়া যায় বোধির আলোতে। নিমেষে নিমেষে আভাসে পথ দেখা যায় বিদ্যুৎ ঝলকের মত, যেন নিকষে সুবর্ণরেখা। ক্রমে সংকল্প দৃঢ় হয়, ভাব গাঢ় হয়। ব্যাকুলতাও সংহত হয়ে আসে। মনের মায়া মোহিনী ও শতরূপা। তারা সব দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে অপরাজেয় অনিরুদ্ধ এক তীব্র সংবেগে পরিণত হয় শ্রদ্ধার শক্তিতে। তখন আর দেরী নাই। পতঞ্জলি যেমন বলেছেন—"তীব্র সংবেগানামাসন্নঃ"।

দেখতে পেলাম ব্যাকুলতারও তিন রকমের অবস্থা। প্রথম একটা আন্‌চান্‌ ভাব। অতে যদি জোর না ধরে সেটা তামসিক। তারপর এক ছটফটানির ভাব আসে, সে চঞ্চলতা রাজসিক। এই দুই অবস্থার মিশ্রণ বহুদিন ধরে চলে। শাস্ত্র ও গুরু লাভ করে এই ব্যাকুলতা যেমন অনুকূলে যেতে পারে, তেমনি আবার ক্ষুদ্র অহংএর স্ফীতিতে প্রতিকূল হয়ে সাধন সম্পদ নষ্টও করে দিতে পারে। তৃতীয় অবস্থাকে সাত্ত্বিক ব্যাকুলতা বলতে পারি যখন আভাসে তাঁকে পাবার ধারণা দৃঢ় হয়। রজ ও তম গুণ অভিভূত হয়ে ব্যাকুলতার রূপান্তর হয় তখন ওই সংবেগে; সেটাই সত্যকার **aspiration** বা উৎসাহ। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন **Psychic aspiration**। চৈত্যসত্তার (**Psychic Being**) সিদ্ধ দৃষ্টি আছে, পরমের সঙ্গে আছে তার নিবিড় যোগ। প্রকৃতিতে প্রবল সংবেগ নিয়ে যে ঊর্ধ্বতন অভীপ্সা (**aspiration**), সেটা চৈত্যসত্তার (**Psychic Being**) ধর্ম। এইখানে তাঁকে পাবই এই দৃঢ় বিশ্বাস তার। তাই নিমেষে নিমেষে ওই যে পেয়ে হারাণো আর অন্তর মথিত করে বিরহের আকুল রোদন এই তার ব্যাকুলতা। তাঁকে ভাল না বেসেও পারি না, এমনই তাঁর প্রচণ্ড আকর্ষণ। তিনি কতভাবেই আসেন, ডাকেন—ধরেও তাঁকে ধরতে পারি না। চৈত্যপুরুষকে আধারে জাগানো শ্রীঅরবিন্দ-যোগের বড় কথা। চৈত্যসত্ত জাগলে ব্যাকুলতা তখন পরিবর্তিত হবে তীব্র সংবেগে।

এইবার শাস্ত্রের কথা। শাস্ত্র হল সনাতন সেই সর্বশ্রুতিশিরোরত্ন বেদ যা প্রতিটি জীবের বুদ্ধিরূপ গুহায় গুহাহিত হয়ে আছে। সাধকের অন্তরে হৃৎকমলের দল যেন নিমীলিত। পূর্ণযোগের যোগসাধন শুরু হলে ওই কমলদল বোধির আলোয় ধীরে ধীরে যেন উন্মীলিত হতে থাকে। আর হার্দজ্যোতির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ওই সরোজকর্ণিকার অভ্যন্তরে সুপ্ত বেদজ্ঞান প্রতিভাত হয় সাধকের চিদাকাশে সূর্যোদয়ের মতই। সেজন্য শাস্ত্র কখনও সাধনা-বিচ্ছিন্ন হয় না। পূর্বেকার সিদ্ধ গুরুবর্গের সাধনার বাণীরূপের ধারক ও বাহক হল শাস্ত্র। শাস্ত্রের একদিকে অনুশাসন

আর অপরদিকে বাক্ বা নয়। শ্রীঅরবিন্দ যোগসমন্বয়ে বিশেষ করে অনুশাসনের দিক ও সাবিত্রী কাব্যে মন্ত্রের দিকটি বিশদভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন।

শাস্ত্রের অনুশাসন থেকে আমরা সাধনের পথ ও লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটা ছক গড়ে নিতে পারি। তাতে সাধ্য ও সাধন সম্বন্ধে ধারণা উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হয় আর ব্যাকুলতার ছটফটানি শান্ত হয়ে আসে। পথ চলতে চলতে সত্য মিথ্যা বাছাই করে নিতে শাস্ত্রীয় অনুশাসন কার্যকরী হয়, অনর্থক হয়রাণি ও হাতড়ে বেড়ানর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান, লক্ষ্য সম্বন্ধে জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান—ওই সঙ্গে ওপারের জ্ঞান সমস্তটাই ধ্যানে ধরতে পারা প্রয়োজন। শাস্ত্রের আর এক কাজ হল যোগবিঘ্নগুলির সঙ্গে সাধকের পরিচয় করে দেওয়া। পথের বাঁকে-বাঁকে সমর ঘাঁটিগুলির উত্তরণের সঙ্কেত শাস্ত্র থেকেই পাওয়া যায় যখন সঙ্কট মুহূর্তগুলি এসে পড়ে। এ থেকেই আসে আত্মবিশ্লেষণের বা নিজেকে দেখা ও যাচাই করে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা। পূর্বেকার শাস্ত্রাদিতে আত্মবিশ্লেষণ এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ও নিপুণভাবে করা হত না। শ্রীঅরবিন্দ অবচেতনার স্তরপরম্পরায় একেবারে তল পর্যন্ত নেমে গিয়ে সমগ্র চেতনাকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ সব কিছুই প্রতিফলিত হচ্ছে আত্মার দর্পণে। যোগশাস্ত্রে বিশেষ করে আত্মবিশ্লেষণের পথকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ওপারের আলো আত্মদর্পণে যা কিছু দেখা প্রয়োজন তা দেখিয়ে দেবে। এই আত্মজ্ঞান বিশ্বেরই জ্ঞান—তা থেকে পথের হদিস ও লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা ক্রমে শুদ্ধ ও মার্জিত হবে। বুদ্ধিশক্তি যখন পূত হবে ও সব আড়াল খসিয়ে আত্মদর্শন হবে তখনই বলা যাবে, যা ওখানে তাই এখানে। শাস্ত্র সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে পূর্ণযোগের সাধক সর্বদা মুক্ত মন নিয়ে শাস্ত্রকে গ্রহণ করবে ব্যবহার করবে, কিন্তু বাঁধা পড়বেনা কিছুতেই। আত্ম-বিশ্লেষণ ঠিকমত হলে তবেই পূর্ণযোগের সাধক মুক্তচিত্ত হতে পারে। কেন না মত শাস্ত্র আছে। তা থেকে রুচি ও প্রয়োজনমত বেছে ও বুঝে নিতে হবে। শাস্ত্র সম্বন্ধে পাচোয়ারী বুদ্ধি পেয়ে বসলেই সব গোলমাল হয়ে যায়। গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতার আটকে গেলে শাস্ত্রীয় অনুশাসনও একটা ভারের মত চেপে বসে। এ যে নিস্ত্রৈগুণ্যের পথে চলা। কোন বিধি নিষেধ তাতে নেই, কিন্তু তাবলে অধিকার সব সাধকের সমান নয়। সন্ন্যাস দেবার সময় যেমন আদেশ আছে 'শাস্ত্রযন্ত্রে যোজিত ছিলে, যোজনা ভেঙ্গে দিলাম। এবার মুক্ত হয়ে বিচরণ কর।'

কিন্তু এই মুক্তিরও প্রকৃত অধিকার অর্জন করতে হয়। সবার অধিকার সমান নয়। পূর্ণযোগের উত্তম অধিকারী যে খুব কম তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তম অধিকারী বোধিবৃত্তিতে আলোকিত পথের সবটাই একসঙ্গে দেখে নিতে পারেন এবং সত্যে অপ্রমত্ত থেকে নিজের মধ্যে পথের নিশানাও ঠিক মত ধরতে পারেন। মধ্যম অধিকারীও আছেন

যাঁরা সব বুঝে এবং মেনে নিয়েও রুচিমত একটা সাধনপথ বেছে নেন। তাঁরা যুগপৎ সবটা দেখতে ও বুঝতে না পারলেও সবকে একসঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন। অন্য সব অধিকারীরা তাদেরও নীচে,—বিক্ষিপ্ত প্রমত্ত ও সঙ্কীর্ণদৃষ্টি। বেশীরভাগ সাধকই এই ভাব নিয়েই যোগ আরম্ভ করতে যায়। কিন্তু একদৃষ্টির ঝলকে সবটা দেখা সম্ভব না হলেও এ ব্যাপারে মনটা যেন মুক্ত থাকে। কেননা অধিকারও ক্রমশ বেড়ে যায় এও সত্য। অন্তর্মুখ হয়ে চলে চৈত্যপুরুষকে চিনে নিতে হবে, তখনই অন্তরের দ্বারগুলি খুলতে থাকবে। কোন শাস্ত্রেরই বহিরঙ্গগুলি যেন পেয়ে না বসে। আসল শাস্ত্র তো হৃদয়ের সনাতন বেদ, সে যে একান্তই প্রাণের বস্তু।

শাস্ত্রপাঠের নিশ্চিত প্রয়োজন আছে এবং সাধনার প্রথম অবস্থায় সাধকের পক্ষে সেটা প্রায় অপরিহার্য। কিন্তু এমন সময় আসে যখন সেই শাস্ত্রপাঠ মর্মে গ্রহণ করতে হয়। তারপর মননীয়ার ভাব নিয়ে তাতে ধ্যানের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হতে হয় গভীরে, আরও গভীরে এক অনিবার্যতায় বিপুল হয়ে যেতে-যেতে। এভাবে বহুশাস্ত্রপাঠ গুটিয়ে আসে স্বাধ্যায়ে, নিত্য অধ্যেয় স্বল্পাক্ষর শাস্ত্রে। তা মহাপুরুষের বাণীও হতে পারে, মন্ত্রজপও হতে পারে। যা-ই হোক্ না কেন, যে যা পেয়েছে তাতেই চিত্ত একাগ্র করতে হবে। অন্য সব শাস্ত্রও থাকবে তার বিভূতির মত। তখন বিভিন্নমতের শাস্ত্রবাক্য ও তার অনুশাসন শুনলেও তা থেকে সমন্বয়ের পথই দৃঢ় হবে, বিরুদ্ধ ভাব আসবে না। এইভাবে শাস্ত্র সংক্ষেপ হতে হতে শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রীয় সব কিছু শ্রুতি ও স্মৃতি পর্যবসিত হয় দিব্যবাক্ রূপে। আর তখনই সাধকের গুহাগ্রন্থি বিদীর্ণ করে সমর্থ মন্ত্রের আবির্ভাব হয়। এই মন্ত্র (Word) বা পরাবাক্ (Great Word) সম্বন্ধে 'যোগসমন্বয়ের' শেষের দিকে শ্রীঅরবিন্দ Revelatory Speech বলে বাক্‌এর প্রসঙ্গ তুলেছেন এবং সাবিত্রী মহাকাব্যে তার কথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আমার মধ্যে তাঁর যে আবেশ তা প্রথম উৎসারিত হয় প্রথম স্পন্দরূপে। তাই মন্ত্রের স্ফুরণ (স্ফোট)। স্বরূপত তা একটা শক্তি মাত্র। সে শক্তি ঝলসে ওঠে মনোজ্যোতিতে। সে-জ্যোতি ভাবনায় গাঢ় এবং অবশেষে বাকে স্ফুরিত হয়। জপের সাধনা করলে এটি বুঝতে পারা যায়। এই মন্ত্রই তখন গুরু হয়ে দিশারী হয়ে আবার নিজেরই কোন নিভৃত কন্দর থেকে যেন অন্তরের সব কিছু আলো করে বেরিয়ে আসে। বাইরের শাস্ত্রের বন্ধন তখন খসে যায়।

(ক্রমশ:)

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রশ্নোত্তর]

এপ্রিল ১৯, ১৯৫১

প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দের "যোগপ্রসঙ্গ" (On Yoga) থেকে—

"এই যোগ কেবল তারাই শেষ পর্যন্ত করতে পারে যারা এ বিষয়ে সমগ্রভাবে সম্পূর্ণ ঐকান্তিক, আর যারা ভগবানের সাযুজ্যলাভের জন্য নিজেদের ক্ষুদ্র অহংকে ও তার সবরকম দাবিকে বর্জন করতে প্রস্তুত। চপল ও লঘুভাবে কিংবা শৈথিল্যের সঙ্গে এ যোগ করা চলে না ; এ কাজ খুবই উচ্চস্তরের আর খুবই কঠিন ; নিম্নপ্রকৃতির যত বিরুদ্ধশক্তি তা একটু ফাঁক পেলেই তার সুযোগ নিতে উন্মুখ হয়ে থাকে, সুতরাং এখানে আস্পৃহা ও তপস্যাকে নিত্য তীব্রভাবে জাগিয়ে রাখা দরকার। মানব মনের ধৃষ্ট আত্মপ্রত্যয়কে ও নিম্নসত্তার দাবি ও প্রবৃত্তিগুলিকে তার স্বাভাবিক ধর্ম বলে ইচ্ছাপূর্বক প্রশ্রয় দিতে থাকলে এ যোগ করা সম্ভব হয় না।"

উত্তর : এতো জানা কথা। যারা আপন প্রকৃতি ও অভ্যস্ত রীতি প্রবৃত্তিকে বদলাতে অনিচ্ছুক তারা সকলেই বলে থাকে, "কি আর করতে পারি, ওটা হলো মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি।" একেই আমরা বলি "স্বেচ্ছাকৃত প্রশ্রয়"। অর্থাৎ ঐ সব জিনিসকে ক্ষুদ্রতা ও বাধা বলে না মেনে উল্টে তাকে সমর্থন ক'রে তুমি বললে, "ওটা হলো মানবপ্রকৃতি, ওকে বাদ দেওয়া যায় না।" এই বলে তুমি আগেকার অভ্যাসমতো নিম্নপ্রকৃতির সকল দাবিকে স্বেচ্ছায় মেটাতে থাকলে। কারণ সেই প্রকৃতি বলে, "এগুলি বিশেষ জরুরী, এ না হলে আমার চলবে না।" তার আছে শুধু আত্মতোষের প্রবৃত্তি আর ধৃষ্টতা ; সে বলে যে তার দাবির একটা গুরুত্ব আছে, যা তার দরকার তা তার চাইই-চাই, নতুবা সে বাঁচবে না। সে বলে যে তারই দাম এখানে সবার চেয়ে বেশি, ইত্যাদি। এইগুলিই হলো বাধা, যত কিছু অন্ধ অজ্ঞানতার ক্রিয়া, পুরাণো অভ্যস্ত জীবনধারার ন্যায্যতাসূচক আস্ফালন, "কি যে বলো, এ সব কি থামানো যায়? এই তো মৌলিক মানবপ্রকৃতি।" তার এই যুক্তি, "কি করি, সকলেই এমনি, একে এড়াবার কোনো উপায় নেই"। সেই মামুলী ধারণা যে আমরা জন্মেছি এই প্রকৃতি নিয়ে, আমরা কেউই একে বদলাতে পারি না।

তাই শ্রীঅরবিন্দ জানিয়ে দিচ্ছেন যে ঐ প্রকৃতিকে না বদলাতে পারলে যোগ করে কোনো লাভ নেই, কারণ বদলাবার জন্যই যোগ, তা ছাড়া ওর অন্য কোনো অর্থ নেই।

প্রশ্ন ক্ষুদ্র অহংকে ত্যাগ করতে পারলেই কি সরাসরি 'ভগবানের সাযুজ্য' নিলে যেতে পারবে?

উত্তর কিন্তু তোমার ক্ষুদ্র অহংকে বর্জন না করেও ভগবানের সঙ্গে মিলতে পারো, কারণ অহংকে বর্জন করতে পারা সাধারণ কথা নয়।

প্রশ্ন সেটা কেমন করে হতে পারে?

উত্তর অহং বর্জন করা? আগে তোমার মধ্যে প্রকৃতই সেই ইচ্ছাটি জাগা চাই, খুব কম লোকেরই মনে সে ইচ্ছা জাগে। সকলেই যুক্তি দেখিয়ে বলে "আমি গোড়া থেকেই এইভাবে তৈরি, তার আর কি করা যাবে। যদি আমার ভিতর থেকে কেবলই এটা বদলাই, ওটা বদলাই, এটা সেটা সবই বর্জন করি, তাহলে আর এই আমি লোকটা রইল কই।" মুখে না বললেও তারা মনে মনে এইরকম ভাবে। এমনি করে যত সব ছোটোখাটো কামনা-বাসনা, আত্মবিনোদন, জীবনের যত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, এগুলি তোমাকে আঁকড়ে থাকে আর তুমিও এগুলিকে আঁকড়ে থাকো, কিছুতে ছাড়তে চাওনা। এমন কতশত দৃষ্টান্ত দেখেছি যেখানে কোনোক্রমে যদি বা একটা ঐরূপ বাধাকে মোচানো সম্ভব হয়েছে (কোনো বিশেষ শক্তির দ্বারা), কিন্তু কিছুকাল পরেই আবার তা নবীন তেজের সঙ্গে ফিরে এসেছে, আর লোকটি তাকে সমর্থন ক'রে বলেছে, "কি করি, ওটি ছাড়া যে আমার অস্তিত্বই থাকে না!" এমন অনেককে জানি যাদের মধ্যে আপনা হতেই এসেছিল একটা মানসিক নিষ্ক্রিয়তা, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তারা তাতে ভয় পেয়ে বললে, "আমি বুদ্ধিহারা বোকা হয়ে পড়ছি না তো?"—যেহেতু তাদের মনোযন্ত্র সর্বদা চঞ্চল থেকে কাজ করছে না...তোমরা জানোনা, মোটে ধারণা করতেই পারবেনা যে এই অহং থেকে নিজেকে মুক্ত করা কত কঠিন, অতি ক্ষুদ্র জিনিস হলেও সে কতখানি জড়িয়ে থাকে, অণুপরিমাণ হয়েও সে কতখানি জায়গা জোড়ে। ওকে তাড়ানো খুব কঠিন কাজ।...অথচ স্থূলভাবেও একে ঠেলে সরানো হয়, যেমন কোনো ভালো জিনিস আরম্ভ করতে তুমি পাশের লোকটিকে ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে যেতে চাও (সাধারণ জীবনে যেমন প্রায়ই হয়), তারপর যেমনি বোঝো যে তা ঠিক কাজ হচ্ছেনা অমনি নিজের লোভকে জোর করে চাপা দিয়ে হাত গুটিয়ে বলো, "নাঃ আমি অমন স্বার্থপর নই, ভালো জিনিসটি আমি নিজে না নিয়ে ওকেই নিতে দিলাম," এই বলে তখন আত্মগর্বে ফুলে ওঠো। এটা হলো নৈতিক অহংকার, যা দৈহিক অহংকারের চেয়েও খারাপ, কারণ এতে তুমি নিজেকে মনে মনে বড়ো করছ। আর যারা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে সব কিছু বিলিয়ে

দিয়ে ঘরসংসার ছেড়ে চলে যায়, তারা আবার নিজেদেরকে সকলের চেয়ে বড়ো জ্ঞান করতে থাকে; আপন আধ্যাত্মিক মহিমার চূড়ান্তে উঠে তারা নিচেকার মানুষদের কৃপাদৃষ্টিতে দেখে আপন অহংকে আরো প্রচণ্ড করে তোলে,—সে জিনিসকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতে না পারলে ভগবানের সাক্ষাৎ কখনই মিলতে পারে না। সুতরাং অহংকে তাড়ানো অত সোজা কথা নয়। তাতে অনেক সময় লাগে, এবং আরো বলছি যে এ কাজ শেষ হয়ে যাবার পরেও আবার সেই গোড়া থেকে শুরু করতে হয়।

স্থূলভাবে আমাদের বাঁচার জন্য দুর্ভাগ্যবশত খাদ্যের উপর নির্ভর করতে হয়—দুর্ভাগ্য এইজন্য যে খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিত্য কত নিশ্চেতনা, তমস, নানারূপ ভারি বোঝাকে ও নূঢ়তাকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করছি,—যদি আমরা জাগ্রতভাবে সদাসতর্ক থেকে তৎক্ষণাৎ সেগুলিকে চিনে নিয়ে কেবল আলোর জিনিস ছাড়া বাকী সব কিছুকে বর্জন না করি, তাহলে তার দ্বারা আমাদের চেতনা অনেকখানি চাপা পড়ে যায়। সেই কারণেই আহারে বসার পূর্বে খাদ্যগুলি ভগবানকে নিবেদন করার প্রথা সকল ধর্মে প্রচলিত হয়েছে। খাবার সময়ে এই আস্পৃহা মনে রাখতে হয় যে আমি খাচ্ছি আমার ক্ষুদ্র অহংটার জন্য নয়, আমার মধ্যে যে ভগবৎ-চেতনা রয়েছে তাকেই বাঁচিয়ে রাখবার জন্য। সকল ধর্মে আর সকল যোগে এই আদর্শটিই সমর্থন করে। তার থেকেই ঐ রীতি উদ্ভাবিত হয়েছে, যাতে ভিতরকার চেতনার সংস্পর্শে তখন আসা যায়, আর অজ্ঞাতে যত নিশ্চেতনার বোঝা নিত্য প্রবেশ করছে তাকে যথাসম্ভব কমানো সম্ভব হয়।

প্রাণের স্তরকেও সেই কথা। প্রাণ নিয়ে তুমি প্রাণময় জগতে রয়েছো, চতুর্দিক থেকে প্রাণশক্তির তরঙ্গ তোমার মধ্যে ঢুকছে বেরোচ্ছে, চেতনার মধ্যে ঢুকে তারা বিরোধ বাধাচ্ছে ও বিঘ্ন ঘটাচ্ছে; যদিও তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা করো তোমার প্রাণচেতনাকে বিশুদ্ধ রাখতে আর তোমার কামনাসত্তাকে ও ক্ষুদ্র অহংকে দাবিয়ে রাখতে, তথাপি যাদের মধ্যে তুমি বাস করছ তাদের থেকে আসা বিভিন্ন বিপরীত স্পন্দনকে গ্রহণ করতে তুমি বাধ্য হও। নিজেকে তুমি কোনো দুর্ভেদ্য চূড়ায় উঠিয়ে রাখতে পারো না, দেহ অপেক্ষা প্রাণের পক্ষে তা আরো বেশি দুষ্কর, সুতরাং যদি তুমি সদাসতর্ক ও সজাগ হয়ে না থাকো, আর যা কিছু ঢুকতে চায় তাকে কড়া পাহারাতে আটক করতে না পারো, তাহলে আশপাশ থেকে আসা বিভিন্ন কামনার সংক্রমণ ও ছোটোখাটো নিষ্ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে আর অকাম্য স্পন্দনগুলির প্রভাব থেকে নিজেকে কোনোমতে বাঁচাতে পারবে না।

মনের স্তরকে আরো খারাপ। মানবমন হলো বাস্তোয়ারির ক্ষেত্র, চারদিকেই রাস্তা খোলা; সকল দিক থেকেই তার মধ্যে যা খুশি তাই আসা যাওয়া করছে, সবই তার ভালো জিনিস নয়। সেখানে কোনো নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা খুব মুশকিলের কথা। মনের মধ্যে

যে সব চিন্তা চলে আসে তাকে রোধ করতে গেলেই এ-কথা বুঝবে। তখন দেখবে যে কেমন করে সজাগ থেকে মনশ্চক্ষুকে সর্বদা খুলে রাখতে হয়, যাতে তুমি স্পষ্ট বাছাই করতে পারো যে কোন চিন্তা ও অনুভব তোমার আত্মোন্নতির অনুকূল আর কোনটা তার বিপরীত। আর প্রতিমুহূর্তে তোমায় এই বারোয়ারির ক্ষেত্রটিকে পাহারা দিতে হবে, কারণ সকল দিকের রাস্তাই ওর দিকে খোলা, তোমায় দেখতে হবে যে সকল দিকের সব রকম যাত্রীরাই যেন হুড়-মুড়িয়ে ওখানে ঢুকে না পড়ে। এ একটা মস্ত কাজ। নিশ্চিত জানবে যে তোমার ঐকান্তিক চেষ্টা থাকলেও এ কাজ একদিনের বা এক মাসের বা এক বছরের নয়, যার মধ্যে সকল গাফিলতি মিটে যাবে। একবার শুরু করলে এ কাজ অটল ধৈর্যের সঙ্গে বরাবর চালিয়ে যেতে হবে। বলতে হবে, "এর জন্যে যদি আমার পঞ্চাশ বা একশো বছরও সময় লাগে, কয়েকটা জন্মও যদি লেগে যায়, তবু যা আনি শেষ পর্যন্ত সমাধা করতে চাই তা করবই।"

এমন সিদ্ধান্ত করে যখন কৃতনিশ্চয় হয়ে তুমি জানবে যে লক্ষ্যে পৌঁছবার এই প্রকৃত পন্থা, আর অবিরল চেষ্টায় এই পন্থাই ধরে থাকতে হবে, তখন তুমি কাজ শুরু করতে পারো। নতুবা কিছুকাল পরেই তুমি এলিয়ে পড়বে; নিরুদ্যম হয়ে বলবে, "নাঃ, এ খুব কঠিন কাজ—যতবারই কিছু করতে যাই ততবারই তা বিফল হয়ে যায়; আবার সেই একই জিনিস গোড়া থেকে শুরু করতে হয় কিন্তু আবারও তা বিফল হয়, এমনি নিত্য হয়ে চলেছে...কিন্তু তাহলে এর শেষ কোথায় দাঁড়াচ্ছে? কখন কোথায় গিয়ে থামব?" এমন হলে চলবে না, এতে প্রচুর ধৈর্য থাকা চাই। একশো বার তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হলেও আরো একবার তা করতে হবে, হাজার বার হলেও তাই, যতক্ষণ পর্যন্ত কার্যসিদ্ধি না হয়। তখন তারপরে আর কোনো ব্যর্থতা ঘটবে না।

তুমি যদি অখণ্ড হতে তাহলে কাজটা সহজ হতো, কিন্তু তুমি যে বহু খণ্ডে গঠিত। তার মধ্যে যখন একটা খণ্ড এগিয়ে গিয়ে অনেক কাজ ক'রে সম্পূর্ণ সচেতন ও সজাগ হয়েছে, তার ফলে সবই ঠিক আছে, তার সজাগ প্রহরাতে অবাঞ্ছিত কোনো কিছুই ঢুকতে পারছে না, কিন্তু এক সময়...পরের দিন সকালে যখন ঘুম থেকে উঠলে তখন অন্য এক অংশ এসেছে সামনে এগিয়ে এবং তার দিকের কাজ শুরু করেছে, তখন তুমি বলবে, "আমি যে এত এগোনোর কাজ করেছিলাম তা কোথায় গেল?" তখন আবার সেই আগের কাজটাই নতুন করে শুরু করতে হবে, খণ্ডের পর খণ্ডের চেষ্টা দিয়ে, যাতে সকল খণ্ডই অংশগ্রহণ করতে করতে চেতনাতে তার ফল প্রবেশ ক'রে সমগ্রটাই বদ্‌লে যায়। এমনি একটা দিকের কাজ শেষ হয়ে গেলে যখন সেই দিক দিয়ে তোমার উন্নতি ঘটল, তখন আবার অন্য

একটা দিকের কাজ নিয়ে ঐভাবে লাগতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারও না সমাপ্তি হয়। কোনো কাজটাই সম্পূর্ণ হতে পারেনা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার সত্তার সকল খণ্ডই এগিয়ে না আসে এবং একটিও বাদ না থাকে, আর সকল খণ্ডই বদ্‌লে গিয়ে তার উপর চেতনার আলো পড়ে তার ইচ্ছা ও লক্ষ্যকে পূর্ণপ্রভাবিত না করে।

তোমাদের নিরুৎসাহ করতে এ সব কথা বলছি না, আগের থেকে কেবল জানিয়ে দিচ্ছি, পাছে তোমরা এমন কথা না বলো, "ওঃ, এত কঠিন তা আগে জানলে এতে মোটে হাতই দিতাম না।" তাই বলছি জেনে রাখো যে এ জিনিস খুবই কঠিন, পাথরের মতো দৃঢ়তা নিয়ে লেগে থেকে শেষ পর্যন্ত চলে যেতে হবে, যদিও তাতে বহু দূর পথ চলতে হয়, এবং তার জন্য অনেক কাণ্ডই করতে হয়। তবে একটা কথা এই বলব যে ঐকান্তিক যত্ন ও খাঁটি অধ্যবসায়ের সঙ্গে যদি তা করতে পারো তাহলে দেখবে যে এ কাজ খুবই চিত্তাকর্ষক। এমন কি যারা নিতান্ত একঘেয়ে জীবন যাপন করে (অনেককে তাই করতে হয়, এক ভাবে একই অবস্থায় থেকে একই জিনিস তারা নিত্য করতে থাকে, মস্তিষ্ক এমনভাবে জাগতে সুযোগ পায়না যাতে কিছু ঔৎসুক্য আসে), তারাও যদি নিজেদের ভিতরে ভিতরে এমনি বিচার ও বর্জনের কাজ শুরু করে দেয় (অর্থাৎ যা কিছু ভিতরে উদয় হচ্ছে তার মধ্যে কতটা অজ্ঞানতা ও অচেতনা ও অহমিকা রয়েছে লক্ষ্য ক'রে তাকে বদলাবার ইচ্ছা নিয়ে সতর্ক থেকে নিত্য তুলনা সমালোচনা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা তার উপর ক্রিয়া করতে থাকে), তাহলে তাদের পক্ষেও সে একটা নতুন রকমের চিত্তাকর্ষক জিনিস শুরু হয়ে যায়।

এতে তুমি অনেক অপ্রত্যাশিত ও আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করতে থাকো। নিজের মধ্যে তুমি এমন সব ছোটোখাটো ও ভাঁজের-মধ্যে-লুকোনো জিনিস দেখতে পাও যার সম্বন্ধে আগে কিছুই জানতে না। মনে হবে যেন ভিতরের অন্ধকার কোণে খোঁচিয়ে সাফ করতে গিয়ে ঐগুলি তোমার নজরে পড়ছে, যার তুমি তখন বলো, "এ কি! আমার ভিতরে ভিতরে এত কিছু ছিল! এই সব ক্ষুদ্রতাকে আমি জমিয়ে রেখেছিলাম।" যে সব জিনিস নিতান্তই হীন ও নোংরা ও কদর্য! সেগুলি যখন আবিষ্কার করে তার উপরে আলো ফেলতে থাকো যার তা একটু একটু করে বিলীন হতে থাকে, তখন আর তোমার সেই ক্ষুণ্ণতা ও হতাশার ভাবটি থাকেনা যে সময়ে তুমি বলতে, "নাঃ, আমার দ্বারা এ হবার নয়।" ধরো, তুমি এখন কিছু সংকল্প করলে যা আপাতদৃষ্টিতে খুবই সহজ, যেমন, "আমি আর মিথ্যাকথা বলব না।" তখন হঠাৎ দেখবে যে কোথা থেকে কেমন করে মিথ্যাকথাই তোমার মুখ দিয়ে আপনা হতে বেরিয়ে আসছে, তুমি তা টের পেলে বলে ফেলার পরে, এবং তুমি ভাবলে, "এ তো ঠিক কাজ হলো না, আমি যে চেয়েছিলাম অন্যরকম বলতে"। তখন তুমি খুঁজতে লাগলে..."কেমন ক'রে এটা হলো? ও কথা

আমি ভাবলামই বা কেন আর বললামই বা কেন? কে আমাকে ও কথা ঠেলে বলালে?" এ প্রশ্নের ব্যাখ্যা ক'রে তখন হয়তো বলবে, "ওটা বাইরের থেকে এসে গিয়েছিল", কিংবা "আমি অজ্ঞানের মুহূর্তে ওটা অমনি বলে ফেলেছি, এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত করে নিয়ে ও-বিষয়ে আর তখন চিন্তা করবেনা। কিন্তু আবার অন্য এক সময়ে ঐরকম হয়ে যাবে। এবার তুমি প্রশ্ন করতে থাকবে, "আমি যখন মিথ্যাকথা বলি তখন তার পশ্চাতে ঠিক কোনরকম উদ্দেশ্য থাকে?"... খুঁজতে খুঁজতে আবিষ্কার হবে ভিতরের ক্ষুদ্র এক কোণে এমন কিছু লুকিয়ে আছে যা নিজেকেই জাহির করতে চাইছে বা নিজেকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করতে চাইছে (এমনি অনেক উদ্দেশ্যই থাকতে পারে), যাতে নিজেকে তুমি লোকচক্ষে একটু অন্যরকম দেখাতে পারো, লোকে যাতে তোমার সম্বন্ধে উচ্চধারণা করে ভাবে যে তুমি নিতান্ত সাধারণ মানুষ নও...তোমার ভিতরকার সেই লুকোনো জিনিসটাই তোমাকে দিয়ে ঐরকম বলিয়েছে—সে তোমার সক্রিয় চেতনা নয়, তার পিছন থেকে সেই জিনিসটাই ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। তখন তুমি ছিলে অসতর্ক অবস্থায়, তাই ঐ জিনিসের গোপন উদ্দেশ্যটাই তোমার মুখ ও জিভকে অধিকার ক'রে তোমাকে দিয়ে মিথ্যেটা বলিয়েছে। এই একটিমাত্র দৃষ্টান্তই বললাম, কিন্তু এমনি কত লক্ষ লক্ষ আছে। এ নিয়ে গবেষণায় লাগা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এই সব যখন আবিষ্কার করতে থাকবে তখন তুমি বলবে, "এটা বদলানো দরকার, সেটা বদলানো দরকার।" এতে একটা আভ্যন্তরীণ দৃষ্টি খুলে যায়, অন্যেদের মধ্যে কেমন হচ্ছে তাও বোঝা যায়, সুতরাং তাদের আশানুরূপ আচরণ করতে না দেখলে তুমি তাদের উপর রাগ না করে খুঁজে দেখ যে কেন তারা অমন হলো, কি প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যে হয়েছে...আর বুঝতে পেরে তুমি হাসো। তাদের প্রতি বিরূপ না হয়ে তাদের এবং নিজেরও এ সব অতিব্যক্তির উৎসকে ভগবৎচেতনার কাছে নিবেদন করে দিয়ে তুমি বলো যে এগুলির রূপান্তর ঘটুক।

(এই প্রশ্নোত্তরগুলি ছাপতে যাবার সময় মা এতে আরো কিছু যোগ করে দিয়ে বলেছেন ৮ই জুন ১৯৬৬ তারিখে তাঁর বর্তমান অনুভূতির কথা যা নিয়ে "দেহের যোগ" উদ্ভূত)

গত দুদিন যাবৎ আমি কেবল এই কাজ নিয়েই ছিলাম। দুটো দিন ধরে সবক্ষণই কাটিয়েছি রাশীকৃত ভাবে জমা করা এই সব নোংরা জিনিসের মধ্যে। ওঃ, এত সব তুচ্ছ ক্ষুদ্র জঘন্য জিনিসের মধ্যে নিত্য থাকতে হচ্ছে! এর সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবার কেবল একটিমাত্র উপায় আছে, চিরদিন সেই একটাই উপায় নিবেদন ক'রে দেওয়া।

সেই পরমচেতনা যেন ইচ্ছা করেই বহু অতীতের যত বিস্মৃত জিনিসের সংস্পর্শে আবার তোমাকে এনে ফেলেছেন, যে সব অমার্জিত জিনিস একেবারে মুছে গিয়েছিল এবং কোনো সম্পর্কই ছিল না তার সঙ্গে, সেই সব ছোটোখাটো ব্যাপার আবার দেখা দিচ্ছে তোমার নতুন চেতনার মধ্যে, যাতে গোটা মানবজীবনকে অতি ঘৃণ্য ও হীন ও বিসদৃশ করে তুলেছে। এখন তাকে আবার বদ্‌লে রূপান্তরিত ক'রে দেবার জন্য, তুমি তাকে ভগবানের কাছে নিবেদন করবে ও সেই নিবেদনের যে জ্যোতির্ময় আনন্দ তারই তুমি অধিকারী হবে।

এখন দেহকোষগুলির চেতনাতেও অনুরূপ ক্রিয়া হচ্ছে। যা কিছু দৌর্বল্য, ছোটোখাটো বিরুদ্ধ প্ররোচনার যা কিছু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া (যা কোষগুলির মধ্যে প্রতিনিয়তই হয়ে থাকে), সবই এখন হচ্ছে ঐরূপে নিবেদিত (তার স্পন্দনতরঙ্গ কখনো কখনো এত বেশি হয় যে দেহ তাকে সামলাতে না পেয়ে মূর্ছিতবৎ হয়ে পড়ে), তার পরে এসে পড়ে এমন আলো, উষ্ণতা, তেজের সঙ্গে মাধুর্য, যে সব কিছুই যথাস্থানে স্থাপিত হয়ে রূপান্তরের পথ খুলে দেয়।

দেহজীবনের পক্ষে এটা খুব কঠিন যুগ : তোমার বিবেচনা হতে থাকবে যে কেবল ভগবৎ-ইচ্ছাই এর কিনারা করতে পারে। তা ছাড়া আর কোনো অবলম্বন নেই—অভ্যস্ত ক্রিয়ারই বলো আর জ্ঞানেরই বলো বা ইচ্ছাশক্তিরই বলো, সবরকমের সব অবলম্বনই ব্যর্থ হয়ে গেছে—আছে কেবল ভগবানের হাত।

(নীরব থেকে)

কোষচেতনার আস্পৃহা আত্মনিবেদনের পূর্ণ ঐকান্তিকতার জন্য।

আর সেই অনুভূতিতে সুগভীর অবস্থান যে, ঐ ঐকান্তিকতাই তার অস্তিত্বের সমর্থক।

ওর বিন্দুমাত্রও যদি ভান হয়, তার অর্থ হবে বিনাশ ও মৃত্যুর শক্তিদের সঙ্গে মিতালি।

দেহকোষেরা যেন গান গাইতে থাকে—কিন্তু গাইছি বলে আদৌ আত্মচেতন না হয়ে—সে গান শুধু এই : "তোমারই ইচ্ছা, হে প্রভু, শুধু তোমারই, তোমারই ইচ্ছা।"

আর ঐ যে মারাত্মক একটা অভ্যাস, অন্যের ইচ্ছা অন্যের চেতনা ও প্রতিক্রিয়ার উপরে নির্ভর করে থাকা (সর্ব ব্যক্তি ও সব বিষয়েই), প্রত্যেকেই যাতে পরস্পরকে নির্ভর ক'রে আশাভরা বৃথা কল্পনার ছেলেখেলা করছে, তার পরিবর্তে হওয়া চাই কেবল স্বতঃ-স্ফূর্ত ও সম্পূর্ণভাবের ঐকান্তিক আত্মনিবেদন। এবং তা চেতনার সম্পূর্ণ স্থূলঅংশেই সম্ভব। সেইখানেই হতে পারে তোমার পূর্ণ ঐকান্তিক অস্তিত্বের ও তার ক্রিয়ার সম্ভাবনা, নিজে আছি বলে না জেনে ও নিজের দিকে না চেয়ে।

*

এপ্রিল ২১, ১৯৫১

শ্রীঅরবিন্দের "যোগ প্রসঙ্গে" (On Yoga) পত্রগুলি থেকে—

...."এই যোগ করা সম্ভব নয় যদি অজ্ঞানতার নিম্নতর জিনিসগুলিকে কিংবা এমন কি যোগের পথে যে সব ছোটোখাটো সত্যের সাক্ষাৎ মেলে তাকেও খাঁটি দিব্যসত্যের সঙ্গে অভিন্ন বলে ধরে নাও। এই যোগ করা সম্ভব নয় যদি তোমার পূর্বসত্তাকে বা তার আগেকার মন প্রাণ দেহের সংগঠনকে ও তার আগেকার অভ্যাসগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকো। নিত্যই তোমার অতীতকে পিছনে ফেলে রেখে উঠিয়ে যেতে হবে, উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে গিয়ে অবস্থান করতে হবে ও সেখান থেকে ক্রিয়া করতে হবে। এই যোগ করা সম্ভব হবেনা যদি তোমার মানবসুলভ মনকে ও প্রাণময় অহংকে "স্বাধীনক্রিয়" অবস্থায় রাখতে চাও। যতক্ষণ তুমি সাধারণ জীবনে রয়েছ ততক্ষণ তোমার মানবসত্তার সকল অংশই আপন কর্মের ঝুঁকি নিয়ে আপন ভাবে নিজেদের অভিব্যক্ত ও পরিতৃপ্ত করতে পারে। কিন্তু যখন এই যোগের পথে পা দিলে—যার লক্ষ্যই হলো এই সব মানবীয় ক্রিয়ার স্থলে এক বৃহত্তর সত্যের বিধানগুলির প্রবর্তন করা এবং যার মূল সূত্রই হলো দিব্যশক্তির কাছে সমর্পণ—তখনও যদি আত্মস্বাধীনতার দাবি করতে থাকো—যার প্রকৃত অর্থ যত অন্ধ বিশ্বশক্তির দাসত্ব করতে থাকা ছাড়া আর কিছুই নয়,—তাহলে তাতে কেবল অন্ধ বিরুদ্ধতাকেই সমর্থন ক'রে একটা দ্বৈত রকমের জীবন যাপন করতে থাকা হবে।"

এ যোগ কখনই তাদের দ্বারা সম্ভব নয় যারা নিজেদের সাধক বলে অথচ অন্ধ অবিদ্যাশক্তিদের যন্ত্র ও কেন্দ্র হয়ে কেবল তারই মুখপাত্রস্বরূপ হয়ে থাকে—যে শক্তিরা বরাবরই এই যোগের আদর্শকে ও উদ্দেশ্যকে অস্বীকার ও তাচ্ছিল্য করেছে।"

প্রশ্ন আপন প্রকৃতিকে বদলাতে হবে আর সত্তার সকল অংশকে শাসনে আনতে হবে, এই চেতনা নিয়ে তদনুযায়ী কাজ করা, সে কথা আর এই কথা কি একই জিনিস?

উত্তর এটার পরে আসে ওটা। প্রথমে দরকার চেতন হওয়া, তার পরে দরকার শাসনে আনা, ধারাবাহিক এই কাজ করতে করতে তোমার চরিত্র বদলাবে। চরিত্রের পরিবর্তন সব শেষের কথা। প্রথমে আগেকার যত মন্দ অভ্যাসগুলিকে জয় করা চাই, তাতেই যথেষ্ট সময় লাগবে, অভ্যাসগুলি ছেড়ে গেলে তখন চরিত্র বদলাবে।

মনে করো একজন নিত্যই অবসাদগ্রস্ত হচ্ছে। যেমনি তার মনের মতো কিছু হচ্ছেনা, অমনি দারুণ অবসাদ এসে পড়ছে। এস্থলে তার ঐ অবসাদ সম্বন্ধে চেতন হওয়া চাই—শুধু তাই নয়, এত অল্পে কেন অবসাদ আসে তার মূল কারণ খুঁজে বের করা চাই।

সে কথা জানার পরে ঐ অবসাদকে জয় করার চেষ্টা করতে হবে, যথেষ্ট কারণ থাকলেও যেন তা আর না আসে সেই দিকে প্রয়াস করতে হবে। অল্পবিস্তর কিছুকাল যাবৎ ঐরূপ চেষ্টা করে যেতে থাকলে তখন সে অভ্যাস ক্রমশ চলে যাবে, আর প্রকৃতির পরিবর্তন এসে গেলে ওরূপ প্রতিক্রিয়া আর হতেই পারবেনা।

প্রশ্ন "অবিদ্যা শক্তিদের মুখপাত্র স্বরূপ হওয়া" এ কথার অর্থ কি?

উত্তর: বর্তমান জগতে অবিদ্যা শক্তিরা সেই সকল ব্যক্তিদেরই চায় যারা তার অজ্ঞানতার ভাষাটাই জগতে প্রচার করে। এ তো সোজা কথা। এমন অনেক লোক আছে যারা অজ্ঞানের তরফের কথাই বলে বেড়ায়,—অর্থাৎ যারা আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা, উচ্চস্তরে ওঠার কথা, এরূপ জীবনের চেয়ে উন্নততর জীবনের সম্ভাবনার কথা আদৌ মানতেই চায়না, মানবপ্রকৃতি যে বদলানো যায় একথা স্বীকারই করেনা, ইত্যাদি। তারা বলে যে রোগ পীড়াকে ঠেকানো যায়না, মৃত্যুকে এড়াতে পারা আরো অসম্ভব কথা, ইত্যাদি। যারা এরূপ বলে তারাই অবিদ্যার মুখপাত্র। জ্ঞান ও আলোর শক্তিকে ব্যক্ত করার বদলে তারা অজ্ঞানের শক্তিকেই ব্যক্ত করতে থাকে—বুঝলে?

প্রশ্ন: শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "আস্পৃহা ও তপস্যা নিরবচ্ছিন্ন ও সদাপ্রবল হওয়া চাই..."

উত্তর: হাঁ, খুব বেশি আন্তরিকতা না থাকলে যোগ করা যায় না। সে আন্তরিকতা এমন হবে যাতে আস্পৃহা ও তপস্যা নিত্যই সতেজ থাকে। তেমন আন্তরিকতা না থাকলে হয়তো মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য আস্পৃহা বলবৎ থেকে পরে দশ ঘন্টার জন্য তা আর থাকবেই না, একদিনের জন্য জোরালো হয়ে উঠে পরে একমাস মোটে জাগবেই না, ইত্যাদি। এরূপ ভাবে যোগ হয়না। ওগুলি নিত্যই বলবৎ থাকা চাই, কখনো তার শৈথিল্য না আসে। তুমি যদি সেটা ভুলে যাও, যদি এলে দাও, তাহলে তোমার পক্ষে যোগ করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন প্রবল রকমের আস্পৃহা কি একটা জন্মগত জিনিস নয়?

উত্তর না, আস্পৃহার রীতিমত অনুশীলন করতে হয়, তার উৎকর্ষ সাধন করতে হয়, সত্তার ভিতরকার অন্যান্য ক্রিয়ার মতোই। অল্প একটু আস্পৃহা নিয়ে হয়তো তুমি জন্মাতে পারো, অতঃপর আপন প্রচেষ্টার দ্বারা তাকে বাড়িয়ে তুলতে

পারো। এটা খুবই হাস্যকর ধারণা যে সবই আপনা হতে হয়ে যায় একরকম কৃপার জোরে, তা ছাড়া অন্য কিছুতেই কিছু হবার নয়—এ ধারণা ভুল। ঠিক তাই লিখেছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর চিঠিতে, যা আমি পড়ে শোনাতে যাচ্ছি। তিনি বলেছেন যে তোমার নিজেকেই আগে বেছে নিতে হবে, আর যে লক্ষ্য বেছে নিয়েছ তা সর্বদাই চোখের সামনে রাখতে আর পুনঃ পুনঃ তাকে লালন করতে হবে, অন্যথা কোনোদিকে এগোতে পারবেনা। নিজেকেই সেটা বেছে সিদ্ধান্ত করে নিতে হবে। এমন কোন "স্বতন্ত্র শক্তি" নেই যে তোমার হয়ে বাছাই করে দেবে—কোনো ভাগ্যবিধিও নয় বা নিয়তিও নয় বা দৈবও নয়—ও সব ঠিক কথা নয়। স্বাধীন ইচ্ছা তোমাকে দেওয়া আছে, ইচ্ছাকৃত ভাবেই তোমার ইচ্ছাকে স্বাধীন করে রাখা হয়েছে, সুতরাং তোমাকেই নিতে হবে তোমার কার্য জিনিস বেছে। তুমি আলোর সন্ধান চাও কি চাওনা, সত্যের সেবক হতে চাও কি চাওনা, ঐদিকে আস্পৃহা করবে কিনা—সেটা তুমিই বলবে, তুমিই সাব্যস্ত করবে। এমন কি যখন বলি, "নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করো তাহলে তোমার জন্য সব কিছুই করা হবে," যদিও তা ঠিকই কথা, কিন্তু সেই পূর্ণ সমর্পণের জন্য তোমাকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে স্থিরসংকল্প করতে থাকা চাই, নতুবা তা সম্ভব হবেনা ; আপনা হতে সে কাজ হয়ে যাবেনা। তুমি যখন তা করতে পারবে তখনই সব ঠিক হয়ে যাবে। জ্ঞানকে যদি আয়ত্ত করতে পারো তাতেও সব ঠিক হবে ; আর যদি ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হতে পারো সে তো যারো ভালো কথা, তথাপি তোমাকেই তা আকিঞ্চন করতে হবে, তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে, অলস হয়ে বসে চুলতে চুলতে এ কথা বলবেনা, "আমার জন্য সবই করে দেওয়া হোক, আমার নিজেকে কিছু করতে হবেনা, কেবল স্রোতের মুখে নিজেকে ছেড়ে দিলেই হলো।" এমন কথা সত্য হতে পারেনা, এ কাজ আপনা হতে হয়না ; যদি সামান্য কিছুও বাধা এসে তোমার ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে শাসিয়ে বলে, "না না, ওদিকে নয়।"...তখন কি হবে ?

প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "যোগের পথে ছোটোখাটো যে সব সত্যের সাক্ষাৎ মেলে", সেগুলো কি ?

উত্তর : তুমি তো সরাসরি একেবারে চরমতম সত্যে গিয়ে পৌঁছতে পারোনা। এখন যতটুকু জানো তার চেয়েও বেশি সত্য অনেক কিছু আছে যা যোগের পথে চুকলে একরূপ হঠাৎ দীপ্তির মতো ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার করবে, যার থেকে কিছু নতুন নিয়মের সন্ধান পাবে, যা তোমাকে কিছু উপরে তুলে দেবে, তোমার সুমুখে

নতুন রাস্তা খুলে দেবে.—কিন্তু তা সেই "চরম সত্য" নয়, চরমানুভূতি নয়, ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হওয়াতে যা নেলে সে জিনিস নয়—অথচ তা যেন সেখান থেকেই নেমে এসে তোমার মধ্যে প্রবেশ ক'রে তোমাকে আংশিকভাবে সত্যদীপ্তি দান করছে। সেই আংশিক দীপ্তিদায়ক জিনিসকেই তিনি বলেছেন "ছোটোখাটো সত্য।"

প্রশ্ন "তপস্যা"র প্রকৃত অর্থ কি?

উত্তর তপস্যা হলো সেই নিয়মিত সাধনার কাজ যাতে ভগবানকে পাবার জন্য নিজেকে সর্বক্ষণই নিযুক্ত রাখা হয়।

প্রশ্ন তপস্যা ও আশ্পৃহা কি একই জিনিস?

উত্তর না, আশ্পৃহা না থাকলে তুমি তপস্যা করতেই পার না। আশ্পৃহা হলো কিছু পাবার জন্য প্রখর আকুতি। আর তপস্যা হলো সেই আশ্পৃহাকে সার্থক করতে প্রচেষ্টার একরূপ প্রণালী—ওর একটা প্রণালী আছে, একরূপ ধারা আছে।

প্রশ্ন নিম্নসত্তার মধ্যে কিসের কেমন কাজ করা হচ্ছে তা কি সে জানতে পারে?

উত্তর: অবশ্য যদি সে যুক্তি দিয়ে বুঝে দেখে আর সরল প্রকৃতির হয়, তাহলে ভগবানের অস্তিত্ব তাকে মানতেই হয়। তুমি বুঝে দেখ, ব্যাপারটা বুঝেও না বোঝার মতো; সে চায়না যে তার মধ্যে কিছু ভবগৎক্রিয়া হোক, কারণ তাতে তাকে বদ্‌লে যেতে বাধ্য হতে হয়, যা তার পক্ষে খুবই বিরক্তিকর; তাহলে অকে সংযত হতে হয়, কামনাগুলিকে রোধ করতে হয়, নিজের দাবি চেপে রেখে মাথা নুইয়ে থাকতে হয়, তাই সে জোর করে বলে "না না, ভগবান বলে কিছু নেই"। অথচ সে বিলক্ষণ জানে যে তার মধ্যে কিছু ক্রিয়া যখন শুরু হয়েছে তখন তাতেই প্রমাণ হচ্ছে যে ভগবান সেখানে উপস্থিত। তবুও সে তা অস্বীকার করতে থাকবে, ইচ্ছা করেই সে বিপরীত যুক্তি দিতে থাকবে, যাতে সে ওরই অনুকূল রকমের প্রয়াস করা থেকে এড়িয়ে থাকতে পারে।

প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন "পুরানো সংগঠন" ও "পুরানো অভ্যাসের" কথা, এ দুটিতে কি পার্থক্য?

উত্তর দুই প্রায় একই জিনিস। যেমন, তোমার দেহ ঠাণ্ডার গরমে ও ক্ষুধাতে একরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশে অভ্যস্ত হয়েছে, এবং তার থেকে তোমার দেহপ্রকৃতিও সেইরূপ

গঠন নিয়েছে, দেহসত্তার মধ্যে সেই অনুযায়ী খাঁজ পড়ে গেছে, অতএব তুমি এখন "তাইই হয়েছ"। অভ্যাস হতে গঠন আসে। চরিত্রেরও গঠন ঐভাবে হয়; যেমন, তুমি যদি অপছন্দের কোনো কিছু দেখলেই তৎক্ষণাৎ রেগে উঠতে অভ্যস্ত হয়ে থাকো, তাহলে তোমার প্রকৃতিতে তারই এমন খাঁজ পড়ে যাবে যে অপছন্দের কিছু হওয়া মাত্রই তুমি আপনা হতে অনিবার্য রকমে রাগে ফেটে পড়বে। একেই বলা যায় "গঠন" নেওয়া, তোমার অভ্যাসগুলোই তোমার চরিত্রের অঙ্গীভূত হয়ে গেল।

প্রশ্ন : আমি যদি যোগের উপর খুব বেশিরকম ঝোঁক দিতে থাকি, তাহলে কি কাজটা কঠিন ভাবতে ভাবতে ক্রমশ আবিষ্ট বা বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ব না?

উত্তর : তারও তো একটা মাত্রা আছে। কিন্তু ওর গুরুত্বকেই যদি মেনে নাও তাহলে তা আর বাতিকের আবেশ না হয়ে বরং সহায়কই হবে। মনে করো অন্তরে তুমি ভগবানকে দেখতে চাও, তাই সর্বদা সকল অবস্থায় সকল কাজের মধ্যে সেইদিকেই একাগ্র হয়ে রইলে যাতে অন্তরে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতে পারো। তাহলে প্রথমে সেই জিনিসগুলি আসবে যাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন "ছোটোখাটো সত্য", অর্থাৎ তুমি টের পেতে থাকবে যে ভগবান আছেন তোমার মধ্যে (এটি "ছোটো সত্যের" উত্তম দৃষ্টান্ত), তারপর যখন ঐরূপ কিছু প্রত্যক্ষ করে আরো জোর আস্পৃহা করতে থাকবে আর তাতেই যখন তুমি অহরহ লেগে থাকবে, তখন অন্যের চোখে তা হয়তো আবিষ্টতার বাতিক বোধ হতে পারে, কিন্তু তোমার পক্ষে তাতে খারাপ কিছু হবে না। খারাপ হতে পারে কেবল যদি তুমি নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেল। তবে এ কথাও বলা দরকার যে, ভাবে আবিষ্ট হয়ে যারা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তারা ওর জন্য আগের থেকেই ঐভাবে প্রস্তুত ছিল, কোনো একটা কিছু উপলক্ষেই তাদের ওরূপ ঘটতে পারত এবং তাদের ভারসাম্য নষ্ট হতো— সেটা তাদের মনেরই গঠনের দোষ, ভাবাবেশ জিনিসটার তাতে কোনো দোষ নেই। আর যে কেউ তার মনের আকাঙ্ক্ষাকে ভাবাবেশে দাঁড় করাবে তারও ভারসাম্য নষ্ট হবে। তাই বলেছি যে তোমার আবিষ্ট হবার লক্ষ্য বস্তু কি তাই জানাই দরকার।

প্রশ্ন কেউ একজন বলেছিল যে নিজের কোনো নির্দিষ্ট মনোভাবকে কেউ যদি উন্মাদের অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে তাহলে সে আলো দেখতে পাবে।

উত্তর : আপন অভীপ্সায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থেকে যদি অতি একাগ্র হয়ে উঠতে পারো তাহলে তুমি "উত্তীর্ণ" হতে পারবে, যে কথা গুহ্যবাদীরা বলে থাকে, এবং সে অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়ে তুমি আলো দেখতে পাবে বটে, কিন্তু কাজটা কিছু বিপজ্জনক।

প্রশ্ন তার মানে অত বেশিরকম একাগ্র যে হবে সেই দেখবে আলো।

উত্তর নিশ্চয়, নিশ্চয়ই তাই। অমন একাগ্র হতে পারলে সে তো ঠিক্ কথাই হলো, কিন্তু এও দেখা চাই যে কিসের উপর একাগ্র হচ্ছি। তাই হলো আসল কথা।

প্রশ্ন কেমন করে জানবো যে আমার সমর্পণ পুরোপুরি রকমের হয়েছে?

উত্তর তা জানা খুব কঠিন বলে আমি মনে করিনা। তুমি ওটা পরীক্ষা করেই দেখতে পারো। প্রথমে বলবে, "আচ্ছা দেখা যাক, আমি ভগবানে সর্বসমর্পিত হলাম, আমার জীবনের সব কিছু এবার তিনিই নির্ধারণ করুন।" এই থেকে শুরু করে তারপর পরীক্ষা মনে করো ভগবান হয়তো এমন কিছু নির্ধারণ করতে যাচ্ছেন যা তোমার ধারণার বিপরীত। তখন তুমি বলবে, "বেশ তো দেরি, তিনি যা ছেড়ে দিতে বলবেন আমি তৎক্ষণাৎ তা অনায়াসে ছাড়তে পারি কিনা"—এই কথা মনে করবামাত্র যেই দেখবে যে ওতে মনের মধ্যে একটু যেন "খোঁচ" খাচ্ছে, তখনই নিজেকে শুনিয়ে বলবে, "না, এখনও আমার পুরো সমর্পণ হয়নি, ভিতরে যখন একটুও কুঁচকে যাচ্ছে..."

(মা আবার পড়লেন শ্রীঅরবিন্দের চিঠিগুলি থেকে)—"একদিকে রয়েছে অতিমানস সিদ্ধি, মানসোত্তর ভগবানের সর্বগ্রাহী শক্তির অবতরণ, জগতে এতাবৎ অনায়ত্ত সর্ববৃহত্তম সত্যের জ্যোতি ও তীব্রতেজ, মানবমন ও তার যুক্তিবুদ্ধির কাছে যতটুকু স্থায়ী বাস্তব আর অতিরিক্ত এমন কিছু যার প্রকৃতি ও প্রকাশরীতি সম্বন্ধে কোনো ধারণা বা আন্দাজ করতে ও তার ক্ষুদ্র আদর্শ দিয়ে বিচার করতে সে অপারগ; সেই জিনিস শত বাধা সত্ত্বেও এই পার্থিব চেতনা ও স্থূল জীবনের মধ্যে অভিব্যক্ত হবার জন্য অনবরত চাপ দিচ্ছে। আর অন্যদিকে রয়েছে এই নিম্নতর প্রাণপ্রকৃতি, তার যত কিছু অজ্ঞান করা, তার ঔদ্ধত্য, অজ্ঞানতা, মূঢ়তা, অন্ধতা ও হঠকারিতা নিয়ে, সে ঐরূপ আলোর অবতরণের প্রতিরোধ ক'রে নিজেরই সব কিছু আড়াতে থাকে, প্রকৃত বাস্তবকে অর্থাৎ অতিমানস বা অতিমানবীয় চেতনার ও সৃষ্টির সম্ভাবনামাত্রকে অবিশ্বাস করে, অথবা আরো উদ্ভট কথা, যদি বা তেমন কিছু থাকে তবে তা যেন ওরই ক্ষুদ্রতম আদর্শের সঙ্গে মিলে যায়; আর যা কিছু যুক্তির দ্বারা তাকে অপ্রমাণ করা যায় তারই উপর জোর দিয়ে ভগবানের অস্তিত্বকে নাকচ করে দিতে চায়—যদিও সে জানে যে তদ্ভিন্ন কোনো কিছু কাজ হওয়াই অসম্ভব—সে কেবল জোর গলায় জাহির করে আপন চিন্তাধারা ও বিচারকে, আপন কামনা ও প্রবৃত্তিকে, এবং তুমি যদি তার কোনো

প্রতিবাদ করো তাহলে তার সংশয়বুদ্ধি, বিরুদ্ধ সমালোচনা, অস্বীকৃতি, বিদ্রোহ প্রভৃতির সাহায্যে তাকে খণ্ডন করতে থাকে। এই দুইরকম আছে যার থেকে প্রত্যেককেই বেছে নিতে হবে।

কারণ দিব্যসত্যের অবতরণের বিরুদ্ধে ব্যর্থ প্রতিরোধ ও অবরোধ কখনো চিরদিনের জন্য চলতে পারে না। প্রত্যেককেই বেছে নিতে হবে এক দিক বা অন্য দিক, হয় সত্যের দিক নতুবা তার বিপরীত দিক। অতিমানসের দীপ্তি কখনো নিরুত্তর অজ্ঞানতার অন্ধকারের সঙ্গে একত্রে থাকতে পারেনা; ঐরূপ দ্বৈতভাব নিয়ে থাকলে প্রকৃতির মধ্যে একটা অসংগতি এসে পড়ে।"

প্রশ্ন নিম্নপ্রকৃতি যদি সম্পূর্ণ অজ্ঞানই হয় তাহলে সে "বেছে নেবে" কেমন করে?

উত্তর অতটা পরিপূর্ণভাবে অজ্ঞান তো সে নয়; কোথায় কিসের অভাব হচ্ছে সে বোধ তার আছে। তারই উপরে সব কিছু নির্ভর করে। অবশ্য যারা আপন বর্তমান অবস্থাতেই সন্তুষ্ট তাদের বদলাতে চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই, কারণ তারা তা চাইবে না। তবে প্রকৃতপক্ষে নিম্নপ্রকৃতির মধ্যেও যদি এ বোধটুকু থাকে যে বর্তমান অবস্থাকে এর চেয়ে আরো ভালো করা যায়। যেমন, কেউ যদি অসুস্থ বা দুর্বল অবস্থায় থাকে, সে নিশ্চয়ই চায় ভালো হয়ে উঠতে, যদিও তেমন শক্তি তার নেই; তার উচ্চাভিলাষ আছে কিন্তু সামর্থ্য নেই; সে তখন এই কথা বলে, "এর চেয়ে একটু ভালো যদি হতে পারতাম, একটু বেশি কিছু যদি জানতাম, একটু বেশি সবল যদি হতাম, যদি বুঝতে পারতাম যে আমার পক্ষে কি করা দরকার..."। কিংবা মনে করো যার উপার্জন কিছু বাড়ানো দরকার, যেমন কাজ সে করছে তাতে যা উপার্জন হচ্ছে ওতে তার কুলোয় না, তখন সে খুব মুশকিলে পড়ে; অর্থ সমস্যার সমাধান করতে না পেরে সে তখন ভাবে, "আমি এখন কি করি?" সে কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না; তথাপি সেই মূঢ়তার মাঝেও এই চিন্তাটি তার মনে থাকে যে এর চেয়ে আরো একটু স্পষ্ট করে যদি কিছু দেখতে পেতাম ও জানতে পারতাম, যদি একটু দূরদৃষ্টি পেতাম তাহলে ভালো হতো। ওর থেকেই তার মনে একটা আস্পৃহা আসে কিছু উন্নতির জন্য—এবং তার থেকেই হয় বেছে নেওয়া জিনিসটার সূত্রপাত। কে যেন বলেছিল যে কুকুরমাছি যদি কুকুরের গায়ে বসে না কামড়াতো, তাহলে কুকুরটা অসাড়ে জড়বৎ হয়ে মাটিতে শুয়েই থাকত, আদৌ নড়াচড়া করত না। মাছি কামড়ে তাকে বিরক্ত করছে বলেই সে চঞ্চল হয়ে উঠে মাঝে

মাঝে গা ঝাড়া দিয়ে চুলকোচ্ছে, ওতে তার 'তামসিক' অসাড়তা ছেড়ে গিয়ে তাকে জাগিয়ে রাখছে। মানুষের বেলাতেও তেমনি। তার কামনা পূরণ হয়না বলেই জড়ভাব থেকে নাড়া দিয়ে অভাবটা তাকে জাগিয়ে রেখে দেয়, কষ্ট পেয়েই সে তার সমস্যার সমাধান খোঁজে। এমনিই হয়ে থাকে। পুরো অচেতনা, পুরো অজ্ঞানতা, সম্পূর্ণ পিছনে অন্ধকার বলে কিছু নেই। সকল রকম অচেতনা ও অজ্ঞানতা ও অন্ধকারের রয়েছে সেই ঐশ্বরিক আলো, যা সর্বত্র সর্বব্যাপী। তার সংস্পর্শ ঘটার পক্ষে সামান্য একটু কিছু হলেই যথেষ্ট।

প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর চিঠির গোড়ার দিকে লিখেছেন, তিনি "আগেকার প্রাচীন ব্যর্থতার নতুন একটা পালার অনুমোদন করতে চাননা।" এই "ব্যর্থতা" মানে কি তা সাধারণ অর্থে অথবা কোনো বিশেষ অর্থে ?

উত্তর এটা তিনি বলেছেন জগতে পূর্বে পূর্বে যত শিক্ষাগুরুরা এসেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে। একজন বললেন, "আমি এনেছি প্রেম," আর একজন বললেন, "আমি এনেছি শান্তি," আর একজন বললেন, "আমি এনেছি মুক্তি"। তাতে ভিতরের দিকের কিছুটা পরিবর্তন হলো, চেতনাতে কিছু জাগলো, কিন্তু বাহিরের দিক যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল। তাকেই বলা হচ্ছে ব্যর্থতা।

প্রশ্ন : ভিতরের অনুভূতি ও উপলব্ধি কি বাহিরের পরিবর্তনে সাহায্য করেনা ?

উত্তর না করতেও পারে। তুমি যদি সেটা চাও তবেই তা হতে পারে, নতুবা এই হয় যে ওতে তুমি উত্তরোত্তর আপন বাহ্যপ্রকৃতি থেকে তফাৎ হয় যাও। যারা কেবল মুক্তি চায় তাদের বেলাতে তাই হয়। তারা তাদের বাহ্য প্রকৃতিটাকে ঘৃণা ও অভ্যাসাদি সমেত তাকে বর্জন করে,—তারা বলে যে ওর দিকে নজর দেবোনা, এই বলে তার চরিত্র তাদের সমস্ত উদ্যম ও চেতনাশক্তিকে বাহিরের দিক থেকে গুটিয়ে এনে উপরের দিকে পাঠায়; আর এটা যদি শেষ পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে করতে পারে তাহলে অবশেষে দেহকে তারা ত্যাগই করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা কেবল আংশিক মাত্রই হতে পারে, তখন যেমনি তারা তাদের ধ্যান বা তন্ময়তা বা সমাধির অবস্থা হতে সাধারণ অবস্থায় বেরিয়ে আসে অমনি সেটা অন্যদের চেয়ে আরো বেশি খারাপ হয়, কারণ বাহ্যপ্রকৃতির দিকটা তারা আপাগোড়া অবহেলাই করেছিল।

এমন কি সাধারণ মানুষরাও নিজেদের কিছু দোষত্রুটি থাকলে তার যথাসাধ্য সংশোধন করে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করে, যাতে জীবনের ক্ষেত্রে অসুবিধায় না পড়তে হয়, কিন্তু এরা দেহটাকে তুচ্ছ ছেঁড়াপোষাক মাত্র জ্ঞান ক'রে তার এবং তার বাহ্য চেতনার দিকটা ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল তাদের "আধ্যাত্মিক চূড়ান্তে", তার পরে আবার সেই ছেঁড়াপোষাকে যখন ফিরে আসে তখন তার মধ্যে অনেক ফুটোফাটা বেরিয়ে পড়ে।

এতে কিছু কাজ হয়না। তখনই কাজ হতে পারে যখন তুমি আমূল পরিবর্তন চাও; পরিবর্তনের জন্য একটা আন্তরিক ইচ্ছা, এটাই খুব সহায়ক, কারণ সেরূপ পরিবর্তনের জন্য তোমার মধ্যে উদ্যোগ আসে। সেই ইচ্ছাটি তোমার মধ্যে থাকা চাই।

*

এপ্রিল ২৩, ১৯৫১

প্রশ্ন: শ্রীঅরবিন্দের "দিব্য অতিমানব" (Divine Superman) থেকে পড়ে—

শ্রীঅরবিন্দ এখানে বলেছেন "তোমার আপন চূড়ান্তে গিয়ে ওঠা চাই",—সে চূড়ান্ত কি সকলের পক্ষেই এক না প্রত্যেকের পক্ষে আলাদা?

উত্তর: শেষ পর্যন্ত দেখতে গেলে চূড়ান্ত সেই একটাই—সকল কিছুর উত্তরে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্—কিন্তু প্রত্যেককে উঠতে হবে তার আপন আপন পথের চূড়ান্তে, অর্থাৎ তার আপন প্রকৃতি ও পদ্ধতি অনুসারে বিভিন্নরূপে নিজের মধ্যে সেই একেরই বিকাশ ঘটাবে। এই কথাই আমরা সেদিন বলছিলাম যে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনে ও তাঁকে অভিব্যক্ত করাতে প্রত্যেকেরই একটি বিশিষ্ট পন্থা আছে যা তার নিজস্ব। তুমি অপর কারো পন্থাকে অনুসরণ করতে যাবেনা। নিজের ভাবে নিজের রাস্তা ধরে তুমি যাবে চূড়ান্তের দিকে, যদিও সে সেই একই চূড়ান্ত। সকল চূড়ান্তের শেষে একই চরম লক্ষ্য—কিন্তু তোমাকে চলতে হবে তোমার নিজের রাস্তায়। তোমার পাহাড় আলাদা, সে অন্যের পাহাড় নয়।

[মা শ্রীঅরবিন্দের অন্য একটি লেখা "পন্থা" (The Way) থেকে পড়ে শোনালেন—]

"পথটি নিতান্ত সহজ ভেবোনা ; এ পথ অতি দীর্ঘ, দুরারোহ, দুষ্কর, দারুণ বিপদসঙ্কুল। এর পদে পদে অপ্রত্যাশিত বাধাবিঘ্ন, বাঁকে বাঁকে চোরা খানাখন্দ। হাজার রকমের দৃশ্য ও অদৃশ্য শত্রুরা তোমাকে তাড়া করবে, যেখানে একটু অজ্ঞানতার সন্ধান পাবে সেখানে তারা অতীব ক্রূর, যেখানে তুমি দুর্বল সেখানে তারা ক্ষমতায় ভীষণ। আর অনেক কষ্টে যেমনি তাদের বিনাশ করতে সক্ষম হবে, অমনি সেখানে আরো নতুন কত হাজার হাজার এসে জড়ো হবে।"

এ কথা বলা হয়েছে তোমাদের সাহস দেবার জন্য, যাতে অদম্য উৎসাহ নিয়ে চলতে পারো। তোমাকে সদাসতর্ক থাকতে হবে, ইচ্ছায় জোর রাখতে হবে, যাই কেন ঘটুক। গোড়া আর শেষ এই দুই প্রান্তকে যদি মিলিয়ে দিতে পারো তবেই জিনিসটা সম্পূর্ণ হবে।

প্রশ্ন : অচেতনার মধ্যে চেতন থাকি কেমন করে ?

উত্তর : সর্বদা দুঁশিয়ার সজাগ হয়ে।

প্রশ্ন : আর যখন ঘুমিয়ে থাকব ?

উত্তর : ঘুমের মধ্যেও চেতন থাকা যায়, তা আগে বলেছি। তখনও ক্রিয়া চলবে।

প্রশ্ন : তাহলে প্রকৃতপক্ষে তা ঘুমই নয়।

উত্তর : একেবারেই না, তুমি কেবল অসাড়ে স্থির হয়ে থাকো, চঞ্চল হয়ে ছটফট্ করোনা। অনেকে ঘুমের মধ্যেও এমন কাণ্ড করে যে ঘুম থেকে উঠে আগের চেয়েও ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। সে কথাও আগে বলেছি। তবে যদি তুমি একেবারে ঘুমিয়ে থাকতে না চাও তাহলে তুমি তেমনভাবে ঘুমোবেনা। যাদের ঘুম আসেনা তাদের আমি বলি, "ধ্যান করতে থাকো, তাহলে অবশেষে একসময় আপনিই ঘুমিয়ে পড়বে।" যেমন তেমন ভাবে শুয়ে পড়ে কোথায় আছি তা পর্যন্ত না জেনে এলোমেলো বা তা ভাবতে থাকার চেয়ে একটা একাগ্রতার ভাব এনে পরে ঘুমিয়ে পড়া অনেক ভালো। ঘুমোতে হলে ভালো করে ঘুমোতে জানা চাই।

যদি দেহে খুব ক্লান্ত হয়ে থাকো, তবে তখনই ঘুমোতে যাওয়া ঠিক নয়। তাতে চেতনাশূন্যতা ঘটতে পারে। প্রথমে বিছানায় শুয়ে হাত পা একেবারে এলিয়ে দেবে, দেহের স্নায়ুগুলি এমন শিথিল করে দেবে যেন তুমি কাপড়ের ন্যাতার মতো হয়ে গেছ, তোমার দেহে যেন হাড়গোড় মাংস নেই। তারপর মাথার মধ্যেও শৈথিল্য আনবে,

কোনো চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকা নয়, কোনো সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা নয়, সারা দিনে মনের উপর যা কিছু ছাপ পড়েছে তাই নিয়ে ভাবা নয়। সব কিছুকে ছটিয়ে দিয়ে শান্তভাবে শিথিল বস্ত্রখণ্ডের মতো বিছানাতে নিজেকে বিলীন করে দেবে। এমন যখন ঠিকভাবে করতে পারবে তখন দেখবে যে ভিতরের দিকে সামান্য একটু শিখা জ্বলছে—সেটি কখনো নেভেনা ; নিজেকে সম্পূর্ণ শিথিল করে দিলে সেটিকে তুমি দেখতে পাবে, দেখবে যে সেই শিখাটি ধীরে ধীরে আত্মীয়তা নিয়ে উঠে চলেছে দিব্যজীবন ও দিব্যসত্য ও ভগবৎচেতনার দিকে, তোমার আভ্যন্তর সত্তার সঙ্গে মিলে গিয়ে ; দেখবে যে অতি ধীরে ধীরে সে নিজেকে ছাড়িয়ে উপরে উঠছে। এই সময়ে যদি ঘুমিয়ে পড়ো তাহলে ঘুমটি হবে চমৎকার। যত্ন সহকারে এই অভ্যাস করলে আমি নিশ্চয় বলতে পারি যে তুমি শান্তভাবে ঘুমিয়ে পড়বে, অন্ধকারের মধ্যে নয় কিন্তু আলোর মধ্যে, আর সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবে যে সকল অবসাদ ঘুচে গিয়ে তুমি স্ফূর্তিতে ভরা হয়ে উঠেছ, সারাদিন কাজ করবার মতো পুরো উদ্যম সঞ্চয় করেছ।

প্রশ্ন : ঘুমের মধ্যে যখন চেতনা থাকে তখন মস্তিষ্ক কি ঘুমিয়ে থাকে ?

উত্তর কখন মস্তিষ্ক ঘুমোয় ? মস্তিষ্ককে ঘুম পাড়ানো সব চেয়ে কঠিন কথা। যদি তা পারো তাহলে খুবই ভালো। ভবঘুরের মতো সে অনবরতই ঘুরতে থাকে। সেই কথাই আমি বলেছিলাম, মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেওয়া সম্পর্কে। যদি তোমার মস্তিষ্ককে বিশ্রামের মধ্যে নীরব করে রাখতে পারো, তাহলে সেটা খুবই প্রশংসনীয়। পাঁচ মিনিটের জন্যও যদি তা করতে পারো তাহলে ওর পরে বেশ চাঙ্গা বোধ করবে, আর তখন অনেক কিছু সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

প্রশ্ন মস্তিষ্ক যদি সকল সময়েই কাজ করে, তাহলে রাত্রে কি কি হয়েছে সে কথা আমাদের স্মরণ থাকেনা কেন ?

উত্তর তার কারণ তখনকার চেতনার ক্রিয়াকে তুমি ধরতে পারোনা। তা ছাড়া রাত্রে কি কি ব্যাপার ঘটেছে তা যদি জেগে উঠে স্মরণ করতে তাহলে হয়তো ভয়ে আঁতকে উঠতে। তখন যা হয় তা পাগলা গারদের ব্যাপার—উদ্ভট যত ধারণা পরস্পরে গুঁতোগুঁতি করছে, মাথার মধ্যে মহা সোরগোল বেধে গেছে ; যেন চারিদিক থেকে তুমি বল্ লোকালুফি করছ। সে জিনিস জাগ্রতে স্মরণ করলে তুমি ব্যাকুল হয়ে পড়বে।

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দ এখানে লিখেছেন—"জ্যোতির্ময় সত্তাগণ খুব কমই আমাদের সাহায্যকল্পে বা উদ্ধারকল্পে আসতে ইচ্ছুক হন বা খুব অল্পক্ষণের জন্যই আসবার অনুমতি পান।" তা কেন?

উত্তর : এ কথা তাদেরই জিজ্ঞাসা করতে হয়। কিন্তু ওর শেষের দিকে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে ওর ব্যাখ্যা স্পষ্টভাবেই রয়েছে : "অমরত্ব কি ছেলেদের হাতে তুলে দেবার মতো খেলার জিনিস, দিব্যজীবন কি অপ্রয়াসে অনায়াসে মিলে যেতে পারে, না দুর্বলের মাথায় রাজকিরীট পরানো যায়?"...এর থেকেই প্রশ্ন জাগে যে বিরোধী শক্তিদের অনুমতি বা প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে কেন তোমাদের এত বিব্রত করে তুলতে? তোমাদের বাচাই করবার জন্যই তা দেওয়া হয়েছে। রাস্তা যদি সোজা ও সহজ হতো তাহলে সকলেই অক্লেশে লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পৌঁছে যেতো, আর তোমরা আগেও যেমন ছিলে পরেও তেমনি থাকতে, কোনো পরিবর্তনই ঘটত না। অর্থাৎ সারা জগৎ তাহলে নতুন না হয়ে পুরোনোর মতোই থেকে যেতো। তাতে কোনো লাভ হতো না। এর থেকে অনেক কিছু বাদ দিয়ে দেবার মতো ক্রিয়াগুলি হওয়ার দরকার, যাতে নতুন জীবনের অভিব্যক্তির পক্ষে যতটা বা গ্রহণযোগ্য তাই শুধু থেকে যায়। এই হলো একমাত্র প্রকৃত কারণ, এ ছাড়া অন্য কারণ নেই। যাকে বলে আগুনে পুড়িয়ে পান দেওয়া, যাতে সমস্ত খাদ পুড়ে গিয়ে বিশুদ্ধ পাকাসোনাটুকু থেকে যায়। সেই খাঁটি জিনিসই তখন সব কিছুকে প্রতিরোধ করতে পারবে। এই হলো কথা। এর মধ্যে যত গণ্ডগোল বাধিয়েছে আমাদের পাপ-পুণ্যের বিচার এবং ধর্মীয় অপরাধবোধ ও মুক্তির সম্বন্ধে ধারণাগুলি। অথচ প্রকৃতপক্ষে ওরূপ কোনো খামখেয়ালি বিচারের ব্যবস্থাই নেই। বরং প্রত্যেকের পক্ষে যার জন্য যেমন সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা হওয়া সমুচিত তাই তাকে দেওয়া হয়েছে। সেদিন আমরা বলছিলাম যে ভগবান তাদেরই উপর খুব কঠোর হয়ে থাকেন যারা তাঁর খুব প্রিয়জন। তোমরা ভাবলে এ বুঝি একটা ঠাট্টার কথা, কিন্তু সত্যই তাই। যারা দৃঢ়চিত্ত থেকে আশা হারায়না, যারা আগুনে পুড়ে শোধিত হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, তাদের বেলাতেই দেওয়া হয় চূড়ান্তের কঠিন সাফল্যে গিয়ে পৌঁছবার মতো কঠিন অবস্থা। আর মানুষের মন এমনভাবে তৈরি যে তুমি এর প্রমাণও পেতে পারো ; খুবই খারাপ রকমের অবস্থা যখন যাচ্ছে তখন যদি বলো "এটা ঠিকই হয়েছে, এমন দারুণ দুর্গতিকে নিতে পারার উপযুক্ত হয়েছি বলেই আমাকে এটি দেওয়া হয়েছে, এতেই প্রমাণ হচ্ছে যে আমার মধ্যে এমন কিছু আছে যা একে কাটিয়ে উঠতে পারবে"—এই যদি বলো তো দেখবে যে দুঃখবোধের বদলে বরং তুমি খুশিই হবে—এত খুশি হবে আর এত বেশি

মনের জোর পাবে যে দারুণ দুঃখকে তোমার মনোরম বলে বোধ হবে। এ তো সোজা পরীক্ষা, অনায়াসেই করে দেখতে পারো। যাই কেন ঘটুক, তোমার মন যদি তাকে অনুকূল জিনিস বলে ভাবতে অভ্যাস করে, তাহলে আর তাকে অপ্রীতিকর বোধ হবে না। এ কথা সর্ববাদীসম্মত যে মন যখন একটা কোনো জিনিসকে নিতে চায়না, তাকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে, ততক্ষণ ভিতরে চলে যত পীড়াদায়ক যন্ত্রণা, তুফান, সংগ্রাম, যত কষ্টবোধ। কিন্তু মন যেমনি বলতে শুরু করে "ও কথা নয়, যেটা আমার হওয়া চাই সেটা এইভাবেই হচ্ছে", তখন যা কিছু হোক তাতেই তুমি খুশি থাকবে। এমন লোকও আছে যারা মনের উপর এতখানি আধিপত্য অর্জন করেছে যে ওগুলোকে আদৌ অনুভবই করেনা। সেদিন তোমাদের বলছিলাম এমন সব গুহ্যপন্থীদের কথা, তারা যদি মনে করে যে ঐসব কষ্টগুলো মেনে নিতে পারলে মুহূর্তেই তারা উপরের ধাপগুলোকে অতিক্রম করে সিদ্ধিতে গিয়ে পৌঁছতে পারবে, অর্থাৎ চরম লক্ষ্যে পৌঁছে ভগবানের সঙ্গে মিলতে পারবে, তাহলে তারা কোনোরকম কষ্টকেই কষ্ট বলে জ্ঞান করেনা। তাদের মনের সেই দৃঢ়বদ্ধ বিশ্বাস যেন দেহটার উপর গলানো ধাতুর প্রলেপাবরণ মাখিয়ে দেয়। এমন প্রায়ই দেখা গেছে, যারা খুব উৎসাহী তাদের মধ্যেও অনেকের এমন হয়ে থাকে। আর মৃত্যুর প্রশ্নটা সম্পর্কে, কোনো কারণে যদি এক দেহ ছেড়ে অন্য এক দেহ ধারণের দরকারই হয়, তাহলে মৃত্যুকে একটা উৎকট রকমের পরাজয় না ভেবে বরং তাকে একটা অভীষ্ট গৌরবের জিনিস মনে করাই কি ভালো নয়? জীবনকে যারা আঁকড়ে থাকে, মৃত্যুকে দুই এক মিনিটের জন্য এড়াতে পারলেও তাই চায়, আর এমন ভাব দেখায় যেন মৃত্যু অতি ভয়ানক রকমের দুর্বহ জিনিস, তারা তাদের আত্মাকে না জানাতেই অমন ক'রে থাকে।... বস্তুতপক্ষে এ ঘটনাকে একটা পরিবর্তনের প্রণালী হিসাবেই ধরে নেওয়া উচিত, এবং তখন জ্ঞান থাকলে অন্যান্য জিনিসের মতো এটিকেও এক সুন্দর জিনিসে দাঁড় করাতে পারো। আর দেখবে যে, মৃত্যুকে যারা ভয় করেনা, আদৌ গ্রাহ্যই করেনা, উৎকট কিছু না ভেবে যারা সহজে মরতে পারে, তারা কখনো এ নিয়ে চিন্তা করতেই যায়না, "বিভীষিকা" ভেবে তার হাত থেকে পালাতেও চায় না, তফাতে সরিয়ে রাখতেও চায় না। সময় উপস্থিত হলে তারা মাথা তুলে একটু হেসে বলে, "এই যে আমি তৈরি"।

আর তারাই তাদের জীবন থেকে যতটা সম্ভব কাজ আদায় করে নিতে চায়। তারা বলে, "যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবার ততক্ষণ তো থাকবই, একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করতে এক মিনিটও বিরত থাকব না। এর মধ্যে একটা মিনিটও নষ্ট হতে দেব না।" আর তারাই প্রয়োজনের সময় সব চেয়ে ভালো

কাজের পরিচয় দেয়। তার কারণ কি? সোজা কথা, তারা চলে তাদের আপন আদর্শ অনুযায়ী ও আপন সত্য অনুযায়ী, সেটাই তাদের কাছে সব চেয়ে প্রকৃত বাস্তব, তাদের অস্তিত্বের তাই মূল হেতু, আর সব কিছুর মধ্যেই তারা সেই আদর্শের দিকে ও সেই হেতুর দিকে স্থিরলক্ষ্য রাখে, স্থূল জীবনের তুচ্ছ হীনতার মধ্যে তারা নামে না।

তাহলে পরিশেষে আমাদের এই বক্তব্য :

মৃত্যুকামনা করবেনা, কখনই না।
মৃত্যুভাবনা করবে না, কখনই না।
মৃত্যুভয় করবে না, কখনই না।

সকল অবস্থাতেই নিজেকে উত্তরণ করতে ইচ্ছা করবে।

প্রসঙ্গত

১১৮

নির্জনতা পছন্দ করা জ্ঞানলিপ্সার লক্ষণ ; কিন্তু জ্ঞান তখনই আয়ত্তাধীন হতে পারে যখন ভিড়ে বা হাটে বা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েও ভিতরের নির্জনতা অবিচল থাকে।

১১৯

যখন বিস্তর কাজ ক'রে আর বিপুল সাফল্য পেয়েও তোমার মনে হতে থাকবে যে তেমন কিছুই তুমি করোনি, তখন জানবে যে ভগবান তোমার চোখের পর্দার উপর থেকে তাঁর সিলকরা মোহরটা উঠিয়ে নিয়েছেন।

১২০

যখন একাকী স্থির হয়ে বসে পর্বতচূড়ার মতো নীরব নিশ্চল থেকেও তুমি দেখবে যে তোমার নিশ্চলতার থেকে স্পন্দনতরঙ্গ উঠছে, তখন জানবে যে তোমার দিব্যদৃষ্টি মিলেছে, আপাতস্থূল দৃষ্টির গণ্ডী থেকে তুমি মুক্ত হয়েছ।

১২১

নিষ্ক্রিয়তা কামনা করাও ভুল, নিষ্ক্রিয়তাকে হেয় বলাও ভুল ; নিষ্ক্রিয়তা জিনিসটা হতেই পারেনা। বালুরাশির মধ্যে যে পাথরখানা পড়ে আছে, কেউবা হেলাভরে তাকে পা দিয়ে ঠেলে যাচ্ছে, সেটাও জগৎগোলার্ধে তার ক্রিয়াফল যোগাচ্ছে।

ঠিক এমনি অনুভূতিই আজকাল আমি পাচ্ছি, কাল কিংবা পরশুও পেয়েছি। সে এই অনুভূতি যে এক অনিবার্য শক্তিই সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করছে : এই জগৎকে, সকল মানুষকে, সকল কিছুকেই নড়াচ্ছে অথচ তার নিজের নড়বার দরকার হচ্ছেনা ; আর বাস্তবের এই অতিবাস্তব তৎপরতা কেবল তারই বুদ্বুদায়িত ফেনা মাত্র, ক্ষিপ্রস্রবাহ জলরাশির উপর যেমন গাদাগাদা বিস্ফারিত ফেনা ভেসে ওঠে—কিন্তু তলে তলে থাকে প্রবল শক্তিতরঙ্গ।

এ ছাড়া অন্য কিছু বলার নেই।

এখানে সেই কথাতেই ফিরে আসতে হয় : জানা ভালো ; বলা ভালো ; করা আরো ভালো কিন্তু আসল শক্তি হলো 'হওয়া'।

তোমরা দেখবে, লোকে অস্থির হয়ে বলে, কই তাড়াতাড়ি কিছুই তো হচ্ছেনা ; কিন্তু আমি অন্তর্দৃষ্টিতে দেখছি তলে তলে দিব্যসৃষ্টির গঠনকার্য হয়ে চলেছে সর্বশক্তিতে, অনিবার্য অপ্রতিহতগতিতে, এত সব বাহ্য গণ্ডগোল থাকা সত্ত্বেও।

প্রশ্ন কিন্তু এই প্রবল শক্তিতরঙ্গ, এর প্রকাশের তো কিছু যন্ত্র চাই ?

উত্তর : তা ঐ মস্তিষ্ক।

প্রশ্ন : কিন্তু শুধু তো মস্তিষ্কই নয়। মন বা অতিমানসের স্তরকেও শক্তি নিজেকে প্রকাশ করতে পারে, যেমন অতীতে হয়েছিল ; প্রাণের স্তরকে তেজ রূপেও তার প্রকাশ হতে পারে, মাংসপেশীর মাধ্যমেও প্রকাশ হতে পারে ; কিন্তু সরাসরি কেবল স্থূলভাবে তার প্রকাশ ঘটবে কি (আপনি যেমন প্রায়ই বলেন "বাস্তব শক্তি") ? উপরের দিকের ক্রিয়া আর এখানকার ক্রিয়ার মধ্যে কি তফাৎ ?

উত্তর : ঐ শক্তি সম্বন্ধে আমার যে অনুভূতি মিলেছে তা প্রত্যেকবার একই রকমের। উপরের ইচ্ছা একটা স্পন্দনে রূপান্তরিত হয়ে প্রাণশক্তির আকার নিচ্ছে, কিন্তু তা কাজ করছে সূক্ষ্মদৈহিক স্তরে। যেরূপ স্পন্দন লক্ষিত হয় তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন, তা যেন ঘনীভূত কিছু (বিক্ষিপ্ত নয়), বাতাসের চেয়ে ঘন কিন্তু সমসত্ত্ববিশিষ্ট আর স্বর্গাভ, তার প্রচালিকাশক্তি অতি প্রচণ্ড ও তার দ্বারা একটা প্রবল ইচ্ছা জ্ঞাপন করে (সে ইচ্ছা মানুষের ইচ্ছা বা চিন্তার মতো জিনিস নয়, কিন্তু একটা কল্পনাদৃষ্টির মতো যা ফলতে বাধ্য), এবং তা জড়বাস্তবের রাজ্যের খুব কাছাকাছি হলেও অদৃশ্য, কেবল আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিতে দেখা যায়। এই স্পন্দনই তার নিজস্ব কল্পনাদৃষ্টি অনুযায়ী সর্বত্র সকল মানুষ ও সকল জিনিস ও সকল ঘটনার উপর চাপ দিচ্ছে, আর সে চাপের ক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। এমন কি যারা অন্যরকম কথা ভাবে, অন্যরকম ব্যাপার করতে চায়, তারাও ইচ্ছা না করেও ওর দ্বারা প্রচালিত হয় ; এমন কি যা কিছু তার বিরোধী তারও গতির মুখ ঘুরে যায়।

জাতীয় জীবনের ব্যাপারে, বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে, জাগতিক ঘটনাবলীর ব্যাপারেও তা ঐভাবে ক্রিয়া করে। নিত্যই সে ক্রিয়া করছে অদম্য এক শক্তি-রূপে। আর যার ভগবৎ-ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্য ও মিলন ঘটে গেছে, সে কোনো চিন্তা বা ধারণা না করেই তাকে জানতে, দেখতে এবং অনুসরণ করতে পারে।

পার্থিব চেতনার ও জড়প্রকৃতির তরফ থেকে জাড্যের যে বাধার সৃষ্টি হয়, তার দ্বারা এই হয় যে ঐ স্পন্দনের ক্রিয়া সরাসরিভাবে সাবলীল ও সুসমঞ্জস হবার বদলে তা হয়ে পড়ে আচ্ছন্ন, দ্বন্দ্ববিরোধ-কণ্টকিত ও শৃঙ্খলাচ্যুত; অর্থাৎ "স্বাভাবিক" প্রকারে বিনা প্রতিরোধে সব কিছু সুব্যবস্থিত না হয়ে (যা হওয়া উচিত ছিল) ঐ জাড্যের বাধা পেয়ে তার ক্রিয়া হয়ে পড়ে আবিল, অব্যবস্থিত ও অবলুপ্ত। কিন্তু এটা যে বাস্তবিক অপরিহার্য ছিল এমন কথা নয়। কারণ সেই ইচ্ছাশক্তি বাস্তবিক সঙ্গতিকারক ও নিখুঁতভাবে সব কিছুকে আশ্চর্যরূপে রক্ষিত করে; সেই জ্যোতির্ময় শক্তি নেমে আসে তার পূর্ণ গঠন প্রবর্তনা নিয়ে, অন্তর্দৃষ্টি থাকলেই তা দেখা যায়, কিন্তু যেমনি তা জড়ের উপর চাপ প্রয়োগ করছে অমনি নীচের দিক থেকে এর প্রতিরোধ ঠেলে উঠছে। সুতরাং দিব্যশক্তির দিব্যক্রিয়ারই উপর বিশৃঙ্খলার দোষ চাপানো, এটা মানুষেরই বোকামি। এই যে জাড্য (ও তার বিরুদ্ধ ক্রিয়া) এর দ্বারাই তার কাজে বিঘ্ন ঘটছে। সুতরাং বর্তমান বিপর্যয়াদি যে ইচ্ছিত তা নয়, এমন কি পূর্বদৃষ্টও নয়, বস্তুত সবই প্রতিরোধের ফল।

তবে ওর সঙ্গে কৃপার কাজও এসে যোগ দেয়। তাতে প্রতিরোধের কুফল অনেকটাই কেটে যায় যেখানে সম্ভব হয়, অর্থাৎ যেখানে কৃপা স্বীকৃত হয়। এই কারণেই বলা হয়ে থাকে যে আশ্পৃহা, আস্থা, পূর্ণ নির্ভরতা প্রভৃতি যেগুলি পার্থিব মানবসত্তার দিক থেকে উদ্ভূত হয়ে ওঠে তারও একটা বিশেষ গঠনশক্তি থাকে, কারণ তারই জোরে কৃপাও সক্রিয় হয়ে বাধাবিঘ্নকে ও তার কুফলকে শুধরে দেয়।

এই অন্তর্দৃষ্টি খুবই স্পষ্ট, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও সবিস্তারে লক্ষিত।

এমন কি যতটা দেখেছি তার থেকে ভবিষ্যদ্বাণীও করতে পারি। কিন্তু পরম ভগবৎ-কৃপায় তা অভিপ্রেত নয়, কারণ সত্যবাণী মাত্রেরই অভিব্যক্ত হবার একরূপ শক্তি আছে, এবং এই সব প্রতিরোধের ফল শেষ পর্যন্ত কি হবে তা ব্যক্ত করলে আগের থেকে তা ছকে দেওয়া হবে, তাতে কৃপার কাজকে খর্ব করা হবে। সেই কারণে দেখতে পেলেও তা বলা চলে না, বলা উচিত হয় না।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এখানে বলতে চেয়েছেন যে সমস্ত কিছু ঘটছে ঐ শক্তিরই দ্বারা। যখন তাকে দেখতে পাই এবং একাগ্র হয়ে যখন তাকে জানতে পারি, তখন সুনিশ্চিত হই যে সেই হলো একমাত্র অস্তিত্বীয় জিনিস যা তাবৎ সব কিছু ক্রিয়া করছে ও সৃষ্টি করছে; আর বাকী যা হচ্ছে তা জগতের বা জড়ের বা বস্তুবাস্তবের তরফের প্রতিরোধের ফল, সেগুলি মূলের ক্রিয়া নয়। এবং তার সঙ্গে মিলিত হওয়া মানে তার ক্রিয়ারই সঙ্গে মিলিত হওয়া; নীচের দিকের সঙ্গে মিলিত হওয়া মানে তার প্রতিরোধের সঙ্গে মিলিত হওয়া। যে তা হয় সে তখন ঘুঁতঘুঁত করে, অস্থির হয়ে ঘুরতে থাকে, নানারূপ ইচ্ছা করতে ও

ভাবতে থাকে, নানা মতলব আঁটতে থাকে, ভাবে যে আমি কিছু করছি...তার মানে সে প্রতিরোধের কাজই করছে।

এর পরে (কিছুদিন বাদে) আমি ছোটোখাটো ব্যাপারের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাতে পারব যে কেমন ভাবে ঐ শক্তি ক্রিয়া করছে, কিসে তাকে বাধা দিচ্ছে ও কিসে তার মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটাচ্ছে ঐ শক্তির দ্বারা কি হচ্ছে ও কিসে তার কাজকে বিকৃত করছে, এবং বাইরে তার ফল আমাদের চোখে কেমন দেখাচ্ছে। পার্থিব দিক দিয়ে যার কোনো গুরুত্ব নেই এমন সামান্য সামান্য দৃষ্টান্ত থেকেও বোঝা যাবে যে কেমন করে সব কিছু তৈরি হচ্ছে আর সব কিছুই এখানে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে।

আর একথা প্রযোজ্য সব জিনিসের বেলাতেই, সব সময়ে সর্বত্রই তাই। যখন দেহ-কোষের যোগ করা হয় তখন প্রত্যক্ষ হয় যে : উচ্চশক্তি তার ক্রিয়া ঠিকই করছে, কিন্তু তার পরে (যা হাসলেন) দেহ সে ক্রিয়ার পরিণাম কি ঘটাচ্ছে।

(নীরব থেকে)

সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন আসে কেন ও কেমন ক'রে। কিন্তু সেটা মনের ঔৎসুক্যের অন্তর্গত, আসল জিনিস হলো প্রতিরোধ নিবারণ। সেটাই জরুরী, যাতে বিশ্ব তেমনই হতে পারে যেমন তার হওয়া উচিত, একটা পরমাশ্চর্য জ্যোতির্ময় ও সঙ্গতিপূর্ণ শক্তির ও অনুপম সৌন্দর্যের বিকাশ। প্রতিরোধ থামাবার পরে যদি তোমার কৌতূহল হয় যে কেন এমন হয়েছে...সে প্রশ্নের আর কোনো গুরুত্বই তখন থাকবে না। কিন্তু এখানকার মতো কেন-র উত্তর খুঁজে সমস্যার কোনো কিনারা হবেনা, এখন শুধু আমাদের নিতে হবে এর জন্য সমুচিত মনোভাব। সেটাই আসল দরকার।

পূর্ণসমর্পণের জোরে প্রতিরোধের প্রতিরোধ করা, প্রত্যেকটি দেহকোষ সমেত সমগ্রভাবে আত্মদান করা, এই যদি করতে পারো—তখনকার আনন্দের মধ্যে তোমার অস্তিত্বটা থাকবে কেবল তাঁর জন্য, তাঁর দ্বারা, তাঁরই মধ্যে।

এমন অবস্থায় যখন পুরোপুরি আসতে পারবে, তাই হবে সঠিক জিনিস।*

জুলাই ৬, ১৯৬৬ শ্রীমা

---

* Bulletin of S. A. I. C. E. থেকে। অনুবাদক—পরমপতি চট্টোপাধ্যায়

পথের কথা

মে ১৮, ১৯৬৬

তোমরা এ সব ওষুধের কথা কি শুনেছ? (মা বলছিলেন L.S.D. নামক একটি ওষুধের কথা, যার ব্যবহারে মাথার মধ্যে একটা মস্তিষ্কের মতো অবস্থা এসে পড়ে) এ ওষুধে কিরূপ কাজ হয় তার কোনো চিত্র দেখেছ কি? আমি দেখেছি। ওতে মানুষ সম্পূর্ণ নিরবলম্ব হয়ে প্রাণসত্তার সর্বনিম্নে ঝপ্ করে নেবে পড়ে, আর তখন আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে হয় বেজায় ফূর্তি পায় অথবা বেজায় আতংকগ্রস্ত হয়ে ওঠে। যেমন, কেউ হয়তো চেয়ারের উপরকার কুশন্-কভারটা দেখেই ভাবতে শুরু করলে, এটি কি আশ্চর্য এক সুন্দর জিনিস দেখছি। এমন ভাব থাকে দুই তিন ঘন্টা পর্যন্ত, অবশ্য তখন তাদের স্বাভাবিক বোধশক্তি একেবারে লোপ পায়। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে লোকে অমন অবস্থাকেও বলে "আধ্যাত্মিক অনুভূতি"! অথচ আধ্যাত্মিকের সঙ্গে এর সম্পর্কই নেই।

কিছুকাল আগে আমাকে একজন চিঠিতে জানিয়েছিল যে এই ওষুধ সে খেয়ে দেখেছে তাতে অনেক ভয়াবহ দৃশ্য সে প্রত্যক্ষ করেছে; সে দেখলে যে তার ঘরের দেয়ালময় হাজার হাজার বীভৎস ও সয়তানি চেহারার মুখ ক্রমাগত উঁকি মেরে তাকে ভয় দেখাচ্ছে, এটা সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ভাবে চলল। তবেই বোঝো!

আরও এক প্রমাণ পেলাম।....."লাইফ" পত্রিকাতে কতকগুলি ছবি দেখলাম (ফটোগ্রাফ), দেখে মনে হলো এ বুঝি পাগলাগারদের চিত্র। অবচেতনের মধ্যে যে জিনিস থাকে এ তারি বাহ্য চিত্র—যত সব গুহ্য চিন্তা, গুপ্ত মনোভাব, বিচিত্র সংবেদন অবচেতনের মধ্যে ছাপ মারা থাকে, সেগুলি যেন বাইরে বেরিয়ে আকৃতি নিয়েছে। ভিতরে যা লুকিয়ে থাকে তারই বাইরের দৃশ্যমান ছবি।

যেমন, স্বপ্নের মধ্যে তোমরা দেখ কিংবা বোধ করো যে অমুক লোকটা পাজি কিংবা মন্দ, তোমাকে সে দেখতে পারেনা, ইত্যাদি; কিন্তু এর বেলাতে না ঘুমিয়ে জেগে জেগেই সেইরকম সব দেখ! তুমি যে সব কথা কখনো মনে মনে ভেবেছিলে সেইগুলোই বাইরে বেরিয়ে এসে ঐ কাণ্ড করে, সেই সব চিন্তাই আকার ধরে ফিরে আসে। সুতরাং এ হলো একটা নিরিখের মতো; যারা হাসিখুশি ও আনন্দময় ছবি দেখছে, তাদের প্রাণসত্তার ভিতরটা তেমনি আনন্দের অবস্থাতেই ছিল, আর যারা দেখছে ভয় পাবার মতো বীভৎসতা তাদের প্রাণসত্তার ভিতরটাতে ছিল তেমনি বিরূপ বিশ্রী অবস্থা।

প্রশ্ন তা বুঝলাম, কিন্তু তাহলে বাস্তব প্রাণসত্তা বলে কি কিছু নেই, যেখানে অবচেতনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই থাকবে না?

উত্তর আছে, কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য এই জিনিসের সঙ্গে এক নয়।

প্রশ্ন এক নয়?

উত্তর : পুরো চেতন হয়ে তার মধ্যে প্রবেশ না করলে তুমি বুঝতে পারবে না—আপন প্রাণসত্তার মধ্যে আর ঐ প্রাণময় জগতের মধ্যে চেতন থেকে তেমনিভাবে দেখতে হবে, যেমন বাস্তবের জগতে দেখ। তার মধ্যে চেতন অবস্থাতে যাওয়া চাই। তখন তা স্বপ্ন নয়, স্বপ্নের মতোই নয়; তা হবে জাগ্রত তৎপরতা, অভিজ্ঞতা, বা পুরোপুরি আলাদা রকমের জিনিস।

প্রশ্ন : কিন্তু এমন প্রাণময় জগৎ তো আছে যা খুবই ভয়াবহ, যেখানে নিপীড়িত নিগৃহীত হতে হয়, তা নেই কি?

উত্তর তার শতকরা নব্বুইভাগ তোমাদের আত্মকল্পিত।

নব্বুই ভাগই কল্পনার গড়া। একটা বছরেরও বেশি সময় আমাকে প্রতি রাত্রে একই সময়ে একইভাবে বিশেষ কোনো কাজে প্রাণময় জগতে যেতে হয়েছিল, আমি ইচ্ছা করে যাইনি; নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছি কোনো কাজের উপলক্ষে। এই প্রাণজগতে প্রবেশের নানারূপ বর্ণনা আছে: একটা সরু গলিপথ, যেখানে প্রাণময় সত্তারা সব পাহারা দিচ্ছে কেউ যেন ঢুকতে না পায় (গুহ্যতন্ত্রের পুস্তকাদিতে. এই সব কথা আছে); কিন্তু বার বার সেখানে গিয়ে আমি জেনেছি (দৈবাৎ জানা নয়) যে এই সব বাধাসৃষ্টি বা তথাকথিত হিংসাপরায়ণতার নব্বুই ভাগই মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ার ফল, অর্থাৎ যদি তুমি আগের থেকে তার প্রত্যাশা বা আশংকা না করো, অজানাকে ভয় করার বা অমঙ্গল হবার আতংক যদি তোমার মধ্যে না থাকে, তাহলে জিনিসটা মনের মধ্যে ছায়াপাতের মতো বা ভূত দেখার মতোই ব্যাপার, ওর কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই।

তবে হাঁ, দুই একবার আমাকে লড়তে হয়েছে প্রাণের দিক দিয়ে, যখন বিপথগামী কাউকে আমি বাঁচাতে গেছি। দুবার আমি ঘুষোঘুষিও খেয়েছি, সকালে উঠে তার দাগ দেখেছি (মা তাঁর ডান চোখে হাত দিয়ে দেখালেন)। আর ঐ দুবারই আমার নিজেরই কিছু ত্রুটি ছিল—ভয় নয়, ভয় আমি কখনই পাইনি, কিন্তু অমনি কিছুর পূর্বপ্রত্যাশা করেছিলাম। "এমন কিছু হতে পারে" এইরূপ ভেবেছিলাম, তাতেই আঘাতটাও এলো।

এ আমি নিশ্চিত জানি। যদি "স্বাভাবিক অবস্থায়" সহজভাবে থাকতাম ও মনে দৃঢ় প্রত্যয় থাকত, তাহলে কোনো কিছুই আমাকে স্পর্শ করতে পারতনা। অমন প্রত্যাশা করার কারণ কোনো গুহ্যসাধিকা প্রাণরাজ্যে মড়তে যাওয়াতে তার ডান চোখটি নষ্ট হয়েছিল, আর সেই কথাটি আমাকে সে জানিয়েছিল (মা হাসলেন), তাতেই আমার মনে হয়েছিল যে তার যখন হয়েছে তখন আমারও হওয়া সম্ভব। কিন্তু যখন আমি স্ব-অবস্থাতে আছি—"ব্যক্তিগত" কিনা বলতে পারিনা, কিন্তু সত্তার নিজস্ব স্থিতি অবস্থা—যখন প্রকৃতপক্ষে চেতন হয়ে আছি, তখন কোনো কিছু আমাকে স্পর্শ করতেই পারেনা।

এও একটা অনুভূতি যে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে তাকে মারতে উঠলাম, কিন্তু মারটা সেখানে পৌছোচ্ছেনা, যা করতে যাচ্ছি তা বিফল হচ্ছে—এ সব মানসকল্পিত অনুভূতি। তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে, যথেষ্টই আছে।

প্রশ্ন : কিন্তু তাহলে বাস্তবিক জিনিস বলতে কি আছে?

উত্তর : কত কত বিভিন্ন জগৎ, কত সব সত্তা, কত শক্তিধারা, সবেরই নিজস্ব বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে, কিন্তু কথা এই যে তোমার মানবচেতনার কাছে তা কিরূপ আকার নেবে তা নির্ভর করবে সেই মানবচেতনারই উপর।

দেখ বাছা, দেবতাদের সম্পর্কেও সেই কথা। অধিমানসের রাজ্যে যে সকল দেবতারা আছে তারা মানুষের কাছে যে কে কেমন আকার নিচ্ছে তা নির্ভর করেছে তাদেরই চেতনার উপর। তুমি হয়তো...কথায় বলে, "মানুষ হলো দেবতাদের চারণধেনু", কিন্তু তারা যদি তা হতে স্বীকৃত থাকে তবেই। কারণ মানবপ্রকৃতির নিষ্কর্ষের মধ্যে তেমনই এক স্বাভাবিক রকমের স্বতঃস্ফূর্ত ও সার্বভৌম ক্ষমতা দেওয়া আছে—যদি তা কতকগুলো বদ্ধ ধারণা ও তথাকথিত জ্ঞানের প্রভাবে নেকিতে পরিণত করা না হয়।

এ কথা বলা চলে যে মানুষ নিজেই আপন প্রকৃতির বিভিন্নরূপ সত্তাবস্থার সর্বময় প্রভু, কিন্তু সে কথা সে ভুলে গেছে। আপন স্বাভাবিক শক্তিমত্তা সে ভুলেই থাকে। এই ভ্রান্ত অবস্থা নিয়ে সে তাকেই বলে বাস্তব যা তার চোখের পর্দার উপর দাগ কেটে,—তাকেই সে বাস্তবে তর্জমা করে নেয়, কিন্তু...তাও সে ঘটতে দিচ্ছে বলেই হচ্ছে।

দেবতাদের সম্পর্কেও সেই কথা। তোমার জীবনকে তারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, এবং তোমাকে নানারূপ কষ্টও দিতে পারে (যথেষ্ট সাহায্যও দিতে পারে), কিন্তু তাদের তা করবার শক্তি কেবল তোমারই দৌলতে, তুমি তাদের করতে দিলে তবেই তা করতে পারবে। এ কথা আমি ক্রমশ জেনেছি বহু বছরের জানার ফলে। এখন আমি এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ।

মানুষের এই সর্বশক্তিমত্তার কথাটা ভুলে যাবার দরকারই ছিল বিবর্তনচক্রের

মাঝখানে, কারণ ওতে মানুষ দম্ভে ও গর্বে ফুলে ওঠাতে জিনিসটা বিকৃত প্রাপ্ত হলো, তখন তার মাথায় ঢুকল যে তার চেয়ে বেশি প্রবল শক্তি আছে অনেক কিছুতে। কিন্তু মূলত: তা ঠিক কথা নয়। চক্রের অগ্রগতির পথে তাই জানাই আপাতত দরকার হয়েছিল।

মানুষ হলো প্রচ্ছন্ন রকমের দেবতা। কিন্তু সে ভেবেছিল প্রকৃতই সে দেবতা। তখন তার এই শিক্ষার দরকার হলো যে মাটির বুকে চলে বেড়ানো কৃমিকীটের চেয়ে সে বিশেষ বেশি কিছু নয়, আর জীবনও তাকে খুঁড়ে খুঁড়ে খর্ব করে ফেললে, অবশেষে...সে বুঝতে না পারলেও অল্পসল্প ইশারাতে এখন জানছে। যেমনি সে তার স্বস্থানে এসে দাঁড়াবে অমনি জানবে যে সে অপ্রকাশ দেবতা। এখন কেবল এই দরকার যে তাকে প্রকাশ হতে হবে, তার অদেবতাকে উত্তীর্ণ হয়ে।

মানুষের সঙ্গে দেবতার সম্পর্ক খুবই চমকপ্রদ।...যতক্ষণ মানুষ অবাক ও হতবুদ্ধি হয়ে ভাবছে যে ঐ সব বিমানচালকদের কত না জানি আশ্চর্য ক্ষমতা ও আশ্চর্যতর গুণাবলী, ততক্ষণ সে তাদের ক্রীতদাস। কিন্তু যেমনি সে উপলব্ধি করবে যে সেও সেই একই পরাৎপরের অন্যরূপ এক সম্ভূতি, তা ছাড়া আর কিছুনা, দেবতাও যেমন তার থেকেই তৈরি সেও তেমনি তার থেকেই তৈরি, এবং তাকে ঐরকমই শেষ পর্যন্ত হতে হবে, তখন পরস্পরের সম্পর্ক বদ্‌লে যাবে, সে আর তখন এমন ক্রীতদাস থাকবেনা,—বস্তুত সে তো ক্রীতদাস নয়ই।

প্রশ্ন : তাহলে বাস্তবিক জিনিস কিছু বলতে একমাত্র সেই পরাৎপর।

উত্তর : হাঁ হাঁ, বাছা, এইবার ঠিক কথাটি বলেছ। এই খাঁটি কথা।

'বাস্তবিকতা' বলতে যদি বোঝো 'যথার্থ এক স্বাধীন অস্তিত্ব'—যা স্বয়ম্ভূ, স্বরাট, সদ্‌বস্তু—তাহলে সেই পরাৎপর ব্যতীত কিছুই কিছু নয়।

প্রশ্ন : তবু, কিন্তু প্রায় সমস্তই যদি ভাগবত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সেটা তো এক অস্বস্তির কথা হয়ে পড়ে।

উত্তর : ও, কেমন ক'রে হয়?

প্রশ্ন : যেহেতু বাস্তবিক কিছু দেখলেও তা প্রকৃত বাস্তবিক কিনা এই কথা ভেবে ধোঁকা লাগবে। সবই কি তাহলে কল্পনার কাজ? এমন কথা মনে করলেই যে অস্বস্তি লাগে।

উত্তর : কিন্তু যখন এই প্রত্যক্ষ অনুভূতি আসবে যে সেই পরাৎপরই হলো একমাত্র অধিতীয় অস্তিত্ব, আর তিনিই নিজেকে নিয়ে নিজের কাছে এই ভাবে বৈচিত্র্যের খেলা

খেলছেন, তখন আর অস্বস্তি বা সংশয় কিছুমাত্র থাকবে না, তার বদলে বরং নিরাপদই বোধ করবে।

তিনিই একমাত্র বাস্তবিক বাস্তব। আর যা কিছু সমস্তই তাঁর খেলা তাঁর নিজের কাছে। আমার কাছে অন্য মতের চেয়ে এই মতটাই স্বস্তিজনক। আর মোটের উপর এই কথাই সুনিশ্চিত যে সকল কিছুরই একটা অনির্বচনীয় পরিণতি ঘটবে, নতুবা...

আর তাও নির্ভর করছে তুমি যেমন দৃষ্টিভঙ্গী নিচ্ছ তার উপরে। ঐ খেলাকে স্বয়ংসৃষ্ট ও স্বয়ংনির্ভর খেলা বলেই দেখে তার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একাত্ম হওয়া চাই গোড়ার দিকে, যাতে সেই খেলাতে ভালোভাবে যোগ দিতে পারো। পরে একটা সময় আসে যা কেবল নিরাসক্তির, মায়া ও মিথ্যা ভেবে অস্তিত্বের উপর একটা বিতৃষ্ণা, এবং তখন তা অসহনীয় হয়ে ওঠে, যদি সব কিছুকে তাঁর নিজের জন্য নিজের খেলা বলে না দেখা যায়।

তার পরে আসে সেই পূর্ণ মুক্তির অবস্থা, যাতে সকল অসম্ভবের সম্ভাবনাকে বাস্তব বলে ও সমস্ত চরমোন্নতির কল্পনাকে সফল বলে জানা যায়।

(মা ধ্যানস্থ হলেন)

একদিন দেখবে এমন সময় এলো যখন নিজেকে বা নিজের জীবনকে আর সওয়া যাচ্ছে না—যদি এ মনোভাবটি না থাকে যে তিনিই হলেন যাবতীয় সব কিছু। তখন দেখতে পাবে যে এই তো আমাদের পরম প্রভু, কত কিছু সামগ্রীই যে তাঁর রয়েছে আর সেই সব নিয়ে তিনি এমনি ছেলে খেলা খেলছেন—আর খেলতে খেলতে কেবলই খেলার ধারা বদলাচ্ছেন। সমগ্রভাবে এটি দেখতে পেয়ে তার সম্পূর্ণ সীমাবিহীন চমৎকারিত্বে তুমি মোহিত হয়ে যাবে, আর তখন এও জানতে পারবে যে আমাদের শত শত আশ্চর্য আশ্পৃহাও সার্থক হচ্ছে এবং তাও তাকে আরো ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। তখন পাবে অনাবিল শান্তি। নতুবা এই অস্তিত্ব...এর তো কোনো কিছু সান্ত্বনা নেই। কিন্তু ঐভাবে দেখলে তা কত মনোমুগ্ধকর। এ সম্বন্ধে একদিন বলব তোমাদের।

যখন জীবনকে অবাস্তব বলে বোধ করতে থাকো—এবং তার তুলনায় বাস্তব রয়েছে এর উত্তরে, এর উপরের দিকে, এবং জীবনের ভিতর দিকেও, তখন মনে হবে...হাঁ হাঁ, এ যে সত্যি, এও সত্যি হতে বাধ্য। সম্ভাব্য যত কিছু গৌরব গরিমা, যত কিছু অনুপম, দীপ্তিময়, আনন্দময়, মধুময়, সুন্দর, তা এই তো রয়েছে, নতুবা...

আমি এসে গেছি এমনি অবস্থার মধ্যে।

তারপর দেখি, আমার এক পা রয়েছে এখানে আর এক পা ওখানে,—যা খুব আরামের অবস্থা নয়—কারণ...তখন যেহেতু ইচ্ছাই হ'তে থাকবে যে কেবল সেই ছাড়া কোনো কিছু না থাকে।

বর্তমানে যেমন ভাবে সম্ভূতি ঘটছে তা হবে অতীতের জিনিস, এমন আর থাকা চলবে না। তারপর অবশেষে যেমন দাঁড়াবে, হাঁ—তারই জন্য জগৎ টিঁকে আছে।

তাহলে সবই হয়ে দাঁড়ালো সুস্পষ্ট ও সুবাস্তব—ধোঁয়াটে কোনো কিছুই নয়। সবই বাস্তব, সবই স্পষ্ট, কিন্তু সবই দিব্য, কারণ সবই তিনি।

ভগবান নিজেই যখন এই সব খেলা খেলছেন। *

---

* S. A. I. C. E. Bulletin থেকে। অনুবাদক—পতিপতি ভট্টাচার্য

বিলাতের ডায়েরীর কয়েক পাতা

(ব্যক্তিগত বিবরণী)

এ. বি. পুরাণী

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫০ : কবি সি. ভে লুইসের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

ট্যাক্সি নিতে হলো স্যাটো উইনডাস্ এণ্ড কোংর (পুস্তক প্রকাশক) অফিসে যাবার জন্য। চল্লিশ মিনিটেও গন্তব্যস্থানে পৌঁছলাম না। ভাগ্যিস কিছু সময় হাতে ছিল। লণ্ডনে 'ভিক্টোরিয়া', 'কুইন', 'উইলিয়াম' প্রভৃতি নামের এত বেশি জায়গা আছে যে নিখুঁতভাবে ঠিকানা না বললে গণ্ডগোল বেধে যায়। আমি দেখলাম যে সেই ব্যাপারই হচ্ছে, ড্রাইভার ঠিক জায়গাতে যেতে পারছে না। তখন তাকে পুরো ঠিকানা জানিয়ে দিয়ে বললাম, "স্যাটো উইনডাস্ কোংর অফিসে যেতে চাই, কিং উইলিয়াম চতুর্থ ষ্ট্রীট, ডব্লউ. সি. ১।" তখন সে বললে, "চতুর্থ উইলিয়াম ষ্ট্রীট।" এই বলে অবশেষে সেখানে গিয়ে হাজির হলো, যদিও অন্তে ভাড়া অনেক বেশি লেগে গেল। ওদের অফিসে পৌঁছে সেক্রেটারিকে বললাম, সে উপর তলায় ফোন করে সি. ভে লুইসকে খবর দিলে। লিফ্‌টে চড়ে আমি উপর তলায় গিয়ে দেখি দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে একজন মূলকায় চশমাপরা ভদ্রলোক। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কে জানতে পারি কি?" তিনি বললেন, "সি. ভে লুইস"। আমি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম।

তাঁর অফিসে গিয়ে বসে শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও তাঁর কর্মাদি সম্বন্ধে উল্লেখ করে আমি আমার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম। আমি বললাম বর্তমানে যে ধরণে কাব্য লেখা হচ্ছে, যেমন তিনি নিজে এবং হাবার্ট রীড ও ষ্টিফেন স্পেণ্ডার লিখছেন, তার মধ্যে এমন অনেক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যার কথা শ্রীঅরবিন্দ অনেক আগেই বলেছেন তাঁর "ভবিষ্যৎ কাব্য" ("The Future Poetry") গ্রন্থে। আমি তাঁর লেখা 'Magnetic Mountain', 'The Word Above All', 'The Poet' প্রভৃতি থেকে কিছু আবৃত্তি করলাম। তাঁরই কাছে তাঁরই কবিতা আমি অনায়াসে গড়গড় করে আবৃত্তি করছি শুনে তিনি আশ্চর্য হলেন। আমি তাঁকে শ্রীঅরবিন্দের লেখা "The Future Poetry" বইখানি দেখিয়ে বললাম যে তিনি ভারতীয় ভাবে কাব্যের মূল্য নিরূপণ করার পন্থা এতে নির্দেশ করেছেন, তাইই এই বইখানির বিশেষত্ব। এ ছাড়া তিনি যে Quantitative Metre সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি

লিখেছিলেন তা ইংলণ্ডের কবি ও সমালোচকরা যে আদৌ গ্রাহ্যই করলে না, এটা খুবই দুঃখের কথা। তিনি কাব্য লিখেছেন বিস্তর, **Collective Poems and Plays** দুই খণ্ডে রচিত, তা ছাড়া তাঁর মহাকাব্য "সাবিত্রী" ('Savitri') একটি ভারতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা এবং 'Ilion' নামক একটি মহাকাব্যও লিখেছেন 'Iliad' এর পরিশিষ্ট হিসাবে। এই মহাকাব্যটি তিনি নতুন একরূপ **Quantitative hexametre**-এর ছন্দে লিখেছেন। কিন্তু তাঁর এই সব ইংরেজী ভাষায় লিখিত সাহিত্য ও কাব্য সম্বন্ধে যে ইংরেজ ভাষাভাষীরা আদৌ কোনো খবরই রাখেনা এটা পরিতাপের কথা।

তিনি এই কথা শুনে বললেন,—"আপনি এই নিয়ে এখানকার কোনো পত্রিকাতে কিছু লিখুন না!" আমি বললাম যে লিখতে আমি রাজী আছি এবং লিখেছিও যথেষ্ট, কিন্তু আপনি যদি লেখেন তাহলে ব্রিটিশ জনসাধারণ তা শুনবে। আপনি আগে তাঁর কাব্য ও অন্যান্য রচনাগুলি পড়ে দেখুন, তারপর যা আপনার অভিমত হয় তাই লিখবেন।

তিনি বললেন,—"আমার ঘাড়ে ভারী বোঝা চেপে আছে, আমাকে এই কোম্পানীর ডিরেক্টর হতে হয়েছে। তা ছাড়া অক্সফোর্ডে আমাকে অধ্যাপনা করতে হয়। অনুসংস্থানের জন্য এগুলি আমাকে করতেই হয়। আমার ছুটি খুব কম, বছরে মাত্র তিন সপ্তাহ। প্রতি মাসে আমাকে তিন সপ্তাহ অক্সফোর্ডে ও এক সপ্তাহ লণ্ডনে থাকতে হয়।"

আমি তাঁকে বললাম **Life Divine** থেকে কিছু অংশ পড়তে, তাতেই তিনি শ্রীঅরবিন্দের রচনার নমুনা পাবেন। অল্প কথায় তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে তিনি তাতে এই কথাই বলেছেন যে মানুষকে সচেতনে এর চেয়ে এক নব চেতনাতে আরো বিবর্তিত হতে হবে।

তিনি মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনে বললেন—"বইগুলির জন্য ধন্যবাদ, আমি পড়ে দেখব"।

তিনি লিফ্‌ট পর্যন্ত এসে আমাকে পৌঁছে দিলেন। লিফ্‌টটি খুব সংকীর্ণ, তাই তিনি বললেন—ওতে চড়তে আমি ভয় পাই, পাছে মাঝপথে আটকে পড়ি।

কেম্‌ব্রিজ : ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫

চিঠি পেলাম মোরেনা ভোনেলির কাছ থেকে যে অদ্যই এগুএ তার বাড়িতে ৭ই তারিখে বিকেলে আমাকে যেতে হবে, তাহলে ৯ তারিখে আমাকে সে কেম্‌ব্রিজে নিয়ে যাবে।

কেম্‌ব্রিজ তার বাড়ির কাছেই। ঐ ৯ই তারিখেই সেখানকার ভাইস চ্যান্সেলারের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের দিন ধার্য হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যায় আমি মোরেনা ডোনেলির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করলাম। এক সুন্দরী তরুণী আমার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিল। আমার ভারী সুটকেস দুটি আমি নিজেই বহন করলাম, ওখানে 'কুলি' থাকেনা।

এসেক্সের সেই গ্রামটির নাম স্যাফ্রন ওয়ালডেন (Saffron Walden), এ গ্রাম আমাদের দেশের গ্রামের মতো একেবারেই নয়। এখানে বাঁধানো রাস্তা, জলের কল, ইলেক্‌ট্রিসিটি, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি আধুনিক যুগের সব কিছুই আছে। প্রত্যেকটি বাড়ির সঙ্গে সংলগ্ন আছে একটুখানি বাগান বা ফাঁকা জমি। সেই বাড়িটি পরিচ্ছন্ন রাখতে, বাগানের কাজ করতে, উপার্জন করতে ও নিয়মিত সময়ের রুটিন রক্ষা করতে এমনই ব্যস্ত থাকতে হয় যে অন্য কিছু করবার সময়ই নেলে না। সপ্তাহান্তে ছুটির সময়টা সামাজিকতা রক্ষা করতেই কেটে যায়, তা ছাড়া বাজার করা, বা পিক্‌নিকে যাওয়া, কিংবা বেড়াতে যাওয়া, এগুলিও আছে।

মোরেনার বাড়িটি আগেকার টিউডোর আমলের ছাঁদে গড়া। তার ছাঁদটিকে নিখুঁত ভাবে বজায় রাখতে নানা দিক দিয়ে মোরেনা ও তার স্বামী মিঃ কলিন্‌সের অধিকাংশ সময়ই কাটে। সে যেন রীতিমত এক অনুষ্ঠানিক ব্যাপার। এমন কিছুই না করা হয় যাতে তার টিউডোর চরিত্রের কিছু অদলবদল হয়ে যায়। বাড়ির নালিকরা এই নিয়ে খুব গর্ব বোধ করে। ইংলণ্ডের সর্বত্রই এই ধারা। সুতরাং মানুষগুলো স্বতন্ত্রভাবে বাস করলেও তাদের মধ্যে যেন একটা সংস্কৃতির ও ঐতিহ্যের মিল রয়েছে। গির্জায় গিয়ে তাদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে দেখাশোনাও হয়। সুতরাং বাড়ির ঐতিহ্য সমান বজায় রাখতে আবার সেই সঙ্গে আধুনিক টেলিফোন, ইলেক্‌ট্রিসিটি, রেডিও প্রভৃতিও রাখতে তাদের যথেষ্টই অর্থব্যয় করতে হয়, কিন্তু তাতে তাদের বিশেষ যায় আসে না।

ডিনারের সময় শ্রীঅরবিন্দের প্রসঙ্গে আমাদের অনেক আলাপ হলো। মোরেনা বললে, ইউরোপেও এমন লোক আছে যারা আধ্যাত্মিকতার জন্য সর্বত্যাগী হতে পারে তবে তাদের সংখ্যা খুব কম। রাত্রি ১১॥টা পর্যন্ত আলাপাদির পরে কিছু ধ্যানে বসে আমরা শুতে গেলাম।

৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

আজ বাড়িটির চারপাশের বাগান দেখলাম। পদ্মফুলে ভরা একটি পুকুরিণী, সুন্দর সুন্দর গোলাপ ফুটে আছে, সবুজ ঘাসে ভরা জমি। আপেল ফলের গাছ রয়েছে, এক পাশে সব্‌জির ক্ষেত; গরু আছে, পোল্‌ট্রি আছে। চাকর বা শ্রমিক মেলা দুর্ঘট, সুতরাং ওদের দুজনেই সব কিছু কাজ করে।

এই দিন আমাকে অনেক খাটতে হলো। পণ্ডিচেরী থেকে ২৭ বাক্স ভরা বই এসে হাজির হয়েছিল, সমস্ত বাক্স খুলে বইগুলি বের করে গুছিয়ে রাখলাম। কথায় কথায় জানলাম যে মোহেনা শ্রীঅরবিন্দের "Collected Poems and Plays" বইটি পড়েনি আর "সাবিত্রী" কাব্য বিরাট বলে সব পড়া হয়নি। সে মন্তব্য করলে যে আশ্রমের কবিরা কেবল "স্বর্ণজ্যোতি", "নীল আকাশ", "অনন্ত" এই সব নিয়েই কবিতা লেখে, কিন্তু "ফুল" বা "মৌমাছি" বা "পিপীলিকা" নিয়ে কিছু লেখেনা কেন?

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

গাড়িতে ১০।।টার সময় উঠে কেম্ব্রিজে পৌঁছলাম ১১টা ১৫ মিনিটে। পথে যেতে যেতে ভারতের দরিদ্রাবস্থা, জনগণের চেতনার অভাব, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি, পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হলো।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। পথে পণ্ডিত শ্রীনিবাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। আমাকে কেম্ব্রিজে দেখে তিনি আশ্চর্য হলেন। তিনি নিজের থেকে ওখানে ধারাবাহিক লেকচার দিচ্ছিলেন। কেমব্রিজের রাস্তাগুলিও অক্সফোর্ডের মতো সংকীর্ণ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত শান্ত, গোলমাল তেমন নেই। অক্সফোর্ডের মতোই সংকীর্ণ পথের উপর পুরানো কলেজগুলি স্থাপিত। বাড়ি ভেঙে রাস্তা চওড়া করার কথা কেউ ভাবতেই পারেনা—ইংরেজ জাতি এমনই রক্ষণশীল অথচ উন্নতিবান। এই কলেজগুলি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবেই গড়া হয়েছিল, সেই পুরানো পরিবেশ এখনও তেমনিভাবেই বজায় রাখা হচ্ছে, যদিও ধর্মের দিকে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে।

ওখানকার ভাইস চ্যান্সেলার মিঃ হেনরি উইলিংকের সঙ্গে ১২টার সময় সাক্ষাৎ হলো, প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে কথাবার্তা হলো। আমার ওখানে যাবার কি উদ্দেশ্য তাঁকে জানিয়ে দিলাম—শ্রীঅরবিন্দ এই কেম্ব্রিজেই কিংস কলেজে ছিলেন ১৮৯০-১৮৯২ পর্যন্ত, ইত্যাদি। তিনি যা কিছু লিখেছেন তাও বললাম। সব শুনে তিনি বললেন যে, ভারতে কখনও তিনি যাননি, কিন্তু গর্বের সঙ্গে বললেন যে জওহরলাল নেহরু যখন এখানে এসেছিলেন তখন তাঁর সঙ্গী যারা ছিলেন তাদের মধ্যে চারজন ছিলেন কেম্ব্রিজের ছাত্র।

কিংস কলেজে ফোন করে তিনি সেখানকার ভাইস প্রোভস্ট অন সল্টমার্শের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ঠিক করে দিলেন ২।। টার সময়। আমাদের জন্য শেরি আনতে বলেছিলেন কিন্তু যখন শুনলেন যে আমি মদ্যজাতীয় কিছু খাইনা তখন অরেঞ্জ স্কোয়াশ আনিয়ে দিলেন। এর পরে তিনি আমাকে লনে নিয়ে গিয়ে তাঁর স্ত্রী, কন্যা ও জামাতার

সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি যখন তাঁকে ভারতে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম তখন তিনি বললেন যে, ভারতের উপর দিয়ে তিনি উড়ে গেছেন। ছোট ছেলেদের সঙ্গে আনন্দে কিছু সময় কাটিয়ে আসবার সময় শ্রীঅরবিন্দের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে তাঁর এক সেট বই ইউনিভার্সিটিকে দিয়ে এলাম। বলে এলাম এগুলি যেন আলাদা করে রাখা হয়। তিনি বললেন, "এতো একটা গোটা লাইব্রেরি"।

অতঃপর প্রফেসর শ্রীমতী ভন্ লোহাইজনের সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া হলো। তাঁর সঙ্গে বেদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের ও কপালী শাস্ত্রীর ভাষ্য নিয়ে আলাপ হলো।

আড়াইটার সময় কিংস কলেজে উপস্থিত হলাম। প্রবেশমুখেই মিঃ জন সল্টমার্শের সঙ্গে সাক্ষাৎ। অনাড়ম্বর শিক্ষাব্রতী, পোষাক পরিচ্ছদের দিকে কোনো যত্ন নেই, ব্যবহার অতি নম্র। আমার সুটকেসটা নিজের হাতেই বয়ে নিয়ে চললেন, আমার প্রতিবাদ সত্ত্বেও। কলেজ বন্ধ থাকায় আমাকে কিছু দেখানো হলোনা বলে দুঃখিত। আমি কলেজের পুরোনো রেকর্ডগুলি দেখতে চাইলাম। তিনি প্রথমে আমাকে নিয়ে গেলেন কলেজের বিখ্যাত প্রাচীন গির্জা দেখাতে, যেটি রাজা ষষ্ঠ ও সপ্তম হেনরির দ্বারা নির্মিত, ৮০ বৎসর যাবৎ একই অবস্থায় রয়েছে। তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ, ও উচ্চতা ও বিরাট বিরাট খিলানগুলি দেখে বিস্ময় লাগে। চারিদিকের জানলায় অজস্র রঙীন কাঁচ আলোতে ঝলমল করে ওঠে।

অতঃপর আমরা গেলাম রেজিষ্ট্রারের অফিসে, তিনি আগের থেকেই শ্রীঅরবিন্দের পূর্বকালের ছাত্রাবস্থার রেকর্ডগুলি বের করে রেখেছিলেন। আমি দেখে আশ্চর্য হলাম যে সেই রেকর্ডের তলদেশে উল্লেখ করা রয়েছে যে ১৯০৬ সালে তিনি রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং নির্দোষ বলে "খালাস" পেয়েছিলেন। এরা এইভাবে অতি যত্নের সঙ্গে এদের ছাত্রদের সম্বন্ধে সমস্ত কিছু রেকর্ড লিখে রাখে। শ্রীঅরবিন্দ কেমব্রিজ ত্যাগ করেছিলেন ১৮৯২ সালে, আর তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল ১৯০৬ সালে, তাও লিখে রাখা হয়েছে!

ভাইস প্রোভোষ্টের অফিসে গিয়ে ছাত্রদের বোর্ডিং আবাসের প্ল্যান দেখলাম। তার মধ্যে "কিংস লেন" নামক স্থানে যে ঘরে শ্রীঅরবিন্দ থাকতেন সেখানে লেখা রয়েছে "ঘোষ"। ১৮৯২ অক্টোবরে সেই ঘর খালি ছিল, কারণ তখন তিনি কেমব্রিজ ছেড়ে লণ্ডনে চলে গেছলেন।

বোর্ডিং হাউসে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের থাকবার সেই ঘরটির চাবি খুলে আমাকে সেই ঘর দেখালেন। সেখানে ঢুকে দুই মিনিটকাল আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এই ঘরে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর জীবনের দুটি বছর কাটিয়েছেন! এখন কোথায় ভারত আর

কোথায় ইংলণ্ড! কোথায় পণ্ডিচেরী আর কোথায় কেমব্রিজ। জীবনের কর্মশৃঙ্খল কতই বিচিত্র! যে যুবক ভারতীয় সম্পর্ক থেকে এতই তফাতে ছিলেন তিনিই কেমন করে তাঁর দেশের ও তথা সমগ্র মানব জগতের এমন ভারতীয় আধ্যাত্মিক গুরু হলেন? মিঃ সলটমার্শ আমার নীরবতা লক্ষ্য করছিলেন। আমি বললাম—"আমি গভীরভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছি।" তিনি বললেন—"তা বুঝেছি।"

আমি দেখলাম তাঁর হৃদয়েও শ্রীঅরবিন্দের কিছু স্থান আছে, তিনি অগ্রণী হয়ে আমাকে তাঁর রেজিষ্ট্রী বইএর এবং ঐ ঘরটির ফটোগ্রাফ করিয়ে দিলেন।

কেমব্রিজে ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে যত ছাত্র আজ পর্যন্ত অধ্যয়ন করে গেছে তাদের প্রত্যেকেরই নাম বর্ণানুক্রমে বড়ো বড়ো খাতায় লিপিবদ্ধ করা আছে।

ওখানে অস্কার ব্রাউনিংএর সম্বন্ধে খবর পেলাম। লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখলাম যে স্যার আইজাক নিউটন ওখানকার প্রোভোষ্ট হবার জন্য রাজার কাছে দরখাস্ত করেছিলেন এবং রাজা সে দরখাস্ত মঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু তথাপি ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রহণ করেনি। রাজার কাছে আবেদন করেও তার কোনো ফল হয়নি।

রাত্রে কিঙ্গারলি ষ্ট্রীটে পণ্ডিত গুপ্তিয়ালের সঙ্গে ডিনার খেলাম। তিনি আমাকে নানারকম প্রশ্ন করে অনেক কথাবার্তা বললেন। বেড়াতে বেরিয়ে তিনি ইংলণ্ডের গণজীবনের অনেক সুখ্যাতি করলেন এবং ভারতের সঙ্গে নিত্যই তার তুলনা করে দেখাতে লাগলেন। এটা আমার মনঃপুত হলোনা। ইংলণ্ড দেশটি ছোট হলেও জাতিটা খুব বড়ো—তারা এমন সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল যেখানে সূর্য অস্ত যায় না। ভারত তার তুলনায় অনেক দুর্বল ও অলস ও দরিদ্র, সবেমাত্র স্বাধীনতা পেয়েছে। আধুনিক জগতের সঙ্গে সমান হতে তার অনেক সময় লাগবে—এই কথাই আমি বললাম।

তা ছাড়া এই সব জাতিকে তাদের "অগ্রগতির জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নতিই প্রকৃত উৎকর্ষের সব কিছু নয়। পূর্ব ও পশ্চিমের পরস্পরে অনেক লেনদেন করতে হবে, কেবল বাহ্য অনুকরণই তার সব কথা নয়। তা ছাড়া জলহাওয়ারও অনেক পার্থক্য—ইংলণ্ডে দরজা জানলা বন্ধ করে থাকতে হয়, আর ভারতে খোলা বাতাসেই থাকা দরকার হয়। ইংলণ্ডে যত ছোট ছোট নদী, যাকে ওরা বলে "Cam",—তাকেই ওরা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে রাখে এবং খুঁড়ে গভীর করে রাখে, যাতে কোনোমতে নৌকা যাতায়াত করতে পারে।

চিঠিপত্র

কেমব্রিজ ভাইস চ্যান্সেলারের কাছ থেকে

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

শুক্রবার ৯ই সেপ্টেম্বর দুপুরে আমার লজে যদি আসতে পারেন তাহলে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খুবই অনুগৃহীত হবো। আশা করি তা সম্ভব হবে

বিনীত হেনরি উইলিংক

কেমব্রিজের প্রফেসর উইলির কাছ থেকে

প্রিয় শ্রীপুরাণী, ২০. ১১. ১৯৫৫

আপনার চিঠি ও "The Life Divine" এবং "Sri Aurobindo and his Ashram" বই দুখানির জন্য অনেক ধন্যবাদ। এই বই দুটি থেকে তাঁর জীবন ও মতামত সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যাবে। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খুবই খুশী হয়েছি, বহুদিন এ কথা স্মরণে থাকবে। আপনি যখন পড়ে শোনাচ্ছিলেন তখন আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম, তাতে কিছুই ক্ষতি হয়নি, এইরূপ স্বাভাবিক ভাবটাই আমি পছন্দ করি। শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানাই।

বিনীত বেসিল উইলি

অ্যাশডন হল, এসেক্স
২২শে অক্টোবর, ১৯৫৫

প্রিয় পুরাণী,

কালকের সকালে আমার কাছে এসে বহুক্ষণ কাটিয়ে গেছেন, সেজন্য ধন্যবাদ জানাই। শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে, প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শোনা, এ আমার পক্ষে সব চেয়ে আনন্দের জিনিস; আমি অনুক্ষণই তা শুনে যেতে পারি!

মোরেনা

অ্যাশডন হল, এসেক্স
৩০শে নভেম্বর, ১৯৫৫

প্রিয় পুরাণী,

আপনি চলে যাচ্ছেন জেনে আমি খুবই দুঃখিত, যদিও দেহেই অদর্শন হচ্ছেন মনে নয়, তথাপি আপাতত এখানে আর আপনাকে পাবোনা। আপনি এখানে খুব ভালোই কাজ করে গেলেন, আমাদের সকলকে জাগিয়ে দিয়ে ও পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে; রেডিওতে ব্রডকাষ্ট করা প্রভৃতি আরো অনেক জিনিস ছেড়েই দিলাম।

এখন আমরা, ক্লেয়ার, ডোরিস, মারগারেট ও আমি দৃঢ়সংকল্পের সঙ্গে অগ্রসর হতে পারব। এমনি উৎসাহ পাওয়াই আমাদের দরকার ছিল, নতুবা সমুচিত ভাবে ঐকান্তিক প্রচেষ্ট করতে পারছিলাম না। আমরা এটা বুঝেছিলাম যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে, ভিতর থেকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কিছুই করা চলবে না। আমরা পাশ্চাত্যবাসী কিছু একটা "করবার" জন্যই ব্যস্ত হয়ে উঠি, সংঘ তৈরি করি, বক্তৃতা দিয়ে বেড়াই, তৎপরতা দেখাতে চাই, নিঃস্বার্থতার ভিত্তি তাতে কিছুই নেই—সবই আমিত্বের খেলা। এই সব অনুষ্ঠান কিছুদিন পরেই ভেঙে যায়, সেই কারণেই আমরা অমন ভুল করতে যাইনি এবং আমাদের মহাগুরুর নির্দেশকে ব্যর্থ করতে চাইনি।

আবার আসবেন আমাদের কাছে, খুব সুদূর ভবিষ্যতে নয়। আমরা চাই আমাদের ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ, বিশেষ যাঁরা শ্রীঅরবিন্দের সাহচর্যে ছিলেন।... শ্রীমাকে বলবেন তিনি যেন মাঝে মাঝে এমনি কাউকে পাঠান।

প্রিয় পুরাণীজী, আপনার সঙ্গে মিশে আমরা পরমানন্দ উপভোগ করেছি অথবা পূর্বেই ছিল আমাদের ঘনিষ্ঠতা, তাতেই আমরা মিলিত হতে পেরেছি? নিশ্চয়ই তাই, কারণ আপনাকে নতুন বন্ধু বলে একবারও আমাদের মনে হয় না।

আপনার যাত্রা শুভ ও নির্বিঘ্ন হোক। ভালবাসা রইল।*

মোরেনা

* অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

কঠিন ডানায় ওড়া

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বীরবাহু

নতুন বিমান উড়াইবার কৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসিতে না আসিতেই সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। আমাদের স্কোয়াড্রনকে কোথায় কোন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইবে, এই কথা নিয়া মেসে প্রত্যহই আমাদের নিজেদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা চলিত। উৎসাহের প্রাবল্যে আমরা নিজেদের শক্তিকে বেশী বড় করিয়া দেখিতাম। মনে হইত যেন আমরা প্রত্যেকেই বহুগুণ শক্তির অধিকারী হইয়া গিয়াছি। ও সেই মত হেন করিব তেন করিব বলিয়া আস্ফালন করিতাম। দপ্তরের কেহ কোন কথা বলিলে পরম আগ্রহে তাহা শুনিতাম ও বিশ্বাসযোগ্য কথা না হইলেও কথা শোনার সময় সব বিশ্বাস করিতাম। তারপর একদিন সত্যই স্থান বদলের হুকুম আসিল। উইং কমাণ্ডার লিলি ও দুই ফ্লাইট কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী এবং হুইন ও আর দুই একজন সিনিয়র অফিসাররা বিলিয়া পুরা স্কোয়াড্রন স্থানান্তরে যাওয়ার খসড়া তৈরি করিয়া ফেলিলেন।

হুকুম হইল প্রত্যেক ক্রু আপন আপন বিমান লইয়া নূতন স্থানে উড়িয়া যাইবে। আর যাহারা বিমানে উড়িয়া যাইবার স্থান পাইবে না, তাহারা সকলে স্পেশাল ট্রেনে রওনা হইয়া দুই দিনে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইবে। যদিও গন্তব্যস্থলের নাম ঠিকানা গোপন রাখা হইয়াছিল, কাহাকেও বলা হয় নাই স্কোয়াড্রন কোথায় বদলি হইয়া যাইতেছে, তথাপি আমরা যে কটকের নিকটবর্তী নূতন বিমান বন্দর চারবাটিয়াতে যাইতেছি, সে সংবাদ সকলের মুখেই শোনা যাইতেছিল। আর সেই বলার সাথে সংবাদ পরিবেশকরা বলিতেছিলেন, "সংবাদটা গোপন। কাহাকেও বলিও না।"

নূতন বিমান চালনা ও মেরামতের কাজ শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করাতে যে আনন্দ, তাহাতে আমাদিগকে বেশী কথা বলার মোহে আকৃষ্ট করিয়াছিল। অপ্রয়োজনীয় বেশী কথা বলা যে সংবাদ গোপন রাখার পরিপন্থী, এবং সংবাদ গোপন রাখা কখনও যে সাংঘাতিকভাবে প্রয়োজন হইতে পারে, একথা তখনও আমাদের বোধে আসে নাই।

বিমানে উড়িয়া যাইবার সৌভাগ্য আমার এইবার হইল না। স্পেশাল ট্রেনে লোকজন, মালপত্র উঠান ও গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া নামান এবং সব সময় মোড়লি অর্থাৎ ট্রেনে তদারকি করার ভার এই অধমের স্কন্ধে পড়িল। স্পেশাল ট্রেনের কমাণ্ডিং অফিসার

হইলেন ফ্লাইট লেফটেনান্ট ডওন। তাঁহার সাথে আমার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। এক নম্বর ভারতীয় স্কোয়াড্রনের জন্য মনোনীত করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে বিমান চালনা ভাল করিয়া শিক্ষার জন্য বিলাতে বিমান চালনার শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান ক্র্যানওয়েল বিমান চালনা শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠাইয়াছিল। সেখানে তিনি বিমান চালনা শিখিয়াছিলেন। এ দেশে ফিরিয়া আসার পর ভারতীয় বিমানবাহিনীর এক নম্বর স্কোয়াড্রনের এক নম্বর ফ্লাইটে কিছুদিন বিমান উড়াইয়াও ছিলেন। নতুন বিমান আসার ফলে তাঁহার পক্ষে বিমান চালনা করা আর সম্ভব হইল না। উচ্চতায় তিনি পাঁচফুট হইতেও খর্ব ছিলেন। সেজন্য র‍্যাডার পেডাল পর্য্যন্ত তাঁর পদযুগল পৌঁছাইত না। ওয়াপিটি বিমান উড়াইবার জন্য বুটের তলায় মোটা কাঠের টুকরা লাগাইয়া তাঁহার পদদ্বয় লম্বা করা হইয়াছিল। কিন্তু নূতন ধরণের বিমান চালনার জন্য বুটের তলায় কাঠ লাগাইয়া পদদ্বয় লম্বা করার বিপদ হইতে পায়ে বিবেচিত হইল। র‍্যাডার দিয়াই বিমান দক্ষিণে বা বামে ঘুরান হয়। আর সেই র‍্যাডার পেডাল পর্য্যন্ত পদদ্বয় না পৌঁছানর ফলে তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত বিমান উড়ান হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়, বিমানবাহিনীর ভাষায় তাঁহাকে গ্রাউণ্ড করা অর্থাৎ মাটির উপর কাজ দেওয়া হইল। আমাদের নূতন স্কোয়াড্রন তিনশত তিপ্পান্ন নম্বরের জন্য যখন বৈমানিক সংগ্রহ সুরু হয়, তখন তাঁহাকে এক নম্বর স্কোয়াড্রন হইতে আনিয়া নূতন স্কোয়াড্রনের ডাঁড়ারের কর্তার কাজ দেওয়া হয়। ডাঁড়ারের কাজ শিক্ষা তিনি এক নম্বর স্কোয়াড্রনে থাকা কালেই সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এ কাজে তিনি যথেষ্ট দক্ষতাও অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এইবার স্পেশাল ট্রেনে যাওয়ার কালে তাঁহার সাথে মিলিয়া মিশিয়া হৃদ্যতার সাথে কাজ করিবার সুযোগ হইল। রওনা হওয়ার দিন, পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী সংবাদ আসিল যে, ভোর বেলাই স্পেশাল ট্রেন দমদম ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশনের সাইডিংএ রাখা হইয়াছে। কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই ভারী যন্ত্রপাতি দমদম ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশনে নির্দ্দিষ্ট মালগাড়ী-গুলিতে উঠাইয়া রাখা হইতেছিল। কাজেই রওনা হওয়ার দিন আমাদের প্রথম কাজ হইল বিমানগুলিকে সব রওনা করিয়া দেওয়া। পরে দমদমায় যেসে দ্বিপ্রহরের আহার সমাধা করিয়া নিজস্ব জিনিষ পত্র, কিটব্যাগ, কম্বল, বিছানা ইত্যাদি লইয়া স্পেশাল ট্রেনে আসিয়া উঠা। যাহাদের কাজ কর্ম্ম বিশেষ ছিলনা, তাহাদিগকে সকাল বেলাই আসিয়া ট্রেনে ওঠার অনুমতি দেওয়া হইল। ট্রেনে কোন আহার্য প্রথম দিন প্রস্তুত করা হইবে না এই কথা ট্রেনের কমাণ্ডিং অফিসার সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। পথের কোন ষ্টেশনে যন্ত্রোবস্ত নিজেই করিলেন। আমরা নিশ্চিন্ত মনে নিজের নিজের নির্দ্দিষ্ট কাজ শীঘ্র সমাধা করিয়া, ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেনে ওঠার জন্য চেষ্টিত হইলাম।

ষ্টেশনে যাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক মত না হওয়ায়, সকাল হইতেই মুস্কিল সুরু হইল।

মতিঝিল কলোনী ক্যাম্পের বৈমানিকরা আসিয়া জানাইল তাহাদিগকে ষ্টেশনে লইয়া যাওয়ার জন্য কোন যান পৌঁছায় নাই। অনুসন্ধানে জানা গেল আমাদের ট্রেনের কমাণ্ডিং অফিসার বৈমানিকদের ষ্টেশনে যাওয়ার নিমিত্ত যানের প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া, কোন বন্দোবস্তই করেন নাই। যানবাহন বিভাগে গিয়া খবর লইতে, তাহারা স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডিং অফিসারের ও তাঁহার অনুপস্থিতে ট্রেনের কমাণ্ডিং অফিসারের নিকট হইতে পত্র লাভী করিল, এবং বলিল যে যানের বন্দোবস্ত করিতে তাহাদের অন্ততঃ দুই তিন ঘন্টা সময় প্রয়োজন হইবে। তাহাদের কথা ন্যায়সঙ্গত মনে হওয়ায় অগত্যা ফ্লাইট লেফ্‌টেন্যান্ট ভওনের নিকট আসিয়া সমস্ত কথা পরিষ্কার করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চিন্তা করার পর তিনি বলিলেন, বৈমানিকরা সব ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া ষ্টেশনে যাউক। তাহাতে তাঁহাকে জানাইলাম যে ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ীওয়ালারা আজ কয়েক দিন হইল তাহাদের ভাড়া দশগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে, এবং এই সময় আমাদের অন্ততঃ পঁচিশখানা গাড়ীর প্রয়োজন হইবে; আর কে গাড়ী ভাড়ার টাকা দিবে? এই সমস্ত প্রশ্ন ছাড়া সব চাইতে বড় প্রশ্ন হইল খুব চেষ্টা করিলেও দুই তিনখানার বেশী গাড়ী এখন পাওয়া যাইবে না। বর্দ্ধিত ভাড়ার কারণও তাঁহাকে জানাইলাম, গাড়োয়ানরা নিশ্চয় সন্দেহ করিয়াছে যে, আমাদের স্কোয়াড্রন অন্য কোথাও বদলি হইয়া চলিয়া যাইতেছে, আর সেইজন্য গাড়ীভাড়া বাড়াইয়া যতটা সম্ভব আমাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য।

তাঁহার চেহারা ছিল লম্বায় ছোট, প্রায় গোল যার খুব ফর্সা। চক্ষু দুইটি ঈষৎ রক্তিম আভাপূর্ণ। রক্তিম আভা অকারণে নয়। আজ সকালে রক্তিম আভা শুধু চক্ষুতে নয় সারা মুখমণ্ডলে বর্ত্তমান, এবং কথা বলার সময় মুখ হইতে দুঃখ-ভোলা ঔষধের সৌরভ ছুটিতেছিল। সমস্ত কথা শুনিবার পর তিনি আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া ইংরাজিতে বলিলেন, এই প্রথম যখন ভারতীয়রা বুদ্ধির কিছু পরিচয় দিল। তাঁহার মুখে এই প্রথম প্রশংসাসূচক কথা শুনিয়া তখনকার মত নিজের উপর সংযম হারাইয়া ফেলিলাম,—ভুলিয়া গেলাম যে তিনিও ভারতীয়—বিলাতে প্রস্তুত নন। সর্ব্বোপরি একথাও ভুলিয়া গেলাম যে ভারতীয় বিমানবাহিনীতে তিনি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। যাহা করিলাম তাহার উৎকট ফলভোগ হইতে স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী আমাকে বাঁচাইলেন।

যাহা হউক স্পেশাল ট্রেনের কমাণ্ডিং অফিসার শেষ পর্য্যন্ত স্পেশাল ট্রেনেই আসিলেননা। যান বাহন সংগ্রহের পর ট্রেনে উঠিতে অনেক সময় লাগিয়া গেল। অপরাহ্ণ প্রায় তিনটার সময় স্পেশাল ট্রেন আমাদিগকে লইয়া রওনা হইল। ট্রেন স্পেশাল

হইলে কি হয়, চলিতেছিল গোশকটের মত বেগে, ঘন্টায় দশ মাইলের বেশী কিছুতেই নয়; এবং অন্য ষ্টেশনের নিকবর্ত্তী হইলেই থামিয়া যাইতেছিল। এক এক বার অনেক সময় পর্য্যন্তই থামিয়া রহিতেছিল। কোন ষ্টেশনের নিকট না থামায়, কোথায় আসিলাম, কতদূর আসিলাম, কোনদিকে ট্রেন চলিতেছে, কিছুই বোঝা যাইতেছিল না। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিল। আমাদের ট্রেন চলার ভঙ্গির ব্যতিক্রম হইল না। যুদ্ধের সময় বলিয়া সব ষ্টেশনের নাম মুছিয়া ফেলা ছিল, আবার তাহার উপর ব্ল্যাক আউটের জন্য সব ষ্টেশনে প্লাটফরমের আলো নিভান। শুধু সন্ধ্যার পর এক বড় নদীর উপর পুল পার হইয়াছি। কি নদী! নিশ্চয়ই গঙ্গা নদী হইবে। কারণ গঙ্গা নদী ছাড়া এত বড় আর কোন নদী নিকটে আছে বলিয়া মনে পড়িল না। কাজেই এ যেন অনির্দ্দিষ্ট অজানা দেশে রওনা হওয়া গেছে; তাহাও অতি মন্থর গতিতে। কোন কিছুই আর জানার উপায় নাই। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই যেন সব ভুলিয়া গেলাম: দিনের বেলা তবু কিছু দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল, রাত্রির অন্ধকারে সেটুকু চাঞ্চল্যও শেষ হইল। কবে রওনা হইয়াছি? কোথায় যাইতেছি? কেন যাইতেছি? উদ্দেশ্যহীন যাত্রা।

মন ভুলিলেও জঠর ভুলে না। ট্রেনের কমাণ্ডিং অফিসার আমাদের রাত্রের আহারের বন্দোবস্ত নিজে করিয়াছেন। কোথায় তাহা কাহাকেও জানান আবশ্যক বোধ করেন নাই। আর শেষ মুহূর্ত্তে তিনি নিজেই ট্রেন হইতে নির্দ্দেশ। কয়েকজন যাহারা ভারতীয়দের প্রতি তাহার প্রেমাত্মক কথা শুনিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন আমাকে দোষারোপ করিতে লাগিল। তাহারা বলিল আমার ব্যবহারের জন্য আজ রাত্রে তাহাদের অনাহারে কাটাইতে হইতেছে; ফ্লাইট লেফ্‌টেন্যান্ট ডগুনের দুর্ব্বাক্য যদি আমি নতমস্তকে মানিয়া লইতাম, তাহা হইলে ট্রেনেই তিনি উপস্থিত থাকিতেন ও রাত্রের আহারের সুবন্দোবস্ত নিশ্চিত হইত; শুধু তাহাই নয়, ট্রেনের গতিও তাহা হইলে এত মন্থর হইত না।

ক্রমে কিছুটা অবসাদে ও কিছুটা ক্ষুধায় কাতর হইয়া সবাই প্রায় ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি প্রায় একটায় আমরা এক বেশ বড়সড় ষ্টেশনে পৌঁছাইলাম। আলো সব জ্বলিতেছে না, কয়েকটা যাহা আছে তাহাও স্তিমিত। আস্তে আস্তে সকলেরই ঘুম ভাঙ্গিল। সবাই ষ্টেশনে নামিয়া পড়িল। এবং কোথায় পৌঁছিলাম জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া খোঁজ করিল। ষ্টেশনের প্লাটফরম খুবই পরিচিত বোধ হইতেছিল। কিন্তু আমরা ট্রেন যাত্রী কয়েকজন ছাড়া সারা ষ্টেশনে আর কোন দ্বিতীয় মানুষ ছিল না। কাজেই "কোউন ষ্টেশন" জিজ্ঞাসা করিবার উপায়ও ছিল না। এই অবস্থা বেশীক্ষণ থাকিল না। ঘাওড়া রেলওয়ে ষ্টেশনের মাপ প্লাটফরমে কোথাও

লেখা না থাকিলেও চিনিতে খুব বিলম্ব হওয়ার কথা নয়। দমদম ক্যান্টনমেন্ট রেল ষ্টেশন হইতে কলিকাতার রাজপথে হাওড়া ষ্টেশনের দূরত্ব কিছুতেই দশ মাইলের বেশী নয়। এই দশ মাইল পথ স্পেশাল ট্রেনে আসিতে আমাদের প্রায় দশ ঘন্টা সময় লাগিয়া গেল। গো-শকটও ঘন্টায় এক মাইলের বেশী পথ অতিক্রম করে।

আমাদের ষ্টোয়ার্ডদের ফ্লাইং অফিসার সরকার রাত্রি আটটার সময় হইতে আমাদের স্পেশাল ট্রেনের জন্য হাওড়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাত্রে কাহারও আহার হয় নাই একথা তিনি শুনিবামাত্র ষ্টেশনে যে কয়টা ক্যান্টিন ছিল সেখানে গিয়া কিছু আহার্য্যের ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইলেন। রাত্রি দুইটার সময় চারিশত লোকের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত সহজ নয়। তবুও হাওড়া ষ্টেশনের চার পাঁচটা ক্যান্টিন সকলে মিলিয়া শেষ রাত্রের দিকে আমাদিগকে কিছু খাওয়াইয়া শান্ত করিল। সৈন্য বিভাগে একটা প্রবাদ আছে "পেট চলে তো পল্টন চলে"।

ভোরের দিকে ট্রেন ছাড়িয়া সারা দিনরাত্রি পূর্ব্বদিনের গদাইলস্করী চঙ্গে চলিল। পথে ট্রেন থামাইয়া দুইবার আহার্য্য ও কয়েকবার চা প্রস্তুত হইল। চা-প্রস্তুত ও বণ্টন-প্রণালী খুব সহজ। ট্রেন থামাইয়া বড় ডেকচি, চা-পাতা, দুধ অর্থাৎ গুঁড়া দুধ ও চিনি লইয়া এঞ্জিনের নিকট যাওয়া হইত। এঞ্জিন চালককে বলিতেই তিনি এঞ্জিনের বয়লার হইতে ফুটন্ত গরম জল লোহার নল মারফৎ ডেকচিতে ঢালিয়া দিতেন। আহার কয়েক মিনিটের মধ্যেই চা প্রস্তুত হইয়া যাইত। তাহার পর মগ হস্তে লাইন করিয়া এঞ্জিন পর্য্যন্ত গিয়া পেয় চা ও সেই সাথে চর্ব্বা 'চা' অনুপানটা সংগ্রহ করা হইত। দ্বিপ্রাহরিক ও রাত্রের আহারও ঐভাবেই সংগ্রহ হইত। কলাইকরা থালা ও মগ লইয়া কিচেন-কারবা পর্য্যন্ত লাইন করিয়া পৌঁছাইয়া খাদ্য সংগ্রহের পর নিজের কামরায় আসিয়া ভোজন করা হইত। সকলের আহার শেষ হইলে পর কমাণ্ডিং অফিসার ট্রেন চালাইবার জন্য এঞ্জিন চালককে অনুমতি দিলেন।

দুই দিন পরে সন্ধ্যার সময় তালচরের নিকট মহানদীর উপর পুল পার হইয়া চারবাটিয়ায় পৌঁছান গেল। সেই রাত্রেই কিছুসংখ্যক বৈমানিককে ট্রেনের কামরা হইতে তাহাদের ব্যারাক বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। আর সকলে ধীরে সুস্থে পরের দিন নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ব্যারাকে পৌঁছাইল।

চারবাটিয়ার বৈমানিকদের থাকিবার জন্য বাসস্থান তখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় নাই। তবুও প্রায় দুই হাজার বৈমানিকদের জন্য বাসের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ভারতীয় ও অভারতীয়দের জন্য প্রথম হইতেই বেশ পৃথক ব্যবস্থা। বাসস্থান, রন্ধনইখানা ও খানাঘর সবই প্রথম হইতেই ভিন্ন। ক্যাম্পে ভারতীয়দের সংখ্যা

খুব অল্প বলিয়া তাহাদের আহার্য্য প্রস্তুতের জন্য কোন বৈমানিক নিযুক্ত করা গেল না।

প্রথম হইতেই কাজের ভীষণ চাপ পড়িল। আমাদের স্কোয়াড্রনে বারখানা বিমান, তাহার মধ্যে চারিখানা লম্বা-নাক গ্লেনহীন এবং অন্য আটখানা হাডসন বম্বার। গ্লেনহীন বিমানের পরীক্ষা ও মেরামতের কাজ শুধু ভারতীয় বৈমানিকরাই করিত। হাডসন বিমানের ও এঞ্জিনের পরীক্ষা ও মেরামতের কাজ ভারতীয় ও ব্রিটিশ বিমান-বাহিনীর বৈমানিকরা মিলিয়া করিত। কাজের সুবিধার জন্য এবং কাজে যাহাতে ভুলভ্রান্তি না ঘটে, তাহার জন্য প্রত্যেক বিমানে যেমন সাত আট জন বৈমানিক মিলিয়া উড়িবার জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এক একটা দল সৃষ্টি করা হইয়াছিল, সেইরূপ এঞ্জিনিয়ার বৈমানিকদেরও প্রত্যেক বিমানের জন্য পৃথক দল প্রস্তুত হইল। প্রত্যেক দলে দুইজন এঞ্জিন মেরামতকারী (ফ্যাইট মেকানিক ই), একজন বিমান মেরামতকারী (ফাইট মেকানিক এ), এবং একজন করিয়া বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ও ইনষ্ট্রুমেন্ট মেরামতকারী রহিল। এবং এই কয়েকজনের কাজ তদারকি ও সাহায্যের জন্য একজন কর্পোরাল প্রত্যেক দলের সহিত যুক্ত হইল।

প্রত্যেক দলই চেষ্টা করিত কেমন করিয়া তাহাদের বিমান সব সময় উড়িবার জন্য প্রস্তুত থাকে। কাজেই মেরামতের কাজ সম্পন্ন করার জন্য কাহাকেও তাড়া দিবার প্রয়োজন হইত না। সকলেরই চেষ্টা ছিল নিজের কাজ শীঘ্র সুচারুরূপে সারিয়া দলের অপরকে সাহায্য করা এবং উড়িবার সময় বিমানে যদি কোন দোষ ত্রুটি নজরে আসিত তাহা হইলে সেই ত্রুটি শীঘ্র মেরামতের জন্য দলের সকলেই প্রাণপণ চেষ্টা করিত। এতে কোন দলের বিমান ভাল এই কথা লইয়া একটা বেশ রেষারেষির ভাব ছিল। কিন্তু সেই রেষারেষিতে কোন অবাঞ্ছনীয় কিছু ছিল না। বরং অনেক সময় এক দলের কাজ শেষ হইলে তাহারা অন্য দলের সাহায্যে আগাইয়া যাইত। এখানেও ভারতীয় বৈমানিকদের সর্ব্বদা চেষ্টা ছিল, কেমন করিয়া গোরাদের চেয়ে কাজ শুধু ভাল নয়, অল্প সময়ের মধ্যেও সম্পন্ন করা যায়। মেস বা ব্যারাকেও আলাপ হইত শুধু কাজের কথা লইয়া। কোন বিমানে নূতন ধরণের ত্রুটি দেখা গেলে, সকলেরই চেষ্টা হইত সেই ত্রুটির সমস্ত দিক বিচার করিয়া দেখা, যাহাতে ত্রুটির পুনরাবৃত্তি না হয়। কাজের মধ্যে দিনগুলি যে কেমন করিয়া পার হইয়া যাইত, তাহা ভাবিয়া দেখার সময় তখন ছিল না। দিনশেষে শুধু মনে হইত দিনগুলি আর একটু বড় হইলে ভাল হয়, আর একটু কাজ তাহা হইলে করা সম্ভব।

কোন কোন দিন নামিত বৃষ্টি, মুষলধারায় অবিরাম বৃষ্টি। একবার জোরে নামিলে দুই তিন ঘন্টার পূর্ব্বে থামিবার কোন লক্ষণই দেখা যাইত না। অবিরাম

বৃষ্টিতে আশপাশের গ্রাম নদী সব বৃষ্টি-জলে ভরিয়া যাইত। বিমান বন্দরের জমি পাশের গ্রামগুলি হইতে কয়েক ফিট উচ্চে ছিল। সেইজন্য পাশে গ্রাম নদী সব জলে ভরিয়া গেলেও উড়ন পথ বা বিমান রাখার যায়গায় জল জমিত না। বিমানগুলি রাখা হইত উড়নপথের চারিদিকে মাঠের মধ্যে। অবশ্য শুধু বিমান যাতায়াতের পথ ও রাখার স্থানটুকুই কংক্রীট করা ছিল। বিমান নেয়ামতের কাজের জন্য বড় ঘর বা হাঙ্গার ছিল না। সেইজন্য বৃষ্টির সময় বিমানের ডানার তলে বসিয়া বৃষ্টি থামা না পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। বৃষ্টির সময় বিমানের মধ্যে কেহই ঢুকিত না; কারণ তাহাতে বিমানের মধ্যে পায়ের সঙ্গে জল-কাদা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে; আর কাদা শুকাইলে বিমান উড়িবার সময় ধূলা হইয়া বৈমানিকের চক্ষুতে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, এই বিবেচনায় বিমান নেয়ামতকারী বৈমানিকরা নিজেরাই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বৃষ্টির সময় জল-কাদা পায়ে লইয়া বিমানের ভিতরে প্রবেশ করিত না, বরং ডানার তলায় থাকিয়া বৃষ্টিতে ভিজিত।

কখন কখন বৃষ্টি কয়েকদিন ধরিয়া সমানে বর্ষণ হইত। এমন এক দিনই ময়মনসিংহের ফ্লাইং অফিসার তরফেও হাডসন বিমানে বর্ষার বোমা ফেলিয়া আসিয়া চারবাটিয়াতে অবতরণের চেষ্টা করেন। আকাশ তখন মেঘে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ছিল। আর মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। মেঘের স্তর খুব নীচে, মাটির উপর হইতে দেড় বা দুইশত ফিট হইতে বেশী নয়। ইংরাজিতে এই অবস্থাকে বলে ক্লাউড এ্যাট ডেক লেভেল। কয়েক ঘন্টা ধরিয়া তিনি চারবাটিয়ার অবতরণ পথ দেখার চেষ্টা করেন; এমন কি কয়েকবার ঠিক উপর দিয়া গিয়াও বিমানবন্দরের আলো বা অন্য কোন নিদর্শন, মেঘের গভীরতার জন্য দেখিতে অসমর্থ হন। পেট্রল ফুরাইবার পর রাত্রে অন্ধকারে ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই তিনি বিমান না-জানা না-দেখিতে পাওয়া মাঠের উপর ধীরে ধীরে নামাইবার চেষ্টা করেন। তিন নম্বর ফ্লাইটে দমদমায় থাকা কালেই তাঁহাকে একবার ভীষণ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল। সেবার বাহন চার এঞ্জিনযুক্ত আটলান্টা বিমান, আর সময় দিনের বেলা। খুব নীচু দিয়া উড়িয়া সেবার ব্যারাকপুর রেল ষ্টেশনের ঢেউ খেলান ছাত দেখিয়া স্থান নিরূপণ সম্ভব হইয়াছিল। এবারকার খেলায় হাডসন বিমানে এঞ্জিন মোটে দুইটি হইলেও গতিবেগ আটলান্টার তুলনায় দ্বিগুণ আর সময় হইল রাত্রি।

ফলে কি হইয়াছিল তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। শুধু একটা প্রশ্ন মনে এখনও জাগিয়া আছে। চারবাটিয়ার বেতার বার্ত্তায় ষ্টেশন সময়মত তাঁহাকে দমদম বিমান বন্দরে যাইয়া অবতরণের নির্দ্দেশ কেন দেয় নাই। চারবাটিয়া বিমান বন্দরের কর্ত্তাদের নিশ্চয়ই মনে কোন সন্দেহ হওয়ার কারণ ছিল না যে ঝড়-বৃষ্টি অন্ততঃ দুই তিন

দিনের মধ্যে শেষ হইয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া যাইবে না। সময়মত নির্দ্দেশ পাইলে ফ্লাইং অফিসার ভগ দেও ও তাঁহার ক্রুরা এবং বিমান সকলেরই অক্ষত রহিবার যথেষ্ট আশা ছিল। ফ্লাইং অফিসার ভগদেওর ক্রুতে পাইলট অফিসার মুখার্জি ছিলেন বেতার বার্ত্তার অফিসার। তাঁহাদের নিবাস ছিল কলিকাতায়।

বিমান কুড়ালে কাটিয়া সকলের দেহ বাহির করিবার পর পাইলট অফিসার মুখার্জির দেহ কলিকাতায় আনিয়া তাঁহার আত্মীয়দের নিকট শেষকৃত্যের জন্য দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। গোয়ালের দেহ চারবাটিয়াতেই কবরস্থ করা হয়। টেইল গানার ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের একজন ইংরেজ জজের পুত্র। তাঁহার দেহও চারবাটিয়াতেই সমাহিত করা হয়। পরদিন অপরাহ্নে কুড়ালে বিমান কাটিয়া যখন তাঁহার দেহ বাহির করা হয় তখনও তাঁহার দেহ উষ্ণ ছিল। সব দেখিয়া মনে হয় আমাদের পৌঁছাইবার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, আর শেষ পর্য্যন্ত তিনি বিমান হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আর একটা প্রশ্ন আছে। বিমানে ক্রুদের সকলের নিকট প্যারাস্যুট ছিল। কেন তাঁহাদিগকে বিমান পরিত্যাগ করার নির্দ্দেশ দেওয়া হইল না? সাধারণতঃ এইরূপ অবস্থায় পেট্রল ফুরাইলে ক্রুরা বিমান ত্যাগ করিয়া প্যারাস্যুট অবলম্বনে মাটিতে নামে। পেট্রল থাকা সময়ে বিমান ত্যাগ করিলে পরে যেখানে বিমান পতিত হইবে সেখানে অগ্নিকাণ্ডের বিপদ আছে। সেইজন্য পেট্রল ফুরাইলেই বিমান ত্যাগ করিবার রীতি। বিপদে আচ্ছন্ন বিমানের কমাণ্ডারকে পেট্রল ফুরাইলে বিমান ত্যাগ করিয়া প্যারাস্যুট অবলম্বনে মাটিতে অবতরণের কথা মনে করাইয়া দেওয়াও বেতারবার্ত্তা ষ্টেশনের একটা অবশ্যকরণীয় কর্ত্তব্য।

পাইলট অফিসার মুখার্জির আত্মীয়দের এই দুর্ঘটনার সংবাদ দিলে, তাঁহারা নিজেরাই দেহ সৎকার করিতে চাহেন বলিয়া আবেদন জানান। সেইজন্য পাইলট অফিসার মুখার্জির দেহ কফিনের মধ্যে রাখিয়া ট্রেনে হাওড়া ষ্টেশনে পাঠান হয়। হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেন হইতে কফিনসমেত দেহ নামাইয়া পাইলট অফিসার মুখার্জির আত্মীয়দের নিকট পৌঁছানর ভার আমার উপর পড়িল। দমদম পর্য্যন্ত বিমানে উড়িয়া আসিয়া পরদিন প্রত্যূষে হাওড়া ষ্টেশনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে দেখি বন্ধুবর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ভগন ষ্টেশন ওয়াগন লইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। অভিবাদনের পর দুইজনে হাওড়া ষ্টেশনে চলিলাম। প্রায় ছয়টার সময় হাওড়া ব্রিজের এপারে আসিয়া দেখা গেল জাহাজ চলাচলের জন্য বেইলী ব্রিজ খোলা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিতে জানা গেল নয়টার পূর্ব্বে ব্রিজ পার হওয়া অসম্ভব। এদিকে কটকের ট্রেন সকাল সাতটার পূর্ব্বেই পৌঁছানর কথা। নদী পার হওয়ার

জন্য তখন নৌকা বা খেয়া ষ্টীমার পাওয়া গেল না। অগত্যা ষ্টেশন ওয়াগন ফিরাইয়া লওয়া হইল। শ্যামবাজার, দক্ষিণেশ্বর, বালি ব্রিজ পার হইয়া গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছান গেল। ততক্ষণ কটকের ট্রেন পৌঁছাইয়া গিয়াছে। স্পেশাল মালগাড়ীর কম্পার্টমেন্ট হইতে কাঠের তৈয়ারী কফিন বাক্স বাহির করিয়া সকলে চিন্তা করিতেছে কোথায় পাঠাইতে হইবে। আমরা কফিন বাক্স নামাইলাম। পাইলট অফিসার মুখার্জির আত্মীয়রা ষ্টেশনেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা কফিন বাক্স হইতে দেহ বাহির করিয়া লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের অনেক কষ্টে বুঝান সম্ভব হইল যে পাইলট অফিসার মুখার্জির অমন সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, বিমান পতনের ফলে এমনভাবে বিকৃত হইয়া গেছে যে সেই শব দেখিলে চিরজীবন একটা বিকৃত ভয়াবহ মূর্ত্তি তাঁহাদের মনে থাকিবে। সেইজন্য মূর্ত্তি না দেখাই শ্রেয়। আমাদের কথায় শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা রাজী হইলেন এবং কফিনশুদ্ধ দেহ ভস্মীভূত করা হইল।

অবিশ্রাম কাজ—অর্থাৎ বিমান মেরামত করা, আর পরে বিমান উড়িয়া তাহার কাজ বর্ম্মার উপকূলে শেষ করিয়া ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত,—অধীর হইয়া অপেক্ষা করা এবং অপেক্ষা করার সময় চিন্তা, বিমান কখন ফিরিয়া আসিবে, কেমন অবস্থায় ফিরিবে, ফিরিয়া আসিতে পারিবে ত, উড়ন্ত অবস্থায় থাকা কালে বিমানের কোন অংশ বিকল হইয়া যাইবে না ত,—ইত্যাদি নানা চিন্তায় নিজের কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাওয়ার অবস্থা হইল।

গোরা এঞ্জিনিয়ার বৈমানিকদের উপর আস্থা এখনও সম্পূর্ণ আসে নাই। তাহারা ভারতীয় বৈমানিকদের পছন্দ ত করে নাই উপরন্তু সহ্য পর্য্যন্ত করিতে পারে না, এই ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

যদিও আমাদের স্কোয়াড্রনের পঁচিশ ছাব্বিশটি ক্রুর মধ্যে অন্ততঃ বার চৌদ্দটির কমাণ্ডার ও বেতার-বার্ত্তা-পরিচালক ছিলেন ভারতীয়। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভারতীয়রা সব আমাদের এ ফ্ল্যাইটে ছিলেন।

চারঘাটিয়া বিমানবন্দরে অনেকগুলি অসুবিধা ছিল। কিন্তু সকলেই বিনা বাক্যে সকল অসুবিধা সহ্য করিয়া আপন কাজ সাধ্যমত সম্পন্ন করিয়াছে। পরিচালকের জন্য বৈমানিকের অভাবে আমাদের রসুইঘর একজন ওড়িয়া মুসলমান কন্ট্রাক্টরের হাতে ন্যস্ত ছিল। প্রথম প্রথম তিনি আমাদের উপর খুব হম্বিতম্বি করিতেন ও বরাদ্দ অনুযায়ী রেশন না দিয়া নিজের ইচ্ছামত করিতেন। অনেক সময় সন্ধ্যার পর কাজ সারিয়া ফিরিবার পর দেখা যাইত খাবার ঘর বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নিকটে কোন হোটেল বা অন্য কোন খাবারের দোকান না থাকাতে সে রাত্রি বিনা আহারে

থাকিতে হইত। ক্রমে ক্রমে জোয়াভ্রুন সীতার চৌধুরী কথাটা জানিতে পারিলেন। তখন কন্ট্রাক্টর বিদায় হইল ও একজন গোরা পাচকের হস্তে আমাদের রসুই ঘরের ব্যবস্থা ন্যস্ত করা হইল।

দ্বিতীয় অসুবিধার কারণ ছিল পরিষ্কৃত জলের অভাব। গোরারা পানীয় জলের অভাব কখনও বোধ করিত না, কারণ তাহারা কখনও জল পান করিত না। তাহারা হয় বগ-ভর্ত্তি চা অথবা বোতল হইতে পর্য্যাপ্ত তরল পদার্থ সেবন করিত। এ দেশে আসার পূর্ব্বে তাহাদিকে শিখাইয়া দেওয়া হইত যে এদেশের জল পানের উপযুক্ত নয়, পান করিলে অসুখ হইবে। পানীয় জলের অভাব আমাদেরকে খুব পীড়া দিত। স্নান করার জন্যও জল অপ্রচুর ছিল। আশেপাশে কয়েকটা ডোবা ছিল। প্রথম প্রথম আমরা ও গোরাদের কয়েকজন খুব উৎসাহের সাথে সেইগুলিতে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া সন্তরণ করিতাম। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে চামড়ার নানা স্থানে বিকার জন্মিয়াছে দেখা গেল। এইবার ডাক্তারের হুকুমে ডোবাগুলিতে ঝাঁপাঝাঁপি করা বন্ধ হইল। মাইল কয়েক দূরে মহানদী,—কিন্তু প্রথম হইতেই সেখানে স্নান ও সাঁতার ত দূরের কথা যাওয়াও বারণ ছিল; বিমানবাহিনীর ভাষায় আউট অব্ বাউণ্ডস্। কতদিন জলের অভাবে কালিঝুলি মাখা অবস্থাতেই রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছে। চর্ম্মরোগ গোরাদেরই বেশী হইত, বিশেষতঃ হাঁটুর নিচে পায়ে। বৃষ্টির সময় ও পরে আর একটি উৎপাত হইতে সাবধান থাকিতে হইত। সে উৎপাত হইল জোঁক। বিশাখাপটনমে কাঁকড়ার আকারের কাঁকড়াবিছা দেখিয়াছি, আর এখানে দেখিলাম চার পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ ব্যাসের কাল রংয়ের জোঁক। আমরা নাম দিয়াছিলাম মহিষাসুর জোঁক।

আমাদের স্কোয়াড্রনে ইণ্ডোর হইতে আগত ফ্লাইং অফিসার সাক্সি একজন কমাণ্ডার ছিলেন। একদিন বোমাবর্ষণ ও বর্ম্মার উপকূলে রক্ষিত জাপানী নৌবহর ও বিমানবন্দরের ছবি, ক্যামেরায় তুলিবার জন্য তাঁহাকে পাঠান হয়। এরূপ কাজে তিনি অনেকবার গিয়াছেন, এবং যথেষ্ট পারদর্শিতা ও দক্ষতাও অর্জ্জন করিয়াছেন। বর্ম্মা উপকূলের নিকটবর্ত্তী হইলেই সাধারণতঃ দুইটি কারণে বিমান অবতরণ করাইয়া মাটির কিছু উপর দিয়া বিমান চালনা করা হইত। প্রথমতঃ মাটির নিকটে থাকিলে, শত্রুপক্ষের বিমান পেটের তলা হইতে আক্রমণ করিতে পারিবে না, ও দ্বিতীয়তঃ আমাদের বিমানগুলি এমন সবুজ রং করা ছিল যে নিকটস্থ বনজঙ্গল ও বৃক্ষের সাথে রং মিলিয়া গিয়া এক হইয়া যাইত। কাজেই বেশী উচ্চে উড়ন্তরত শত্রু-বিমানের পক্ষে আমাদের বিমানের অস্তিত্ব বোঝা অসম্ভব হইত। যাহা হউক ফ্লাইং অফিসার সাক্সি নিয়মমাফিকই সেদিন উড়িতেছিলেন। এত সাবধানতা সত্ত্বেও ফ্লাইং অফিসার

সাব্বি সেদিন তিনখানা জিরো বিমানের নিকট ধরা পড়িয়া গেলেন। জাপানী বৈমানিকরা বোধহয় নূতন ধরণের বিমান উপলব্ধি করিয়া, গুলি মারিয়া বিমান ধ্বংস করিবার পরিবর্তে, বিমান ও বিমানের ক্রুদের ধরিয়া ফেলিবার মনস্থ করে। তিনটি জিরো বিমান দুইপাশে ও পশ্চাতের দিক হইতে আমাদের হাডসনকে ঘিরিয়া ফেলে ও অঙ্গুলি সঙ্কেতে বর্ম্মার উপকূলভাগ পার হইয়া নিকটস্থ এক নূতন বিমানবন্দর পর্য্যন্ত যাইতে আদেশ করে। ফ্লাইং অফিসার সাব্বি অনুপায় হইয়া তাহাদের নির্দ্দেশ মানিতে বাধ্য হন। গত্যন্তর ছিল না। একটু অনিচ্ছা প্রকাশ পাইলেই তিন জিরো মিলিয়া অচিরেই হাড্‌সন্‌কে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিতে পারিত। নূতন বিমানবন্দর তখন তৈয়ারী সম্পূর্ণ হয় নাই। অবতরণ পথের উপর জাপানী এঞ্জিনীয়াররা তখন পিচ চালিতেছিলেন। ফ্লাইং অফিসার সাব্বি অবতরণ পথে বিমান নামাইয়া ফেলেন ও ধীরে ধীরে বিমান ঘুরাইয়া লন। তাঁহাকে অবতরণ করাইয়া জাপানী জিরো বিমান তিনটি সোজা পূর্ব্বদিকে বর্ম্মার অভ্যন্তর ভাগে চলিয়া যায়, ও সেই সময় ফ্লাইং অফিসার সাব্বি দেখিতে পান যে কয়েকজন জাপানী পদাতিক সৈন্য তাঁহার বিমানের দিকে বন্দুক উঁচাইয়া আসিতেছে। আকাশের দিকে তাকাইয়া জিরো বিমান তিনটিকে দেখিতে না পাইয়া তিনি আর কালবিলম্ব করেন না। বিমান এঞ্জিন চালু অবস্থায় অবতরণ পথের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এঞ্জিন দুইটি পূর্ণ শক্তিতে চালু করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি অবতরণ পথ ত্যাগ করিয়া বিমান সমুদ্রের দিকে পশ্চিমে উড়ান। চারঘাটিয়ায় ফিরিয়া আসার পর বিমানের চাকা ও পেটের তলা হইতে অনেক জাপানী পিচ্ আমাদেরকে পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। আর বিমানের পশ্চাৎ দিকে কয়েকটা জাপানী ·২০২ (দুইশত দুই ইঞ্চি) বাপের রাইফেল গুলির আঘাত মেরামত করিতে হইয়াছিল। ফ্লাইং অফিসার সাব্বির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সেদিন আমাদের একটা হাড্‌সন ও সাতজন বৈমানিক জাপানী নির্য্যাতন হইতে বাঁচিয়া গেল।

এরপর একদিন আমাদের সাথী (sister) স্কোয়াড্রন তিনশত চুয়ান্ন নম্বরের একটি হাডসন বিমান উড়িয়া যাইবার জন্য অবতরণ পথের বেগে চলিতে সুরু করে। তখন সময় সকাল দশটা হইবে। সেই সময় অন্য কোন স্কোয়াড্রনের একটি হারিকেন ফাইটার বিমান অবতরণের জন্য নীচে নামিতে থাকে। কন্ট্রোল টাওয়ার প্রথমে হারিকেন বিমানের বৈমানিককে অবতরণ না করার জন্য বেতারে বলে। কিন্তু হারিকেন বিমানের চালক সে কথা গ্রাহ্য না করায় হারিকেনের দিকে লক্ষ্য করিয়া লাল রংয়ের কার্ত্তুজ ভেরী সাংকেতিক পিষ্টলে মারে। লালরংয়ের কার্ত্তুজ মারার উদ্দেশ্য হইল বিমান-চালককে জানান যে বিমান এখন অবতরণ করা মহা বিপজ্জনক। হারিকেন বিমানচালক কোন বাধাই মানিল না। আমরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া দেখিতে-

ছিলাম কি হয়। কয়েক সেকেণ্ডও অপেক্ষা করিতে হইল না। হারিকেন বিমান সোজা আসিয়া হাডসনের উপর অবতরণ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। দুই বিমান আলিঙ্গনাবস্থায় একসাথে জ্বলিয়া উঠিল। হাডসনে বোমা ছিল। দেখিতে দেখিতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে দুই বিমান নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, শুধু বিমানবন্দরের নানা স্থানে বিমান দুইটির খণ্ড খণ্ড অংশ পড়িয়া জ্বলিতে লাগিল। আর সংঘর্ষের স্থানে তৈল পেট্রল পড়িয়া ছিল বলিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আগুন জ্বলিয়া পরে তৈল পেট্রল শেষ হইলে নির্ব্বাপিত হইল। হাডসনের আটজন বৈমানিক ও হারিকেনের একজন বৈমানিক বোধ হয় কি হইল বুঝিবার পূর্ব্বেই অন্যলোকে গমন করিলেন। স্কুলে সার্জেন্ট নোলের শিখান সেই সতর্কবাণী সকলকে এই ঘটনায় মনে করাইয়া দিল। "যতই সাবধান হওনা কেন, আর একটু সাবধান হইতে পারিতে, তাহা হইলে তোমার সহ নয়টি জীবন নষ্ট হইত না।" এ সতর্কবাণী শুধু এঞ্জিনীয়ার বৈমানিকের উপরই প্রযোজ্য নয়, এ বাণী সকলের জীবনেই প্রযোজ্য। তিনশত চুয়ান্ন নম্বর স্কোয়াড্রনও আমাদের মত কোষ্টাল ডিফেন্স হাডসন স্কোয়াড্রন ছিল, কিন্তু আমাদের স্কোয়াড্রনের মত আধা-ভারতীয় ছিল না, সম্পূর্ণ ব্রিটিশ বিমানবাহিনীর অংশ ছিল।

উনিশশত বিয়াল্লিশ সনের আগষ্ট বিপ্লবের এক আখ্যায়িকা এখানে অসঙ্গত হইবে না বলিয়া আশা করি। তখন চারিদিকে নানা অসন্তোষ ও গোলমালের কথা শোনা যাইতেছিল। বিদ্রোহীরা কোথাও ট্রেন পুড়াইতেছে, কোথাও গবর্ণমেন্টের কাচারী বাড়ী ধ্বংস করিতেছে। প্রত্যহই সংবাদপত্রে নানা রকম উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ ভর্ত্তি হইয়া বাহির হইতেছে। আমরাও কিছু বিচলিত, কিন্তু আন্দোলন অসহযোগ বলিয়া, তাহাদের সাথে সহযোগ করিতে আমাদের সম্পূর্ণ আপত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। একদিন দুপ্রহরে স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার উইং কমাণ্ডার লিলির নিকট সংবাদ আসিল যে নিকটেই কোন গ্রাম্য থানা প্রায় একহাজার লোক আক্রমণ করিয়াছে। সেখানে হাজার লোকের সাথে যুঝিবার মত হাতিয়ার ও পুলিস নাই। কাজেই আমাদের স্কোয়াড্রনের ব্যোমহীম চারিখানা উড়াইয়া লইয়া ঐ হাজার লোকের জনতার উপর গুলি বর্ষণ করা হউক। জনতা গুলিবর্ষণে কাবু হইবে। তাহাদের নিকট আগ্নেয়াস্ত্র নাই, কাজেই খুব নীচে নামিয়া তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ করা সম্ভব হইবে, এবং এতেই জনতার উচিত শিক্ষা হইবে। উইং কমাণ্ডার লিলি এই বীরত্বের কাজের ভার দিয়া স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরীকে নিযুক্ত করিলেন। প্রায় দুইটা আড়াইটার সময় চারিখানা লম্বানাক ব্যোমহীম সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া উড়িয়া গেল। স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী নিজেই এই দুঃসাহসিক কাজের লীডার হইলেন। সন্ধ্যা লাগ লাগ সময়ে চারিখানা ব্যোমহীম কাজ সমাধা করিয়া ফিরিয়া আসিল। আমরা ভারতীয় বৈমানিক যাহারা বিমানে যাই নাই, তাহারা বেশ

উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছিলাম। কিন্তু অবতরণের পর স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরীর মুখ দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। তিনি শুধু মুখে বলিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, রিপোর্ট লিখিয়া দিলেন যে থানার চারিদিকে চারিখানা বিমান সমস্ত গুলি বর্ষণ করিয়াছে। তাঁহাদের বিমান আক্রমণ করিতেছে দেখিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া পালাইয়া গিয়াছে। হতাহতের সংখ্যা বিমান হইতে তাঁহাদের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়, ইত্যাদি। দুই একদিনের মধ্যেই আসল খবর জানা গেল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিমানবন্দর দেখা গেছে, ততক্ষণ তাঁহারা থানার দিকেই বিমান উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তারপর বিমানের মুখ ঘুরাইয়া সোজা পূর্ব্ব দিকে চলিয়া যান। সমুদ্রের উপর দিয়া কিছুদূর যাওয়ার পর সমস্ত গুলি সমুদ্রের ঢেউ লক্ষ করিয়া চারিখানা বিমানই বর্ষণ করে। যখন শেষ বিমান হইতে শেষ গুলি নিক্ষিপ্ত হইল, তখন তাঁহারা ফিরিয়া আসেন।

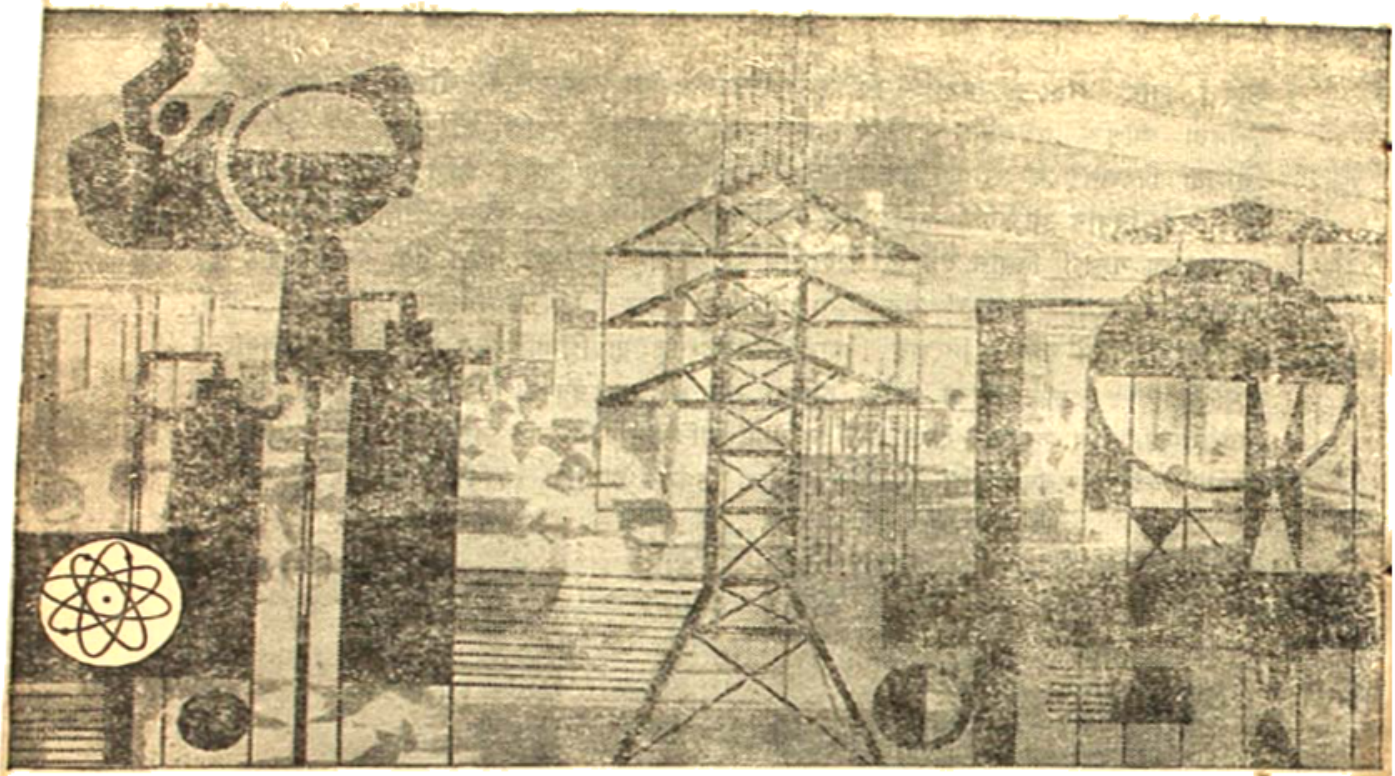

FROM BLUE PRINT TO INITIAL OPERATION

Kuljian's world-wide services in the field of consulting engineering range from preliminary surveys, site selection, feasibility reports, engineering studies, preliminary design to detailed plants and specifications, estimating and purchasing, management of construction and initial operation. ■ The Kuljian system of integrated engineering provides efficient and economical solution to all problems of an entrepreneur. Under one corporate roof Kuljian (India) maintains not only an able team of designers and experts in civil, mechanical, nuclear, electrical, architectural and chemical engineering, but also technicians, economists and management specialists who are equal to any exacting assignment anywhere in India. ■ Whatever be your project—a steel plant or an apartment house, a fertilizer plant or a thermal station, subway systems or transmission lines, let Kuljian do the job for you. It has the experience and the resources.

YOUR PARTNER IN PROGRESS

AN INDO-AMERICAN JOINT ENTERPRISE

The Kuljian Corporation (India) Private Ltd.

SURVEYS ■ REPORTS ■ DESIGN ■ ENGINEERING
■ PROCUREMENT ■ CONSTRUCTION ■ INSPECTION ■ INITIAL OPERATION

ENGINEERS • CONSTRUCTORS
24-B PARK STREET, CALCUTTA-16